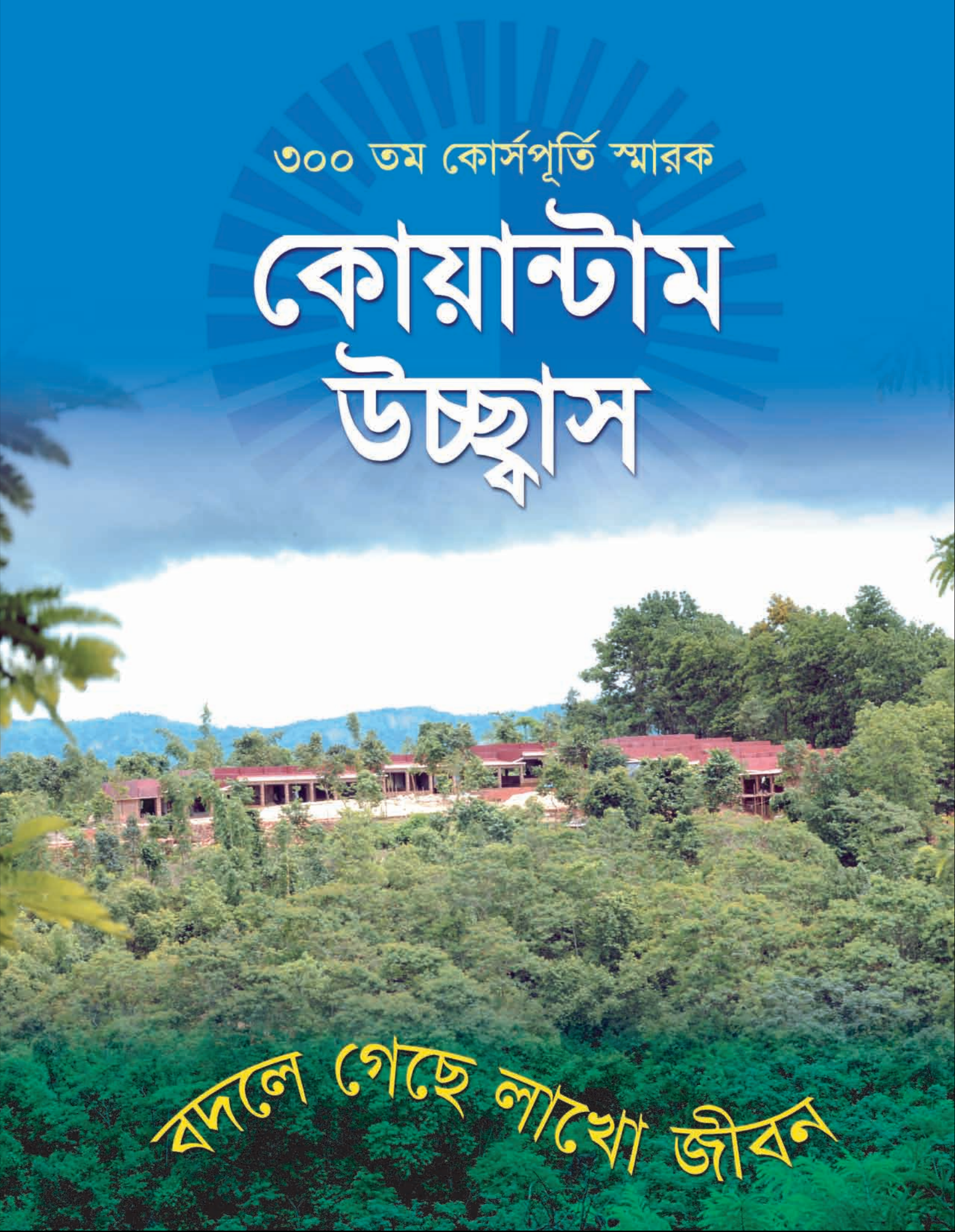
৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক

কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস



বদলে গেছে লাখো জীবন

যুগে যুগে
দেশে দেশে
মানবতার
কল্যাণে
আত্মত্যাগী
মানুষের
স্মরণে

তাঁরা তেল
হয়ে পুড়েছেন
তাই আমরা
আলোর
দিশা
পেয়েছি

আমরা এঁদের স্মরণ করি

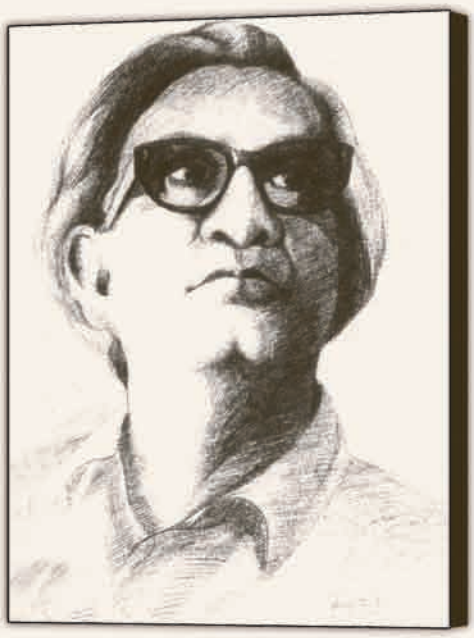
কোয়ান্টাম চেতনা বিকাশে এঁদের সমমর্মিতা ও সহযোগিতা অপরিসীম

ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এম ইউ আহমেদ

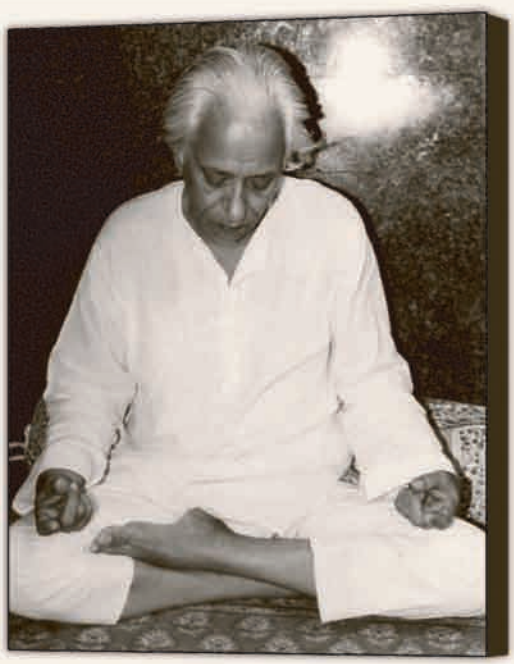


শিল্পী-গুরু রশীদ চৌধুরী





শিল্পাচার্য কামরুল হাসান



ধ্যানমগ্ন অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমান

বাংলা ॥ সোনালি অতীত

সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা। মাঠে মাঠে ফসল, হাওর বিল বোঝাই মাছ আর গাছে গাছে হাজার প্রজাতির পাখি। গোলাভরা ধান আর পুকুরভরা মাছ। পুঁথি-গান-বাঁশিতে মুখরিত বিকেল-সন্ধ্যা। বারো মাসে তেরো পার্বণ। প্রতিমাসেই উৎসব। কত প্রাচুর্য থাকলে এটা সম্ভব!

চুরি ছিনতাই বলে কিছু ছিলো না। রাতে ঘুমোতে গেলে দরজায় খিল লাগানোর প্রয়োজন কেউ মনে করতো না। পর্যটকরা সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ দিতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলতেন।

সভ্য বিশ্বে আভিজাত্যের প্রতীক বাংলার মসলিন। সওদাগররা সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতেন ময়ূরপঙ্ক্ষীর বাণিজ্যবহর নিয়ে। যখন ফিরতেন সৃষ্টি হতো আরেক আনন্দের হুল্লোড়। পৃথিবীর ৬ষ্ঠ সমৃদ্ধ জাতি। এই ছিলো বাংলার সোনালি অতীত।

মনছবি ॥ বাংলাদেশ

সবচেয়ে গরিব মানুষটিরও রয়েছে ৩ বেডরুমের বাড়ি, এয়ার কন্ডিশন্ড গাড়ি। যানজটমুক্ত সড়ক। বিশাল বিশাল ফ্লাইওভার। কম্পিউটারাইজ্ড নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আর রাস্তার গাড়ি সবই বাংলাদেশে তৈরি।

সকল মজা খাল-বিল-নদী পুনরুদ্ধার, নদীশাসন ব্যবস্থায় বিশাল বিশাল জলাশয় মাছে পরিপূর্ণ ও গ্রাম-গঞ্জ-শহর পাখির কলকাকলিতে মুখরিত। বন্যামুক্ত দিগন্তবিস্তৃত ভূমি পরিপূর্ণ শস্যে। দেশে দান বা যাকাত গ্রহণ করার মতো কোনো মানুষ নেই।

বারো মাসে আবার হচ্ছে তেরো পার্বণ। সারা পৃথিবী থেকে ছাত্র ও গবেষকরা আসছেন বাংলায় উচ্চতর গবেষণার জন্যে। বাংলাদেশের কোচরা ইউরোপ আমেরিকায় যাচ্ছেন খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দিতে। বিশ্বসংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে ঢাকা।

এক মানবিক মহাসমাজ। প্রত্যেকের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান নিশ্চিত। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-অঞ্চল নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের স্বাধীন আত্মবিকাশের অধিকার সুরক্ষিত।

কোটি মানুষের এখন এটাই স্বপ্ন।

সূচিপত্র

- শহীদ আল বোখারী মহাজাতক ॥ ৬
- কাজী আনোয়ার হোসেন ॥ ১০
- জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম ॥ ১১
- জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক ॥ ১২
- জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান ॥ ১৩
- বিচারপতি এ কে এম সাদেক ॥ ১৪
- অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ ॥ ১৫
- অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ॥ ১৬
- আল্লামা ড. এম শমশের আলী ॥ ১৭
- বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ॥ ১৮
- প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ॥ ১৯
- ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ॥ ২০
- প্রফেসর ডা. মো. নজরুল ইসলাম ॥ ২১
- বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ ॥ ২২
- এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার ॥ ২৩
- আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ॥ ২৪
- ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী ॥ ২৫
- প্রফেসর আনু মোহাম্মদ ॥ ২৬
- কামাল লোহানী ॥ ২৭
- রামেন্দু মজুমদার ॥ ২৮
- এডভোকেট সালমা আলী ॥ ২৯
- প্রফেসর ড. নুরুন্নবী ॥ ৩০
- আল্লামা শেখ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী ॥ ৩১
- আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা ॥ ৩২
- স্বামী স্থিরাত্মানন্দজী মহারাজ ॥ ৩৩
- শুদ্ধানন্দ মহাথের ॥ ৩৪
- অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ॥ ৩৫



- প্রশান্তি আনন্দ ও সাফল্যের পথে ॥ ৩৭
- শিক্ষায় সাফল্য ॥ ৬১
- সিগারেট কোমল পানীয় এনার্জি ড্রিংকস ও মাদককে 'না' বলুন ॥ ৬৭
- সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টাম ॥ ৭৩
- স্বতঃস্ফূর্ত নিরাময়ের পথে ॥ ৮১
- কোয়ান্টাম ব্যায়াম : নীরোগ দেহ তরতাজা মন ॥ ৯৫
- কোয়ান্টায়ন : আত্মজাগরণের অনুঘটক ॥ ৯৭
- কোয়ান্টাম হিলিং : দোয়া ও দানে কল্যাণ অফুরান ॥ ৯৮
- কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক : দাতার বহুমুখী কল্যাণে ॥ ১০২
- স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম : লাখো বিপন্নের ভরসাস্থল ॥ ১০৬
- সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় ॥ ১১১
- কোয়ান্টাম শিশুসদন : প্রতিটি শিশুর হোক আত্মপরিচয় ॥ ১১২
- শ্রমানন্দে করসেবা ॥ ১১৩
- কোয়ান্টাম পল্লী : সাধনার মনের বাড়ি ॥ ১১৪
- কোয়ান্টাম শিশুকানন : আঁধারে আলোর ফুল ॥ ১১৫
- লামা কোয়ান্টায়ন : হিরন্ময় মৌনতার পথে যাত্রা ॥ ১১৬
- কোয়ান্টাম সাফারি : ধ্যান ও ভ্রমণে একাকার মন ॥ ১১৭
- কোয়ান্টাম মেডিটেশন ক্যাসেট/সিডি : প্রশান্তির সুর লাখো প্রাণে ॥ ১১৮
- মঙ্গলবার আলোকায়ন ॥ ১২১
- শুক্রবার সাদাকায়ন ॥ ১২২
- এগিয়ে যান ধাপে ধাপে ॥ ১২৩
- কোয়ান্টামে নারী ॥ ১২৪
- কোয়ান্টাম পরিবার সুখী পরিবার ॥ ১২৫
- প্রবাসে মেডিটেশন ॥ ১২৭
- সেলিব্রেটি জগতে মেডিটেশন ॥ ১২৮
- ধ্যান মোরাকাবা মেডিটেশন : দেশে দেশে যুগে যুগে ॥ ১৩২
- বিজ্ঞানীদের বিশ্বদৃষ্টি ॥ ১৩৫
- প্রাচ্যের পদ্ধতিই বেশি কার্যকর : পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের সমীক্ষা ॥ ১৩৬
- ৩ যুগের দীর্ঘপথে ॥ ১৩৮
- গুণীজন ভাবনা ॥ ১৪২
- কোয়ান্টাম : নতুন সহস্রাব্দের জীবনযাপনের বিজ্ঞান ॥ ১৪৩
- কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট ॥ ১৪৪

কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস ☐ ৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক

সংকলন ও সম্পাদনা ☐ নাহার আল বোখারী

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা ☐ আবদুল্লাহ জুবাইর

প্রকাশক ☐ মায়িশা তাবাসসুম ॥ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

মুদ্রণ ☐ উইনডোজ প্রিন্টিং সেন্টার, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০১৭২০-৫১৫৮২৫

প্রকাশকাল ☐ ১৬ অক্টোবর ২০০৯ পরিমার্জিত সংস্করণ ☐ ১৪ এপ্রিল ২০১২

মূল্য ☐ ১৫০ টাকা

E-mail : info@quantummethod.org.bd Website : www.quantummethod.org.bd



কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস

পরম করুণাময়ের অসীম অনুগ্রহে সম্পন্ন হয়েছে কোয়ান্টাম মেথডের ৩০০ তম কোর্স। উদ্ভাবক কর্তৃক একা ৪ দিন ক্লাস নিয়ে ১৭ বছরে ৩০০ কোর্স সম্পন্ন করা পৃথিবীর ধ্যানচর্চার ইতিহাসে এই প্রথম। এ অবিস্মরণীয় সাফল্যের ফসল কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস।

কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস সৃষ্টির এ ১৭ বছরের যাত্রাপথে ফুল বা কাঁটা, আনুকূল্য বা বাধা, প্রশংসা বা নিন্দা কখনোই আমাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি। পরিস্থিতির আলোকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায়। তাই আমরা এগিয়ে গেছি ঝর্নার গতিময়তায়, সৃষ্টি হয়েছে সাফল্যের নতুন নতুন উদাহরণ।

কোয়ান্টামের যাত্রাপথে আমাদের মূল চালিকাশক্তি ছিলো মুক্ত বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি মানুষ এক বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনার আধার। বিশ্বাসের শক্তিকে জাগ্রত করে সে নিজেই পারে তার জীবনকে বদলে দিতে।

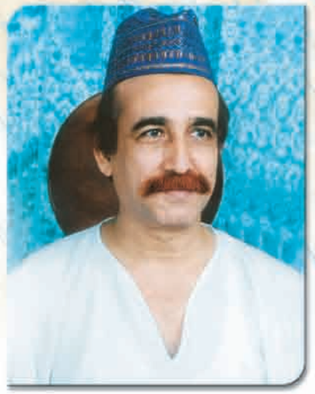
লাখো মানুষ এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে কোয়ান্টাম সূত্র প্রয়োগ করে তাদের জীবনকে বদলে দিয়েছেন। লালিত অভ্যাসচক্রের শৃঙ্খল ভেঙে ভয় উদ্বেগ রোগ শোক অভাব ব্যর্থতা হতাশা কাটিয়ে লাভ করেছেন অনাবিল প্রশান্তি। নেতিবাচকতা পুরোপুরি ভেসে গেছে শুকরিয়ার জোয়ারে।

কোয়ান্টাম তাদের পরিবার পেশা ও জীবনে এনেছে নতুন ছন্দ। সুস্থ ও সফল জীবনের পাশাপাশি তারা নিবেদিত হয়েছেন মানবতার সেবায়। পরিবারের সদস্য ও পরিচিতদের নিয়ে এসেছেন কোর্সে। সৃষ্টি করেছেন কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস।

৩০০ তম কোর্সপূর্তি স্মারক এ বিশ্বাস, এ অনুভব, এ অর্জন, এ সাফল্য, এ উচ্ছ্বাসেরই এক প্রামাণ্য দলিল।

মুক্ত বিশ্বাস বদলে দেয় জীবন

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক



শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন চর্চার পথিকৃৎ। নতুন সহস্রাব্দের জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথড-এর উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক।

একটাই তো জীবন। সুখ সাফল্য আনন্দ খ্যাতি পার্থিব বা আত্মিক যা কিছু অর্জন তা তো এই এক জীবনেরই ফসল। তাহলে রোগ শোক অভাব ব্যর্থতা হতাশাকে কেন প্রশ্রয় দেবেন? যেখানে আপনি নিজেই পারেন নিজের সবকিছু বদলে দিতে। আর জীবন বদলানোর জন্যে, সফল জীবনের পথে যাত্রা শুরুর জন্যে অনেক প্রস্তুতির কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থ-বিত্ত, বংশমর্যাদা, শান-শওকত, জ্ঞান-গরিমা, ডিগ্রি-পদবি না থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। প্রয়োজন শুধু মুক্ত বিশ্বাসের। মুক্ত বিশ্বাসই বদলে দিতে পারে আপনার জীবনের সবকিছুকে।

আমি পারি, আমি পারবো– ছোট্ট একটি বাক্য। কিন্তু এই ছোট বাক্যটির মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে সেটাই প্রভাবিত করে আপনার সকল কর্মকাণ্ড। ধরুন, আপনার বাড়ির সামনের রাস্তায় ১০০ ফুট লম্বা এবং ১ ফুট চওড়া ৬ ইঞ্চি পুরু একটি তক্তা বিছিয়ে বলা হলো, এর ওপর দিয়ে হেঁটে যান, আপনি কোনো দ্বিতীয় চিন্তা ছাড়াই হেঁটে যাবেন। কেউ বা হয়তো দৌড়ও দেবেন। কারণ আপনি বিশ্বাস করেন, আপনি জানেন যে, আপনি পারবেন। আপনার পা ফেলার জন্যে ১ ফুট চওড়া জায়গাই যথেষ্ট।

কিন্তু এ তক্তাটাই যদি রাস্তার এপারের বহুতল ভবনের ছাদ থেকে ওপারের বহুতল ভবনের ছাদে লাগিয়ে দেয়া হয়, আপনি এই ১০০ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবেন না। এক পা দুপা এগোনোর পরই হাত পা কাঁপতে শুরু করবে, মাথা ঘুরতে শুরু করবে। কাঁপতে কাঁপতে একসময় হয়তো পড়েই যাবেন, একাকার হয়ে যাবে আপনার হাড়-মাংস।

অথচ চোখের সামনেই আপনি দেখছেন একজন রাজমিস্ত্রি বাঁশ বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ৮/১০ তলা ভবনের দেয়াল প্লাস্টার করছে দুই বাঁশের মাঝখানে বিছানো এক ফুট চওড়া তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে। একজন কাঠমিস্ত্রি পাতলা কাঠের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে টিনের চাল বা ছনের ছাউনি লাগাচ্ছে। রাজমিস্ত্রি বা কাঠমিস্ত্রি ৮/১০ তলা ভবনের প্লাস্টার করতে গিয়ে বা টিনের চাল লাগাতে গিয়ে পড়ে গেছে, এমন কথা আপনি কখনো শুনেছেন? শোনেন নি। কেন? কারণ সে বিশ্বাস করে ৭০/৮০/১০০ ফুট ওপরের কাঠের তক্তায় দাঁড়িয়ে সে দেয়াল প্লাস্টার করতে পারবে, ছাদে উঠেও অনায়াসে টিন লাগাতে পারবে। বিশ্বাসই তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে এই স্বতঃস্ফূর্ত কর্মদক্ষতা।

স্বাভাবিকভাবেই আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, বিশ্বাস কীভাবে কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করে। এর বৈজ্ঞানিক উত্তর খুব সহজ। বিশ্বাসের প্রথম প্রভাব পড়ে মনে। মন প্রোগ্রাম পাঠায় মস্তিষ্কে। আর মস্তিষ্ক আপনার পারার ইচ্ছাটা বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে।

আবার আপনি প্রশ্ন করতে পারেন– মন কী? নোবেল পুরস্কারবিজয়ী নিউরোসায়েন্টিস্ট রজার স্পেরি 'Mind, Brain and Humanist Values' নিবন্ধে '৫০ কোটি বছরের বিবর্তনের সর্বোচ্চ অর্জন' বলে অভিহিত করেছেন মনকে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী স্যার জন একল্‌স 'Evolution of the Brain : Creation of the Self' গ্রন্থে মনকে বর্ণনা করেছেন আত্মসচেতন, সক্রিয়, অনুসন্ধিৎসু স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ারূপে। আর বিখ্যাত কানাডীয় নিউরোসার্জন ডা. ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড তার 'The Mystery of the Mind' গ্রন্থে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন 'মস্তিষ্ক হচ্ছে কম্পিউটার যা মনের প্রোগ্রাম অনুসারে পরিচালিত হয়।' তাই আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি– মন এক বিশাল স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা পরিচালিত করে মস্তিষ্ককে। আর মস্তিষ্ক পরিচালিত করে আপনার সকল শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমকে।

মস্তিষ্ককে নিউরোসায়েন্টিস্টরা সবচেয়ে আধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও কমপক্ষে ১০ লক্ষ গুণ শক্তিশালীরূপে বর্ণনা করেছেন। মস্তিষ্ক নিয়ে যত গবেষণা করছেন ততই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছেন বিশাল সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে তীরে ধেয়ে আসা ঢেউই কেবল তারা গুনছেন। এমনকি মস্তিষ্কের মাত্র একটি বিষয়ও যদি আমরা দেখি তাহলেও এর বিশাল কর্মক্ষমতা ও প্রতিটি মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারবো।

মস্তিষ্কে ১০০ বিলিয়ন নিউরোন সেল রয়েছে। প্রতিটি নিউরোন ১ হাজার থেকে ৫ লক্ষ নিউরোনের সাথে সংযুক্ত। প্রতিমুহূর্তে কমপক্ষে ১০০ ট্রিলিয়ন সংযোগ ঘটছে মস্তিষ্কে। প্রতিটি নিউরোন মস্তিষ্কের যেকোনো নিউরোনের সাথে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম। কতগুলো সংযোগ সম্ভব? যুক্তরাষ্ট্রে মেডিটেশন সংক্রান্ত গবেষণার অগ্রপথিক হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ডা. হার্বার্ট বেনসন খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, 'সংখ্যাটি হবে : ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এটাকে অন্যভাবেও দেখতে পারেন– আপনি আপনার টেবিলে একটার ওপর একটা সাধারণ সাইজের টাইপ করার কাগজ রাখুন। রাখতে থাকুন। এটা উঁচু হতে থাকবে। আপনি যদি আপনার মস্তিষ্কের সম্ভাব্য নিউরোন সংযোগ-সংখ্যার সমসংখ্যক কাগজ রাখতে যান, তাহলে কাগজের ঢিবি উঁচু হতে হতে চাঁদ পার হয়ে সৌরজগৎ পার হয়ে গ্যালাক্সি পার হয়ে যাবে। এমনকি আমাদের জানা মহাবিশ্বের সীমানা (১৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ) পার হয়ে যাবে। তারপরও কাগজ রয়ে যাবে।'

ড. বেনসনের এ বিবরণ থেকে মানব মস্তিষ্কের অফুরন্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি। নিউরোসায়েন্টিস্টরা সর্বশেষ গবেষণায় দেখেছেন, আপনি যখন আপনার মস্তিষ্কে নতুন বিশ্বাস, নতুন ধারণা, নতুন স্বপ্ন প্রদান করেন, তখন মস্তিষ্কের নিউরোনে নতুন সংযোগপথ রচিত হয়। একই বিশ্বাস, একই স্বপ্ন, একই ধারণা, একই কল্পনার পুনরাবৃত্তি এই সংযোগপথকে রাখে ব্যস্ত ও সক্রিয়। মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বদলে যায় মস্তিষ্কের কর্মকাঠামো। আপনার সকল মনোদৈহিক প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে শুরু করে লক্ষ্যের বাস্তবায়নে। সহজ-স্বতঃস্ফূর্ততায় আপনি আপনার কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। মুক্ত বিশ্বাসই আপনার সকল কর্মকাণ্ডে এভাবে সূচিত করে এই মৌলিক পরিবর্তন।

মুক্ত বিশ্বাস যদি সবকিছু এত সহজে বদলে দেয়, তাহলে দুর্দশাগ্রস্তরা, অভাবগ্রস্তরা, রোগ-শোকে ভারাক্রান্তরা কেন এই সহজ পথকে সহজে গ্রহণ করে না? কারণ খুব সহজ। তারা বিশ্বাস করে নেতিবাচকতায়। বিশ্বাস করে দুর্ভাগ্যে। বিশ্বাস করে অলীকে। বিশ্বাস করে প্রতারকদের। বিশ্বাস করে মূর্খদের। বিশ্বাস করে শয়তানকে। আর তাদের এই বিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত। ভালো কোনোকিছুকে তারা সহজে বিশ্বাস করতে পারে না। পারে না ইতিবাচক ভালো জিনিসকে গ্রহণ করতে। কল্যাণকর ভালো জিনিস দেখলেই তাদের মনে সন্দেহ জাগে। এত ভালো হয় কীভাবে! এত সহজ! ধর্মের ব্যাপারে এদের প্রশ্ন আছে। অধর্মের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। সত্যের ব্যাপারে এদের প্রশ্ন আছে। কিন্তু প্রচলিত মূর্খতা বা অবিদ্যার ব্যাপারে এদের কোনো প্রশ্ন নেই। ঈশ্বরের ব্যাপারে এদের মনে প্রশ্ন আছে। শয়তানের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। একজন নাস্তিককে জিজ্ঞেস করুন। দেখবেন সে ঈশ্বর সম্পর্কে এক হাজারটা প্রশ্ন করছে। তাকে জিজ্ঞেস করুন– শয়তান সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন আছে? দেখবেন তার মুখে কোনো কথা নেই।

দুর্দশাগ্রস্তরা কেন দুর্দশামুক্ত হতে পারে না? এককথায় বলা যায়, এরা নেতিবাচক কথায় বিশ্বাস করে বেশি। নেতিবাচক কথায় সহজে প্রভাবিত হয়ে যায়।

কয়েক বছর আগের ঘটনা। কোর্সের শেষদিন সবাই চলে যাওয়ার পরও এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। সুযোগ বুঝে কাছে এসে দুহাত জড়িয়ে ধরলেন। কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। একটু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছেন। চোখেমুখে একধরনের কৃতজ্ঞতা। একটু স্থির হয়ে বললেন, আমার এত বছরের সমস্যা যে এত সহজে সমাধান হয়ে যেতে পারে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তার কথায় জানলাম, ভদ্রলোক শান্তিনগর এলাকায় থাকেন ২০ বছর হবে। ফাউন্ডেশন অফিসের সামনের রাস্তা দিয়েই আসা-যাওয়া করেন প্রতিদিন। জিজ্ঞেস করলাম, এত বছর পরে কেন কোর্সে এলেন? আরো আগে এলে তো অনেক আগেই আপনি ভালো থাকতে পারতেন।

একটু ইতঃস্তত করার পর বললেন, দেখুন নানারকম কথা শুনেছি চারপাশ থেকে। একেকজন একেকরকম কথা বলেছেন। মাঝে মাঝে কৌতূহল যে একেবারে হয় নি তা-ও না। একবার ভেবেছিলাম নিজে একটু খোঁজখবর নেবো, কিন্তু পরে নাপিতের কথা শুনে আর সাহস হয় নি।

বিস্মিত হয়ে তাকালাম তার দিকে। জিজ্ঞেস করলাম, মেডিটেশনের সাথে নাপিতের সম্পর্ক কী? তিনি বললেন, দেখুন মহল্লার নাপিত। বহু বছর ধরে চুল কাটাই তার কাছে। একদিন চুল কাটাতে গিয়ে কথায় কথায় বললাম, দেখি একবার কোয়ান্টামে যাবো। সে হা হা করে উঠলো– স্যার! আর যা-ই করেন ঐখানে যাবেন না। শুনছি ঐখানে গেলে সব সন্ন্যাসী হইয়া যায়। ঈমান আমল সব নষ্ট হইয়া যায়। একেবারে বেদাতি কাজ। নাপিতের কথা শুনে মনে মনে বললাম– এমনিই কষ্টের শেষ নাই। আছে একটা ঈমান। তা-ও যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে আর থাকবে কী?

একটু হাসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এখন কী মনে হচ্ছে, ঈমান আছে না নাই? ভদ্রলোক বললেন, আর লজ্জা দিয়েন না। কোর্সে এসে শিখলাম, শোকর গোজার কীভাবে হতে হয়। গত দুইদিন নামাজে যে তৃপ্তি পেয়েছি তা সারা জীবনেও পাই নি।

স্বাভাবিকভাবেই আমার পরবর্তী প্রশ্ন হলো, তাহলে শেষ পর্যন্ত কোর্সে এলেন কীভাবে? তিনি বললেন, আমার এক বাল্যবন্ধু কিছুদিন আগে কোর্স করেছে। আমার সমস্যা দেখে সে আমাকে একরকম জোর করেই কোর্সে পাঠিয়েছে। বন্ধুর কথা বলতে বলতে তার চোখ আবার ছলছল করে উঠলো কৃতজ্ঞতায়। বললেন, সে-ই আমাকে বাঁচিয়েছে। মনে হচ্ছে বেহেশতের শান্তি। এত শান্তি আগে কখনো পাই নাই।

এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রত্যেক কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের ঝুলিতেই হয়তো আছে এমন অনেক ঘটনা।

দুর্দশার বৃত্তে বন্দিরা ভ্রান্ত বিশ্বাস, নেতিবাচক কথা, সন্দেহ-সংশয় দ্বারাই প্রভাবিত হয় বেশি। এরা ধর্মান্ধদের কথায়, চালবাজদের কথায়, শোষকদের কথায়, মূর্খদের কথায়, প্রতারকদের কথায়, দারোয়ানের কথায়, মুদি দোকানির কথায়, নাপিতের কথায় আরো সংশয়ী হয়ে ওঠে। নিজে অনুসন্ধান করে খোঁজখবর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্যম হারিয়ে ফেলে। আলোকিত আপনজনদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এরা এই শয়তান বা অকল্যাণের বৃত্ত থেকে বেরুতে পারে না। বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরও এদের সকল স্বপ্ন অধরা থেকে যায়।

তাই বুদ্ধিমান মানুষের মতো, লাখো সফল মানুষের মতো আপনিও বিশ্বাস করুন আপনিও পারবেন আপনার যেকোনো দুর্দশার বৃত্ত ভাঙতে। বিজ্ঞানী স্যার জন একল্‌সের ভাষায়, 'প্রতিটি মানবীয় সত্তা অনন্য। প্রতিটি সত্তা ঐশ্বরিক সৃষ্টি। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার বাইরেও মানুষের রয়েছে আত্মিক অস্তিত্ব। তার রয়েছে আত্মসচেতন, সক্রিয় ও অনুসন্ধিৎসু মন।' ('Brain and Conscious Experience' থেকে উদ্ধৃত)। আর মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা সম্পর্কে সামান্য একটু হলেও আপনি ধারণা পেয়েছেন।

অতএব সফল মানুষের মতো আপনি বিশ্বাস করুন আপনার অফুরন্ত সম্ভাবনায়, বিশ্বাস করুন সত্যে, বিশ্বাস করুন ইতিবাচকতায়, সৃজনশীলতায়, কল্যাণকামিতায়। আপনার আত্মিক ক্ষমতার সীমানা এখনো কেউ নির্ধারিত করতে পারে নি। কল্যাণশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার আপনার মধ্যেই রয়েছে।

বিশ্বাস করুন, মনোদৈহিক রোগগুলো থেকে আপনি নিমেষেই মুক্তি পেতে পারেন। আপনি মুক্তি পাবেন। সুস্থ জীবন আপনাকে স্বাগত জানাবে।

বিশ্বাস করুন, সারা পৃথিবী আপনার, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবেন। আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যেতে পারবেন।

বিশ্বাস করুন, যা চাইবেন তা-ই পাবেন। বিশ্বাস করুন অভাবমুক্ত সফল জীবন আপনার। সাফল্যের বরণমালা নিয়ে ভাগ্য আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে।

সকল সাফল্য সকল অর্জনের ভিত্তি হচ্ছে এই মুক্ত বিশ্বাস। ভ্রান্ত ধারণার শিকল ভেঙে মুক্ত বিশ্বাসে উপনীত হওয়াই হচ্ছে মানুষের আসল স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতাই আপনাকে নিয়ে যাবে আলোকিত মহিমান্বিত জীবনের পথে।

কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস

একটি বিশ্বাস একটি বাস্তবতা

শুরুর পুরোটাই ছিলো বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনায়, মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী দক্ষতায়, শরীরের অক্লান্ত কর্মক্ষমতায়, মনের বিরামহীন প্রচেষ্টায়, আত্মার বিশুদ্ধ সম্ভাবনায় আর স্রষ্টার অসীম করুণায়। বিশ্বাস ছিলো রোগকে সুস্থতায়, অভাবকে প্রাচুর্যে আর অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে। শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি বদলেই সে পারে জীবনকে সুস্থ সুন্দর সফল ও সুখী করতে।

১৭ বছর আগে এ বিশ্বাস নিয়েই আমরা সবাইকে ডাক দিয়েছিলাম। আসুন দৃষ্টিভঙ্গি বদলান। মনের অফুরন্ত শক্তিকে, মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে ব্যবহার করুন। শোক বলে কিছু থাকবে না। অশান্তি বলে কিছু থাকবে না। ৭০ ভাগ রোগ কোনোরকম ওষুধ ছাড়াই ভালো হয়ে যাবে। কারণ মনোদৈহিক রোগের শেকড়টাকে উপড়ে ফেলতে হয় মনের ভেতর থেকে। অধিকাংশই হাসাহাসি করেছেন এ নিয়ে। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম প্রথম দিনই অনুধাবন করেছিলেন কোয়ান্টাম মেথডের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। বলেছিলেন, কোয়ান্টাম মেথড আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক। উপকার হবে চমৎকার।

শুধুমাত্র প্রবল বিশ্বাস নিয়ে শুরু করলেও দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হতে সময় লাগে নি। প্রথম ব্যাচ থেকেই একের পর এক সাফল্য। দীর্ঘ অনিদ্রা দূর হয়ে গেল রাতে বিছানায় যেতে যেতেই। মাইগ্রেন মাইগ্রেশন নিয়ে চলে গেল ক্লাসরুম থেকেই। এজমা-শ্বাসকষ্ট দূর হয়ে গেল। ব্যাকপেইন ভালো হলো। বহু বছর পর আবার শুরু করলেন রুকু সেজদা দিয়ে নামাজ। হাঁটু ব্যথা, বাত ব্যথা চলে গেল। স্বাভাবিক হাঁটা চলাফেরা শুরু করলেন। বাইপাস অপারেশন না করিয়েই দিব্যি ভালো আছেন ১৫ বছর ধরে। কত বিচিত্র ক্রনিক ব্যাধি যে ভালো হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। উপকৃত হয়ে অনেকেই বলেন, এটা অলৌকিক। আসলে ভিত্তি বিশ্বাস হলেও প্রক্রিয়াটা পুরোপুরি বিজ্ঞান।

১৯৭৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. হার্বার্ট বেনসনের মেডিটেশন সংক্রান্ত অনুসন্ধানী গ্রন্থ The Relaxation Response প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ২৫ বছরপূর্তি সংস্করণের ভূমিকায় ২০০০ সালে ডা. বেনসন বলেন, আমরা বিগত বছরগুলোয় হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করেছি। দেখেছি শিথিলায়ন ও স্বপরিচর্যার (যেমন ব্যায়াম ও পুষ্টি) মাধ্যমে মনোদৈহিক ব্যাধিগুলোর উপশম বা পূর্ণ নিরাময় হতে পারে। এই খরচহীন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসাখাত থেকে বার্ষিক ৫০ বিলিয়ন ডলার বাঁচানো সম্ভব।

> এই উচ্ছ্বাস এই জোয়ার ঘটাবে আমাদের বিশ্বাস ও শাশ্বত নৈতিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ। আমাদের সাথে কোটি মানুষ বলবে আমরাও বিশ্বাস করি, আমরাও ভালো আছি।

ডা. বেনসন দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, হৃদরোগ, স্কিন এলার্জি, দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা, ব্রংকিয়াল এজমা, কফ, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়াবেটিস, আলসার, ঝিমানি, অবসাদ, হাইপারটেনশন, বন্ধ্যাত্ব, অনিদ্রা, বমিভাব, নার্ভাসনেস, সব ধরনের ব্যথা (মাথা ব্যথা, মেরুদণ্ডে ব্যথা, পেটে ব্যথা, পেশিতে ব্যথা, গিঁটে গিঁটে ব্যথা, অপারেশন পরবর্তী ব্যথা, ঘাড়, হাত ও পায়ে ব্যথা), পিরিয়ড পূর্ব যন্ত্রণা, রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস নিরাময় এবং ক্যান্সার ও এইডসের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্তিতে মনোদৈহিক নিরাময় প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকর।

কোয়ান্টামের শুরুতে যা ছিলো আমাদের বিশ্বাস, কোর্সের রোগমুক্তির হাজার হাজার উদাহরণে তা পরিণত হয়েছে বাস্তবতায়। আর আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার স্বর্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের ডা. বেনসন, ডা. কাবাত জিন, ডা. কার্ল সিমনটন, ডা. রিচার্ড ডেভিডসন, ডা. ডেভিড ওরমে জনসন, ডা. জন রবিন্স, ডা. বার্নি সীজেল, ডা. ডীন অরনিশ প্রমুখের গবেষণায় আমাদের বিশ্বাসই পরিণত হয়েছে পরীক্ষিত বিজ্ঞানে। ডা. বেনসনের গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯২ সালে তাকে হার্ভার্ড প্রফেসরশিপ প্রদান করা হয়। হার্ভার্ডে মাইন্ড-বডি মেডিকেল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সকল ক্রনিক ব্যথা নিরাময়ে শিথিলায়নকে চিকিৎসাপ্রক্রিয়ার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ অফ রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সিনেটে ডা. বেনসনের সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালে 'সেন্টার ফর মাইন্ড বডি ইন্টারেকশন এন্ড হেলথ' স্থাপনের জন্যে সরকার ১০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেন।

ডা. বেনসন তার বইয়ের নতুন সংস্করণের ভূমিকায় লেখেন, '১৯৭৫ সালে ৭ শতাংশ আমেরিকান শিথিলায়নের চর্চা করতো। এখন ভালো থাকার জন্যে শিথিলায়নের চর্চা করে ৩৩ শতাংশ মানুষ।' ... 'যুক্তরাষ্ট্রের ৬৬ শতাংশ ডাক্তার এখন রোগীদের শিথিলায়ন ও মনোদৈহিক নিরাময় প্রক্রিয়ার পরামর্শ দেন।' ... '২০২৫ সাল এবং তারপর? নিঃসন্দেহে ওষুধ ও সার্জারির মধ্যে আসবে অনেক পরিবর্তন। কিন্তু আমি নিশ্চিত. মন-দেহের অফুরন্ত আত্মনিরাময় ও পুনরুজ্জীবনী ক্ষমতায় আমাদের অটল বিশ্বাসের বিজয় কেতন উড়বে অনন্তকাল ধরে।'

আসলে মন-দেহের অফুরন্ত পুনরুজ্জীবনী ক্ষমতা ও বিশ্বাসের শক্তিই সকল মানবীয় সম্ভাবনাকে বাস্তবরূপ দেয়। এই শক্তি প্রয়োগ করেই গত ১৭ বছরে হাজার হাজার মানুষ বেকারত্বকে কর্মমুখর জীবনে, সমস্যাকে নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করেছেন। ঋণজর্জরিত অবস্থা থেকে প্রাচুর্যবান হয়েছেন। দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ পারিবারিক জীবনকে প্রশান্তির নীড়ে রূপান্তরিত করেছেন।

কোয়ান্টাম মন-দেহের অফুরন্ত পুনরুজ্জীবনী ক্ষমতাকেই লাখো মানুষের ব্যক্তিজীবনকে বদলে দেয়ার পাশাপাশি প্রয়োগ করেছে সামগ্রিক কল্যাণে। পরিবার ও সমাজ জীবনের অবিদ্যা ও ভ্রান্তবিশ্বাসের অন্ধকারকে আলোকিত করেছে মুক্ত বিশ্বাসের আলোয়। মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী বলেই কোয়ান্টাম সকল ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করে। সকল মতের সকল পথের গুণীজনদের স্বাগত জানায়।

কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক। স্থান কাল ভাষা পরিবেশ অনুসারে ধর্মাচারে পার্থক্য রয়েছে। স্বধর্ম পালন ও অন্যের ধর্মপালনের অধিকার নিশ্চিত করাই ধর্মের শিক্ষা। কোরআন কণিকার পাশাপাশি বেদ কণিকা, বাইবেল কণিকা, ধম্মপদ কণিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সকল ধর্মের প্রতি কোয়ান্টামের শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

প্রচলিত ধারণা ছিলো, আমাদের দেশে কোনো প্রোগ্রাম সময়মতো শুরু করা সম্ভব নয়। আমরা বিশ্বাস করেছি সময়মতো শুরু এবং শেষ করা সম্ভব। ৩০০ কোর্সে ১,২০০ দিন, বিভিন্ন কার্যক্রমে অন্তত আরো ১,৫০০ দিন অর্থাৎ ১৭ বছরে অন্তত ২,৭০০ দিন প্রতিটি প্রোগ্রাম সময়মতো শুরু হয়েছে কারো জন্যে অপেক্ষা না করেই। ঝড় শিলাবৃষ্টি বন্যা জলোচ্ছ্বাস সিডর তুষারপাত ভূমিকম্প হরতাল ধর্মঘট কারফিউ সবক্ষেত্রেই আমরা নিয়মের মধ্যে থেকে সময়মতো নির্ধারিত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছি।

বিদেশি বা সরকারি অনুদান ছাড়া কোনো সেবামূলক কাজ করা সম্ভব নয়– এ ধারণাকে আমরা ভুল প্রমাণিত করেছি। আমরা বিশ্বাস করেছি স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা, স্ব-অর্থায়নে যেকোনো সেবামূলক কাজ করা সম্ভব। আমরা বিশ্বাস করেছি ভালো কাজে কখনো অর্থের অভাব হয় না। কখনো অর্থের অভাব হয় নি। অর্থ সংগ্রহের জন্যে আমরা ব্যবহার করেছি একেবারে দেশজ মাটির ব্যাংক।

আমরা বিশ্বাস করেছি আমরা দাতার জাতি। আয়ব্যয়ের স্বচ্ছতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলে জাতিগতভাবেই আমরা দিল খুলে দিতে পারি। এর একটি ছোট্ট প্রমাণ হচ্ছে মাটির ব্যাংক। মাটির ব্যাংক থেকে সংগৃহীত দানের পরিমাণ এখন গড়ে দিনে লাখ টাকার ওপরে। বন্যা, সিডর, জলোচ্ছ্বাস, স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম যখনই অর্থের প্রয়োজন হয়েছে, তখনই সদস্যরা এগিয়ে এসেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, মহিলারা তাদের হাতের বালা, গলার হার খুলে দিয়েছেন অবলীলায়।

সেবার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম সবসময়ই বেছে নিয়েছে কঠিন ব্যতিক্রমী কাজগুলোকে। দেশে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে যখন এক ধরনের স্থবিরতা চলছিলো, কোয়ান্টাম তখন দৃঢ়বিশ্বাসে কাজ শুরু করে। কোয়ান্টামের ডোনার পুল এখন দেশের সবচেয়ে সংগঠিত ও বড় ব্লাড ডোনার পুল। এই ডোনাররা বাঁচাতে সাহায্য করেছেন প্রায় আড়াই লাখ জীবন। আজ রক্তের প্রয়োজনে প্রথমেই মানুষ ছুটে আসে কোয়ান্টাম ল্যাবে।

লামার কোয়ান্টাম পল্লীও এমনি এক অসম্ভব সম্ভব হওয়ার নাম। ১০ বছর আগে তা ছিলো সে এলাকার সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর, অনুর্বর রুক্ষ পোড়া পাহাড়। মশা-ম্যালেরিয়া ছিলো নিত্যদিনের সঙ্গী। বর্ষার সময় পিচ্ছিল পাহাড়ি পথে ৭/৮ কিলোমিটার হেঁটে যেতে হতো। আর এখন কোয়ান্টাম পল্লী এক বিকাশমান আলোকিত জনপদ। গাড়ি যায় গেট পর্যন্ত। গোটা পল্লী সংযুক্ত পাকা রাস্তা আর সিঁড়িতে। সারি সারি নিমগাছ। মশা-ম্যালেরিয়া নেই। পার্বত্য অঞ্চলের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর এলাকা। পল্লীতে ঢুকলেই মুহূর্তে সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। ভালোলাগার এক অপার্থিব অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হন সবাই। শত শত বঞ্চিত শিশু-কিশোর এখানে স্বপ্ন দেখে সোনালি আগামীর।

সকল আপাত অসম্ভব সম্ভবের পেছনে আমাদের শক্তি ছিলো বিশ্বাস। এ বিশ্বাস ছিলো মানুষের ভালত্বের ওপর, জাতিসত্তার মহত্ত্বের ওপর। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোথাও আমাদের সাধারণ মানুষের মতো ভালো মানুষ নেই। আমাদের তরুণদের চেয়ে ভালো তরুণ নেই। এত অভাব এত দারিদ্র তারপরও এত দয়া এত মায়া এত সমমর্মিতা। কারণ ধ্যান আর ধর্মের পূণ্যভূমি এই বাংলা। বরেন্দ্রভূমি থেকেই একসময় শাসিত হতো উপমহাদেশের বিশাল অংশ। সদাচারী পূর্বসূরীদের রক্ত প্রবাহিত আমাদের ধমনীতে। ফলে আমরা দিতে জানি, আমরা পারি অন্যের জন্যে ত্যাগ করতে।

কোয়ান্টামের ১৭ বছর এই ত্যাগ ও সমমর্মিতার আধুনিক উদাহরণ। একই ফি দিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। অনেক আগে এসে পছন্দের জায়গায় বসেছেন। প্রবীণ/বয়স্ক অনেকেই হয়তো পরে এসেছেন। কোনো চেয়ার ফাঁকা নেই। কাউকে কিছু বলতে হয় নি। তরুণ তরুণীরা নীরবে বয়স্কদের জন্যে চেয়ার ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে বসেছেন। এ ঘটনা নিত্যদিনের।

এক হলে জায়গা না হওয়ায় ওপরে নিচে দুটো হলে আখেরি দোয়ার অনুষ্ঠান হচ্ছে। নিচের হল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সাউন্ড সিস্টেম সুন্দর। ওপরে গরম, জানালা খোলা। বাইরের শব্দ। সাউন্ড সিস্টেম অপর্যাপ্ত। ১৩শ মানুষ ঘেমে একাকার। ১৫/২০ জন পরদিনের কার্ড নিয়ে চলে গেলেন। বাকি সবাই সারাদিন সেখানেই কাটালেন। নিচের শীতাতপের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েও কারো কোনো উত্তেজনা বা প্রতিক্রিয়া নেই। দোয়ায় নিমগ্ন থাকলেন সারাটা সময়।

নেতিবাচকতা ও হতাশায় ভরা সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা বলেছিলাম, 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ! বেশ ভালো আছি। আমাদের সাথে আসুন আপনিও ভালো থাকবেন'। কারণ আমরা জানি ভালো থাকার রহস্য। আমরা জানি 'মন-দেহের অফুরন্ত পুনরুজ্জীবনী ক্ষমতা' কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া। পরিচিতরা সেদিন আমাদের 'পাগল' বলে সম্বোধন করেছিলো।

১৯৭৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. বেনসনও সহকর্মী ডাক্তারদের কাছে সম্বোধিত হয়েছিলেন পাগল বলে। ২৫ বছরের মধ্যে তার মাইন্ড-বডি সিস্টেম প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে। সরকারিভাবে একে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসাব্যবস্থার সাথে।

আমরাও পাগল অভিধায় হেসেছি। নিজেদের বিশ্বাসে অটল থেকেছি। নিরলস কাজ করেছি। অল্প অল্প করে মানুষ এসেছেন। জীবন বদলে গেছে তাদের। তারা তাদের আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে এসেছেন। ধীরে ধীরে কোয়ান্টাম পরিবার বড় হয়েছে। ভালোর সাথে জড়ো হয়েছে বৈচিত্র। বহুমুখী হয়েছে আত্মনির্মাণ ও সৃষ্টির সেবার কর্মকাণ্ড। ব্যক্তির মন-দেহের অফুরন্ত পুনরুজ্জীবনী ক্ষমতা রূপ নিয়েছে সঙ্ঘশক্তির অপরিমেয় সামর্থ্যে।

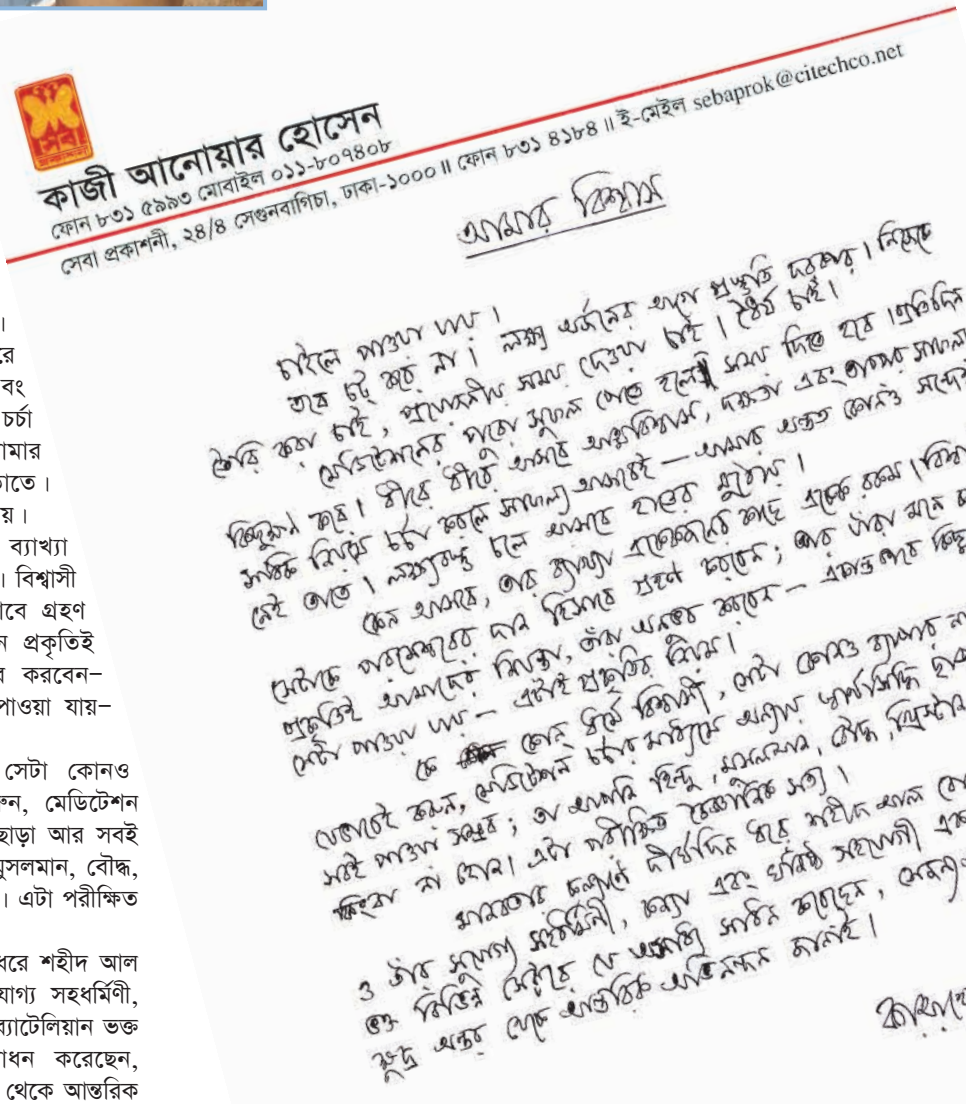
সঙ্ঘশক্তির সুঅনুরণন নিজের ভালো থাকার পাশাপাশি সৃষ্টি করেছে সবাইকে ভালো রাখার আকুতি। লাখো মানুষের হৃদয়ের এই আকুতিই সৃষ্টি করেছে কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস, সৃষ্টি করেছে কল্যাণশক্তির জোয়ার। এই উচ্ছ্বাস এই জোয়ার ঘটাবে আমাদের বিশ্বাস ও শাশ্বত নৈতিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ। আমাদের সাথে কোটি মানুষ বলবে আমরাও বিশ্বাস করি, আমরাও ভালো আছি।



আমার বিশ্বাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশে আত্ম উন্নয়নমূলক সাহিত্যের পথিকৃৎ কাজী আনোয়ার হোসেন। বিদ্যুৎ মিত্র ছদ্মনামে কাজী আনোয়ার হোসেনই বাংলা ভাষায় আত্ম উন্নয়ন ও মননিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করেন। বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত রহস্য সিরিজ 'মাসুদ রানা'র স্রষ্টা তিনি। বাংলাদেশে সুলভে বই প্রবর্তনও করেন তিনি। তিনি বহুল প্রচারিত 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'র সম্পাদক। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণে তিনি পর্যবেক্ষক হিসেবে চারদিন নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মহাজাতক একজন সাধক আর কোয়ান্টাম মেথড আমাদের দেশের মানুষের উপযোগী এক চমৎকার মেডিটেশন ও মননিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ৩০০ তম কোর্সপূর্তিকে তিনি কোয়ান্টাম মেথডের এক অবিস্মরণীয় সাফল্য বলে অভিনন্দিত করেন। অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটালেও তিনি নিয়মিত মেডিটেশন করেন।



চাইলে পাওয়া যায়। তবে চট্ করে না। লক্ষ্য অর্জনের আগে প্রস্তুতি দরকার। নিজেকে তৈরি করা চাই, প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া চাই। ধৈর্য চাই।

মেডিটেশনের পুরো সুফল পেতে হলে সময় দিতে হবে। প্রতিদিন কিছুক্ষণ করে। ধীরে ধীরে আসবে আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা এবং তারপর সাফল্য। সঠিক নিয়মে চর্চা করলে সাফল্য আসবেই– আমার অন্তত কোনও সন্দেহ নেই তাতে। লক্ষ্যবস্তু চলে আসবে হাতের মুঠোয়।

কেন আসবে, তার ব্যাখ্যা একেকজনের কাছে একেক রকম। বিশ্বাসী সেটাকে পরমেশ্বরের দান হিসাবে গ্রহণ করবেন; আর যাঁরা মনে করেন প্রকৃতিই আমাদের নিয়ন্তা, তাঁরা অনুভব করবেন– একান্তভাবে কিছু চাইলে সেটা পাওয়া যায়– এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

কে কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী, সেটা কোনও ব্যাপার নয়– যে যেভাবেই করুন, মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে অন্যায় স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর সবই পাওয়া সম্ভব; তা আপনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যাই হোন কিংবা না হোন। এটা পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য।

মানবতার কল্যাণে দীর্ঘদিন ধরে শহীদ আল বোখারী মহাজাতক ও তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী, কন্যা এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগী এক ব্যাটেলিয়ান ভক্ত বিভিন্ন সেক্টরে যে অসাধ্য সাধন করেছেন, সেজন্যে আমি আমার ক্ষুদ্র অন্তর থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

কোয়ান্টাম : প্রশান্তি ও সুস্থতার সুবাতাস

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম



[জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম এদেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা বিদ্যাপীঠ আইপিজিএমআর (বিএসএমএমইউ)-এর রূপকার– ফাউন্ডিং ফাদার হিসেবেই কেবল নন, অসামান্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও তৃতীয় বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাতীয় ওষুধনীতির অন্যতম প্রণেতা হিসেবেও বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পদকসহ দেশ-বিদেশের বহু পদকে ভূষিত হয়েছেন। বাংলাদেশে ধূমপান বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ ডা. নুরুল ইসলাম। বিশ্বনন্দিত 'আধুনিক', আইএইচএস এবং ইউএসটিসির (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম) তিনি প্রতিষ্ঠাতা-উপাচার্য। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউএসটিসি। আন্তর্জাতিক মানের এই বিশ্ববিদ্যালয় তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি]

কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে সদ্য এমবিবিএস করে ঢাকায় চাকরি খুঁজছি। হঠাৎ মেজভাইয়ের টেলিগ্রাম– মাদার হোপলেস, কাম। 'মায়ের বাঁচার আশা নেই। চলে এসো।' সঙ্গে সঙ্গে বিমান অফিসে গিয়ে শুনি মাত্র ২/৩ মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে যাবে ঢাকা-চট্টগ্রাম ফ্লাইট। রাতে ট্রেনে যাওয়া ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই।

পরদিন ভোরবেলা বাড়ি পৌঁছে দেখি মা অজ্ঞান। ৮/১০ দিন ধরে অবিরাম জ্বর। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। বুঝলাম এটা সন্নিপাত জ্বর। ইতোমধ্যে পরিবারের আরেকজন ডাক্তারের পরামর্শমতে একজন শহরে গেছেন ক্লোরোমাইসেটিন আনতে। কিন্তু ওষুধ আনার পর দেখা দিলো আরেক বিপত্তি। ক্যাপসুল মুখে খাওয়ানো সম্ভব নয়। আর তখনও এর ইনজেকশন আবিষ্কার হয় নি। হঠাৎ মাথায় এলো নাকের ভেতর দিয়ে পেটে টিউব ঢুকিয়ে ওষুধ দেয়া যেতে পারে। ক্যাপসুল ভেঙে দুধের সাথে মিশিয়ে সিরিঞ্জ দিয়ে টিউবের মাধ্যমে ওষুধ খাওয়াবো ঠিক করলাম। আত্মীয়স্বজনরা আপত্তি করলো। এমন একটা লম্বা টিউব নাকের ভেতর দিয়ে পেটে ঢোকানো স্বভাবতই তাদের কল্পনার বাইরে।

সবাইকে ঘর থেকে বের করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিলাম। টিউব দিতে কোনো অসুবিধা হলো না। ছ-ঘণ্টা পরপর ক্লোরোমাইসেটিন দিতে লাগলাম। সারাক্ষণই আমি বা আরেকজন পর্যবেক্ষণে থাকতাম। দিন-তিনেক পর একদিন ভোরবেলা দেখি মা চোখ মেলে তাকালেন। আর কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থও হয়ে উঠলেন। আমার মা গুলমেহের বেগম এরপরও বেঁচে ছিলেন ৩৮ বছর। ১৯৯০ সালে ৯৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান। আমার পেশাজীবনের প্রথম রোগী মা-কে সুস্থ করে তোলা আমার এক পরম সৌভাগ্য।

৪ বছর বয়সে বাবাকে হারানোর পর মা-ই ছিলেন আমার সব। মায়ের দোয়ায় অটল বিশ্বাস এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত আমাকে সমস্ত অন্যায়-অবিচার, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার মনে চিরদিন অক্ষুণ্ন ছিলো। হয়েছেও তা-ই। মেট্রিক পাশের পর যখন কলেজে পড়ার কথা উঠলো শুরু হলো অনিশ্চয়তা। গ্রামে পড়াশুনা করতে পয়সাকড়ি লাগে নি। কিন্তু শহরে জীবনযাপন আলাদা। বই-পত্র, থাকা-খাওয়া, আসা-যাওয়া সবকিছুতেই টাকা লাগে। কী করবো ভেবে মন খারাপ করছি। এমন সময় বড় ভাই কলকাতা থেকে চিঠি লিখলেন, আমার পড়াশোনার ব্যবস্থা কলকাতায় হবে। ভর্তি হলাম কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে।

ইসলামিয়া কলেজে প্রতিটি ছাত্রকে শেরওয়ানি পরতে হতো। এটা ছিলো বাধ্যতামূলক। নইলে উপস্থিতি গণ্য করা হতো না। আমার ছোটমামার একটা পুরনো শেরওয়ানি যোগাড় করলাম। কিন্তু গায়ে দিয়ে দেখি অনেক জায়গায় ছেঁড়া! শেষমেশ বুদ্ধি করলাম শুধু রোলকল পর্যন্ত এটা গায়ে রাখবো। রোলকলের পর খুলে পাশে রেখে দিতাম। একবার এর জন্যে ক্লাসে উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত হতে হলো। তারপরও কলেজের দুটি বছর ছেঁড়া পুরনো শেরওয়ানি দিয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ পোশাকের পেছনে অত খরচ করার সঙ্গতি আমার ছিলো না।

ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিলো ডাক্তারি পড়বো। আইএসসি রেজাল্টের পর কলকাতায় এসে শুনি মেডিকেল কলেজে ভর্তির ফরম নেয়ার তারিখ শেষ। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। গুরুজনরা পরামর্শ দিলেন বি এ পড়তে। আমি মেনে নিতে পারলাম না। সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে সচিবের সঙ্গে দেখা করে সমস্যার কথা বললাম। কিন্তু বার বার গিয়েও তার সহানুভূতি পেলাম না। শেষমেষ মরিয়া হয়ে দেখা করলাম কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে। তাকে সবকিছু খুলে বলতেই তিনি সেই সচিবকে ডেকে আমাকে ফরম দিতে বললেন। এ ঘটনা থেকে আমি শিক্ষা নিলাম যে, সৎ প্রচেষ্টা সফলতা আনে। সেদিন নির্ভয়ে এগিয়ে না গেলে জীবন হয়তো অন্যরকম হতো।

পেশাগত জীবনে অনেক অপ্রত্যাশিত সুযোগ যেমন এসেছে তেমনি এসেছে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত অন্যায় অবিচার বিরোধিতা। কিন্তু আমি কখনো ধৈর্যহারা হই নি। নীরবে কাজ করে গেছি আর প্রতিকারের অপেক্ষা করেছি। কারণ আমি বিশ্বাস করেছি, প্রতিভা আপন গতিতে প্রবাহিত হতে পারে এবং একদিন না একদিন প্রতিষ্ঠিত হবেই। আর এক সুযোগ হাতছাড়া হলে তার প্রতিদানে আরো একাধিক সুযোগ এবং সম্ভাবনা আসে– এটি আমি আমার জীবন-অভিজ্ঞতায়ই দেখেছি।

সৎপথে থেকে সাহসের সাথে এগিয়ে চলা আমার স্বভাব। আমার মতে– আন্তরিকতা এবং জীবনস্রোতে সততা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সে কারণেই পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যখন যেভাবে সুযোগ পেয়েছি সমাজের জন্যে কাজ করেছি। সমাজের যেকোনো ভালো উদ্যোগের পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করি নি। কোয়ান্টাম হলো এমনি একটি উদ্যোগ।

১৭ বছর আগে শিথিলায়ন ক্যাসেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম। কারণ অসুস্থ, অস্থির-অশান্ত আধুনিক মানুষের জীবনে প্রশান্তির সুবাতাস আসতে পারে মেডিটেশনের মাধ্যমে। আমি তখনই উপলব্ধি করি, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে কোয়ান্টাম মেথড চমৎকার কাজ করতে পারে। যেসব রোগের ওষুধের প্রয়োজন নেই কোয়ান্টামই হতে পারে তার নিরাময়ে সার্থক বিকল্প। আর এখন ৩০০ কোর্সপূর্তির মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম এ সত্যকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৭ বছর আগে শিথিলায়ন ক্যাসেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম। কারণ অসুস্থ, অস্থির-অশান্ত আধুনিক মানুষের জীবনে প্রশান্তির সুবাতাস আসতে পারে মেডিটেশনের মাধ্যমে। আমি তখনই উপলব্ধি করি, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে কোয়ান্টাম মেথড চমৎকার কাজ করতে পারে। যেসব রোগের ওষুধের প্রয়োজন নেই কোয়ান্টামই হতে পারে তার নিরাময়ে সার্থক বিকল্প।

জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলামের আত্মজীবনী গ্রন্থ 'জীবনস্রোতে' এবং সাক্ষাৎকার অবলম্বনে

ডা. মনিরুজ্জামান



সুস্থ জীবনধারা ও মেডিটেশন হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে পারে

জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক

জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক। বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ। পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির মিলিটারী হাসপাতালে তিনি-ই প্রথম কার্ডিয়াক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ সেন্টার থেকেই তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি হয়। বাংলাদেশে পিজিতে (বর্তমানে বিএসএমএমইউ) কার্ডিয়াক বিভাগ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতাল, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা। ২০০৪ সালে 'স্বাধীনতা পদক'-এ ভূষিত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমি স্কুলে পড়ি। এ যুদ্ধে জার্মানি, ইটালি এবং জাপান একপক্ষে ছিলো যাদেরকে বলা হতো অক্ষশক্তি। আর ইংল্যান্ড, রাশিয়া এবং আমেরিকা ছিলো আরেক পক্ষে যাদেরকে বলা হতো মিত্রশক্তি। বৃটেন ছাড়া ইউরোপের প্রায় পুরোটাই আর এদিকে বার্মা পর্যন্ত একের পর এক যখন অক্ষশক্তির দখলে চলে আসছে, মনে হচ্ছে যুদ্ধে বোধ হয় তারাই জিতে যাবে। একদিন আমাদের এক স্যার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী মনে হয়? কে জিতবে এ যুদ্ধে? আমরা সমস্বরে বললাম, জার্মানি জিতবে। কারণ জার্মানি তখন একের পর এক যুদ্ধ জিতছে। কিন্তু স্যার বললেন– না, জার্মানি জিতবে না। কারণ একদিন তাদের সব সম্পদ শেষ হয়ে যাবে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তারা পারবে না। স্যারের কথাই ঠিক হয়েছিলো।

হিটলার আসলে একজন ইভিল জিনিয়াস ছিলো। তার যে মেধা ছিলো তা ভালো কাজে লাগালে পৃথিবীর অনেক উপকার হতো। যেমন, একটা ছুরি দিয়ে অপারেশন করে জীবন বাঁচানো যায়। আবার এ ছুরি দিয়ে মানুষও খুন করা যায়। নির্ভর করে কে কীভাবে ব্যবহার করবে তার ওপর।

সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। স্রষ্টা এক অসাধারণ কর্মক্ষমতাময় স্বয়ংসম্পূর্ণ দেহশৈলী দিয়ে আমাদের প্রত্যেককে পাঠিয়েছেন। আমাদের আচরণ, অভ্যাস এবং জীবনযাপনে অপরিমিতি ও অনাচারের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা রোগ ভোগ করি, যন্ত্রণা-অস্বস্তির শিকার হই।

যেমন, হৃদরোগের কথা বলা যায়। সারাবিশ্বে প্রতিবছর ১ কোটি ৭৫ লক্ষ লোক সরাসরি হৃদরোগের কারণে মারা যায়। এ সংখ্যা উন্নত বিশ্বে মোট মৃত্যুর ৪৫% এবং উন্নয়নশীল দেশে মোট মৃত্যুর ২৫%। অথচ কিছু সাধারণ বিষয় মেনে চললে, একটু সচেতনতা ও জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে সহজেই এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে আগামী ১০-১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হৃদরোগ মহামারি আকারে দেখা দিতে পারে।

হৃদরোগের চিকিৎসায় প্রায় ৫ দশকের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমাদের দেশে হৃদরোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অভাব সচেতনতার। হার্টের কোনো সমস্যা হলে প্রথমে আমরা আমলই দেই না। অনেকে মনে করি, হৃদরোগ কেবল ধনীদের রোগ। অথচ হৃদরোগের একটি প্রধান ধরন বাতজ্বর এবং বাতজ্বরজনিত হৃদরোগ গরিবদেরই বেশি হয়। আর জন্মগত হৃদরোগ বা উচ্চ রক্তচাপ ধনী এবং গরিব সবারই হতে পারে।

হৃদরোগ একদিনে হুট করে হয় না। দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে ধমনীতে কোলেস্টেরল জমে মূলত এ রোগের সূত্রপাত ঘটে। ধমনীতে কোলেস্টেরল জমা শুরু হতে পারে ৮-১০ বছর বয়স থেকেই। তারপর রোগ দেখা দেয় সাধারণত মধ্য বয়সে। যে বয়সে একজন ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্যে অবদান রাখতে পারেন সে বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরিবারের বোঝায় পরিণত হওয়াটা দুঃখজনক। তাই হৃদরোগ প্রতিরোধে মূল বিষয় হলো সচেতনতা। এজন্যে শৈশব থেকেই সুষম খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম ও সুস্থ জীবনধারা অনুসরণের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। কারণ, আজকাল অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে এমনকি শিশুদের মধ্যেও হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, মেদস্থূলতা ও উচ্চ রক্তচাপের হার আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। এর প্রধান কারণ হলো– শাকসবজি-ফলমূল না খাওয়া, ফাস্টফুড ও কোমল পানীয়ের প্রতি আসক্তি এবং খেলাধুলার সুযোগ কমে যাওয়া।

শরীরের ওপর মনের প্রভাব অপরিসীম। তাই শরীরকে যেমন সুস্থ রাখতে হবে তেমনি মনকেও রাখতে হবে সুস্থ। মনের প্রভাবে কোনো কোনো সময় বুকে ধড়ফড়, ব্যথা, পেটের অসুখ, এজমা ইত্যাদি অসুবিধা হয়। এছাড়া মানসিক চাপে বিভিন্ন রোগও বাড়তে পারে। মনোদৈহিক এ রোগকে সারাতে হলে মনের জোর বাড়াতে হবে। এজন্যে দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নিয়মিত নামাজ, প্রার্থনা ও মেডিটেশনের অনুশীলন করতে হবে। মানুষের মন অতীতের সুখ বা দুঃখ অথবা ভবিষ্যতের চিন্তা নিয়ে সবসময় অস্থির থাকে। এই অস্থির মনকে শান্তি ও কল্যাণের পথে আনতে হলে মেডিটেশনের বিকল্প নেই।

হৃদরোগের অনেক অত্যাধুনিক চিকিৎসা এখন বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস অপারেশনসহ এসব চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুলও বটে। এছাড়া ওষুধের পেছনেও হৃদরোগীদের খরচ খুব একটা কম নয়। আর এসব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তো আছেই। তাই হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে মেডিটেশন এবং লাইফস্টাইল ভিত্তিক বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতি এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও জনপ্রিয় একটি মাধ্যম। আমেরিকার ডা. ডীন অরনিশের চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসরণ করে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম ও মেডিটেশনের মাধ্যমে হাজারো হৃদরোগী অপারেশন ও এনজিওপ্লাস্টি ছাড়াই সুস্থ হয়ে উঠছেন।

কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণ এবং তার লেখা 'জীবনের কিছু কথা' ও 'আলোর পথ' গ্রন্থ অবলম্বনে

ডা. আতাউর রহমান

হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রেখে সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের জন্যে করণীয় :

- ☐ ধূমপান বর্জন করুন।
- ☐ সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন।
- ☐ তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।
- ☐ ফলমূল ও শাকসবজি বেশি খান।
- ☐ লবণ ও চিনি কম খান।
- ☐ শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- ☐ নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করুন।
- ☐ বেশি বেশি হাঁটার অভ্যাস করুন।
- ☐ উচ্চ রক্তচাপ ও বহুমূত্র নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- ☐ বাচ্চাদের গলাব্যথা ও বাতজ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- ☐ বয়স ৪০ বা তার বেশি হলে প্রতি ৬ মাসে ১ বার রক্তে চর্বির পরিমাণ পরীক্ষা করুন।
- ☐ যাদের পরিবারে হৃদরোগ রয়েছে, তারা বেশি সাবধানতা অবলম্বন করুন।
- ☐ যতদূর সম্ভব দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করুন।
- ☐ নিয়মিত নামাজ, প্রার্থনা, মেডিটেশন, শিথিলায়ন করুন।

শিশুকে স্ব-নির্ভর ও শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত করাতে হবে



জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান

[জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার সূচনা ও বিকাশে এক জীবন্ত কিংবদন্তির নাম। দাদা, বাবা ও নাতি– পর পর তিন প্রজন্মের শিশুর চিকিৎসা করার বিরল চিকিৎসক জীবনের অধিকারী তিনি। পোলিও নির্মূল আন্দোলনেরও তিনি চেয়ারম্যান। ১৯৬৫ সালে তার হাত দিয়েই বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাকসিন নেয়া শুরু হয়। বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন, নিবেদিতা হাসপাতাল, সেন্ট্রাল হাসপাতাল, উত্তরা মহিলা মেডিকেল কলেজ তার হাতেই গড়া। শুধু চিকিৎসা নয়, সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্যে তিনি তার পেনশনের পুরো অর্থ দিয়ে গঠন করেছেন ডা. এম আর খান-আনোয়ারা ট্রাস্ট। ৮২ বছর বয়সেও তার কর্মস্পৃহার উৎসে রয়েছে তার শিশুসুলভ সারল্য আর হাসিখুশি মন]

জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম বলতেন, আল্লাহর পরে রোগী যাকে বিশ্বাস করে সে হলো ডাক্তার। একজন ডাক্তার তার সেবা দিয়ে, সুস্থতার কথা বলে রোগীর মনে যেভাবে সাহস যোগাতে পারে, তা আর কেউ পারে না।

ম্যাডাম হাসিনার ছেলে জয়ের বয়স যখন মাত্র ১৬ দিন, তখন (বর্তমানে মরহুম) ওয়াজেদ সাহেব অর্থাৎ জয়ের বাবা একদিন রাত ১টার সময় দৌড়ে এলেন। এসে বললেন, বাচ্চাটার এখন-তখন অবস্থা। পেট ফুলে ঢোল। ধানমণ্ডি ১৮ নম্বরের একটা বাড়িতে মা-সহ বাচ্চা বন্দি আছে। আমি কিছু করতে পারি কি না।

আমি দৌড়ে গেলাম। দেখে বুঝলাম হাসপাতালে নিয়ে টিউব দিয়ে পেট থেকে গ্যাস বের করে ফেলতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হতো। কিন্তু হাসপাতালে নেয়ার সুযোগ নেই। তাই বললাম চিন্তা করবেন না, একটা ওষুধ দিচ্ছি। আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাবে।

তা-ই হলো। মরেই যাচ্ছিলো যে বাচ্চাটা, সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলো। সেই স্মৃতিটা ম্যাডাম হাসিনার এখনো আছে। সেদিন যশোর এয়ারপোর্টে তার সঙ্গে দেখা। সঙ্গে ছেলে জয়। আমার সাথে কুশল বিনিময়ের পর ছেলেকে বললেন, এই সালাম কর। তোকে বাঁচিয়েছেন। আমি বললাম, ম্যাডাম আমি বাঁচাই নি। আল্লাহ বাঁচিয়েছেন। আমি চেষ্টা করেছি মাত্র। তিনি বললেন, আপনি আসাতেই তো আল্লাহর সাহায্য পেয়েছি।

একজন সফল চিকিৎসক তিনিই যিনি এ ভরসাস্থল হতে পারেন। সেজন্যে তাকে পেশাগত যোগ্যতার পাশাপাশি রোগীর মানসিক অবস্থা বোঝার সামর্থ্যও অর্জন করতে হবে। ইব্রাহীম স্যার যে দুটি বৈশিষ্ট্য ডাক্তারদের আয়ত্ত করতে বলতেন তার একটি হলো সিমপ্যাথি, অন্যটি এমপ্যাথি। সিমপ্যাথি হলো সহানুভূতি। লোকটা গরিব। তাকে ৫ টাকা বা ১ টাকা দিয়ে দিলাম– এটা এক ধরনের অনুভূতি। আর এমপ্যাথি হলো সহমর্মিতা। যে কষ্ট, যে যন্ত্রণা ঐ লোকটা পাচ্ছে তা যদি আমিও অনুভব করি, একই ব্যথায় ব্যথিত হই, তাহলেই ঐ লোকটাকে নিকটাত্মীয় ভেবে আমি চিকিৎসা করতে পারবো।

আমার ছাত্র-সহকর্মীদেরকে আমি একটি কথাই বলি যে, এমনভাবে কাজ করবে যেন রোগী মারা গেলেও আত্মীয়-স্বজনরা বলতে বলতে যায়, হায়াত নেই তাই মারা গেছে। ডাক্তার সাহেব চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি।

শিশুরা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। একটি শিশুর ভালো বেড়ে ওঠা যদি আপনি নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে একজন সফল মানুষ, ভালো মানুষের গ্যারান্টিও আপনি পেতে পারেন। প্রথমেই হলো খাবার। ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ এবং ৬ মাসের পর থেকে ভাত-মাছ-ডাল; শিশুর জন্যেও এগুলোই যথেষ্ট।

শিশুর জন্যে কৌটা দুধ, ফাস্টফুড– এগুলোর চেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আর কিছু নেই। এখন বাজারের অনেক দুধেই ক্ষতিকারক মেলামিন পাওয়া গেছে। তার চেয়ে গরুর দুধ বা সয়াদুধ খাওয়ানো যেতে পারে। সয়াবিন থেকে যেমন তেল হয়, তেমনি দুধও পাওয়া যায়। যদিও এর স্বাদ একটু ভিন্ন, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যে এটি বেশ উপকারি। কারণ এর মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত প্রোটিনসহ সব খাদ্যমান। আর যেসব শিশু ফাস্টফুড গ্রহণ করে, তারা অল্প দিনেই মোটা হয়ে যায়। তৈরি হয় কোষ্ঠকাঠিন্যসহ নানা ধরনের সমস্যা।

> *একটি বা দুটি সন্তানকে*
> *ননীর পুতুলের মতো*
> *সারাক্ষণ আগলে রেখে*
> *ফার্মের মুরগি বানাচ্ছেন*
> *আজ-কালকার বাবা-মায়েরা।*
> *এটা না করে সন্তানকে*
> *স্ব-নির্ভর ও শারীরিক শ্রমে*
> *অভ্যস্ত করাতে হবে।*

অনেক মায়ের অভিযোগ, তার সন্তান খায় না। যদি কোনো শিশু ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ৬ বার প্রস্রাব করে, তাহলে বুঝতে হবে সে তার পরিমাণ মতো খাবার ঠিকই খাচ্ছে।

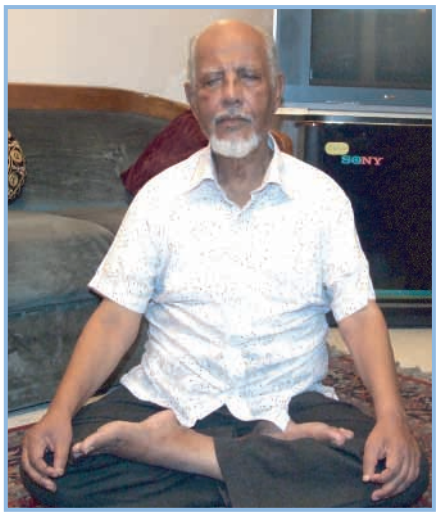
আর হচ্ছে শারীরিক শ্রম। একটি বা দুটি সন্তানকে ননীর পুতুলের মতো সারাক্ষণ আগলে রেখে ফার্মের মুরগি বানাচ্ছেন আজ-কালকার বাবা-মায়েরা। এটা না করে সন্তানকে স্ব-নির্ভর ও শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত করাতে হবে।

আমার পরিচিত মহলে বেশ প্রচলিত একটি কথা হলো– ওজনের মেশিনে ভুল হতে পারে কিন্তু আমার ওজনে নাকি কোনো ভুল হয় না। গত ২০ বছর ধরে একই ওজন ধরে রেখেছি। এর রহস্য খুব সহজ। বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস, শৃঙ্খলা আর রাগ বর্জন। আমি সবসময় রাগ বর্জন করার চেষ্টা করি। কখনও যদি রাগ আসতে চায়, আমি চুপ হয়ে যাই। কারণ রাগ মানেই উত্তেজনা। আর উত্তেজনা মানে এড্রিনালিন সিক্রেশন। যার শারীরিক প্রভাব সবসময়ই ক্ষতিকর। এজন্যেই বলা হয় রাজ্য জয় বা শাসন করার চেয়েও সে বেশি সফল যে রাগকে দমন করতে পারে। মহামানবরা এ কাজটিই করেছেন।

একবার এক বেদুইন রসুলুল্লাহ (স)-কে গালি দিচ্ছিলো। কিন্তু তিনি কোনো জবাব তো দিচ্ছিলেনই না বরং মিটিমিটি হাসছিলেন। এমন সময় আবুবকর (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে বেদুইনকে গালির জবাব দিলেন। সাথে সাথে নবীজী (স) বললেন, এতক্ষণ যে ফেরেশতাটি আমার আমলনামায় নেকি এবং তার আমলনামায় বদি লিখছিলো, তুমি আসাতে সে চলে গেল।

সুস্থ সফল জীবনের এসব দৃষ্টিভঙ্গির কথাই কোয়ান্টাম বলছে। ৩০০ কোর্সের মধ্য দিয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গিই সঞ্চারিত হয়েছে হাজারো মানুষের মধ্যে। এটা সত্যিই একটা ইতিহাস। কারণ আমাদের দেশকে এগিয়ে নিতে গেলে যে সচেতন, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা বোধসম্পন্ন মানুষ প্রয়োজন, সে মানুষ গড়ার উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে চলেছে কোয়ান্টাম। এ উদ্দেশ্য সফল হোক– এটাই কামনা করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন



সমস্যাটা মনের ॥ সমাধানের সূত্রও পেয়েছি মনে

বিচারপতি এ কে এম সাদেক

খ্যাতনামা আইনবিদ, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ কে এম সাদেক। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বার কাউন্সিল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, ল' কমিশন এবং ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্টস্-এর সদস্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৪ কৃতী ছেলে-মেয়ে এবং এক ঝাঁক প্রতিভাধর নাতি-নাতনি পরিবেষ্টিত সফল পরিবার প্রধান। ৮১ বছর বয়সেও অসাধারণ জ্ঞানতৃষ্ণা এবং কৌতূহলী মন তাকে দিয়েছে এক চিরতরুণ প্রাণ-প্রাচুর্য।

বছরখানেক আগে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্টস-এর একটি অধিবেশনে যোগ দিতে জার্মানিতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ফ্রাংকফুর্ট এয়ারপোর্টে একটা দুর্ঘটনা হলো। বিমানের ল্যাডার থেকে পড়ে গেলাম মাটিতে। ১৪ দিন কোমায় ছিলাম। দেশে এসেও হাসপাতালে থাকতে হলো কিছুদিন। দুর্বলতা ছিলো। হাঁটতে কষ্ট হতো। তারপরও ধীরে ধীরে সেরেই উঠছিলাম। কিন্তু কিছুদিন আগে আমার প্রিয়জনের কিছু সমস্যার কারণে মানসিক উদ্বেগ, কষ্ট এবং দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হলাম। সন্ধ্যার দিকে অনুভব করলাম মাথার পাশে যেন চিনচিন করছে। একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমালাম। সকালবেলায় দেখি নিজে নিজে আর উঠতে পারছি না, কথাও বলতে পারছি না। আমাকে হাসপাতালে নেয়া হলো। ডাক্তার বললেন, সেরিব্রাল এটাক হয়েছে। সেই থেকে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের হলো ছন্দপতন।

এমন সময় আমার নাতনি সাদিয়া, নাজিয়া, রাইসা ধরলো, 'নানা ভাই, মেডিটেশনে চলো। তুমি ভালো হয়ে যাবে।' এদিকে আমার মনেও চলছে ভাবনার তোলপাড়, শরীরের কোনো সমস্যা তো আমার অসুস্থতা ঘটায় নি। এ শরীর নিয়েই তো এতদিন দিব্যি ছিলাম। যেদিন টেনশন করলাম, মনে কষ্ট পেলাম সেদিনই অসুস্থ হলাম। তার মানে অসুখটা মনে, হৃৎপিণ্ডে নয়; সমস্যাটা ব্রেনের চিন্তায়, স্নায়ুতে নয়। অর্থাৎ সমাধানের সূত্রও রয়েছে মন আর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। অতএব নাতনিদের পরামর্শ গ্রহণ করে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৭২ তম ব্যাচে অংশ নিলাম স্ত্রী-কন্যা ও নাতনিকে নিয়ে।

দেখলাম আমার পর্যবেক্ষণ সঠিক। কোর্সের প্রথম দিন গাড়ি থেকে নেমে হলে এসে বসতে আমার লেগেছিলো কয়েকজনের সহযোগিতা। দ্বিতীয় দিন শুধু লাঠিতে ভর করেই হেঁটে এসেছি। আর তৃতীয় এবং চতুর্থ দিন লাঠি এবং কারো সহযোগিতা ছাড়াই আমি হাঁটছি, কথাও বলতে পারছি বেশ স্পষ্টভাবে। কারণ কোর্সের এ দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে মানসিকভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠার সাথে সাথে সম্পন্ন হয়েছে আমার সুস্থতাও।

শুধু সুস্থতাই নয়, কোর্সে এসে সতীর্থ এবং এখানকার কাউন্সিলর অর্গানাইজার প্রো-কোয়ান্টিয়ার– সবাই যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, সমমর্মিতা এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন সেটা আমাকে অভিভূত করেছে, আশাবাদী করেছে। একবার বিদেশ ভ্রমণের সময় মালপত্রসহ হুইল চেয়ারে বসা অসুস্থ আমাকে নিয়ে আমার স্ত্রী বেশ অসহায় বোধ করছিলেন। সেসময় একজন বিদেশি সহযাত্রী যেভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তা আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আসলে একটি জাতির উত্থানের প্রকাশ হচ্ছে মানুষের নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমমর্মিতায়। এখানে এসে আমি এর সবই পেয়েছি।

আমার জন্ম ১৯২৮ সালের ১০ আগস্ট কুমিল্লার মুরাদনগরে। দাদা ও বাবা দুজনই ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। সমৃদ্ধ আইন পেশার সুবাদে দাদা হাজী আবদুস সোবহান একটা জমিদারিও কিনে ফেলেন। মুরাদনগরের সে জমিদার বাড়িটি এখনো আছে।

আমি ছিলাম বংশের প্রথম সন্তান। প্রাচুর্য এবং প্রশ্রয়– দুটোই পেয়েছি অঢেল। কিন্তু বখে যাই নি। কারণ একজন দায়িত্বশীল পিতার মতোই আমার বাবা তার সন্তানদের লালন করেছেন সীমিত চাহিদায় অভ্যস্ত করে, কষ্ট এবং পরিশ্রমের মানসিকতা দিয়ে। জমিদারের ছেলে হয়েও বছরে আমরা পেতাম সাধারণ কাপড়ের দুই সেট জামা-হাফপ্যান্ট। কলেজে পড়ার সময় ঢাকা-কুমিল্লা যাতায়াত করেছি সবসময় ইন্টার ক্লাসে চড়ে। একবার কলেজ ছাত্রদের জন্যে রেলওয়ে একটা সুবিধা দিলো, যে ক্লাসের টিকেট কাটা হবে ভ্রমণ করতে পারবে তার ওপরের ক্লাসে। স্বাভাবিকভাবেই আমি ইন্টার ক্লাসের টিকেট কেটে সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে বাড়ি গেলাম। এটা শুনে বাবা বললেন, 'কেন, থার্ড ক্লাসের টিকেট কেটে ইন্টার ক্লাসে আসতে পারলে না? এখনই যদি সেকেন্ড ক্লাসের আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে যাও, জীবনের আরো ঘাত-প্রতিঘাত তো সামলাতে পারবে না!' এই ছিলো তখনকার অভিভাবকদের সন্তান লালনের দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে আমরা ভাই-বোন প্রত্যেকেই গড়ে উঠেছি সফল, আত্ম-পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত একেকজন মানুষ হিসেবে।

> *এ শরীর নিয়েই তো এতদিন দিব্যি ছিলাম। যেদিন টেনশন করলাম, মনে কষ্ট পেলাম, সেদিনই অসুস্থ হলাম। তার মানে অসুখটা মনে, হৃৎপিণ্ডে নয়; সমস্যাটা ব্রেনের চিন্তায়, স্নায়ুতে নয়। অর্থাৎ সমাধানের সূত্রও রয়েছে মন আর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে।*

স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে চলে গেলাম লাহোরে। আমি খুব ভ্রমণপ্রিয় ছিলাম। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়তাম। পাকিস্তানে গিয়েই ঘুরে এলাম সীমান্তবর্তী সোয়াত ভ্যালি, খাইবার পাস। এ চাকরির সময়ই ১৯৭১-এ চলে এলাম ঢাকায়, আর যাওয়া হয় নি। মুক্তিযুদ্ধে আমার দুভাই ছিলেন, আমার বোনের স্বামী যুদ্ধে শহীদ হলেন। স্বাধীন দেশে আমি আবারও শুরু করলাম আমার কর্মজীবন।

টাঙ্গাইলে ডিস্ট্রিক্ট জজ হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর যখন অবসর গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন একটি সরকারি চিঠি এলো– হাইকোর্ট ডিভিশনে বিচারক হিসেবে যোগ দেয়ার জন্যে। পরে এসেছে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ। পেশাজীবনে সবসময়ই চেষ্টা করেছি সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালনের। লোভ বা অন্যায়ের সাথে আপস না করার শিক্ষা আমি ধারণ করেছি পারিবারিকভাবেই। ফলে সাফল্য, সম্মান ও সুনামের পাশাপাশি প্রশান্ত প্রাচুর্যও পেয়েছি।

জনশক্তি আমাদের অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর অনেক দেশে গিয়েছি– যতই দেখেছি, ততই মনে হয়েছে মেধা-প্রতিভা-সম্ভাবনায় আমাদের তরুণ প্রজন্ম সত্যিই অসাধারণ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে আমি লক্ষ্য করলাম– এখানে একদিকে তরুণদের জন্যে যেমন রয়েছে জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সব নির্দেশনা, তেমনি নারীরা এখানে বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়েছেন আত্মনির্মাণ ও সৃষ্টির সেবায় শরিক হতে, একই সাথে বান্দরবানের অবহেলিত জনপদ লামায় চলছে নানামুখী সেবা কার্যক্রম।

কোয়ান্টাম মেথডকে আমার কাছে একটি বৈজ্ঞানিক এবং পরীক্ষিত প্রক্রিয়া বলে মনে হয়েছে। কারণ সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও প্রশান্তি অর্জনের কমান্ড যখন মেডিটেশনের আলফা লেভেলে দেয়া হয়, সেটাই স্থায়ী হয়, কার্যকরী হয়। সুস্থতার জন্যে কোর্স করতে এসেও আমার উপলব্ধির ভাণ্ডারে জমা হয়ে গেল আরো অনেক মূল্যবান রত্ন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : সাইফ উদ্দিন সাইফ

শুরু করতে হবে নিজেকে দিয়ে

অধ্যাপক ড. মুজাফ্‌ফর আহমেদ



আমার বাবা ১৯২৯ সালে আইসিএস পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলেন। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন সরকারের সহকারী সচিব হিসেবে। রিটায়ারের সময় তার বাড়িতে যে আসবাবগুলো ছিলো, এনটিক্‌স হিসেবে হয়তো তার কিছুটা মূল্য আছে কিন্তু আজকাল একজন পিয়নের বাড়িতেও দেখা যাবে এর চেয়ে দামী, সুন্দর আসবাবপত্র। তিনি যে ডিপার্টমেন্টের সচিব ছিলেন সেটি ঢাকার সব খাস জমি তত্ত্বাবধান করতো। ইচ্ছে করলেই তিনি প্রচুর জমিজমার মালিক হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। শেষমেষ নানা অনুরোধ-উপরোধে বাবা একটা দরখাস্ত করলেন ঢাকার ধানমণ্ডি এলাকার সবচেয়ে ছোট প্লটটির জন্যে। ঐ প্লটটিতেই এখন আমাদের একমাত্র বাড়ি। কারণ গ্রামের বাড়ির সবকিছু পদ্মায় ভেঙে গেছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবেন আর অফিসে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন– এটিই ছিলো বাবার চিন্তা। তিনি একাই নন, সেসময়ে সমাজের শিক্ষিত পেশাজীবী মানুষেরা এভাবেই ভাবতেন।

কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন চলছে কনজিউমারিজম বা ভোগবাদের যুগ। এখন প্রত্যেক ঈদেই আমাদের নতুন কাপড় কিনতে হয়। দুদিন পর পর রেস্তোরাঁয় না খেলে তৃপ্তি হয় না। একটা বিয়ের জন্যে ১০টি অনুষ্ঠান করতে হয়। বিলাসবহুল কমিউনিটি সেন্টারে একেকটি আয়োজন করতে গিয়ে অর্থের যে অপচয় আমরা করি তা যেন কোনো ব্যাপারই নয়। অর্থাৎ সবার মধ্যে একটা ভোগের মানসিকতা, লোভের কামনা। আর এ প্রবণতাই আমাদেরকে ঠেলে দিয়েছে আজকের এই ব্যাপক দুর্নীতিগ্রস্ততার দিকে।

ছোটবেলায় বাড়িতে দেখেছি মায়ের ঘরের তাকে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে অজস্র বই। আমার জীবনের প্রথম আনন্দের দিন ছিলো– ক্লাস ফোরে পড়ার সময় পত্রিকায় আমার একটা লেখা ছাপা হওয়ার পর বাবা আমাকে এক টাকা দিয়ে একটা গীতাঞ্জলি কিনে দিয়েছিলেন। সেই গীতাঞ্জলিটা আমার কাছে এখনও আছে। এখন কিন্তু কোনো বাবা তার ছেলেকে গীতাঞ্জলি দিয়ে খুশি করতে পারবেন না। এখন ছেলেকে হয় চাইনিজ নয়তো পিৎজা বা আইসক্রিম খাওয়াতে হবে। আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে ঝাড়বাতি দেখেছি, বাড়িতে লাগানোর চিন্তা করি নি। কিন্তু এখন ঢাকায় এমন অনেক বাড়ি আছে যেখানে ড্রয়িংরুমের ঝাড়বাতিটার দামই দশ লাখ টাকা। ধনীরা এখন ধনের প্রদর্শনী করতে বেশি উদগ্রীব।

দুর্নীতি কমাতে হলে প্রথমে প্রয়োজন এই ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যা শুরু হবে শিশুর পারিবারিক পরিবেশ থেকেই। শোকর এবং সবরের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। যা পেয়েছি এজন্যে আল্লাহর কাছে শোকর বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং যা

অর্থনীতিবিদ মুজাফ্‌ফর আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ-র অধ্যাপক এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। সুশাসনের জন্যে নাগরিক (সুজন) এবং 'বুড়িগঙ্গা বাঁচাও' আন্দোলনের সাথেও সম্পৃক্ত। ২০০৮ সালে লাভ করেছেন একুশে পদক।

পাই নি এজন্যে সবর অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ, যাতে আল্লাহ দেন। আমাদের পরিবারগুলোতে এখন এ শিক্ষা দেয়ার মানসিকতা দুর্ভাগ্যবশত নেই।

বিশ্বব্যাংকের মতে দুর্নীতি হলো– Use of public property for private gain অর্থাৎ জনগণের সেবা না করে সরকারি অফিসের ক্ষমতা নিজের কাজে ব্যবহার করাই হলো দুর্নীতি। কিন্তু এটা দুর্নীতির একটা আংশিক সংজ্ঞা। ১৯৯৬ সালে আমরা দুর্নীতির ওপর প্রথম একটি জাতীয় জরিপ চালাই। এতে সাধারণ মানুষ দুর্নীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছিলো এভাবে যে– যার যা কর্তব্য সে যদি তা না করে তাহলে সেটাই হলো দুর্নীতি। দুর্নীতির এ ব্যাখ্যার সঙ্গে হজরত ওমর (রা)-এর একটি ঘটনার খুবই মিল পাই। হজরত ওমর (রা) আবু হোরায়রা (রা)-কে বাহরাইনের গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে আবু হোরায়রা ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনী হয়ে যান। হজরত ওমর তখন তাকে ডেকে পাঠান এবং শাসন কাজের চেয়ে ব্যবসায়ে বেশি মনোযোগ দেয়ার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বলেন। হযরত ওমরের যুক্তি ছিলো একজন সরকারি কর্মচারি শুধু দাপ্তরিক সময়ের জন্যে নয় বরং ২৪ ঘণ্টার জন্যেই জনগণের সেবক। এর খেলাফ করা মানেই নীতিহীনতা। এজন্যে পরে আবু হোরায়রার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এখন সরকারি চাকরি নিয়ে কত কথাই পত্রিকায় দেখি। প্রাইমারি স্কুলের একটা চাকরির জন্যে নাকি ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। চাকরি পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক টাকাটা নানাভাবে তোলার চেষ্টা করেন।

> *সবচেয়ে বড় কথা– দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে শুরু কিন্তু করতে হবে নিজেকে দিয়েই। জবাবদিহিতাটা থাকতে হবে নিজের কাছে। বিশ্বাস করতে হবে যে, আমার হিসেব নেয়ার জন্যে আছেন এমন একজন যার কাছে কিছু ফাঁকি দেয়া যায় না।*

ছাত্রবৃত্তির টাকা বা খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির টাকা থেকে সরিয়ে, বই ছাত্রদের না দিয়ে বাইরের দোকানে বিক্রি করে বা প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করে ইত্যাদি নানাভাবে এখন দুর্নীতি হয়।

কিন্তু ঘুষ নেয়া বা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়াই শুধু দুর্নীতি নয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যাপক থাকাকালীন বারডেমের প্রতিষ্ঠাতা ডা. ইব্রাহীমের সারাদিন কাটতো হাসপাতালে রোগী দেখে ও ক্লাস নিয়ে। আজকাল এটা একটা বিরল ব্যাপার। ডাক্তাররা বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। এমন ডাক্তারও আছেন যিনি একসাথে ৪/৫ জন রোগী দেখেন। কর্তব্যের এ অবহেলা কি দুর্নীতি নয়? এই যে খাবারে ভেজাল দেয়া হচ্ছে, ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের কারণে ভবন ধসে পড়ছে, জমির সীমানা ছাপিয়ে সরকারি জায়গা দখল করা হচ্ছে– এগুলো কি দুর্নীতি নয়?

দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে তদনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে। যেমন, সিঙ্গাপুরে দুর্নীতি ধরা পড়ার সাথে সাথে তার বিচার হয় এবং শাস্তি হিসেবে এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেয়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা– দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে শুরু কিন্তু করতে হবে নিজেকে দিয়েই। জবাবদিহিতাটা থাকতে হবে নিজের কাছে। বিশ্বাস করতে হবে যে, আমার হিসেব নেয়ার জন্যে আছেন এমন একজন যার কাছে কিছু ফাঁকি দেয়া যায় না। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার পর আমাকেও অনেক রকম হয়রানি, জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার ২০ বছরের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু এতে আমার কোনো অস্বস্তি নেই। কারণ আমি খুব চুলচেরা হিসেব করে বলতে পারবো যে, চাকরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি কত টাকা পেয়েছি।

বিশ্বজুড়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মোট ১১২টি চ্যাপ্টার আছে। বাংলাদেশকে বলা হয় স্টারশিপ অফ দি মুভমেন্ট। কারণ দুর্নীতি নিয়ে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কাজ করেছি। অন্যান্য দেশে যেখানে জাতীয় দুর্নীতি নিয়ে কাজ হয়েছে সেখানে আমরা কাজ করছি তৃণমূল পর্যায়ের দুর্নীতি নিয়ে। আমরা কেবল দুর্নীতির পরিমাণই বের করছি না, তার প্রতিকারের পরামর্শও দিচ্ছি।

আমার কাজের জন্যে সরকার, পুঁজিপতি, ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রচুর সমালোচনা শুনতে হয়। কিন্তু যখন সাধারণ মানুষের কাছে যাই, তখন পাই অফুরন্ত ভালবাসা আর শ্রদ্ধা। এখন সরকার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মধ্যে অন্তত একটা সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে যা আগে ছিলো না। আমি আশাবাদী যে, এ অবস্থার উত্তরণ হবে। কারণ এখনও দুর্নীতি যারা করেন তাদের চেয়ে যারা দুর্নীতি করেন না, তাদের সংখ্যাই বেশি।

[কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন]



সমৃদ্ধ জাতির স্বপ্নই পরিবর্তনের সূচনা করে

অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি এবং এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে অর্থায়নের প্রধান প্রতিষ্ঠান (পিকেএসএফ)-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। বাংলাদেশ ব্যাংক বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ১৯৯৩ সাল থেকে।

জাপানের একজন অর্থনীতিবিদ ও সাবেক মন্ত্রী একবার বলছিলেন, তাদের কাজের সংস্কৃতি আমাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে একজন শ্রমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা গবেষক নিজেদের কাজগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাত তার মধ্যেই মগ্ন থাকেন। সেসময় পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে সে খবর তারা রাখেন না, এমনকি পেপারও পড়েন না। অর্থাৎ পুরো মনোযোগ ঢেলে দিলেই কাজটি হয় কালোত্তীর্ণ।

ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলো কাজের ক্ষেত্রে যে সিস্টেম দাঁড় করিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু এ সিস্টেম একটু এদিক-ওদিক হলেই তারা খেই হারিয়ে ফেলে। কয়েক মিনিটের বিদ্যুৎ বিভ্রাটও তাদের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট। এদিকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হাজারো টানাপোড়েন সামলাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি এবং তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি। ফলে ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে বাড়ছে আমাদের সহনশীলতা, মানিয়ে চলার ক্ষমতা, বিপর্যয় মোকাবেলা করার শক্তি ও সাহস।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অনেক প্রতিভাবান– যাদের জিনিয়াস বলা হয়– তাদের চেয়ে মধ্যম মানের বা সাধারণ মেধার শিক্ষার্থীরা সাধারণত ভালো রেজাল্ট করে। এর মূল কারণ হলো ব্যালেন্সিং। কারণ সবগুলো বিষয়ে গড়পড়তায় ভালো করলেই সর্বমোট হিসেবে ভালো করা যায়। অথচ জিনিয়াস বা ব্রিলিয়ান্টরা তাদের যা করতে বা পড়তে ভালো লাগে সারাক্ষণ সেটার মধ্যেই ডুবে থাকে। গণিত ভালো লাগলে সেটা করতে করতেই বাংলা পড়তে ভুলে যায়। তাদেরকে কোনো ট্র্যাকে রাখা যায় না। ফলে সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা আর প্রথম সারিতে থাকতে পারে না।

শুধু ছাত্রজীবনে নয়, মানুষের পুরো জীবনেই সুসমন্বয় প্রয়োজন। জীবনের দিকগুলো ছড়িয়ে আছে ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে পারিবারিক পেশাগত পারিপার্শ্বিক সামাজিক– সব ক্ষেত্রে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এত কাজ, এত যোগাযোগ– এত উদ্বেগ ও চ্যালেঞ্জকে ঠান্ডা মাথায় হাসিমুখে মোকাবেলা করার সূত্র রয়েছে মেডিটেশনে। ব্যক্তিগতভাবে আমি আরেকটি কৌশল অবলম্বন করি। সেটি হলো কম্পার্টমেন্টালাইজেশন অর্থাৎ কাজের বিভক্তিকরণ। একটি কাজ শেষ করে পরবর্তী কাজ শুরু করা এবং তখন আর আগের কাজটি নিয়ে কোনোরকম দুশ্চিন্তায় না ভোগা।

জাতিগতভাবে অসুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব আমাদের মানসিক শান্তির পথে একটি বাধা। আমরা এপ্রিসিয়েশনের চেয়ে কম্পিটিশনে বেশি অভ্যস্ত। প্রতিযোগিতা ভালো, কারণ ক্রমাগত প্রতিযোগিতার মধ্যে না থাকলে ভালো কিছু করা যায় না। কিন্তু 'ও পারছে আর আমি পারছি না' মনে করে প্রতিযোগিতা যদি ঘৃণা-হিংসার পর্যায়ে চলে যায় তখন তা হয়ে যায় আত্মঘাতী। খেলায় হেরে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মন একটু খারাপ হবে। কিন্তু সুস্থ প্রতিযোগিতা তা-ই, যেখানে বিজয়ীর ভালো খেলাকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসে পরাজিত পক্ষ। তখনই আসলে পরাজিতের মধ্যে ভালো করার প্রণোদনা কাজ করে। মানসিক স্থিরতা নিয়ে সে আবার মাঠে নামতে পারে।

অর্থনীতিবিদ হিসেবে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন আমাদেরও গবেষণার বিষয়। অর্থনীতির মাপকাঠিতে যদি একাধারে ২৫ বছর কোনো দেশের বার্ষিক জিডিপি ৭%-এর বেশি হয় তাহলে মাথাপিছু আয় বেড়ে যায় এবং সে দেশটি ধনী দেশের তালিকায় স্থান পায়। এ হিসেব অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ২০০টিরও বেশি দেশের মধ্যে মাত্র ১৩টি দেশ ধনী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলো এবং এ দেশগুলোর অবস্থান পূর্ব এশিয়াতেই। এদের কারো কারো অবস্থা একসময় বাংলাদেশের মতো বা তার চেয়েও খারাপ ছিলো। কিন্তু ১৯৫০ সালেও যা তাদের কাছে স্বপ্ন ছিলো আজ তা বাস্তব। কাজেই জাতিগত স্বপ্ন নিঃসন্দেহে পরিবর্তনের সূচনা করে। তবে বাস্তবে এ পরিবর্তন করতে হবে দেশীয় আদলে, নিজস্ব কাঠামো-উপযোগী করে। ইদানীং গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা আইএমএফ-এর মতো সংস্থাগুলোর সংস্কার পরামর্শ অনেক দেশ মেনে চলছে। কিন্তু তাদের সবাই ধনী হয়ে যায় নি। আসলে বাইরের সাহায্য নিয়ে কখনোই পরিবর্তন সম্ভব নয়। বরং নিজেদের প্রয়োজন বুঝে যেখানে যেভাবে যে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তার পরিকল্পনা করলে ফলাফল যেমন কাঙ্ক্ষিত হয়, তেমনি সময়-সম্পদেরও অপচয় রোধ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ২০০টিরও বেশি দেশের মধ্যে মাত্র ১৩টি দেশ ধনী দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলো এবং এ দেশগুলোর অবস্থান পূর্ব এশিয়াতেই। এদের কারো কারো অবস্থা একসময় বাংলাদেশের মতো বা তার চেয়েও খারাপ ছিলো। কিন্তু ১৯৫০ সালেও যা তাদের কাছে স্বপ্ন ছিলো আজ তা বাস্তব। কাজেই জাতিগত স্বপ্ন নিঃসন্দেহে পরিবর্তনের সূচনা করে।

আবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যতই হোক না কেন, একসময় তা মুখ থুবড়ে পড়বে যদি এর অন্যতম চালিকাশক্তি অর্থাৎ দেশের নেতৃত্ব সৎ, যোগ্য ও দূরদর্শী না হয়। অর্থনীতির সব তত্ত্ব-সূত্র-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এ নেতৃত্বের প্রশ্নে এসে থেমে যায়। একই অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে কেন দক্ষিণ কোরিয়া ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারলো কিন্তু বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়লো তার উত্তর মেলানোর সময় এখন এসেছে।

একবার সুখী মানুষের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রথম স্থান অধিকার করেছিলো, যেখানে স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত আমেরিকা ছিলো সবচেয়ে অসুখী মানুষের দেশ। অর্থনৈতিক পরাশক্তি হলেই যে সুখ আসবে তা নয়। আসল সুখ নির্ভর করছে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অর্থাৎ যা আছে তা নিয়েই একজন মানুষ সত্যিকার অর্থে পরিতৃপ্ত কি না, সন্তুষ্ট কি না তার ওপর। এজন্যে অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে প্রয়োজন বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, প্রজ্ঞা, সৃজনশীলতা আর মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা। তখনই দেশ পরিণত হয় সমৃদ্ধ দেশে, জাতি পরিণত হয় সুখী জাতিতে।

[কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন]

দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মনে শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছে কোয়ান্টাম

আল্লামা ড. এম শমশের আলী



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য আল্লামা ড. এম শমশের আলী দেশের নেতৃস্থানীয় পদার্থবিজ্ঞানী। একই সঙ্গে তিনি শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক ও টিভি ব্যক্তিত্ব। জাতীয় জীবনে বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাভাবনা প্রসারে তিনি গ্রহণ করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। বর্তমানে সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর।

'কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন' নামটাকে আমার খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। কোয়ান্টাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পরিমাণ। কিন্তু একজন পদার্থবিদ হিসেবে 'কোয়ান্টাম' শব্দের গুরুত্ব আমার কাছে আরো বেশি। কারণ দৃশ্যজগতে সবকিছু একইরকম হলেও বিজ্ঞানের চোখে ল'জ অব দ্য স্মল আর ডিফারেন্ট ফ্রম দা ল'জ অব দ্য লার্জ। অর্থাৎ বিজ্ঞানে বড় জিনিসের জগৎ আর ছোট জিনিসের জগৎ এক নয়। দৃশ্যজগতে শক্তিকে আমরা দেখি নিরবচ্ছিন্ন হিসেবে। কৌণিক ভরবেগ, এঙ্গুলার মোমেন্টাম– সবকিছুই নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু আমরা যদি ছোট জিনিসের জগতে যাই, তাহলে দেখবো সেখানে পদার্থের অণুরা যে গতি বিনিময় করছে তা নিরবচ্ছিন্ন নয়। থোকায় থোকায়, গুচ্ছে গুচ্ছে হয় এ শক্তি দেয়া-নেয়া। আর এটাই কোয়ান্টাম মেকানিক্স।

এখন আমরা যদি আমাদের দেহের দিকে তাকাই, আমাদের সমস্ত চেতনার মূল হলো নিউরোন যা অতি সূক্ষ্ম। আর এ নিউরোনগুলো যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে তা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আওতায়ই পড়ে। সুতরাং 'কোয়ান্টাম' নাম দেয়াটা খুব যথার্থ হয়েছে। কারণ কোয়ান্টাম শেখায় আত্মমগ্নতার মধ্য দিয়ে চেতনার গভীর থেকে একজন মানুষ কীভাবে পাবে তার অশান্তি, অসুস্থতা আর ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙার পথ। কোয়ান্টাম শেখায় দেহ-মনের অফুরন্ত শক্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে কীভাবে একজন মানুষ তার কাজে লাগাতে পারে।

দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মনে শান্তির বাণী পৌঁছানো, তাকে আত্মবিশ্বাস যোগানো– এটাই হলো তার সবচেয়ে বড় সেবা। অর্থ দিয়ে এর কোনো পরিমাপ হয় না। গত ১৭ বছর ধরে নিরলস সেবার মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম এখন ৩০০ তম কোর্স সম্পন্ন করেছে। নিঃসন্দেহে এ এক মাইলফলক। কারণ মেডিটেশন কোর্সের মতো একটি বিষয়, যে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তেমন কোনো ধারণা ছিলো না, তার ৩০০ তম কোর্স হওয়াটাই প্রমাণ করে– এ কোর্স মানুষের জীবনে কোথায় স্থান করে নিয়েছে। একজন এসেছে, উপকার পেয়েছে, তার বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়কে বলেছে, নিয়ে এসেছে তাকেও। এভাবেই তো এগিয়েছে কোয়ান্টাম চেতনা।

মোরাকাবা, তাফাক্কুর, ধ্যান, মেডিটেশন– এটা ইসলামের একটা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। যেমন নামাজ। মুসলমানদের দৈনন্দিন এ ফরজ ইবাদতটি আসলে ধ্যান এবং যোগাসনের একটি যুগপৎ উপযোগিতা। আমরা যখন নামাজ পড়ি, দুনিয়ার সমস্ত কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে নিবিষ্টচিত্তে স্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদন করি। হয়তো স্রষ্টাকে দেখছি না, শুনছি না কিন্তু তিনি আমাকে দেখছেন, আমাকে শুনছেন– এই যে নিবিষ্টচিত্তে কল্পনা, একাগ্রচিত্ততা– এটাই তো ধ্যান।

একবার হজরত আলী (রা)-র পায়ে তীর বিঁধলো। প্রচণ্ড ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। কয়েকজন সাহাবী তীর খুলতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তীরে হাত দিলেই আলী (রা) চিৎকার করে ওঠেন ব্যথায়। রসুল (স) বললেন, আলী যখন নামাজে সেজদায় থাকবে তখন তীরটা খুলে নিও। কারণ নামাজে সে এত নিমগ্ন থাকবে যে, ব্যথা কিছুই টের পাবে না। তা-ই হলো। আলী (রা) নামাজে দাঁড়ালেন। তীর খুলে নিলেন সাহাবীরা। তিনি টেরই পেলেন না।

মোবাইল ফোনের এ যুগে এক দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের আরেক দেশে সরাসরি কথা বলা, কথা শোনা এখন খুব দৈনন্দিন একটি ব্যাপার। একসময় এটা যতই অকল্পনীয় ব্যাপার হোক না কেন, এখনকার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে আমরা জানছি যে, কলারের মোবাইল থেকে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগনাল ট্রান্সমিট হচ্ছে। সেই সিগনালটা রিসিভড্ হচ্ছে রিসিভারের মোবাইলে। আর সেটা সম্ভব হচ্ছে কলার এবং রিসিভারের মধ্যে একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউনিং হচ্ছে বলে।

আমাদের সমস্ত চেতনার মূল হলো নিউরোন যা অতি সূক্ষ্ম। আর এ নিউরোনগুলো যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে তা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আওতায়ই পড়ে। সুতরাং 'কোয়ান্টাম' নাম দেয়াটা খুব যথার্থ হয়েছে। কারণ কোয়ান্টাম শেখায় আত্মমগ্নতার মধ্য দিয়ে চেতনার গভীর থেকে একজন মানুষ কীভাবে পাবে তার অশান্তি, অসুস্থতা আর ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙার পথ। কোয়ান্টাম শেখায় দেহ-মনের অফুরন্ত শক্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে কীভাবে একজন মানুষ তার কাজে লাগাতে পারে।

একইভাবে বান্দা যদি আল্লাহকে ডাকতে পারে, টিউনিংটা যদি ঠিকভাবে হয়, তখন স্রষ্টার সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে যায়। এজন্যে ওলি আউলিয়ারা ধ্যানের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। নিবিষ্ট চিত্তে যিনি ধ্যান করেন তিনিই বুঝতে পারেন যে, কীভাবে ধ্যান করলে আল্লাহর সঙ্গে তার একটা সংযোগ হবে। এ যোগাযোগ বাইরের মানুষ টের পায় না। সেরকম এই বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে, যিনি আমাদের প্রভু, যিনি আমাদের প্রতিপালক, যিনি আমাদের জীবনের সবকিছুর বিধায়ক– তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার পদ্ধতি হচ্ছে ধ্যানের পদ্ধতি।

নামাজে যোগাসন বা ব্যায়ামের উপযোগিতাও আমরা লাভ করি। আমরা রুকুতে যাই, সেজদায় যাই, মাথা থেকে রক্ত চলাচল হয়। আমরা যখন আঙুলে গুণতে থাকি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'– তখন আমাদের হাতের আঙুলের যে কতগুলো পয়েন্টের কম্প্রেশন তা রক্ত চলাচলকে স্বচ্ছন্দ করে। সুতরাং দৈহিক, আত্মিক, মানসিক– সবদিক দিয়ে নামাজ আমাদের উপকার করে। ধ্যান থেকেও আমরা দৈহিক-মানসিক ও আত্মিকভাবে উপকৃত হই।

বিক্ষিপ্ততা কাজের কার্যকারিতাকে ব্যাহত করে। অন্যদিকে কনসেনট্রেশন বা সংবদ্ধতা এনার্জি বা শক্তিকে ফোকাসিং করে কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে অনেক বড় কাজও হয়ে যায় সহজে। ধ্যান বা মেডিটেশনে এ কাজটিই হয়। বিশেষ একটি দিকে আমি চিন্তা ধাবিত করছি। শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে এবং সে শক্তি দিয়ে সম্ভব হচ্ছে অনেক অভাবনীয় কাজ।

অর্থাৎ আল্লাহ একটা সিস্টেম দিয়েছেন, যদি বিশ্বাস জন্মে যে, এ সিস্টেমের কোনো ত্রুটি জয় করার ক্ষমতাও আল্লাহ দিয়েছেন, তাহলে কিন্তু আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ধ্যান এই আত্মবিশ্বাসকে অসাধারণভাবে জাগিয়ে তোলে। মেডিটেশনের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। মেডিটেশন মানুষকে শারীরিক এবং আত্মিকভাবে জাগ্রত করে, শক্তিশালী করে এবং তার আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

সাক্ষাতকার গ্রহণ ও অনুলিখন : রাবিয়া নাজরীন



ভালো হওয়ার শক্তি প্রত্যেকের মাঝেই আছে

বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ক নাগরিক কমিশনের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হুগলি কলেজে বাবার চাকরি সুবাদে আমরা ছিলাম হুগলির শিবপুরে। যুদ্ধের ডামাডোল বেড়ে যাওয়ায় বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন বগুড়ার পৈত্রিক বাড়িতে আমাদের রেখে আসবেন। ট্রেনে চড়ে আমরা রওনা হলাম। পথিমধ্যে কিছু আমেরিকান সৈন্য উঠলো আমাদের বগিতে। আমাদের ঠিক উল্টো পাশের বেঞ্চিতে বসেছিলো এক তরুণ সৈনিক। হঠাৎ তার হাতে একটা পিঁপড়া দেখে আব্বাকে সে জিজ্ঞেস করলো, এর বাংলা কী? আব্বা বললেন, পিঁপড়া। কিন্তু বার কয়েক চেষ্টা করেও সে উচ্চারণ করতে পারছিলো না। হঠাৎ দেখলাম পিঁপড়াটাকে সে আলতো স্পর্শে নামিয়ে রাখলো পাশে যাতে এর কোনো ক্ষতি না হয়। দৃশ্যটা আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিলো। একটা লোক কাঁধে বন্দুক নিয়ে মানুষ খুন করতে যাচ্ছে অথচ একটা ছোট পিঁপড়াকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেও তার কত সতর্ক চেষ্টা। তার মানে প্রতিটি মানুষ ভালো মানুষ হিসেবে ভালো মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। খারাপ হয় সে পরিবেশ পরিস্থিতি বা প্রবৃত্তির শিকার হয়ে।

প্রতিটি মানুষই তার ভালো-মন্দ কাজের ব্যাপারে স্বাধীন এবং স্রষ্টার কাছে ব্যক্তিগতভাবেই দায়বদ্ধ। এই স্বাধীনতাকে যদি সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, যদি উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি দেয়া যায় তাহলে তার খারাপ প্রবৃত্তি এবং প্রবণতাকেও সে দমন করতে পারবে অনেকাংশে।

রাষ্ট্রব্যবস্থার রয়েছে এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আমাদের সংবিধানের ৫৯-৬০ বিধানে স্থানীয় শাসনের কথা বলা হয়েছে। সেটা যদি বাস্তবায়িত হতো অর্থাৎ ছোট ছোট এলাকাভিত্তিক গঠিত হতো একেকটি লোকাল ইউনিট বা রিপাবলিক, তাহলে সেটাই হতো সত্যিকার অর্থে জনকর্তৃত্বের সরকার। যেখানে জনগণ স্বাধীন-স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের চাওয়া-পাওয়াকে প্রতিষ্ঠা করতে পারতো।

কিছুদিন আগে কুড়িগ্রাম থেকে কিছু ছাত্র-শিক্ষক এসেছিলেন তাদের দুঃখের কথা জানানোর জন্যে। তাদের দুঃখটা এরকম– পুঁটিমারির দিকে ব্রহ্মপুত্র বাঁধের একটা জায়গা ভেঙে যাওয়ায় তা মেরামতের জন্যে ৩৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ বরাদ্দ দেয়ার সময় আমলারা আরেকটি প্রকল্প অনুমোদন করলেন– ঐ ভাঙনের জায়গায় অর্ধবৃত্তাকারে আরেকটি বিকল্প বাঁধ তৈরি করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বন্যা প্রতিরোধ হবে বটে কিন্তু বিনিময়ে মোট ৬টি গ্রামের মানুষকে বাস্তুহারা হতে হবে, যেখানে ছিলো তিনফসলী জমি। গ্রামবাসীদের দুঃখ এখানেই যে, নিজেদের এলাকার যে উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকার তাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে তাতে যে তাদের লাভের চেয়ে ক্ষতি হবে বেশি সরকারকে সেটা বোঝানোর সুযোগ তারা পাচ্ছে না। বছরের কিছুসময় বন্যাকে মেনে নিতে তাদের অসুবিধা নেই, কিন্তু বাস্তুহারা জীবিকাহারা হয়ে গেলে তাদের অস্তিত্বই তো বিপন্ন হয়ে যাবে।

স্থানীয় বিষয়গুলোর সর্বোত্তম সমন্বয় ছাড়াও এর আরেকটি কার্যকর দিক হলো কর্মকর্তা, নেতৃবৃন্দ এমনকি সাধারণ মানুষেরও সামাজিক দায়বদ্ধতা। যেমন, মামলা-মোকদ্দমা থেকেই একটা উদাহরণ দেই। জমিজমার মামলায় বাদী-বিবাদী দুই পক্ষেই মিথ্যা সাক্ষী পাওয়া যায়। তারা গ্রাম থেকে অনেক দূরে একটা আদালতে এসে খুব অবলীলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আবার গ্রামে ফিরে যায়। কিন্তু আদালতটা যদি ঐ গ্রামেই হতো, তাহলে তারা আর এ সুযোগ পেতো না। কারণ তখন পরিচিত পরিমণ্ডলে নিন্দার মুখোমুখি হওয়ার ভয় থাকতো।

এখন পণ্যের প্রসার নির্ভর করে তার কার্যকারিতার ওপরে নয়, কত সুন্দরী বা জনপ্রিয় তারকা এর মডেল হলেন তার ওপর। কিছু নারী তাদের সৌন্দর্যকে বানিয়েছে পণ্য। বিশ্বব্যাংক বা দাতাগোষ্ঠীগুলো সাহায্যও করে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। বিশ্বব্যাংক আমাদেরকে অঢেল অর্থ দিলো রাস্তা তৈরি করার জন্যে। আমরা রাস্তা করলাম। ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলাম যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ এবং সুলভ মাধ্যম রেল-ব্যবস্থাকে।

আমার বিচারিক জীবনে মুসলিম ব্যক্তিক আইনের কিছু রায় নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। তার মধ্যে একটি ছিলো তালাকপ্রাপ্তা নারীর তার প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়া প্রসঙ্গে। আরেকটি ছিলো ওয়ারিশদের অসিয়ত করা যাবে কি না সে প্রসঙ্গে। আর সবচেয়ে আলোচিত রায়টি ছিলো ফতোয়া বা আইনের ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার কোনো ব্যক্তির আছে কি না সে প্রসঙ্গে। প্রথমটিতে আমি বলেছিলাম, তালাকপ্রাপ্তার তার স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলেছিলাম, ওয়ারিশকেও অসিয়ত করা যেতে পারে, তবে প্রশ্ন থাকলে তা আদালতে ফয়সালা হতে পারে। আর তৃতীয় ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে, ফতোয়া দেয়ার অধিকার আদালতের, কোনো ব্যক্তির নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমি রায় দিতে চেষ্টা করেছি কোরআন-হাদিসের সঠিক বর্ণনারীতিকে অনুসরণ করে। কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্যতা বা স্বাভাবিক মানবিকতা বিবেচনার বদলে রায়গুলো সম্মুখীন হয়েছে উগ্র আবেগ বা একদেশদর্শী সমালোচনার।

অন্যের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে আমি যেমন সবসময় সম্মান করেছি, নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করতে গিয়েও কোনো ভয়-হুমকি-ধামকির মুখে বিচলিত হই নি। ফতোয়া সংক্রান্ত রায়টির পর (যদিও আপিল বিভাগে তা বিবেচনাধীন আছে) আমার প্রতি নানারকম হুমকি এসেছে, ভুয়া বোমার প্যাকেট ফেলে রাখা হয়েছে আমার বাড়িতে। প্রশাসন থেকে বিশেষ নিরাপত্তা পুলিশ দিতে চেয়েছে। কিন্তু আমি সম্মতি দেই নি।

মানুষের এই স্বাধীন সত্তা হরণের আরেকটি উদাহরণ হলো বিশ্বায়ন। এখন পণ্যের প্রসার নির্ভর করে তার কার্যকারিতার ওপরে নয়, কত সুন্দরী বা জনপ্রিয় তারকা এর মডেল হলেন তার ওপর। কিছু নারী তাদের সৌন্দর্যকে বানিয়েছে পণ্য। বিশ্বব্যাংক বা দাতাগোষ্ঠীগুলো সাহায্যও করে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিশ্বব্যাংক অঢেল অর্থ দিলো রাস্তা তৈরি করার জন্যে। আমরা রাস্তা করলাম। ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলাম যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ এবং সুলভ মাধ্যম রেল-ব্যবস্থাকে। বিনিময়ে রাস্তা তৈরির পর তাদের বাস-ট্রাক-গাড়ি আমদানির পথই সুগম হলো।

আমরা সমস্যার সার্বিক বা সমন্বিত সমাধান না করে আংশিক সমাধানের পেছনে ছুটি। আমাদের এখানে দুর্নীতি হয়, মানুষ ঘুষ খায়। কারণ বিপুল অর্থ দিয়ে কেনার মতো প্রচুর পণ্য বাজারে রয়েছে। একটা পিৎজার দাম যদি আড়াই হাজার টাকা বা একটা পারফিউমের দাম যদি সাত হাজার টাকা হয়, সেটা কেনার জন্যেও অবশ্যই কিছু মানুষ তৈরি হবে যারা প্রলুব্ধ হবে অবৈধ উপার্জনের পথে। এর সবকিছুর পেছনেই আছে পুঁজিবাদী চক্রের হাত।

এ বিষয়গুলোতেই এখন আমাদের সচেতনতা দরকার। ব্যক্তি থেকে জাতি সব পর্যায়েই প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনের মধ্যে সীমা নির্ধারণ করা দরকার। কোরআন অনুসারে এই প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সীমাটা খুব সহজবোধ্য একটি ব্যাপার। আর তাহলেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগতভাবে আমরা আবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো একটি সফল, সমৃদ্ধ এবং সার্বজনীন শক্তি হিসেবে।

[কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন]

কোয়ান্টামই হবে দিনবদলের অনুঘটক

প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন



ইতিহাসবিদ ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির সভাপতি। তিনি বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপরে তার কোনো আস্থা নেই। কিন্তু সেই মানুষগুলোর ওপর তার আস্থা আছে, যাদের মধ্যে অন্তত তিনটি গুণ আছে। যারা সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারে, মহান অনুভব যাদের চিত্তে সবসময় থাকে এবং জগৎ ও জীবনের স্বার্থে যারা সঠিক কর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ তিনটি গুণ সম্বলিত মানুষ সমাজের জন্যে সম্পদ, দেশের জন্যে সম্পদ। অন্যথায় সে মানুষ নিজের জন্যে বোঝা, সমাজের জন্যে হুমকি, দেশের জন্যে ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ শেষ কথাটি হচ্ছে মানুষ চাই। নিজে মানুষ হলে সমাজটা মানুষ হয়, দেশও মানুষ হয়। দিনবদল হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স ৩৮ বছর পেরিয়ে গেল। স্বাধীনতা আমাদের কাছে অনেক বড় স্বপ্নের দ্যোতক ছিলো, সূচক ছিলো। সময় যত গড়িয়েছে, স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এমনকি সেই ত্রিশের দশকে যখন বাংলাদেশ ভাগ হয় নি তখনই নজরুল বলে গেছেন– আমাদের বাংলাদেশ, রাজরানি এখন ভিখারিনি, কাঁদিছে বনে লুটিয়ে কেশ।

কেন এ অবস্থা? বিভিন্ন সময় গবেষকরা নানান তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছেন এর কারণ হিসেবে। অথচ সহজ সত্যটি হলো আমাদের যাবতীয় সংকটের মূলে রয়েছে মানুষের মনুষ্যত্বহীনতা। গত বইমেলায় 'মনুষ্যত্বের সংকট' নামে আমার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে বলেছি আমার চূড়ান্ত উপলব্ধ সত্যের কথা– বাংলাদেশ গড়বার জন্যে মানুষ চাই, যে মানুষের এখন বড় অভাব।

১৫ কোটি মানুষ আমাদের জন্যে সমস্যা নয়। সমস্যা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের জন্যে, আইএমএফ-এর জন্যে। আমার দেশের সবচেয়ে বড় সংকট যেমন মনুষ্যত্বহীনতা, তেমনি আমার দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা। এই ১৫ কোটি মানুষের ৩০ কোটি হাত আছে, ১৫ কোটি মন আছে, ১৫ কোটি মস্তিষ্ক আছে। এগুলো যদি কাজে লাগানো যায়, তাহলে এই দেশ বিশ্বের বিস্ময় হতে পারে। আর গুরুজীর নেতৃত্বে ফাউন্ডেশন সে কাজটিই করছে। গুরুজী একসময় হাতের রেখা ধরে আমাদের ভবিষ্যৎ রোডম্যাপ তৈরি করে দিতেন। সেই সুবাদে তার সঙ্গে আমার সখ্য, ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু তিনি নিজের মতো বদলে গেলেন একদিন। তিনি দেখলেন মানুষের এই রোডম্যাপ তো মানুষ নিজেই তৈরি করতে পারে, যদি মানুষ 'মানুষ' হয়ে ওঠে।

সে-ই মানুষ– যে মানুষের মন আছে, যে মনে নেতিবাচক চিন্তা নেই, আছে কল্যাণ ভাবনা, আছে সৃষ্টিশীল প্রণোদনা, আছে চেতনা। জাগতিক হতাশা-ব্যর্থতা এবং বিপন্ন বিষণ্নতায়ও যে মানুষ নিজের মধ্যে স্থিতধী, সে মানুষ আমাদের জন্যে সম্পদ। গুরুজী এই সম্পদ সৃষ্টির কাজে লেগে গেলেন এবং আমি দেখছি ক্রমেই তিনি বিস্তৃত হচ্ছেন, সম্প্রসারিত হচ্ছেন গভীর শিকড় নিয়ে। তিনি তার শক্তিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন সারাদেশে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোয়ান্টামই একদিন এই বাংলাদেশের দিনবদলের অনুঘটক হবে। হয়েছেও ইতোমধ্যে। কারণ রাজনীতি নয়, এখানে কোয়ান্টামের মতো উদ্যোগগুলোই দিনবদল ঘটাবে বলে আমি বিশ্বাস করি ।

কোয়ান্টাম শুধু তার ব্যাপ্তিই বাড়ায় নি, শুধু কোয়ান্টিফাই-ই করে নি, করেছে কোয়ালিফাই। অর্থাৎ গুণগত মান বাড়াবার কাজ। মানুষকে মানুষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার কাজ। একজন মানুষ তার শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে ধ্যান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, ইতিবাচক শক্তির মাধ্যমে কীভাবে জয় করবে– শিখিয়েছে সে প্রক্রিয়া।

আত্মবিশ্বাস, ইতিবাচকতা যে একজন মানুষের বাস্তবতাকে কীভাবে বদলে দেয় তার একটা উদাহরণ দেয়া যাক। একটু বয়স হয়ে গেলেই আমরা বলতে থাকি– বয়স বাড়ছে, এখন আর আগের মতো মনে থাকে না কিছুই। তার মানে আপনি নিজেই নিজেকে বৃদ্ধ করছেন। আপনার শরীরের যন্ত্রগুলোকে আপনি দুর্বল করে দিচ্ছেন।

> *১৫ কোটি মানুষ আমাদের জন্যে সমস্যা নয়। সমস্যা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের জন্যে, আইএমএফ-এর জন্যে। আমার দেশের সবচেয়ে বড় সংকট যেমন মনুষ্যত্বহীনতা, তেমনি আমার দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা। এই ১৫ কোটি মানুষের ৩০ কোটি হাত আছে, ১৫ কোটি মন আছে, ১৫ কোটি মস্তিষ্ক আছে। এগুলো যদি কাজে লাগানো যায়, তাহলে এই দেশ বিশ্বের বিস্ময় হতে পারে।*

বিজ্ঞান বলে, ২৮ বছর বয়স থেকে আমরা শারীরিক নিয়মেই স্মৃতিশক্তি হারাতে থাকি আর ৫৮-এর মধ্যে স্মৃতিশক্তির জীবন শেষ হয়ে যায়। ৫৮-এর পর থেকে বার্ধক্যের লক্ষণগুলো ফুটে উঠতে থাকে। প্রায়ই তার ভুলে যাওয়ার প্রবণতা হতে থাকে।

কিন্তু একজন সচেতন মানুষ বা আত্মশক্তিসমৃদ্ধ মানুষের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আরেকটি সূত্র তখন সক্রিয় হয়। তাহলো, ৫৮-এর পরে একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের সেকেন্ডারি মেমোরি গড়ে ওঠে, যিনি তার স্মৃতিকে কর্মক্ষম রাখার জন্যে ভালো কাজে, নতুন নতুন দক্ষতা শেখার কাজে ব্যবহার করেছেন এবং পজিটিভ অটোসাজেশন দিয়েছেন। অন্যদিকে যারা নেতিবাচক চিন্তায় বেশি সময় ব্যয় করে তাদের স্মৃতিশক্তি সবচেয়ে দুর্বল থাকে। পিকাসো তো জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। ৯৮ বছর বয়সেও সন্তানের জনক হয়েছিলেন। কাজেই মানুষের মধ্যে অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতাগুলোই জাগিয়ে তুলছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলতেন, 'তোমরা যেমন মাছের চাষ কর, তেমনি তোমরা মানুষের চাষ কর।' মানুষের চাষ হচ্ছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে। আসুন এই চাষ-বাসে একটু সার দেই– আমাদের ফলগুলো যেন বেশ জীবন্ত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের মানুষগুলো যেন মনুষ্যত্বের ঠিকানা খুঁজে পায় এই ফাউন্ডেশনে।

১৯৯৩ সালে পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে কোয়ান্টামের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। আমার সৌভাগ্য যে, সেদিন আমি ছিলাম। তখন ছিলো শীতের দিন। বেশ স্যুট, কোট-টাই পরে কেতাদুরস্ত হয়ে বক্তৃতা করেছিলাম, গরমে ঘামি নি, লোডশেডিং ছিলো না তখন। এখন এসে দেখলাম লোডশেডিং হলো, গরমে ঘামলাম, কিন্তু যা দেখলাম যা শুনলাম তাতে গরমে ঘামবার শ্রান্তিটি ভুলিয়ে দিয়েছে। আমার একান্ত কামনা এই প্রতিষ্ঠান আরো বিস্তৃত হবে। হতাশাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত, নেতিবাচক চিন্তায় বিপন্ন এবং ধ্বংসাত্মক ভাবনায় প্রায় বিধ্বস্ত– এমন মানুষগুলোকে আবার আশাবাদের ঠিকানা চিনিয়ে দেবে এই ফাউন্ডেশন।

[কোয়ান্টাম মেথড ৩০০ কোর্সপূর্তির প্রাক্কালে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট শিক্ষক সমাবেশে প্রদত্ত শুভেচ্ছা বক্তব্যের অনুলিখন]



পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ এবং আর্থসামাজিক বিষয়ের গবেষক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আদিপা'র সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং রোমভিত্তিক সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট।

'দেশের অবস্থা কী'– এ প্রশ্নের উত্তরে এক রিকশাচালক বলছিলেন, 'আর বইলেন না ভাই, খুব খারাপ অবস্থা, রাজনীতির মধ্যেও পলিটিক্স ঢুইকা গেছে।' কথাটার অর্থ হয়তো ভুল কিন্তু এর আবেদনটা দেশের সাধারণ জনগণ সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি– সবই এই পলিটিক্সে জর্জরিত।

রাজনৈতিক দলগুলোর একটা প্রচলিত স্লোগান হচ্ছে– জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস। অথচ জনগণ কী চায় তা না জেনেই তারা ভাষণের পর ভাষণ দিয়ে যান। তারা থাকেন বাঁশের বেড়া দেয়া পৃথক মঞ্চে, জনতার কাছাকাছি আসতে পারেন না। তাই জনগণের চাওয়াও তাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে না।

সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের এসব কথাকে সবার সামনে তুলে ধরতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে আমরা একটি উদ্যোগ নিয়েছি। দেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত সব এলাকায় আমরা যাচ্ছি। সেখানকার কৃষক, শ্রমিক, রিকশাচালক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের কথা শুনছি, বুঝতে চেষ্টা করছি তাদের চাওয়াগুলোকে। এগুলোর আলোকে আমরা এরপর তৈরি করবো আমাদের প্রস্তাবনা।

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে আমরা পরিণত হয়েছি বিভিন্ন বিদেশি দাতাগোষ্ঠীর ক্রীড়নকে। অথচ যে সম্মান আমরা তাদের দেই তার কানাকড়িও আমরা দেই না আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের, যাদের উপার্জনের ৯৬০ কোটি ডলার আমরা পেয়েছি গত অর্থ-বছরে যা জাতীয় আয়ের ১২%। যদিও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে এই বিপুল পরিমাণ অর্থকেও আমরা উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করতে পারি নি।

যদি আমরা প্রবৃদ্ধি বাড়াতে চাই তাহলে বিনিয়োগ করতে হবে। এটা হতে পারে দেশি অথবা বিদেশি। জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশ বিনিয়োগ করে আমরা প্রবৃদ্ধি পাই ৫.৩%। অথচ অর্থনীতিবিদদের মতে, আমাদের পাওয়া উচিত ৮.৫%। কারণ অনেকগুলো, হয় তথ্য ভুল অথবা তথ্য ঠিক আছে কিন্তু চুরি হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অদক্ষতা হতে পারে, হতে পারে বিনিয়োগের যথাযথ ক্ষেত্রের অভাব।

বিদেশি বিনিয়োগ শুনলেই আমরা কেউ কেউ উল্লসিত হয়ে উঠি। কিন্তু টেলিকমিউনিকেশন বা মোবাইল ফোনের মতো খাতে অল্প বিনিয়োগ করে রাতারাতি কাঁড়ি কাঁড়ি মুনাফা বিদেশি কোম্পানি হাতিয়ে নিলে দেশের কোনো লাভ হয় না।

বিনিয়োগের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো শক্তি সম্পদের পর্যাপ্ততা। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ যথেষ্ট নয়। এছাড়া গ্যাস যে হারে ব্যবহার হচ্ছে তা বজায় থাকলে আগামী ১৫ বছর পর আমাদের গ্যাসভাণ্ডার শূন্য হবে। তারপর কী হবে কেউ জানি না। কারণ একটাই– তাৎক্ষণিকতাদুষ্ট ব্যবস্থাপনা।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নিয়ামক শক্তিগুলো তৃতীয় বিশ্বের ওপর চালাচ্ছে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আন্তর্জাতিক বিশ্বের কূটনীতি হচ্ছে একের পর এক প্রকল্পে তারা তৃতীয় বিশ্বকে মাতিয়ে রাখে। যেমন '৭০-এর দশকে শুরু হলো বাজার অর্থনীতি। '৭২-এ বলা হলো অর্থ নয়, পরিবেশই সব। '৮০-তে তাদের মুখে শোনা গেল, যা কিছু পারো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে রেখে যাও। '৯২-এ এলো টেকসই উন্নয়নের ধারণা। '৯৫-এ ২০:২০ কনট্রাক্ট। জাতীয় বাজেট থেকে ২০% রাখা হলো সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণে।

এদিকে ২০০০ সালে প্রকল্পের মাত্রা গেল বদলে, দারিদ্র পেলো প্রাধান্য। শুরু হলো মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট, তারপর এলো পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট। অর্থাৎ একদিকে বলছে টাকা দেবো, আবার বলছে অংশীদারিত্ব কর। সাম্প্রতিক যে প্রকল্প বাংলাদেশে চলছে তা হলো– এইড ফর ট্রেড। বাণিজ্য কর, সাহায্য পাবে। অর্থাৎ একেকবার একেক রকম কথা।

> *আমরা যদি আজ থেকে ২০ বছর পর এমন একটা সমাজ চাই যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না, সবার জন্যে থাকবে সমান সুযোগ। অজ-পাড়াগাঁয়ের একজন ছেলেও যদি বিজ্ঞানী হতে চায় বা কৃষিবিদ হতে চায়– সে সুযোগ সে পাবে। অর্থনীতি হবে সজীব ও সচল এবং রাজনীতি হবে অংশীদারিত্বমূলক গণতান্ত্রিক।*

বাংলাদেশের উন্নতি হচ্ছে না– কথাটা ঠিক নয়। উন্নতি হচ্ছে কিন্তু তা চলে যাচ্ছে মাত্র কয়েকজনের পকেটে। সরকারি এক হিসেবে দেখা যায়, '৯১-'৯২ সালে সবচেয়ে দরিদ্রের তুলনায় সবচেয়ে ধনীর আয় ছিলো ১৮ গুণ বেশি। মাত্র ৫ বছর পর সেটা হয় ২৭ গুণ। ২০০০-এ ৪৬ গুণ এবং ২০০৫-এ এসে হলো ৮৪ গুণ। কী অবিশ্বাস্য পরিমাণ বৈষম্য নিয়ে চলছে আমাদের সমাজ!

একটা সময় ছিলো যখন কেউ যদি সুদ-ঘুষ খেতো, লোকজন তার সঙ্গ এড়িয়ে চলতো। আর এখন কে অনেক টাকার মালিক– এটাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। টাকার উৎসটা বৈধ না অবৈধ সেটা কোনো ব্যাপার নয়। যদি আপনি ঘুষ না খান তাহলে অফিসের সবাই মনে করবে আপনি গোলমেলে লোক, আপনাকে সরাতে হবে– এটাই আজকের বাস্তবতা।

এ বাস্তবতা বদলানোর জন্যে দরকার লক্ষ্য। বাংলাদেশে আমরা কোনোদিন কোনো লক্ষ্য স্থির করি নি। ঠিক করি নি যে, আজ থেকে ২০/২৫/৩০ বছর পর আমরা কোথায় যেতে চাই। আমরা যদি আজ থেকে ২০ বছর পর এমন একটা সমাজ চাই যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না, সবার জন্যে থাকবে সমান সুযোগ। অজ-পাড়াগাঁয়ের একজন ছেলেও যদি বিজ্ঞানী হতে চায় বা কৃষিবিদ হতে চায়– সে সুযোগ সে পাবে। অর্থনীতি হবে সজীব ও সচল এবং রাজনীতি হবে অংশীদারিত্বমূলক গণতান্ত্রিক। হয়তো সবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না, কিন্তু আমাদের চেষ্টা থাকবে।

এখন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে কয়টি পথের কথা বলা যায়, তার একটি হলো শিক্ষা। কিন্তু আমাদের শিক্ষার মান খুবই নিচু। শিক্ষার প্রধান যে দুটো দিক– নৈতিকতা এবং দক্ষতা– এ দুটোরই প্রকট অভাব আমাদের শিক্ষায়। WHO বলে, মাথাপিছু বার্ষিক ৩৬ ডলার খরচ করলে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যব্যবস্থা পাওয়া যায়। অপরদিকে স্বাস্থ্যখাতে আমাদের মাথাপিছু গড় ব্যয় মাত্র ৪ ডলার।

এতসব নেতিবাচক বাস্তবতার মধ্যেও এখন আমাদেরকেই হাল ধরতে হবে। পরিবর্তনের আন্দোলনের সূচনা করতে হবে। যে আন্দোলনের হাতিয়ার লাঠিসোঁটা বা গুলি-বন্দুক নয়; সে আন্দোলনের হাতিয়ার করতে হবে নতুন চিন্তা, নতুন ধারণা, পারস্পরিক মমতা ও ভালবাসাকে। তাহলেই আসবে কাঙ্ক্ষিত সে পরিবর্তন।

[কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন]

মেডিটেশন নিরাময় ক্ষমতাকে উজ্জীবিত করে

প্রফেসর ডা. মো. নজরুল ইসলাম



প্রখ্যাত ভাইরোলজিস্ট প্রফেসর ডা. মো. নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর। তিনি বাংলাদেশ সরকারের এইডস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কর্মসূচির প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় এইডস কমিটির সদস্য সচিব। সম্প্রতি তিনি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র পোলিও নির্মূল প্রকল্পের আঞ্চলিক কমিশনের চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৭৯তম ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন।

কয়েকদিন আগে আমার এখানে একজন রোগী এসেছিলেন বিলিরুবিন টেস্ট করাতে। এর আগে আরেক জায়গা থেকে টেস্ট করিয়ে তিনি জেনেছিলেন যে, বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিক। ভদ্রলোক নিজেই মোটরসাইকেল চালিয়ে এলেন। কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় দেখা গেল বিলিরুবিন অনেক বেশি। শুনেই তার লুটিয়ে পড়ার অবস্থা। যে মানুষটি কিছুক্ষণ আগেও মোটর সাইকেল চালিয়ে এসেছেন এখন তিনি হেঁটেও যেতে পারছেন না। অর্থাৎ শুধু তথ্য বা কথা দিয়েও একজন মানুষকে যে প্রভাবিত করে ফেলা যায় এটা তার একটা বাস্তব উদাহরণ।

একসময় আমরা ভাবতাম, এটা বোধ হয় শুধু মানসিক ব্যাপার বা রহস্যময় একটি ব্যাপার। কিন্তু গত ৩০ বছরের স্টাডিগুলোর ডাটা এনালিসিস করে দেখা গেছে, এর দৃশ্যমান বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই রয়েছে। যেমন, এক লোক হাঁটতে হাঁটতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোনোভাবেই আর হাঁটতে পারছে না, ক্লান্তিতে মাটিতে পড়ে গেছে। হয়তো কাছেই বাড়ি কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও তার নেই। এমন সময় সে যদি শোনে– একটা বাঘ আসছে, তাহলে সে উঠে দৌড় দেবে। শক্তিহীন হয়ে পড়া মানুষটি দৌড় দেয়ার এ শক্তি পেলো কোথায়? বাঘটাকে দেখার পর যখন সে মনে করেছে ধরা পড়লে কী ঘটতে পারে। তখনই তার ব্রেনের হাইপোথ্যালামাস থেকে নানা ধরনের হরমোন নিঃসরিত হয়ে তাকে যোগালো পালানোর জন্যে যে শক্তি বা প্রস্তুতি দরকার তার সবকিছু।

সাইকোলজিকেল ইনপুট দিয়ে ফিজিকেল আউটপুট সৃষ্টির ব্যাপারটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তখন এটা দিয়ে ইমিউনোলজিকেল আউটপুট সৃষ্টির ব্যাপারটি নিয়েও বিজ্ঞানীরা আগ্রহী হলেন। অর্থাৎ মনের শক্তির মাধ্যমে নার্ভাস সিস্টেমকে প্রভাবিত করে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত ও পূর্ণ কর্মক্ষম করে তোলা। বর্তমানে দেশের ৬০টি সেন্টারে এইডস ও হেপাটাইটিস আক্রান্ত রোগীদেরকে আমরা এ পদ্ধতিতে কাউন্সেলিং করছি।

আমার কাছে একটি মেয়ে এলো। তার স্বামী এইডসে মারা গেছে। মেয়েটি বললো, তার যদি এইচআইভি পজিটিভ ধরা পড়ে তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। যখন সত্যিসত্যিই ধরা পড়লো আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, এখন ওকে জানাবো কীভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সেলিং ইউনিটের শরণাপন্ন হলাম। মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের কাছে। বন্ধ দরজার ভেতরে ৩ ঘণ্টা কাউন্সেলিং। কান্নাকাটি, আবেগাপ্লুত হয়ে পড়া ইত্যাদি। শেষমেষ চোখ মুছে বেরিয়ে এলো মেয়েটি। সে এখন দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় এনজিও-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক থেকে উইমেন লিডারশিপে এওয়ার্ড নিয়ে এসেছে।

আমার কাছে একটি মেয়ে এলো। তার স্বামী এইডসে মারা গেছে। মেয়েটি বললো, তার যদি এইচআইভি পজিটিভ ধরা পড়ে তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। যখন সত্যিসত্যিই ধরা পড়লো আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, এখন ওকে জানাবো কীভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সেলিং ইউনিটের শরণাপন্ন হলাম। মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হলো তাদের কাছে। বন্ধ দরজার ভেতরে ৩ ঘণ্টা কাউন্সেলিং। কান্নাকাটি, আবেগাপ্লুত হয়ে পড়া ইত্যাদি। শেষমেষ চোখ মুছে বেরিয়ে এলো মেয়েটি। সে এখন দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় এনজিও-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক থেকে উইমেন লিডারশিপে এওয়ার্ড নিয়ে এসেছে।

একজন মানুষ যখন জানতে পারে তার ক্যান্সার বা হেপাটাইটিস বা এইডস হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবে সে বিষণ্নতা ও হতাশায় ভেঙে পড়ে। শুধু তা-ই নয়– তার আশেপাশেও সবাইকে সে গোপনে বা প্রকাশ্যে এই দীর্ঘশ্বাসই ফেলতে দেখে। ফলে চিকিৎসা ও ওষুধে যা-ও কিছু হতে পারতো তা-ও হয় না। এই মানুষটিকেই যদি আশার বাণী শোনানো যেতো, যদি যথাযথভাবে কাউন্সেলিং করা যেতো তাহলে তার ইমিউন সিস্টেমকে চাঙ্গা করে তাকে এমনকি নিরাময় করে তোলাও সম্ভব। অন্তত যে কদিন বেঁচে আছে সে কদিন তাকে একটা আনন্দময়, প্রশান্ত এবং কর্মক্ষম জীবন দেয়া সম্ভব। এতে কোনো ওষুধেরও প্রয়োজন হয় না।

কোয়ান্টাম কোর্সে গুরুজীর আলোচনায় এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। গুরুজী তো কাউকে কোনো ওষুধ দিচ্ছেন না, তার বিশ্বাসের কথা আর এখানকার ইতিবাচক পরিবেশই এক্ষেত্রে নিরাময়ের প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। সাথে ওষুধ আর ডাক্তারের পরামর্শ তো সহায়ক শক্তি হিসেবে থাকছেই। এজন্যেই কোয়ান্টাম কোর্সে এসে মানুষ বিভিন্ন রোগ থেকে সেরে উঠছেন।

বর্তমান প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় আমরা চিকিৎসকেরা প্রকৃতপক্ষে রোগীদেরকে যথাযথ সেবা দিতে পারছি না বা দিচ্ছি না। শুধু কিছু ওষুধ লিখে দিয়ে আমরা দায়িত্ব শেষ করছি। উপযুক্ত কাউন্সেলিং-এর অভাবে রোগীর মানসিক, আত্মিকসহ সার্বিক পরিচর্যা তাই হচ্ছে না। ওষুধ খেয়ে উপকার হয়তো পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু সামগ্রিক নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা যায় যথাযথ কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে। তাই রোগীদের সাথে কথা বলাটা এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। রোগীরা যে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে যাচ্ছেন তার একটি বড় কারণ হলো ডাক্তারদের কাউন্সেলিং-এর অভাব। কারণ সাইকোলজিকেল ইনপুট দিতে হলে রোগীর সাথে কথা বলতে হবে।

মূলত নিজেকে জানার ও আত্ম অনুভবের তাগিদ থেকেই আমার কোয়ান্টামে আসা। সাইকো-নিউরো-ইমিউনোলজি নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে চমৎকার, সমৃদ্ধ ও বাস্তবভিত্তিক তথ্য ও প্রক্রিয়া এখানে দেখলাম। এখানে আমি নিজেকে আরো সম্পৃক্ত করতে চাই। কোয়ান্টাম হিলিং প্রক্রিয়াকে বিস্তারিত উপলব্ধি করতে চাই, যাতে এ থেকে রোগীরা আরো বেশি উপকৃত হতে পারে।

[কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট শিক্ষক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন]



ধ্যান ॥ আল্লাহকে উপলব্ধি করার পথ

বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। হামদর্দ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যরা নিজেকে জানার বা আত্ম উপলব্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আসলে নিজেকে বোঝার চেষ্টাটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে– যদি স্রষ্টাকে চিনতে চাও তবে আগে নিজেকে চেনো। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, মানুষ আমার রহস্য। আমি মানুষের রহস্য। এ রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যেই মানুষের সৃষ্টি।

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সকল সৃষ্টির ওপর আধিপত্য দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, বানিয়েছেন তার প্রতিনিধি। একমাত্র মানুষকেই তিনি দিয়েছেন সেই জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধা যা দিয়ে সে আল্লাহর অসীম সৃষ্টিশীলতা ও কুশলতাকে অনুধাবন করতে পারে। মানুষকে তিনি কত গুরুত্ব দিয়েছেন তা বোঝা যায় এভাবে যে, প্রথম নাযিলকৃত আয়াতে মানুষের জন্মরহস্যকেই তিনি তুলে ধরেছেন– 'মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ড থেকে'। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোরআন নাযিলের ৯০০ বছর পর ১৬৭৭ সালে মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর স্পার্ম সেল নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরাও একই তথ্য দিলেন।

মানুষ যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তা তিনটি মাপকাঠি দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি। স্থান, গতি এবং বিশেষ বিবেক।

স্থানের মাপকাঠিতে অন্যান্য সৃষ্টিবস্তুর তুলনায় মানুষ যথেষ্ট ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব। সাড়ে ৩ হাতের মানুষকে ২৫ হাজার মাইলের পৃথিবীর তুলনায় একটি বালিকণাই বলা যায়। আর সে যখন পৃথিবীরও ১৩ লক্ষ গুণ বড় সূর্যের তুলনায় দাঁড়ায় তখন কী হয় তা বলাই বাহুল্য। এটা তো বাহ্যিক। কিন্তু মানুষের অন্তর্গত স্থানের কি কোনো সীমাবদ্ধতা আছে? মানুষের ব্রেনে নিউরোন সেল রয়েছে ১০০ বিলিয়ন। যদি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করি তাহলে এক সূর্য তো বটেই এরকম হাজার-কোটি সূর্যের ধারক গ্যালাক্সিকে আমার ভেতরে নিতে কোনো অসুবিধা হয়? হয় না। এটাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

দ্বিতীয় হলো– গতি। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে মন নামের এক রহস্যময় অস্তিত্ব। মনের গতিকে কি আলোর গতি বা অন্য কোনো মাপক দিয়ে পরিমাপ করা যায়? আলোর গতি ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। মনের গতি কি এর চেয়েও বেশি নয়?

তৃতীয় হলো– বিশেষ বিবেক। সাধারণ সচেতনতা আল্লাহ সবাইকেই দিয়েছেন। একটা পিঁপড়াও জানে কোথায় ঘর করলে ডিম নিরাপদ থাকবে। সাইবেরিয়া থেকে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে শীতের পাখি যেমন বাংলাদেশে আসে তেমনি আবার ঠিক ঠিক চিনে ফিরেও যায়। মানুষকে আল্লাহ এই সাধারণ বিবেক যেমন দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন বিশেষ বিবেক– মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রজন্মান্তরে যে জ্ঞান সঞ্চারিত হয়ে আসছে।

আর যদি কুশলতার কথা বলি তাহলে যেকোনো সৃষ্টির চেয়ে বিস্ময়কর বোধ হবে মানুষের সৃষ্টি। মানুষের ডিএনএ-তে তিনশ কোটি কোড রয়েছে। মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণের সঞ্চার হয় তখনই স্থির হয়ে যায় কোন জিন শরীরের কোন অংশটি তৈরি করবে। এমনকি তা নাকের সূক্ষ্ম লোম থেকে শুরু করে মুখের দাড়ি পর্যন্ত।

আল্লাহর সৃষ্টির এ পরিকল্পনা ও আর্কিটেকচারাল কনসেপ্ট– এটা এত নিখুঁত ও রহস্যময় যে, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে আমি কে, কেন এসেছি, সৃষ্টিজগতে আমার অবস্থান কোথায়– এই আত্মজ্ঞানই হওয়া উচিত মানুষের সকল জ্ঞান, সকল শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। আর ধ্যান বা আত্মমগ্নতা এই আত্মজ্ঞান লাভেরই মোক্ষপথ। পবিত্র কোরআনে এ ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে

সূরা আর রহমানে আল্লাহ বলছেন, হে জ্বীন ও মানুষ, তোমরা অসীমে যেতে পারবে। কিন্তু পারবে না আমার আয়ত্তের বাইরে যেতে। ধ্যানের মাধ্যমে আমরা এই অসীমেই যেতে পারি। ধ্যানে আমি যখন আল্লাহকে চিন্তা করবো তখন সূর্যের ভেতর দিয়ে চলে গেলেও এর হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপ শরীরে লাগে না। মনের গতিকে কোনো ছাদ, কোনো দেয়াল, কোনো হিমালয়ই আটকে রাখতে পারে না। ধ্যানের মধ্য দিয়েই আল্লাহ প্রদত্ত এই অসীম শক্তি উপলব্ধ সত্যে পরিণত হয় মানবমনে।

আসমান জমিন এবং দিবারাত্রি পরিবর্তনের মধ্যে আমি চিন্তাশীলদের জন্যে রেখেছি নিদর্শন।

জীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত ঘটনা হলো মৃত্যু। কিন্তু সময়টা অনিশ্চিত। অলি-বুজুর্গ, সাধক যারা এ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেন তারা বলেন, দমে দমে আল্লাহ আল্লাহ কর। কারণ দম যতক্ষণ আছে ততক্ষণই জীবন। যেমন, কেউ কোমায় আছে, কথা বলতে পারে না, খেতে পারে না, কাউকে চেনে না। বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে কৃত্রিম যন্ত্রপাতি দিয়ে। তারপরও কিন্তু কেউ বলবে না লোকটা মারা গেছে। কারণ তার এখনও দম আছে। এই দম আমরা প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার বার নিই, ছাড়ি। একবার দম নিয়ে যদি তার পরেরবার ছাড়তে না পারতাম তাহলে সেটাই কিন্তু হতো আমার মৃত্যু মুহূর্ত। তার মানে প্রতি মুহূর্তেই আমার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। বলা উচিত– শোকর আলহামদুলিল্লাহ। যে ধর্মাবলম্বীই হই না কেন স্রষ্টার প্রতি ধন্যবাদ জানানোর বিকল্প কিছু হতে পারে না। কারণ আলো বাতাস পানিসহ চারপাশের সমস্ত পরিবেশটা বিবেচনা করলে আমরা প্রতি মুহূর্তেই স্রষ্টার আশীর্বাদপুষ্ট।

এ শুকরিয়া, এ স্মরণ এবং এ উপলব্ধির জন্যে প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতি, প্রয়োজন ধ্যান। ব্যায়াম করলে একজন শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারেন। কিন্তু সুষম মানসিক গঠন ও বিকাশে প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এ প্রস্তুতি বা ধ্যানের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করে ইলমে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

নবীজী (স) হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান করেছেন। একসময় আল্লাহ তাঁকে যথাযথ সত্য অবহিত করেছেন। তবে ধ্যানকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করার জন্যে আল্লাহ কিছু খুঁটি ঠিক করে দিয়েছেন যাতে আমরা দিকভ্রান্ত না হই বা ছিটকে না পড়ি। কলেমা নামাজ যাকাত রোজা হজ– ইসলামের এ ফরজগুলোই সেই খুঁটি।

সূরা আর রহমানে আল্লাহ বলছেন, হে জ্বীন ও মানুষ, তোমরা অসীমে যেতে পারবে। কিন্তু পারবে না আমার আয়ত্তের বাইরে যেতে। ধ্যানের মাধ্যমে আমরা এই অসীমেই যেতে পারি। ধ্যানে আমি যখন আল্লাহকে চিন্তা করবো তখন সূর্যের ভেতর দিয়ে চলে গেলেও এর হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপ শরীরে লাগে না। মনের গতিকে কোনো ছাদ, কোনো দেয়াল, কোনো হিমালয়ই আটকে রাখতে পারে না। ধ্যানের মধ্য দিয়েই আল্লাহ প্রদত্ত এই অসীম শক্তি উপলব্ধ সত্যে পরিণত হয় মানবমনে।

[কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন]

স্বপ্নের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছবোই

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন বীর সেনানী। মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ হিসেবে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীন দেশের তিনিই প্রথম বিমানবাহিনী প্রধান। বিভিন্ন সময় তিনি বাংলাদেশ বিমানের চেয়ারম্যান, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার এবং বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালে আমি পাকিস্তান বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে ঢাকায় কর্মরত ছিলাম। ঢাকায় এয়ারফোর্সের বাঙালিদের মধ্যে আমিই ছিলাম সিনিয়র মোস্ট অফিসার। ২৫ মার্চ রাতে ঘটে গেছে ইতিহাসের বর্বরতম সেই হত্যাকাণ্ড যখন পাকিস্তানি বাহিনী রাতের আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালির ওপর। গুলি করে মেরেছিলো হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে। এত আগুন জ্বলেছিলো সে রাতে যে, রাতের আকাশও আগুনের আঁচে টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিলো। আর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিলাসবহুল রুমের জানালা দিয়ে সেই হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছিলেন পাকিস্তানের কুখ্যাত রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টো। সকালবেলা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তার প্রতিক্রিয়া তিনি জানান এভাবে– "Thank God, Pakistan has been saved" অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশ– সে সময় যাকে পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো, তাকে তিনি পাকিস্তান বলে মনে করেন না এবং তার ক্ষতি নিয়েও তিনি বিচলিত নন– এ মনোভাবই বোধ করি ফুটে উঠেছে এ মন্তব্যে।

মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আরো কয়েকজন ফাইটার পাইলটের সাথে যোগাযোগ করলাম। সব মিলিয়ে ১০ জন পাইলট তাদের পরিবার নিয়ে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে সীমান্ত অতিক্রমের জন্যে এগুতে লাগলাম। একটি দল আগরতলায় পৌঁছে গেল। আমাদের দলটি সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছলো সীমান্তের একদম কাছে শিবের বাজার নামে একটি গ্রামে। সারাদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে হেঁটে আমরা সবাই ভীষণভাবে ভিজে গিয়েছিলাম, পথের ক্লান্তি আর ক্ষুধা তো ছিলোই। গ্রামের বাজারে একজনের কাছে আশ্রয় চাইতেই সে আমাদেরকে একজন কৃষকের সাথে যেতে বললো। আমরা গেলাম। একটা কুঁড়ে ঘরে খড়ের বিছানা পেতে আমাদের সবাইকে ঘুমুতে দেয়া হলো। হঠাৎ রাত আড়াইটার দিকে শুনি দরজা ধাক্কানোর শব্দ। সঙ্গী পাইলটরা সাথে সাথে অস্ত্র হাতে অবস্থান নিয়ে ফেললো। কিন্তু দরজা খুলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম– যখন দেখলাম কৃষক এবং তার স্ত্রীর হাতে আমাদের জন্যে গরম ভাত এবং মুরগির মাংসের তরকারি। দরিদ্র এ কৃষক তার ঘরের যৎসামান্য চাল এবং পালা মুরগি জবাই করে এই রাত আড়াইটায় রান্না করে নিয়ে এসেছে আমাদের জন্যে। নিষ্ঠুরতা দেখতে দেখতে পাথর হয়ে ওঠা আমার এ মন সেদিন আপ্লুত হয়ে পড়লো এক দরিদ্র কৃষকের মানবিকতার দৃষ্টান্ত দেখে। যুদ্ধ শেষে পুরো গ্রাম আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া সেই খাঁ খাঁ শিববাড়িতে গিয়ে অনেক খুঁজেও তাকে আর পাই নি।

সেসময় পাকিস্তানি বাহিনী ছিলো অত্যন্ত সুসজ্জিত, সুপ্রশিক্ষিত আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ৯৩ হাজার সেনাদলের একটি সুসংগঠিত বাহিনী। আর এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে যারা, সেই মুক্তিবাহিনী ছিলো যুদ্ধ সম্পর্কে কোনোরকম পূর্ব অভিজ্ঞতাবিহীন নামমাত্র প্রশিক্ষণে তৈরি একটি বাহিনী, যাদের রসদ বলতে গেলে কিছুই নেই। ১৯৭১-এর আগস্টে একবার মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ক্যাম্প পরিদর্শনে গেলাম। একটা শতচ্ছিন্ন ত্রিপলের নিচে গাদাগাদি করে তিনশ মুক্তিযোদ্ধার থাকার ব্যবস্থা। এদের কেউ ছাত্র, কেউ কৃষক, কেউ ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার। রাতে যখন গেলাম তখন তারা ঠান্ডা ভাত আর ডাল দিয়ে খাবার খাচ্ছিলো। ধরেই নিলাম যে, এখন এদের কাছ থেকে থাকা-খাওয়া নিয়ে নানারকম অভিযোগের কথা শুনতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, একটি মানুষও সেদিন উঠে দাঁড়ায় নি থাকা-খাওয়ার কোনো অভিযোগের কথা বলার জন্যে। বরং তাদের সবার একটিই জিজ্ঞাসা ছিলো কবে নাগাদ তারা আরো অস্ত্রশস্ত্র পাবে।

প্রশিক্ষণের জন্যে বা যুদ্ধের জন্যে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের বিমানবাহিনীর কোনো বিমান ছিলো না। সেপ্টেম্বরে ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকে আমরা তিনটি বিমান পেলাম। আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলো ভারতের নাগাল্যান্ডের পরিত্যক্ত একটি বিমান ঘাঁটি বীমাপুরে। যে তিনটি জঙ্গি বিমান আমরা পেয়েছিলাম তা এতই সাধারণ মানের জঙ্গি বিমান যে, আমাদের একমাত্র রণকৌশল হলো রাতের বেলায় আক্রমণ করা এবং বৃক্ষের উচ্চতায় ওড়া যাতে রাডারে ধরা না পড়ে। কিন্তু নাগাল্যান্ডের মতো গাছপালা আচ্ছন্ন পাহাড়ি এলাকায় এই প্রশিক্ষণ যে কতটা দুঃসাধ্য সেটা একজন অভিজ্ঞ পাইলট হিসেবে আমি জানি। একটা পাহাড়ের চূড়ায় গাছ কেটে সেখানে সাদা প্যারাসুট ফেলে তৈরি করা হলো প্রশিক্ষণ টার্গেট। সে এলাকায় গাছের একটু ওপর দিয়েই ভেসে বেড়াতো পুরু মেঘের আস্তরণ। গাছ এবং মেঘের স্তরের সেই সামান্য ব্যবধানে জঙ্গি বিমান নিয়ে প্রশিক্ষণ নেয়া এতটাই কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ যে সাধারণ অবস্থায় এটা চিন্তাই করা যায় না। কিন্তু আমাদের নিবেদিতপ্রাণ একদল তরুণ পাইলট সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করেছে। ফাইটার প্লেন নিয়ে নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে তারা যে সফল অপারেশন চালিয়েছে তা এ যুদ্ধে বিজয়ের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কারণ তারা পাকিস্তানি বাহিনীর জ্বালানি তেলের ডিপোতে আক্রমণ করে তা জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। ফলে জ্বালানি সরবরাহে দারুণ ঘাটতিতে পড়ে পাকিস্তানি বাহিনী।

> *দরজা খুলে বিস্ময়ে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম– যখন দেখলাম কৃষক এবং তার স্ত্রীর হাতে আমাদের জন্যে গরম ভাত এবং মুরগির মাংসের তরকারি। দরিদ্র এই কৃষক তার ঘরের যৎসামান্য চাল এবং পালা মুরগি জবাই করে এই রাত আড়াইটায় রান্না করে নিয়ে এসেছে আমাদের জন্যে।*

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান পশ্চিম ভারতের কয়েকটি ঘাঁটি আক্রমণ করে আর এর মাধ্যমেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু মুক্তিবাহিনী আক্রমণের পর আক্রমণ করে পাকিস্তানি বাহিনীকে শারীরিক-মানসিকভাবে এতটাই দুর্বল করে ফেলেছিলো যে, মাত্র ৬ দিন পরেই ৯ তারিখে তারা আত্মসমর্পণের জন্যে প্রস্তাব দিলো। অবশ্য এরপরও নানারকম কূটনৈতিক জটিলতার কারণে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ হয় ১৬ ডিসেম্বর। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ হিসেবে আমি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করি। জিপে করে যখন রমনা রেসকোর্স ময়দানে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করছিলো। তাদের চোখে-মুখে ছিলো স্বপ্ন– স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে যে স্বপ্নের দরজা তাদের সামনে খুলে গেছে বলে তারা মনে করেছিলো।

সেসময়ে পৃথিবীর আধুনিকতম একটি সমরবাহিনীর বিরুদ্ধে নামমাত্র প্রশিক্ষণ এবং রসদ নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিলো যে বাহিনী তাদের কতটা সাহস, মনোবল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলে মাত্র ৯ মাসেই আত্মসমর্পণে বাধ্য করানো যায়, তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ পুরো জাতি সে যুদ্ধে নেমেছিলো এবং জয়ের ব্যাপারে ছিলো আপসহীন। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে যে স্বপ্ন ঝলসে উঠেছিলো সেদিনের চেহারাগুলোয় সে স্বপ্ন হয়তো সাময়িকভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এ আত্মত্যাগ, এ শ্রম বৃথা যেতে পারে না। সে স্বপ্নের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছবোই।

[কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন]



আত্মার মুক্তি ও জগতের কল্যাণই ধ্যানের লক্ষ্য

আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি, সংস্কৃত ও বিশ্ব ধর্মতত্ত্বের প্রাক্তন অধ্যাপক, গবেষক ও ধর্মবেত্তা আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১০৭ তম ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে কবে, কখন প্রথম যোগানুশীলনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও অনুশীলিত হয়েছে তা এখনও নিশ্চিত করে বলা যায় নি। আদিম যুগ থেকেই মানুষের চিরন্তন বাসনা ছিলো সুস্থ দেহে সম্পদ ও আনন্দের অধিকারী হওয়া। কিন্তু মানবদেহের যা গঠন পদ্ধতি তাতে রোগ-ব্যাধি এতে আশ্রয় নেয়। দুঃখ-বেদনা-বিষাদ মনের আনন্দকে ক্ষয় করে, জীবনের প্রতি আগ্রহ-উৎসাহ হ্রাস করে। এ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছায় ঋষিরা যে যোগপদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তা অনুশীলন করে মানুষ নীরোগ দেহে, প্রশান্ত মনে অবস্থান করার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

যোগদর্শনের অষ্টাঙ্গ পদ্ধতি হলো– যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি। এই অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্তি বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয়ে থাকে।

যম বলতে সংযমকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এর অঙ্গ হিসেবে এসেছে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। অর্থাৎ দেহ মন ও বাক্য দ্বারা আহত বা ব্যথা না দেয়া। সত্যনিষ্ঠ থাকা, কথায় ও কাজে মিল রাখা। অপরের জিনিস চুরি না করা। দৈহিক সংযম এবং বিনা প্রয়োজনে অপরের কোনো দ্রব্য গ্রহণ না করা। দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়মের মধ্যে রয়েছে শৌচ অর্থাৎ পবিত্রতা, সন্তোষ, তুষ্টি অনুভব, তপস্যা, সাধনা এবং সর্বক্ষণ স্রষ্টার স্মরণ।

যোগসাধনায় দেহকে সুস্থ এবং মনকে স্থির রাখার জন্যে রয়েছে পদ্মাসন, ধ্যানাসন, সহজাসনসহ বিভিন্ন আসন। প্রাণায়াম যোগসাধনার স্তরগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণায়ামে হৃদযন্ত্র সক্রিয় থাকে, মনোযোগ বাড়ে।

প্রত্যাহার বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলোকে অন্তর্মুখী করার প্রচেষ্টার নাম। কারণ ইন্দ্রিয়গুলো অন্তর্মুখী হলে মনে স্থিরতা আসে, আরাধ্য বস্তুতে মন নিবিষ্ট হয়। আর মনকে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে স্থির বা সংযত রাখার নাম ধারণা। দীর্ঘ অনুশীলনে লক্ষ্যবস্তুতে মন নিবিষ্ট হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। যে বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করা হয়েছে সে বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন ভাবনাকে ধ্যান বলে।

যোগসাধনার সর্বোচ্চ স্তর সমাধি লাভ। সমাধিতেই সবকিছু সম্পূর্ণরূপে লীন হয়ে যায়। ধ্যানের ক্ষেত্রে সাধক একটি ভাবনা বা বিষয়েই চিন্তা করেন, কিন্তু সমাধির ক্ষেত্রে এই ভাবটি লুপ্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় ধ্যানী, ধ্যেয় বস্তু এবং ধ্যানপ্রক্রিয়া– সব একাকার হয়ে যায়। যোগানুশীলনের এ সর্বোচ্চ পর্যায়ে যোগী সমাধিস্থ হন। সংক্ষেপে এই হলো প্রাচীন যোগশাস্ত্রে অনুমোদিত যোগসাধনা।

যুগোপযোগী করে যোগসাধনার প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষের মাঝে গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। তাই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে আমরা যে আধুনিক যোগসাধনার প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করছি তার মধ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কোয়ান্টাম মেথড সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

ছাত্রজীবন থেকেই সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ শ্রী গীতার প্রতি আকৃষ্ট হই। এ গ্রন্থের মহান বাণী তখন আমাকে আলোড়িত করেছে, কৌতূহল বাড়িয়েছে। শিক্ষক জীবনে প্রবেশ করে কৌতূহল আরো বাড়তে থাকে। একসময় কোয়ান্টাম মেথডের নাম শুনে ভাবলাম, গিয়ে দেখি কী হয়। জানার আগ্রহে মুক্ত মন নিয়ে কোর্সে অংশগ্রহণ করলাম এবং খুঁজে পেলাম দীর্ঘদিনের কৌতূহল মেটানোর পন্থা। ভারতীয় দর্শনে 'যোগ' এর কথা বার বার এসেছে। সে তত্ত্বকে বাস্তব অভিজ্ঞতায় আনার সুযোগ পেলাম এতে।

কোয়ান্টাম মেথড নামকরণের মধ্যেই বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাচীন যুগের চিরায়ত যোগসাধনা ও বিজ্ঞানের এক চমৎকার সংমিশ্রণের ফলে কোয়ান্টাম এখন আধুনিক মানুষের জীবনে একাকার হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃত ভাষার ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে সনাতন ধর্মের তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে যতটা জেনেছি সে আলোকে বলা যায়, ধর্মীয় বাণী ও কোয়ান্টাম মেথড পরস্পর সম্পূরক। যিনি যে ধর্মের পথে আছেন, মেডিটেশনের মাধ্যমে তার সেই ধর্ম পালন আরো সুন্দর হবে, সহজ হবে।

প্রাচীন যুগের চিরায়ত যোগসাধনা ও বিজ্ঞানের এক চমৎকার সংমিশ্রণের ফলে কোয়ান্টাম এখন আধুনিক মানুষের জীবনে একাকার হয়ে গিয়েছে। ..... সে আলোকে বলা যায়, ধর্মীয় বাণী ও কোয়ান্টাম মেথড পরস্পর সম্পূরক। যে যে-ই ধর্মের পথে আছেন, মেডিটেশনের মাধ্যমে তার সে ধর্ম পালন আরো সুন্দর হবে, সহজ হবে।

প্রাচীন যুগের যোগসাধনায় পার্থিব জীবনের চেয়ে পারমার্থিক কল্যাণ ছিলো প্রধান। কিন্তু 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' অর্থাৎ আত্মার মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ এই দুই-ই সাধন জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত– স্বামী বিবেকানন্দের এ অমর বাণীর বাস্তব রূপায়ণ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মধ্যেও ঠিক যেন এ নীতিরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কোয়ান্টামে রয়েছে স্রষ্টার করুণার প্রতি গভীর বিশ্বাস রেখে নিজের শক্তি-সম্ভাবনার অনুসন্ধান এবং তারপর তা জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় কল্যাণের কাজে নিয়োগ করা।

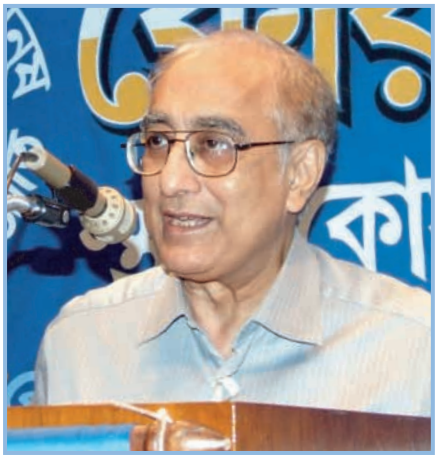
১৭ বছরের কর্মপ্রবাহে গুরুজী ৩০০ তম কোর্স অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করে মেডিটেশন জগতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সমাজের বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন পেশার, ধর্মের ও মতের হাজার হাজার নারী-পুরুষ, কিশোর-বৃদ্ধ কোয়ান্টামের প্রদর্শিত সাধনরীতি অনুসরণ করে আলোকিত জীবনের পথে পথিক হয়েছেন। কোয়ান্টাম অনুশীলন করে শিক্ষার্থী পেয়েছে অভীষ্ট সাফল্য। পরিবারে এসেছে শান্তি। পেশাজীবী পেয়েছেন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সফলতা লাভের দিক-নির্দেশনা। কোয়ান্টাম কোর্স করে নিয়মিত ধ্যান অনুশীলন করেছেন এমন ব্যক্তির আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, কর্মপ্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বন্ধুবান্ধব, নিকটাত্মীয়রা আজ কোয়ান্টামমুখী হয়ে উন্নততর জীবনের পথে অগ্রসর হচ্ছেন।

আত্ম উন্নয়নের পাশাপাশি কোয়ান্টাম উদ্বুদ্ধ করছে শ্রমানন্দে অসহায় মানুষের দিকে করসেবার হাত বাড়িয়ে দিতে। কোয়ান্টামে রয়েছে নিজের ও অন্যের নিরাময়ের জন্যে বিশেষ শিক্ষা, মুমূর্ষুকে সুস্থ করার প্রয়াসে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, সমাজে দরিদ্র-নিপীড়িত, অসহায় শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থাসহ বহুমুখী সেবা কার্যক্রম। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তরুণ প্রজন্মকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। সমাজে বিপথগামী হওয়ার বহু উপকরণের মাঝেও এখন কোয়ান্টাম মেথডের মাধ্যমে তরুণরা নিজেদের আত্মিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানব সেবায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে এরাই হবে একেকটি অনন্য মানুষ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : শাফিয়া নাজরীন

বিদেশি অনুদানের প্রত্যাশা জাতিকে করে মানসিক প্রতিবন্ধী

ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী



খ্যাতনামা তথ্যপ্রযুক্তিবিদ অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বর্তমানে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ভিসি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক উপদেষ্টা। তিনি যমুনা বহুমুখী সেতুর উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বেই বাস্তবায়িত হয় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাস্টারপ্ল্যান।

আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগের কথা। একজন প্রকৌশলী পাস করার পর পরই যোগ দিলেন সরকারি কর্মকর্তা পদে আর কাঁধে নিলেন বাংলাদেশের একমাত্র ঝুলন্ত সেতু নির্মাণের গুরু দায়িত্ব। তার স্কুলপড়ুয়া ছেলেটিকে 'বড় হয়ে কী হতে চাও' প্রশ্ন করলে সোজা-সাপ্টা জবাব দিতো 'ইঞ্জিনিয়ার হবো!' দিন-মাস-বছর পেরিয়ে সে ছেলেটিকে দেশবাসী চিনলো ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী হিসেবে।

আমার জন্ম সিলেটে হলেও পড়াশোনার সুবাদে বেড়ে উঠেছি ঢাকায়। কলেজ পাশের পর ভর্তি হলাম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) এবং সেখানেই ১৯৬০ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলাম। ১৯৬৪ সালে অয়েল কোম্পানি– বার্মা শেল-এর স্পন্সরে স্কলারশিপ নিয়ে গেলাম ইংল্যান্ডে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে।

১৯৬৮ সালের নভেম্বরে পিএইচডি করার পর ক্যারিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলো। আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার অফার উপেক্ষা করে দেশে ফিরে আবারও যোগ দিলাম বুয়েটে প্রভাষক হিসেবে। কারণ আমার সবসময় মনে হতো এ জীবনে যদি কিছু দিয়ে যেতে পারি তা আমার মাতৃভূমিকেই দেবো। বিশেষজ্ঞদের প্রবাসী হওয়ার ক্ষেত্রে একটা কথা বলা হয় যে, বাংলাদেশে কাজ করলে প্রফেশনাল স্যাটিসফেকশন আসে না। কিন্তু আমি বলি, বাংলাদেশে থেকে আমি যত ধরনের প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, মনে হয় না বিদেশে গেলে কেউ এ সুযোগ পেতো।

শিক্ষকতার পাশাপাশি দেশে-বিদেশে সরকারি, বেসরকারি– বিভিন্ন প্রকল্পে কখনো উপদেষ্টা, কখনো চেয়ারম্যান আবার কখনো পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছি। আমি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সভাপতি ছিলাম পর পর ৩ বছর। ১৯৭২ সালের ১২ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস যাকে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে ধরা হয়, সেসময় সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। সাইক্লোন শেল্টার স্থাপনের কাজে ঘুরেছি টেকনাফ থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্যামনগর, সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলা এবং হাতিয়া, সন্দ্বীপ, মনপুরাসহ বিভিন্ন চরাঞ্চলে।

বাংলাদেশের এলাকাভিত্তিক ভূমিকম্পের ঝুঁকি নির্ণয়ের তথ্য সংগ্রহের প্রথম উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি। আমার পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিলো উচ্চ ইমারত ডিজাইন। দেশে এসে টল বিল্ডিং ডিজাইনিং-এর ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারে কিছু অবদান রাখার সুযোগ পেয়েছি। ফলে ডিজাইনিং-এর ক্ষেত্রে এখন এসেছে অনেক বৈচিত্র এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ।

আসলে প্রত্যেকে যদি নিজ অবস্থানে ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে তাহলেই উন্নয়নের স্রোত ব্যক্তিগত পর্যায়ে বইতে শুরু করবে। কোয়ান্টামের কর্মপ্রক্রিয়ায় এ বিষয়টিই লক্ষণীয়। কোয়ান্টাম আত্ম উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিটি মানুষকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তার জীবনের দুর্দশার শৃঙ্খল ভাঙতে সাহায্য করছে।

বিদেশি অনুদান ও সিদ্ধান্তহীনতা আমাদের জাতিগত উন্নয়নের দুটি বড় প্রতিবন্ধকতা। আমরা দ্রুত চূড়ান্ত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আর এর সঙ্গে রয়েছে বিদেশি সাহায্যের আশায় বসে থাকার মানসিক প্রতিবন্ধকতা। অথচ স্ব-অর্থায়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করলে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়েই আমরা চমৎকারভাবে এগুতে পারি।

এ প্রসঙ্গে আমার পেশাগত জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি– আরিচা-নগরবাড়িতে নদীর ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন টাওয়ার বসানোর প্রজেক্ট ডিজাইনটি পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড পুনরায় পরীক্ষা করার জন্যে বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ খুঁজতে লাগলো। বিদেশি ডিজাইনাররা পিডিবিকে খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, তোমাদের দেশে কি এরকম ডিজাইন চেক করার লোক আছে? সব শুনে আমরাও বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম। পরীক্ষায় তাদের ডিজাইনে– বিশেষ করে টাওয়ারের ফাউন্ডেশনে– কিছু ভুল ধরা পড়লো।

বিদেশি অনুদান ও সিদ্ধান্তহীনতা আমাদের জাতিগত উন্নয়নের দুটি বড় প্রতিবন্ধকতা। আমরা দ্রুত চূড়ান্ত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আর এর সঙ্গে রয়েছে বিদেশি সাহায্যের আশায় বসে থাকার মানসিক প্রতিবন্ধকতা। অথচ স্ব-অর্থায়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করলে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়েই আমরা চমৎকারভাবে এগুতে পারি।

১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের জলোচ্ছ্বাসের পর সরকার ইউএনডিপি-কে সাইক্লোন শেল্টারের মাস্টার প্ল্যান করে দেয়ার প্রস্তাব করলো। ইউএনডিপি প্রস্তাবে রাজি হয়ে ২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করে বিদেশি বিশেষজ্ঞ পাঠানোর উদ্যোগ নিলো। তখন বাংলাদেশ সরকার ইউএনডিপিকে বেশ কাঠখড় পুড়িয়েই বোঝালো যে, বাংলাদেশেই অভিজ্ঞরা রয়েছেন এ কাজের জন্যে। তখন বুয়েট এবং বিড্স-এর যৌথ সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞ দল যে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করলেন তাতে অবিশ্বাস্যভাবে বাজেটের এক-চতুর্থাংশ ব্যয় হয়। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও সে প্রতিবেদন ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

আমার প্রকৌশলী জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায় ছিলো যমুনা সেতু। নির্মাণশৈলী থেকে শুরু করে সেতুর স্থান নির্বাচন, আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ– সব মিলিয়ে এটি ছিলো পৃথিবীর অন্যতম চ্যালেঞ্জিং একটি সেতু প্রকল্প। এর প্রাথমিক ও মূল নকশা তৈরি, কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজ করাসহ নির্মাণের ২/৩ বছর পর পর্যন্ত নির্মাতাদের বাড়তি মজুরির দাবি নিষ্পত্তি– সব মিলিয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে, এত দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

নিজেকে কখনোই সফল মনে করি না। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ, যা অর্জন করেছি সেজন্যে। তবে যখন যে কাজ করেছি নিষ্ঠার সাথে করার চেষ্টা করেছি। সবসময় দায়িত্ব সচেতন থেকেছি।

গণিতকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা শুরু করেছি গণিত অলিম্পিয়াডের অভিযাত্রা। উদ্বুদ্ধ করছি শিক্ষার্থীদের, ২০২০ সাল নাগাদ গণিতে সর্বোচ্চ সম্মাননা ফিল্স মেডেল যেন বাংলাদেশের ঘরে আসে সে লক্ষ্যে কাজ করতে। আর ২০৩০ সালের মধ্যে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জনের টার্গেটও বেঁধে দিয়েছি আমরা ছাত্রছাত্রীদের।

শুধু গণিত বা বিজ্ঞানে নয়, আমি স্বপ্ন দেখি আত্মবিশ্বাসী এক তরুণ প্রজন্মের যারা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্বের দরবারে একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে পরিচিত করাবে। সমৃদ্ধ স্বদেশের সে স্বপ্ন প্রতিটি তরুণ হৃদয়ে বুনে দেয়ার জন্যেই হোক আমাদের এখনকার সকল কর্মপ্রচেষ্টা।

[কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন]



মানবিক বিশ্বায়নের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবেই

প্রফেসর আনু মোহাম্মদ

অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান এবং নৃতত্ত্বের সাবেক অধ্যাপক। বিশ্বায়ন, সামাজিক রূপান্তর, লিঙ্গ বৈষম্য, এনজিও, জ্বালানি সম্পদ বিষয়ে তার গবেষণা কর্মের জন্যে তিনি লাভ করেছেন খ্যাতি।

অন্তর্গতভাবে মানুষ একক, অখণ্ড একটি জাতি। অর্থাৎ মানবজাতি। কিন্তু সৃষ্টির নিয়মেই তার মধ্যে কিছু বৈচিত্র আছে, পার্থক্য আছে। যেমন, গায়ের রঙ, জাতীয়তা, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এ পার্থক্যগুলোর ভিত্তিতে যদি তার সাথে বৈষম্য করা হয়, নিপীড়ন, নির্যাতন করা হয় বা তাকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে সেটা খুবই অযৌক্তিক একটি ব্যাপার। কারণ এ বৈশিষ্ট্যগুলো তার ইচ্ছানিরপেক্ষ। যেমন, একজন মানুষ কোন দেশে, কোন বর্ণে, কোন ধর্মে বা কোন ভাষা নিয়ে জন্মাবে এটা সে নিজে নির্ধারণ করে না, এটা নির্ধারিত হয়।

বৈষম্যের এই যে নানা রূপ, নানা মাত্রা– এর বিপরীতে একটি অখণ্ড মানবসমাজের ঐক্যের জন্যেই বিশ্বায়নের ধারণার উদ্ভব। বলাবাহুল্য, তাতে মানবসমাজের স্বাভাবিক বৈচিত্রপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে। কিন্তু তারপরও তারা হবে অখণ্ড ঐক্যসমৃদ্ধ একটি মানবসমাজ। সেটা বিশ্বায়নের প্রচলিত ধারণা নয়; বরং সেটা হলো এক মানবিক বিশ্বায়ন, যেখানে একটি দেশ বাকি পৃথিবীর সঙ্গে তার শক্তি এবং দুর্বলতাগুলোর বিনিময়ের মাধ্যমে সুস্থ ভারসাম্যে পৌঁছাতে পারে। আরও আশার কথা হলো, বর্তমান পৃথিবীর যে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও সম্পদের অবস্থা– তা দিয়েই অর্জিত হতে পারে এই কাঙ্ক্ষিত বিশ্বায়ন।

আমাদের সম্পদের অভাব আছে– এ কথাটি বাংলাদেশ বা পৃথিবী– দুই ক্ষেত্রেই খুবই ভুল একটি কথা। বলা হয় পৃথিবীর ৬০০ কোটি মানুষের অর্ধেকেরও বেশি দরিদ্র। বাংলাদেশের ৭ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। এ দারিদ্র সম্পদের অভাবের জন্যে নয়, এ দারিদ্র সম্পদের অসম ব্যবহার এবং অসম বণ্টনের জন্যে হয়েছে। যেমন, জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচি একটি হিসেব করে দেখিয়েছিলো যে, পৃথিবীর জমি, পানি এবং প্রযুক্তি– এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়ে যে খাদ্য উৎপাদন করা যাবে তাতে ৬,০০০ কোটি মানুষের খাবারের সংস্থান হবে যেখানে পৃথিবীর জনসংখ্যা হলো মাত্র ৬০০ কোটি। গত ৩৪ বছরে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেড়েছে ১০০ ভাগ এবং এ সময়ে খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে ১৭০ ভাগ। এখন বাংলাদেশে মাথাপিছু খাদ্যের উৎপাদনও বেশি। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের ৬০ ভাগ শিশু অপুষ্টির শিকার।

পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ হয় যে খাতে তা খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা বা শিক্ষা নয়, তা হলো সমরাস্ত্র এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম। প্রতিবছর ৯০০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয় এ খাতে। আর এর ৬০ ভাগ অর্থাৎ ৬০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করে একা আমেরিকাই। তারপরও আমেরিকা প্রতিনিয়তই হুমকি মনে করে এমন সব দেশকে যারা এর ১ ভাগও খরচ করে না।

অথচ জাতিসংঘের একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, এ খরচের মাত্র ১০০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৯ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করলেই সারা পৃথিবীর সব মানুষের জন্যে নিরাপদ পানির সংস্থান করা সম্ভব।

মাটি, পানি, খনি এবং জনসম্পদ মিলিয়ে বাংলাদেশের মতো এত সমৃদ্ধ অঞ্চল খুব কমই আছে। মাটি যদি উর্বর হয়, তাহলে তা সোনার খনির চেয়েও দামী হতে পারে। কারণ সোনার খনি তুলে ফেললেই শেষ। কিন্তু যে মাটি উর্বর তা-তো অনন্তকাল ধরে উৎপাদন দিতে থাকে। বাংলাদেশের আছে সেই মাটি।

বাংলাদেশের মতো এত সমৃদ্ধ পানিসম্পদ খুব কম দেশেই আছে। এমনকি এর বিপুল জনসংখ্যাও এর জন্যে সম্পদ হতে পারে যদি এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হয়। কারণ মানুষ শুধু মুখ নিয়েই জন্মায় নি, এর সাথে আরো আছে তার হাত, পা এবং অমিত সম্ভাবনাময় ব্রেন। একটা কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে আমরা কত আফসোস করি কিন্তু এই কম্পিউটারের চেয়েও হাজার গুণ শক্তিশালী যে মস্তিষ্কগুলো ফুটপাতে বস্তিতে হেলায় নষ্ট হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের ভাবনা নেই।

এগুলো তো মাটির ওপরের সম্পদ। মাটির নিচের সম্পদের মধ্যে রয়েছে গ্যাস, কয়লা। কিন্তু একটি দেশের শাসকগোষ্ঠী যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্যে কতিপয় কোম্পানি বা বিদেশি গোষ্ঠীর ক্রীড়নকের ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে এতসব সম্পদ বরং সে দেশের জন্যে বিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিশেষত সে চক্রান্ত যদি অনবায়নযোগ্য সম্পদ নিয়ে হয়। বাংলাদেশের অবস্থাও অনেকটা তা-ই।

কিছুদিন আগে একজন বিশেষজ্ঞের কাছে শুনছিলাম, পৃথিবীতে যে দুটি তেলভাণ্ডারকে কিছুই করা হয় নি তার একটি হলো আলাস্কা এবং আরেকটি হলো বঙ্গোপসাগর।

'দাতা সংস্থা' বলতে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংককে বোঝায়, আর 'সাহায্য' বলতে বোঝায় এই সংস্থাগুলোর নিজস্ব কৌশল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশকে ঋণ দেয়া।

এই তেল বা গ্যাসকে যদি আমরা আমাদের কাজে ব্যবহার করি তাহলে কত কিছুই না করতে পারবো। এখন বাংলাদেশের ৭০ ভাগ মানুষের কাছে বিদ্যুৎ নেই। গ্যাস দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবো। কমে যাবে আমাদের উৎপাদন খরচ। কিন্তু বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ভাষ্যমতে এসব সম্পদ উত্তোলন বা ব্যবহার করার সামর্থ্য আমাদের নেই। এর জন্যে বিদেশি বিনিয়োগ লাগবে, বিদেশি কনসালটেন্ট লাগবে। তারা এসে মাইলের পর মাইল কৃষিজমি নষ্ট করবে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করবে, পানি শুকিয়ে মরুভূমি বানাবে। তারপর গ্যাস বা কয়লা সব তুলে নিয়ে গিয়ে আমাদের কাছেই আবার বিক্রি করবে দ্বিগুণ, তিনগুণ বেশি দামে।

'দাতা সংস্থা' বা 'বিদেশি সাহায্য' শব্দগুলো আমাদের খুব পরিচিত। আমরা কেউ কেউ মনে করি এটা বোধ হয় হাতেম তাঈ, হাজী মুহম্মদ মুহসীন বা আর পি সাহার দান। আসলে তা নয়। 'দাতা সংস্থা' বলতে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংককে বোঝায়, আর 'সাহায্য' বলতে বোঝায় এ সংস্থাগুলোর নিজস্ব কৌশল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশকে ঋণ দেয়া।

আর এরকম বিদেশি সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের নির্বিচার বাস্তবায়ন করতে গিয়েই আমাদের ওপর নেমে এসেছে আর্সেনিক নামের এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের খড়্গ। গভীর নলকূপ দিয়ে নির্বিচার পানি উত্তোলনের ফলে মাটির নিচে পানির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। আবার এখন এই আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে চলছে তাদের হাজার কোটি টাকার নতুন নতুন প্রকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতিযোগিতা। বলাবাহুল্য, এসব প্রকল্পের কাজ আর্সেনিক সমস্যার কারণ উদ্‌ঘাটন নয়, সমাধানও নয়। কাজ হলো নানারকম জরিপ করা আর কনসালটেন্টের লাখ লাখ টাকার বেতন গোনা।

এ প্রেক্ষাপটে মানবিক বিশ্বায়নের পথ যতই দুর্গম হোক, আমি বিশ্বাস করি সেটা অসম্ভব নয়। কারণ এ অবস্থা বদলানো যাবে না বা বাংলাদেশ পারবে না– এ ধরনের মানসিক হতাশা ও হীনম্মন্যতা থেকে আস্তে আস্তে আমরা বেরিয়ে আসছি।

মানুষের ভেতরের অমিত সম্ভাবনা এবং তার সঙ্গে সম্পদের যোগ করে যে বিপুল ক্ষমতার স্ফূরণ সম্ভব সেটা ভাবলেই বিশ্বাস হয় যে, এ পরিবর্তন অবশ্যই আমরা করতে পারবো। সকল প্রকার জাতিগত হীনম্মন্যতা ঝেড়ে ফেলে এ আত্মবিশ্বাস এবং এ স্বপ্ন দেখার প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম ইতোমধ্যেই শুরু করেছে– এটা খুবই ইতিবাচক একটি দিক।

[কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন]

দেশের কল্যাণে আবার এক হয়ে কাজ করতে হবে

কামাল লোহানী



প্রবীণ সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী। ভাষা সৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব লোহানী স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রথম পরিচালক। তিনি বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক প্রেসিডেন্ট, প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক এবং শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক।

একক প্রৌঢ়া বিধবা। পাকিস্তানি আর্মির বিরুদ্ধে অপারেশন চালাতে ব্যস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের এক অস্থায়ী ক্যাম্পে তার ১৭ বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে এসে বললেন, 'আমার এ ছেলেটিকে আপনারা সাথে নিয়ে নিন। যুদ্ধের জন্যে কোনোভাবে কাজে লাগানো যায় কি না দেখবেন।' ছেলেটি কদিন পরে এক অপারেশনে গিয়ে মারা যায়। শুনে সে মহিলা ৯ বছর বয়সী তার একমাত্র বেঁচে থাকা ছেলেকে নিয়ে এসে বললেন, 'এবার একে নিয়ে যান। মুক্তিযুদ্ধের জন্যে আমি আমার এ সন্তানকেও উৎসর্গ করছি।'

১২ বছর বয়সী এক কিশোর। দাঁড়িয়ে আছে এক পাকিস্তানি সৈন্যের সামনে। কদিন আগে তাদের গ্রামে ঢুকে পড়া পাকিস্তানি বাহিনীর একজন সদস্য এ সৈন্য। ইতোমধ্যেই গ্রামটিতে চালিয়েছে তারা ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ। পাকিস্তানি সৈন্যটির তৃষ্ণা মেটানোর খায়েশ চরিতার্থ করতে সে বাধ্য হয়েছে জীবনে প্রথমবারের মতো ডাব গাছে চড়তে। বন্দুকের মুখে ডাব পেড়ে আনলো। হুকুম মোতাবেক দা এনে ডাব কেটেও দিলো। কিন্তু যেই না সৈন্যটি গলা উঁচু করে ডাবের পানি খেতে লাগলো অমনি কিশোরটির মাথায় খেলে গেল বুদ্ধি। গলায় চালিয়ে দিলো ধারালো দা-এর পোঁচ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হলো তার। বর্বর পাক আর্মির অত্যাচারের বদলা এভাবেই নিতে বাধ্য হলো এক গ্রাম্য কিশোর।

এমনি লাখো সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ, সমর্থন আর সহযোগিতায় মাত্র ৯ মাসে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়, পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে যা এক বিরল ঘটনা।

আসলে আত্মশক্তি-সচেতনতা এবং রুখে দাঁড়ানোর সাহস প্রতিটি মানুষের প্রবৃত্তিজাত। অন্যায়, শোষণ এবং বঞ্চনার মাধ্যমে তাকে যখন সহ্যের শেষসীমায় পৌঁছে দেয়া হয় তখন এই আত্মশক্তিতে সে হুংকার দিয়ে ওঠে, লড়াই করতে প্রবৃত্ত হয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধটা আসলে এরকমই একটা ব্যাপার।

১৯৭১ সালে আমি ছিলাম কলকাতার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বার্তা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। এপ্রিলে মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করলেন বাংলাদেশের নিজস্ব একটি বেতার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করার জন্যে। দেয়া হলো ৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভের একটি ট্রান্সমিটার। কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটা দোতলা বাড়িতে শুরু হলো এর কার্যক্রম। যেটাতে সদ্য গঠিত প্রবাসী সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী প্রথম কিছুদিন অবস্থান করেছেন। বাড়িটির পেছনেই ছিলো বিএসএফ-এর ব্যারাক। দুপুরে যখন তাদের মেসে খাবার দেয়া হতো তখন সেখানে জড়ো হতো শকুন আর কুকুরের দল। বেতারে আমাদের অনুষ্ঠান প্রচারের সময় মাঝে মাঝে সেসব আওয়াজও ঢুকে পড়তো বৈকি। কিন্তু প্রবাসে বসে একটা যুদ্ধরত জাতির একমাত্র নিজস্ব প্রচার মাধ্যম পরিচালনায় এ ত্রুটিটুকু বোধ হয় অনায়াসেই মেনে নেয়া যায়।

পাকিস্তানি বোমা আঘাত হানার পর চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জনা দশেক বেতার কর্মী ১০ কিলোওয়াটের একটা ছোট্ট ট্রান্সমিটার নিয়ে পালালেন। পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল পাড়ি দিয়ে তাদের একটা দল গিয়ে পৌঁছলো আগরতলায়। এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কর্মীরা ছিলেন, ছিলেন বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী আর দেশের জন্যে প্রাণ উৎসর্গে ব্রতী শব্দ-সৈনিকেরা।

বন্য শুকর হেঁটে যাচ্ছে আর তার সামনে বসে ভাত খাচ্ছে বেতারকর্মী। সিগারেটের প্যাকেটের একটুখানি কাগজে কোনোরকমে লেখা খবর থেকে পড়ে শোনানো হচ্ছে সংবাদ বুলেটিন। ইংরেজি অনুবাদ করে তা-ও পড়ে শোনাতে হচ্ছে। আবার বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতেও খবর এবং অনুষ্ঠান করতে হবে এই সীমিত লোকবল নিয়েই।

যারা খবর পড়তেন কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণের বেতার মানদণ্ডে তারা হয়তো উৎরাবেন না। কিন্তু সে খবর শোনার জন্যে মানুষ কী উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতো। লেপের তলায় দরজা-জানালা বন্ধ করে বা ১০/১২ জন একসাথে বসে হন্যে হয়ে চেষ্টা করতো স্বাধীন বাংলা বেতারের একটু খবর শোনার জন্যে।

একবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে লাগাতার ৩ দিনের হরতালে আমরা ভীষণ অসুবিধায় পড়লাম। কারণ বালিগঞ্জ থেকে ৪৫ মিনিটের গাড়িপথের একটা দূরত্বে স্থাপিত হয়েছিলো আমাদের ট্রান্সমিটার। সেখানে অবশ্য আমাদের যাওয়ার সুযোগ ছিলো না। নির্দিষ্ট সময়ে বিএসএফ-এর একজন লোক এসে তার পোর্টফলিওতে আমাদের টেপগুলো ভরে নিয়ে যেতেন। এখন হরতালের মধ্যে কীভাবে সেখানে যাওয়া যাবে– এ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিলো।

আমরা বাংলা, ইংরেজি এবং উর্দু– এই তিন সার্ভিসের জন্যে তিনজন সংবাদ পাঠক এবং একজন টেকনিশিয়ান পাঠানোর অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তারা শুধু আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিলো। আমরা তখন একটু বিকল্প পথে কাজ করলাম। রণাঙ্গন থেকে মাঝে মাঝে আমাদের কাছে সহযোগীরা আসতেন। তারা বলে যেতেন আগামী কয়েকদিনে তাদের সম্ভাব্য অপারেশনগুলোর কিছু পরিকল্পনার কথা। যেমন, এ অপারেশনে এই এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, এতে এরকম ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব পরামর্শের ভিত্তিতে আমরা তখন বসে তৈরি করে ফেললাম আগামী ৩ দিনের জন্যে ৯টা বুলেটিন। অর্থাৎ যা ঘটতে পারে তাকে 'ঘটেছে' হিসেবে বর্ণনা করে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের কৌশল। আর তার ফলাফলও এসেছিলো আমাদের অনুকূলেই।

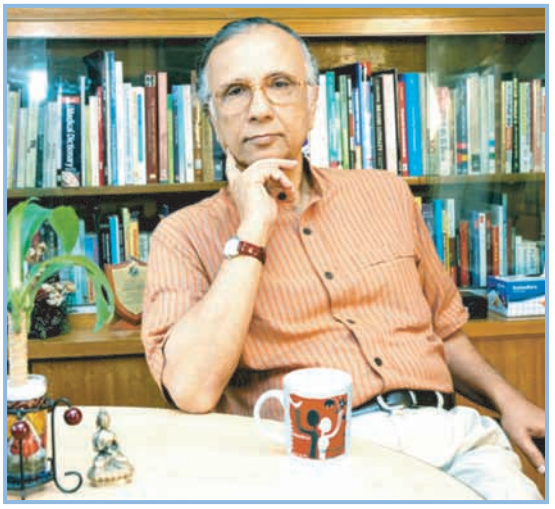
সেই দিনগুলো যতবার স্মরণ করি ততবারই রোমাঞ্চিত হই, শিহরিত হই। ভাবি, কী অসাধারণ বীরত্ব, সাহস আর সমবেত সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার নজির বাঙালি প্রতিষ্ঠা করেছিলো। কিন্তু তারপর যখন বর্তমান বাস্তবতার দিকে তাকাই হতাশ হয়ে পড়ি। অবাক লাগে যে, এই কি সেই বাঙালি জাতি যারা একসাথে লড়ে মাত্র ৯ মাসে পরাজিত করেছে পৃথিবীর অন্যতম সুসংগঠিত সুসজ্জিত একটি সেনাবাহিনীকে।

কিন্তু কেন এ অবস্থা? আমার মনে হয় দেশের স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের চাওয়ার উদ্দেশ্যে সততার অভাব ছিলো। আমরা কেউ অর্থলিপ্সু, কেউ ক্ষমতালিপ্সু, কেউ পদলিপ্সু হয়ে পড়লাম। ফলে স্বাধীনতা অর্জনের পর সেটাকে অর্থবহ করার জন্যে যে সম্মিলিত এবং সমন্বিত প্রয়াস দরকার, তা আমরা করতে পারি নি।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে দরকার লক্ষ্য এবং মানসিকতার সার্বজনীনতা। সবাইকে এক হয়ে একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে আর তা হলো দেশের কল্যাণ, জাতির শেকড় সন্ধান।

[কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন]

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে দরকার লক্ষ্য এবং মানসিকতার সার্বজনীনতা। সবাইকে এক হয়ে একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে আর তা হলো দেশের কল্যাণ, জাতির শেকড় সন্ধান।



সততা আর আন্তরিকতাই বিজয়ের মূলমন্ত্র

রামেন্দু মজুমদার

জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নব্য থিয়েটার আন্দোলনের তিনি পথিকৃৎ। তার নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের থিয়েটার গ্রুপগুলোর কমন প্লাটফরম গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন। ২০০৮ সালে তিনি বিশ্ব নাট্য সভা– ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি দ্বিতীয় এশীয় যিনি এ সম্মাননায় ভূষিত হন।

আমার দাদু প্রচণ্ড দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে লেখাপড়া শিখেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী হিসেবে বাড়িঘর এমনকি একটা জমিদারি পর্যন্ত কিনে রেখে গিয়েছিলেন বংশধরদের জন্যে। আমার বাবা এবং কাকাও খুব সফল আইনজীবী ছিলেন। কিন্তু আমাদের কখনো বিলাসিতায় অভ্যস্ত হতে দেন নি। আমার মা কলকাতার মেয়ে ছিলেন। গান করতেন, বেহালা বাজাতেন। কিন্তু বিয়ের পর নোয়াখালির এক গণ্ডগ্রামের সংসারজীবনে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। এসব কারণে আমি হয়ে উঠেছিলাম কষ্টসহিষ্ণু, যেকোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার মানসিকতা সম্পন্ন।

আমার বাবা সবকাজ আগেভাগে গুছিয়ে রাখতেন। এসএসসি-র রেজাল্ট হওয়ামাত্র একটা টেস্টিমোনিয়াল দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। ফলে রোল নাম্বার হলো ১। কী যে বিড়ম্বনা! সবার কাছেই চেনা, প্রক্সি দিয়ে যে ক্লাস ফাঁকি দেবো সে সুযোগ নেই।

কলেজ শেষ করে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। জগন্নাথ হলে ৩ জন অনন্য সাধারণ মানুষকে অভিভাবক হিসেবে পেয়েছিলাম। আমাদের প্রভোস্ট ড. জি সি দেব এবং হাউজ টিউটর ছিলেন ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ও সন্তোষ ভট্টাচার্য। ড. দেবকে আমরা ঋষিতুল্য মানুষ হিসেবে দেখতাম। জাগতিক বিষয়ে তার উদাসীনতা নিয়ে নানা গল্প প্রচলিত ছিলো। একবার হলো– সামান্য এক মারামারির ঘটনার বিচারে বসেছেন ড. দেব। আমরা একপক্ষের লোকজন ঘরে ঢুকে দেখি তিনি আলো নিভিয়ে বসে আছেন। আমরা কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, এত আলো আমার এখানে আসবে যে, তাদের আলোতেই ঘর আলোকিত হয়ে যাবে।

জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে পেয়েছি আমার ইংরেজি বিভাগেও। চমৎকার পড়াতেন। নাটকের সূত্রে মুনীর চৌধুরীর কাছে তিনিই আমাকে পাঠান।

শিক্ষার পর পেশাজীবনেও এলো সহজ সুযোগ। ফল বেরোবার আগেই চৌমুহনী কলেজে যোগ দিলাম ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে। তখন বেসরকারি কলেজে প্রভাষকের পদ ছিলো না, সবাই অধ্যাপক। সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ টি হোসেইনের স্নেহানুকূল্যে এক ভোরে রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আমার চাকরি হয়ে গেল। ভীষণ আনন্দময় ছিলো সে দিনগুলো। নকল বা ছাত্র সংগঠনগুলোর বিরোধ– সবকিছুর বিরুদ্ধেই সেসময় যে আত্মবিশ্বাস আর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দাঁড়াতাম– এখন সেটা প্রায় ভাবাই যায় না।

কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে সে সুখের দিনগুলো ছেড়ে চলে যেতে হলো করাচিতে একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থার চাকরি নিয়ে। মজার ব্যাপার হলো, এর ১ বছরের মাথায় আমি যেমন আবার ফিরে এসেছিলাম চৌমুহনীতে, তেমনি ফিরে গিয়েছিলাম করাচির সেই বিজ্ঞাপনী সংস্থায় তারও বছর দু-এক পরে।

দ্বিতীয় দফায় করাচি থেকে সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় যেদিন ফিরলাম, তারিখটা ছিলো ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ। দেশের পরিস্থিতি তখন ক্ষুব্ধ। শুধু একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাঙালি জাতি কোনোদিন এত ঐক্যবদ্ধ হয় নি, আর সে উদ্দেশ্যটি ছিলো আমাদের স্বাধীনতা– ক্ষুধা থেকে, দারিদ্র থেকে, সামাজিক বৈষম্য থেকে।

সততার চর্চাটাই এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার। শুধু নেতা-নেত্রীর জন্যে নয়, আম জনতার জন্যেই। কারণ কথায় আছে, যে জাতি যেমন, সে তেমন নেতৃত্বই পায়। দরকার হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে সৎ, আদর্শবান নেতা নির্বাচনে আসতে পারেন। যেমন ভারতেও দুর্নীতি আছে। কিন্তু তার একটা মাত্রাও আছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও তার দুই রুমের ফ্ল্যাটটা ছাড়েন নি। তার স্ত্রী অফিসে যান ট্যাক্সি ক্যাবে চড়ে।

স্বাধীনতার পর পর আমরা সবাই রাজি হয়েছিলাম যে, ১ হাজার টাকার বেশি কারো বেতন হবে না। সবাই সবার দুঃখকে ভাগাভাগি করে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখজনক হলো, সে চেতনাকে আর ধরে রাখতে পারি নি। কে কত দ্রুত বড়লোক হতে পারে সে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলো একদল লোক। অন্যরা তখন ভাবলো– আমার পাশের লোকটা এত অযোগ্য হয়েও লাখ লাখ টাকা কামাই করছে, তাহলে আমি কী করলাম! সে-ও তখন শামিল হয়ে গেল এ প্রতিযোগিতায়।

স্বাধীনতার পর আমরা নতুনভাবে নাট্যচর্চা শুরু করলাম। টিকিটের বিনিময়ে নিয়মিত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাটক। সমাজের অসঙ্গতির কথাগুলো নাটকের মাধ্যমে উঠে আসতে লাগলো। চিন্তার খোরাক যোগাতে লাগলো। টিভি চ্যানেল আর প্যাকেজের এই যুগেও এখন অনেকেই মঞ্চে এসব নাটক দেখছেন। যদিও পেশা হিসেবে মঞ্চনাটককে নেয়ার সুযোগ এখনো আসে নি।

ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশ কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৮২ সালে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাট্যকর্মীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এ পর্যন্ত আমরা ৯টি আন্তর্জাতিক সেমিনার ও নাট্যোৎসব করেছি এর ব্যানারে। প্রতি দুবছরে বের করেছি 'ওয়ার্ল্ড অফ থিয়েটার' নামে একটি বড় প্রকাশনা যাতে থাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাটকের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অর্জনের বিবরণ। বিদেশিরা অবাক হয়েছে যে, বাংলাদেশের মতো একটা গরিব দেশে কী করে এটা সম্ভব। আমরা তখন বলেছি, তোমরা আগে বাজেট যোগাড় কর, তারপর কাজে হাত দাও আর আমরা কাজ শুরু করে দেই, বাজেটের যোগাড় হয় তারপর। কারণ, কাজটি ভালো– এ প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হলে আমরা আন্তরিকভাবে তা করতে পারি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে।

সততার চর্চাটাই এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার। শুধু নেতা-নেত্রীর জন্যে নয়, আম জনতার জন্যেই। কারণ কথায় আছে, যে জাতি যেমন, সে তেমন নেতৃত্বই পায়। দরকার হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে সৎ, আদর্শবান নেতা নির্বাচনে আসতে পারেন। যেমন ভারতেও দুর্নীতি আছে। কিন্তু তার একটা মাত্রাও আছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও তার দুই রুমের ফ্ল্যাটটা ছাড়েন নি। স্ত্রী অফিসে যান ট্যাক্সি ক্যাবে চড়ে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমার স্ত্রী অংশ নিয়েছিলেন। তখন আমি সঙ্গে এসেছিলাম। দেখেছি যে, সত্যিকার অর্থেই এখানে আত্মার শুদ্ধি সম্ভব, সম্ভব আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে বড় কাজ করা। মানুষের কল্যাণব্রতী এ ফাউন্ডেশনের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

[কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন]

কোয়ান্টাম মেথড নির্যাতিতাকে মানসিকভাবে পুনর্বাসিত করতে পারে

এডভোকেট সালমা আলী



এডভোকেট সালমা আলী বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির নির্বাহী পরিচালক। নিরাপত্তা হেফাজতের নামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারে প্রথম সফল আইনজীবী। তার সাহসী ভূমিকার জন্যে দক্ষিণ এশিয়ায় নারী ও শিশুপাচার বন্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে তার অবদানের জন্যে লাভ করেছেন অশোক ফেলোশিপ। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৭৩ তম ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন।

আজ থেকে ২৯ বছর আগে একটি পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে মহিলা আইনজীবী সমিতি যাত্রা শুরু করে। সে সময় আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো আইন পেশার সঙ্গে জড়িত মহিলাদের সংগঠিত করা, তাদের দক্ষতা বাড়ানো এবং পুরুষ সহকর্মীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা যাতে পিছিয়ে না পড়ে সেজন্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ। সংগঠন করার পর আমরা দেখলাম সাধারণ মানুষদের অনেকেই– বিশেষত মহিলারা– নির্যাতনের শিকার হয়ে আমাদের কাছে আসছে সাহায্য বা পরামর্শ নিতে। চরম দারিদ্রপীড়িত বা অসহায় অবস্থায় নিপতিত এই নির্যাতিতাদের সাহায্য করার জন্যেই তখন আমরা শুরু করলাম আইনী সহায়তা দেয়ার কাজ।

এর মধ্যেই একটা জরিপের কাজে এক জেল পরিদর্শনে গিয়ে দেখলাম ভয়ংকর অবস্থা। নিরাপত্তা হেফাজতের নামে অপরাধী বন্দিদের সঙ্গে বছরের পর বছর বন্দি হয়ে আছে অপরাধের শিকার মানুষগুলো যাদের অধিকাংশই মহিলা। এমনকি একজন আসামী যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, এদের তা-ও নেই। তার ওপর আছে রক্ষক নামধারী ভক্ষকদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতি মুহূর্তের আতঙ্ক। বিষয়টা এত দাগ কাটলো যে, তারপরই আমরা এদের জন্যে কাজ শুরু করলাম। দেখলাম শুধু দেশে নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন জেলখানায়ও প্রচুর বাংলাদেশি মেয়ে আটকে আছে। এদেরকে উদ্ধার করার পর যে সমস্যাটি সামনে এলো তা হলো এদেরকে কোথায় রাখা হবে। কারণ তাদের বেশিরভাগেরই পরিবারে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিলো না। সরকার বা কোনো এনজিওরও এরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। অতএব অফিসের ভেতরেই ৫ জন মেয়ে নিয়ে আমরা শুরু করলাম মহিলা আইনজীবী সমিতির শেল্টার হোম 'প্রশান্তি'-র কার্যক্রম। এখন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও রয়েছে এর ব্যাপক পরিচিতি। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আমরা ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে পারি স্থানীয় এনজিওদের সহায়তায়। জেলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমরা ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করেছি। এতে নির্যাতনের শিকার মেয়েকে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি আইনী সহায়তা ও কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে মানসিক সমর্থন দেয়া হয়।

একটি মেয়েকে সাহায্য করা মানে তার পুরো দায়িত্ব নেয়া। এমনকি ভিকটিম নিজেই যখন মামলা করতে ভয় পায় বা দীর্ঘসূত্রিতায় হাঁপিয়ে ওঠে তখন আইনী সহায়তা দেয়াটাও কঠিন হয়ে যায়। তাকে দিনের পর দিন বোঝাতে হয়, ভরসা দিতে হয়, নিরাপত্তা দিতে হয়। এমনকি সাক্ষীকেও রাজি করাতে হয়, তার নিরাপত্তা বিধান করতে হয়। আবার কিছু বিশেষ পরিস্থিতি আসতে পারে। যেমন, পাচার থেকে উদ্ধার পাওয়া কাউকে দেশে ফিরিয়ে আনলেও আবার বিদেশে পাঠাতে হতে পারে মামলার প্রয়োজনে বা কেউ হয়তো মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তখন এ খরচও আমাদেরই বহন করতে হয়।

নির্যাতনের ব্যাপারে আমরা মনে করি প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ কার্যকরী। জন্ম নিবন্ধন আইন, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন এমনি কয়েকটি আইন যা আমাদের দাবির প্রেক্ষিতে সরকার প্রণয়ন করেছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আইন থাকলেও আইনের বাস্তবায়ন নেই। এজন্যে শুধু সরকার বা রাজনীতিকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দায়িত্ব আমাদেরও।

যে অবস্থা থেকে একজন নির্যাতিতাকে আমরা উদ্ধার করি এটা কিন্তু তার নির্যাতনের ইতিহাসের দ্বিতীয় উপাখ্যান। প্রথম উপাখ্যানের সূচনা তার নিজের পরিবার, গোত্র বা সমাজ থেকেই। যেখানে সে হয়তো সৎ মা বা সৎ বাবার দ্বারা নির্যাতিত, আত্মীয়ের যৌন নিপীড়নের শিকার, বাল্যবিয়ে বা স্বামীর অত্যাচার ও বহুবিয়ের শিকার। এ অত্যাচার, বঞ্চনা থেকে বাঁচার জন্যে পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে সে সম্মুখীন হয় আরো বড় নির্যাতনের বা প্রতারণার। শহরে এসে বাসাবাড়িতে বা গার্মেন্টসে কাজ করতে গিয়ে অথবা বস্তিতে, রাস্তাঘাটে প্রতি পদে পদে শিকার হয় বঞ্চনা, নির্যাতন আর যৌন হয়রানির। হয়তো পতিতালয়ে বিক্রি হয়ে যায় বা পাচার হয়ে যায়।

মেডিটেশন আলোচনা কাউন্সেলিং– সবকিছু মিলিয়ে যথার্থই এ কোর্স একজন মানুষকে মানসিকভাবে পুনর্বাসিত করতে পারে। পরিণত করতে পারে আগের চেয়েও ধবধবে নিভাঁজ এক সাদা কাগজে।

কোর্স করে ব্যক্তিগতভাবেও আমি উপকৃত হয়েছি। হাঁটু, কোমরের ব্যথা থেকে মুক্ত হয়ে এখন ঠিকভাবে রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারি।

আমাদের কাছ পর্যন্ত আসে যখন ভিকটিমের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, আর ধামাচাপা দেয়ার উপায় নেই। কিন্তু নির্যাতনের একটা বড় অংশই থেকে যাচ্ছে পর্দার অন্তরালে। সম্মানের কথা ভেবে দিনের পর দিন নীরবে সয়ে যায় এ অত্যাচার। পারিবারিক সহিংসতার ক্রমবর্ধমান হারের কথা বিবেচনা করে এখন অবশ্য আমরা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্যে একটি ডমেস্টিক ভায়োলেন্স ল'র কথা ভাবছি। কিন্তু অনেক শক্ত আইন দিয়েও কোনো লাভ নেই যদি ভিকটিম বিচার প্রার্থনায় আগ্রহী না হন, সেই আনুকূল্য না পান। ইভ টিজিং-এর বহু ঘটনা, থার্টি ফার্স্ট নাইটে বাঁধনের হয়রানি বা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলোর বিচার এ কারণেই এগোয় নি যে, সামাজিক হয়রানির কথা ভেবে মেয়েরা সাহস পায় নি। নিউজিল্যান্ডের একজন মানবাধিকার কর্মী সেদিন মন্তব্য করছিলেন, 'ডিমের ফাঁপা খোসার মতোই অবস্থা তোমাদের মেয়েদের। বাইরে সাজ-গোজ, হাসিখুশি চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ালেও ভেতরে গুমরে মরছে শুধু কান্না আর অসহায়ত্বের দীর্ঘশ্বাস।'

জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির মাধ্যমে আমরা মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা পালনের চেষ্টা করছি। আমাদের এ তৎপরতা আরো সফল হবে যদি মানবাধিকারের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা এবং ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। আমার মনে হয় আমাদের কাজে একটি পরিপূরক ভূমিকা রাখতে পারে মেডিটেশন। কারণ নির্যাতিত হওয়ার পর একজন মানুষ যে মানসিক বিপর্যয়, হতাশা এবং হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয় তখন মেডিটেশনই পারে তাকে সত্যিকারভাবে উজ্জীবিত করতে, আত্মবিশ্বাসী করতে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে।

এ কৌতূহল নিয়েই অংশ নিয়েছিলাম ২৭৩ তম কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে। কোর্সে এসে মনে হয়েছে আমার ধারণা সঠিক। একজন নির্যাতিতা মেয়েকে তুলনা করা হয় একটা দোমড়ানো সাদা কাগজের সাথে যা আর কখনো আগের মতো মসৃণ হয় না। কিন্তু এখন আমি বিশ্বাস করি মেডিটেশন আলোচনা কাউন্সেলিং– সবকিছু মিলিয়ে যথার্থই এ কোর্স একজন মানুষকে মানসিকভাবে পুনর্বাসিত করতে পারে। পরিণত করতে পারে আগের চেয়েও ধবধবে নিভাঁজ এক সাদা কাগজে।

কোর্স করে ব্যক্তিগতভাবেও আমি উপকৃত হয়েছি। হাঁটু, কোমরের ব্যথা থেকে মুক্ত হয়ে এখন ঠিকভাবে রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারি।

[মুক্ত আলোচনা ও প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যের অনুলিখন]



নিয়মিত মেডিটেশন জীবনে আনে ইতিবাচক পরিবর্তন

প্রফেসর ড. নুরুন্নবী

প্রফেসর ড. নুরুন্নবী লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন লন্ডন গিল্ডহল ইউনিভার্সিটিতে। দীর্ঘ ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বর্তমানে আইকন কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজির প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল।

তখন আমি লন্ডন গিল্ড হল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করি। দেখলাম লন্ডনে ব্যাঙের ছাতার মতো ইউনিভার্সিটি হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে দেখেছি উন্নয়নশীল দেশের ছেলে-মেয়েরা লন্ডনে আসে পড়াশোনার জন্যে। কিন্তু তাদের দুর্দশার কোনো শেষ থাকে না। আমি এবং আজিজুর রহমান সাহেব, এখন যিনি আইকন কলেজের ডিরেক্টর, একসাথে মিলে চাইলাম সুবিধাবঞ্চিত কমিউনিটির জন্যে কিছু করতে। পরিকল্পনা ছিলো ভোকেশনাল স্কিলভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার। কারণ আমরা দেখেছি উন্নয়নশীল দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভোকেশনাল স্কিলের ঘাটতিটাই প্রকট থাকে।

২০০৪ সালে আমরা লন্ডনে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিই। কলেজ শুরু করার অনুমতি নিতে সময় লেগেছিলো তিন মাস। এরপর বিজ্ঞাপন পর্ব এবং ১/২/৩ জন করে ছাত্রছাত্রীর ভর্তি হওয়া। পূর্ব লন্ডনের ই-১ এডলার স্ট্রিটে শুরু হলো আইকন কলেজ অফ টেকনোলজি এন্ড ম্যানেজমেন্টের যাত্রা। প্রথমে ছাত্রসংখ্যা ছিলো মাত্র ২০ জন। এদের মধ্যে ১২ জনই পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগ পায় এবং লন্ডন সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটি থেকে সাফল্যের সাথে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে।

২০০৬ সালে গুরুজী কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করানোর জন্যে দ্বিতীয়বারের মতো লন্ডন আসেন। সে কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয় আইকন কলেজ মিলনায়তনে। সেসময়ে তিনি একটি কথা বলেছিলেন যে, আইকন কলেজের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটবে। আজ সত্যিই তা-ই হয়েছে। আইকন কলেজের ছাত্রসংখ্যা এখন ৭ শতাধিক। কলেজের জন্যে এখন আরও বেশি ক্লাসরুম এবং জায়গার প্রয়োজন।

এ সাফল্যের মূল কারণ হলো শিক্ষার গুণগত মানের ব্যাপারে আমরা সবসময় আন্তরিক ও সৎ সেবা দেয়ার চেষ্টা করেছি। ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে যেমন মান বজায় রাখার চেষ্টা করেছি ফ্যাকাল্টি বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও আমরা সবসময় গুরুত্ব দিয়েছি ভালো ও যোগ্য শিক্ষক।

কলেজ শুরু করার পর আমরা প্রথমে হায়ার ন্যাশনাল ডিপ্লোমা (HND) কোর্স চালু করলাম এবং তা ছিলো শুধুমাত্র ব্যবসায় শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে। এখন এ কোর্স আমরা ট্রাভেল এন্ড টুরিজমসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শুরু করেছি। শুধু তা-ই নয়, আমাদের কলেজে এখন আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা (PGDNS) কোর্সও চালু করেছি। দুটো মাত্র কোর্স দিয়ে যে আইকন কলেজ যাত্রা শুরু করেছিলো সেখানে এখন কোর্সের সংখ্যা ৭টি।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে আইকন কলেজ একটি ভালো কলেজ হিসেবে স্বীকৃত। প্রচুর বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী এখানে রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত পাকিস্তান মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড মায়ানমার নেপাল শ্রীলঙ্কা ঘানা ও নাইজেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রী এখন আমাদের এখানে পড়াশোনা করছে।

যুক্তরাজ্যের প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বোর্ড (EdExcel) আইকন কলেজকে ডিএমএস এবং এইচএন্ডডি ডিগ্রি প্রদানের অনুমতি দিয়েছে। EdExcel আমাদের কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্ট।

বাংলাদেশসহ ভারত পাকিস্তান শ্রীলংকা ও নেপালে আইকন কলেজের আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে আইকন কলেজ থেকে বাংলাদেশি ছাত্রদের জন্যে স্কলারশিপও দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমরা কোর্স ফি-ও অনেক কম রাখি। HND কোর্স সম্পন্ন করতে টিউশন ফি প্রয়োজন হয় মাত্র ৩,৫০০ পাউন্ড। আমাদের ফুলটাইম কোর্স যেমন আছে তেমনি কর্মজীবী ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা বিবেচনায় ইভিনিং এবং উইকএন্ড কোর্স আছে, আছে ফ্লেক্সিবল ক্লাস আওয়ারের সুযোগ। আইকন কলেজের মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়নশীল দেশের ছেলে-মেয়েদেরকে লন্ডনে পড়াশোনা করতে সাহায্য করা।

সম্প্রতি বাংলাদেশে আইকন কলেজের আঞ্চলিক কার্যালয় চালু করা হয়েছে। লন্ডন সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটির সাথে আইকন কলেজের কোলাবোরেশন রয়েছে। দুবছর আইকন কলেজে পড়ার পর শেষ বছর তারা সাউথ ব্যাংক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে পারে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বিআইটি ম্যানেজমেন্ট এবং মোবাইল কমার্স বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রিও নিতে পারবেন সেখান থেকে। আইকন কলেজ বর্তমানে নর্থাম্ব্রিয়া ইউনিভার্সিটির এলএলবি অনার্সের ওপেন লার্নিং প্রোগ্রামের একমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র। কলেজের একজন ছাত্র ২০০৭ সালে সেরা মেডিকেল ল' স্টুডেন্ট হিসেবে লাভ করে নর্থ অফ ইংল্যান্ড মেডিকো লিগাল সোসাইটি স্পেশাল প্রাইজ।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার পর আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাপনসহ সবকিছুতেই বিশাল পরিবর্তন এসেছে। আগে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপজনিত কিছু সমস্যা ছিলো আমার। ২০০৬ সালে কোর্স করার পর থেকে আমার এসব কোনো সমস্যাই নেই। ৫৮ বছর বয়সেও সপ্তাহের সাতদিনই ১২ ঘণ্টা করে কাজ করি। মেডিটেশন আমার মধ্যে এ প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছে। এখন পর্যন্ত ৪৮টি দেশ ভ্রমণ করেছি। প্লেনে ভ্রমণের সময়ও মেডিটেশন করি। মেডিটেশন আমার মনের শক্তি, একাগ্রতা ও উদ্যম সবসময় বাড়িয়ে দেয়।

প্রত্যেকেরই প্রতিদিন মেডিটেশন করা উচিত। যে মানুষ নিয়মিত মেডিটেশন করে তার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। গুরুজীর কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যে, তিনি কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশনকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

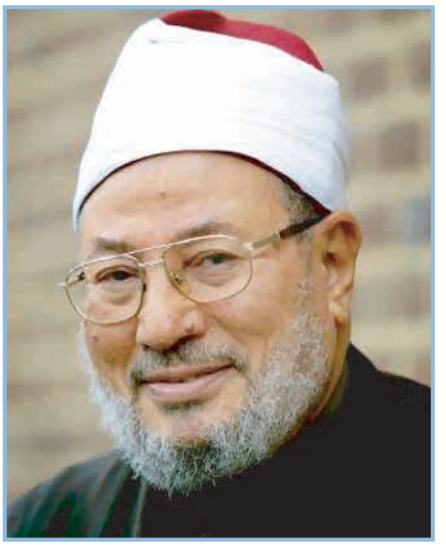
আইকন কলেজ কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির কার্যক্রমের জন্যে সবসময় উন্মুক্ত। গুরুজীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর পাশাপাশি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কর্মীদের জন্যে আন্তরিক শুভকামনা করি যাতে মানুষের কল্যাণার্থে তারা আজীবন কাজ করে যেতে পারেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সারাহ বিনতে সালেহ

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার পর আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাপনসহ সবকিছুতেই বিশাল পরিবর্তন এসেছে। আগে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপজনিত কিছু সমস্যা ছিলো আমার। ২০০৬ সালে কোর্স করার পর থেকে আমার এসব কোনো সমস্যাই নেই। ৫৮ বছর বয়সেও সপ্তাহের সাতদিনই ১২ ঘণ্টা করে কাজ করি। মেডিটেশন আমার মধ্যে এ প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছে।

ধ্যান ॥ উচ্চস্তরের ইবাদত

আল্লামা শেখ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী



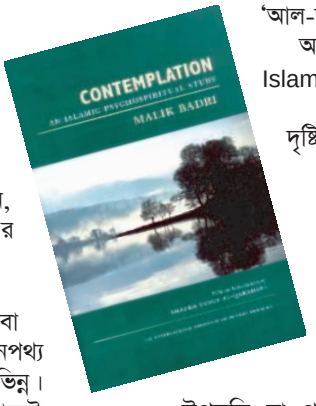
আল্লামা শেখ ড. ইউসুফ আল কারযাভী বর্তমান বিশ্বের সর্বজনমান্য ইসলামি চিন্তাবিদ। ১৯৭৩ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূল আদ-দ্বীন অনুষদ হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. কারযাভী মিশর সরকারের বোর্ড অব রিলিজিয়াস এফেয়ার্স এর সদস্য, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন এবং আলজেরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইসলামিক সায়েন্টিফিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এ পর্যন্ত তার ৫০টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি তুর্কি ফারসি উর্দু ইন্দোনেশীয়সহ বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় তার বই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষায় অনূদিত তার বইগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, ইসলামী পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম ইত্যাদি।

আল্লামা কারযাভী আল জাজিরা টেলিভিশনের 'শরীয়া এন্ড লাইফ' সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে সরাসরি কোরআন ও জীবন সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর ও ফতোয়া প্রদান করেন।

আজকের বিশ্বে মুসলমানদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে, আধুনিক জ্ঞানের সকল শাখায়ই তারা পাশ্চাত্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। যারা বর্তমান তথাকথিত ধার্মিক মানুষদের আচরণ দিয়ে ধর্মকে বিচার করেন তারা ভ্রান্তভাবে একেই আমাদের ধর্ম বা মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। অথচ অতীতে ইসলামি সভ্যতা ছিলো বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সভ্যতার অন্যতম। মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিলো জ্ঞানকেন্দ্র যা মুখরিত থাকতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষার্থীদের পদচারণায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খ্যাতনামা শিক্ষকদের বই আন্তর্জাতিকভাবেই পণ্ডিতদের নিকট গণ্য হতো রেফারেন্সরূপে। আরবি ভাষা জ্ঞানচর্চায় পালন করেছে মৌলিক ভূমিকা। রবার্ট ব্রিফল্ট, জর্জ সার্টন, গুস্তব লি বন এবং উইল ডুরান্ত-এর মতো ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে প্রকাশ করেছেন ঐকমত্য।



পিওর সায়েন্স ধর্ম-বর্ণ-গোত্র বা সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত। তবে এর নেপথ্য দর্শন বা শিক্ষা প্রক্রিয়ার বিষয়টি ভিন্ন। মানব ও সমাজবিজ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। স্বভাবতই তা তাদের আচরণ বিশ্বাস মূল্যবোধ ও পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত। যদিও কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী দাবি করেন, মানবীয় বিজ্ঞানগুলো আন্তঃসাংস্কৃতিক, কিন্তু বাস্তবে তা মূলত পাশ্চাত্যের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ।

মুসলিম বিশেষজ্ঞদের অবশ্যই মুক্তমন নিয়ে এ বিজ্ঞানগুলো পর্যালোচনা করা উচিত। প্রয়োজন ইসলামের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণ করা। এতে নতুন তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যাবে যা এ বিজ্ঞানগুলোয় বিরাজমান অনেক প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করবে।

সোশ্যাল সায়েন্সের একটি বিশাল ক্ষেত্র হচ্ছে মনোবিজ্ঞান, যাতে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজিত হলে অফুরন্ত কল্যাণ সাধিত হতে পারে। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানবাত্মা, তার সহজাত সম্ভাবনা ও দৃশ্যমান আচরণ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালে মুসলিম বিশেষজ্ঞরা এ ক্ষেত্রে বেশকিছু কাজ করেছেন। এ ক্ষেত্রে অগ্রগামীদের একজন হচ্ছেন মিশরীয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান নাজাতী। যিনি 'আল কোরআন ওয়া ইলম আন-নাফস' (আল কোরআন ও মনোবিজ্ঞান) এবং 'আল হাদীস ওয়া ইলম আন-নাফস' (আল হাদীস ও মনোবিজ্ঞান) নামে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়জন অধ্যাপক মালিক বাদ্‌রী, তিনি বিশিষ্ট গবেষক, মনোবিজ্ঞানী ও থেরাপিস্ট। অধ্যাপক বাদ্‌রী প্রচলিত মনোবিজ্ঞানের সাথে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সংযুক্ত করে নতুন এক ধারার সূত্রপাত করেছেন। তিনি ইসলামি আকিদা বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আমল থেকে সূত্র নিয়ে তা প্রয়োগ করে বিভিন্ন মানসিক রোগ নিরাময়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেন নি যার নিরাময় নেই। কেউ এই নিরাময় জানে, কেউ জানে না।' রসুলুল্লাহ (স)-র এ বাণী শারীরিক এবং মানসিক– উভয় রোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

অধ্যাপক বাদ্‌রী তার বর্তমান গ্রন্থ 'আল-তাফাক্কুর মিন আল মুশাহাদাহ ইলা আল-শুহুদ' (Contemplation : An Islamic Psychospiritual Study)-তে আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বইয়ের আরবি নামকে ইংরেজিতে অনায়াসে বলা যায় Contemplation : from perception to spiritual cognition অর্থাৎ ধ্যান : ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথ। তিনি ধ্যানকে ইন্দ্রিয় উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষন (যা সকল গবেষণামূলক বিজ্ঞানের ভিত্তি) থেকে অবধারণ বা পূর্বজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টির (Cognition) স্তরে উন্নীত করতে চান। রসুলুল্লাহ (স) এই অন্তর্দৃষ্টি বা পূর্বজ্ঞানের কথাই বলেছেন 'ইহসান' শব্দের ব্যাখ্যায়। তিনি বলেছেন, 'তুমি তাকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন– এই জেনে যখন তুমি আল্লাহর ইবাদত কর তখন তা হচ্ছে ইহসান।'

গ্রন্থকার তার গ্রন্থে ধ্যান করা এবং প্রশান্ত মনে সৎচিন্তার আলোকে বিচার করার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনাকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। যথার্থই আল কোরআন বলে, 'আমি একটি বিষয়ে সতর্ক করছি, আল্লাহর সামনে দাঁড়াও একক বা যৌথভাবে এবং চিন্তা কর ....'

> *"নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন-রাত্রির আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে, বসে বা শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে ধ্যানে (তাফাক্কুর) নিমগ্ন হয় এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি কর নি।"*
>
> *সূরা আলে ইমরান : ১৯০-১৯১*

(সাবা : ৪৬)। 'আল্লাহর সামনে দাঁড়াও' অর্থ এখানে আন্তরিকভাবে সত্যকে অনুসন্ধান করা। 'একক বা যৌথভাবে' অর্থ হচ্ছে সামাজিক বা ব্যক্তিগত সংস্কারের প্রভাব বা চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে চিন্তা বা বিচার বিশ্লেষণ করা।

অধ্যাপক বাদ্‌রী ইবাদতের একটি মাধ্যম হিসেবে ধ্যানের গুরুত্বকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, এক ঘণ্টার ধ্যান সারা রাত জেগে ইবাদতের চেয়ে উত্তম। অন্যান্য হাদীসবেত্তারা বলেছেন, এক ঘণ্টার ধ্যান সারা বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আরো সুবিধা হচ্ছে ধ্যানকে বলা যায় বিন্যাস বা আকারহীন ইবাদত যা স্থান বা কাল; দৃশ্যমান বা অদৃশ্য– কোনো কিছু দিয়েই বাধাগ্রস্ত হয় না।

অন্যান্য ধ্যানের সাথে বিশেষত ট্রানসেন্ডেন্টাল মেডিটেশনের সাথে যা পাশ্চাত্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে, ইসলামি ধ্যানের পার্থক্যও লেখক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তার অভিমত হচ্ছে যে, একজন মুসলমান নিজেকে নিয়ে, স্রষ্টার সৃষ্টিরহস্য নিয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হলে আল্লাহর রহমতে অন্য ধ্যানীদের চেয়ে উচ্চতর উপলব্ধিতে উপনীত হবেন।

[অধ্যাপক মালিক বাদ্‌রীর 'কনটেমপ্লেশন : এন ইসলামিক সাইকোস্পিরিচুয়াল স্টাডি' বই-এর ভূমিকার অংশ বিশেষ]



ধ্যানের পথেই আমাদের মুক্তি

আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা

বাংলাদেশে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা ঢাকার আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা।

প্রভু যিশু একবার এক বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। নানা জায়গা থেকে অভ্যাগতদের দ্বারা ঘরটি এত পরিপূর্ণ ছিলো যে, দরজা দিয়ে আর একজনেরও প্রবেশের সুযোগ ছিলো না। এ অবস্থায় এক চলৎশক্তিহীন অবশ রোগীকে নিয়ে হাজির হলো তার বন্ধুরা। তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, প্রভু যিশুর কাছে গেলেই সে নিরাময় হয়ে যাবে। কিন্তু ভেতরে প্রবেশের কোনো সুযোগ না পেয়ে তারা হতাশ হচ্ছিলো। অগত্যা এক উপায় অবলম্বন করলো। ঘরের চালার একটা অংশ খুলে তার ভেতর দিয়ে নামিয়ে দিলো দড়িবাঁধা বিছানায় শোয়া সেই অবশ রোগীকে। যিশু তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে বললেন, বাছা! প্রভু তোমাকে ক্ষমা করেছেন। উঠে দাঁড়াও এবং বিছানা হাতে নিয়ে চলে যাও। সবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে লোকটি তা-ই করলো।

আরেকবার সঙ্গীদের নিয়ে যিশু জেরুজালেম ত্যাগ করছেন। জেরিকোর কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন, পথের ওপর এক অন্ধ ভিক্ষুক বসে আছে। বার্টিমোস নামের এই ভিক্ষুক চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে যিশু, আমাকে দয়া করুন। তার সঙ্গীরা তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করে বার্টিমোস আরো জোরে জোরে যিশুকে ডাকতে লাগলো। যিশু থামলেন। অন্ধ ভিক্ষুকটিকে তার কাছে নিয়ে আসতে বললেন। তিনি বললেন, তুমি কী চাও? বার্টিমোস বললো, আমি আমার দৃষ্টি ফিরে পেতে চাই। যিশু বললেন, তা-ই হবে। তোমার বিশ্বাসই তোমাকে নিরাময় করবে। তৎক্ষণাৎ বার্টিমোস দৃষ্টি ফিরে পেলেন এবং পরিণত হলেন তাঁর অনুসারীতে।

বিশ্বাস ছিলো প্রভু যিশুর প্রথম শিক্ষা। তিনি বিশ্বাস করেছেন এবং বিশ্বাসী হতে বলেছেন। দীক্ষিত হওয়ার পর ৪০ দিন-রাতের উপবাস ব্রতের সময় শয়তানের নানা বিভ্রান্তি-চেষ্টাকে তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছেন বিশ্বাসের দৃঢ়তা দিয়ে। প্রথমবার শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলো তার ক্ষুৎপিপাসা কাতরতার সুযোগে। তাকে বললো– হে যিশু, তুমি যদি সত্যই প্রভুর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে থাকো, তাহলে এ পাথরকে বল রুটি হয়ে যেতে। যিশু বলেছিলেন, শুধু দেহের খাবার নয়, ঈশ্বর নিঃসৃত বাণী মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

দ্বিতীয়বার শয়তান তাকে পৃথিবীর ভূ-ভাগের দৃশ্য দেখিয়ে বললো, আমার আনুগত্য করলে তোমাকে এ সমস্ত রাজ্যের অধিপতি করে দেবো। যিশু বলেছিলেন, আনুগত্য তো কেবল ঈশ্বরেরই প্রাপ্য। উপাসনা তো তাঁরই একাধিপত্য। তৃতীয় এবং শেষবারের মতো শয়তানের ধোঁকাকেও তিনি জয় করেছেন বিশ্বাসের শক্তি দিয়ে।

দ্বিতীয় শিক্ষা হলো প্রত্যাশা। যিশু বলেছেন, যারা ধৈর্যের সাথে সৎকর্ম করে ঈশ্বরের কাছে সুখ-সম্মান ও অনন্ত জীবন প্রত্যাশা করে, ঈশ্বরও তা-ই দেবেন।

আর তৃতীয় হলো মমতা। যিশু বলেন, বিশ্বাস প্রত্যাশা ও মমতা– এ তিনটিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে। এর মধ্যে মমতাই সবচেয়ে মহৎ। এই মমতা এমনকি শত্রু বা বিরোধিতাকারীর জন্যেও। তিনি বলেন, যে তোমার শত্রুতা করে, তাকে ভালবাসো। যে তোমাকে ঘৃণা করে তার কল্যাণ কর। আর যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তার জন্যে প্রার্থনা কর।

সারাজীবন যিশু তা-ই করেছেন। এমনকি ক্রুশবিদ্ধ করার জন্যে যখন সাধারণ কয়েদীদের সাথে তাকেও বেঁধে আনা হচ্ছিলো তখনও তিনি ঈশ্বরের কাছে এ প্রার্থনাই করছিলেন যে, হে প্রভু! তুমি এদের ক্ষমা কর। কারণ এরা জানে না, এরা কী করছে।

উদারতা আর সহিষ্ণুতার এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন যিশু। একবার ব্যভিচারের দায়ে এক মহিলাকে শাস্তির জন্যে তার কাছে নিয়ে আসা হলো। যিশু যখন উপলব্ধি করলেন মহিলাটি আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করছে, তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। কিছু লোকের ব্যাপারে অভিযোগ এলো তারা যিশুর নামে ভূত তাড়ায়, রোগমুক্ত করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন কি না জানতে চাইলে শিষ্যদের তিনি নিরস্ত করে বলেছিলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি মানুষের মুক্তির জন্যে। মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্যে। তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার জন্যে নয়।

যিশুর শক্তির উৎস ছিলো তাঁর ধ্যান, তাঁর প্রার্থনা। যে ধ্যানে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতেন। যে প্রার্থনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, প্রার্থনায় যা কিছু তোমরা চাও বিশ্বাস করবে তা পেয়েছ, তাহলে তা-ই পাবে। সারাদিন ধরে ভক্ত-শিষ্য-অভ্যাগতদের সাথে সময় কাটানোর পর সন্ধ্যাবেলা খানিকটা নির্জনে গিয়ে তিনি প্রার্থনায় নিমগ্ন হতেন, ভুলে যেতেন সমস্ত ক্ষুধা-ক্লান্তি-অবসাদ। অন্যদেরকেও তিনি বলতেন, অনেক কাজ করেছো, এখন ধ্যান কর। নিজেকে পর্যালোচনা কর, ভুলগুলো খুঁজে বের কর, মনের পর্দায় নিজেকে দাঁড় করাও, জীবন পরিবর্তন কর।

অর্থাৎ একজন মানুষ একশটা ভুল করতে পারে। কিন্তু একটা ভালো কাজ তো সে করেছে। এই ভালোর ওপর ভিত্তি করেই আমরা চেষ্টা করি গড়ে তোলার জন্যে। যিশুর আদর্শে এটা হলো আমাদের শিক্ষা এবং নীতি। যেখানে অনৈতিকতা দেখছি, আমরা তা দূর করার জন্যে চেষ্টা করছি।

যিশুর শক্তির উৎস ছিলো তাঁর ধ্যান, তাঁর প্রার্থনা। যে ধ্যানে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতেন। যে প্রার্থনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, প্রার্থনায় যা কিছু তোমরা চাও বিশ্বাস করবে তা পেয়েছ, তাহলে তা-ই পাবে। সারাদিন ধরে ভক্ত-শিষ্য-অভ্যাগতদের সাথে সময় কাটানোর পর সন্ধ্যাবেলা খানিকটা নির্জনে গিয়ে তিনি প্রার্থনায় নিমগ্ন হতেন, ভুলে যেতেন সমস্ত ক্ষুধা-ক্লান্তি-অবসাদ। অন্যদেরকেও তিনি বলতেন, অনেক কাজ করেছো, এখন ধ্যান কর। নিজেকে পর্যালোচনা কর, ভুলগুলো খুঁজে বের কর, মনের পর্দায় নিজেকে দাঁড় করাও, জীবন পরিবর্তন কর।

আমি মনে করি, ধ্যান-মেডিটেশন বা রিফ্লেকশন– যে নামেই বলি, ধ্যানের পথেই আমাদের মুক্তি। কারণ ধ্যান আধ্যাত্মিকতার দ্বার উন্মুক্ত করে আর আধ্যাত্মিকতার ফসল হলো শান্তি সম্প্রীতি সমৃদ্ধি। কারণ ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্ট– কোনো ধর্মই সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না, অনৈতিকতাকে সমর্থন করে না, অশান্তিকে সমর্থন করে না।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মিশনারীর উদ্যোগে প্রতিবছরই আমরা আয়োজন করি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের। সেখানে ২০০ জন অংশ নিলে ৫০ জন মুসলমান, ৫০ জন হিন্দু, ৫০ জন বৌদ্ধ এবং ৫০ জন খ্রিষ্টান সমবেত হন। অত্যন্ত খোলামেলা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নিজেদের মধ্যকার দূরত্ব ঘোচাতে প্রয়াস পান।

কোয়ান্টাম এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্ব ধর্ম প্রতিনিধিত্বের সহাবস্থানের যে দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপিত হয়েছে তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এ সংগঠনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক– এটাই কামনা করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ডা. মনিরুজ্জামান

ধ্যান সমাধির পথ

স্বামী স্থিরাত্মানন্দজী মহারাজ



রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী স্থিরাত্মানন্দজী মহারাজ

শ্রী রামকৃষ্ণের জীবনটাকে আমরা বলতে পারি যে, ধর্মের একটা গবেষণাগার। তিনি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মসহ বিভিন্ন ধর্মমত অভ্যাস করেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন– ধর্মসমূহের পথ ভিন্ন হলেও সকলেরই উদ্দিষ্ট এক ও অভিন্ন– ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ। তার ভাষায় 'সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ', অর্থাৎ ধর্মীয় মত ও পথ ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক।

ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত বাঙালি যোগসাধক দার্শনিক ও ধর্মগুরু শ্রী রামকৃষ্ণ। ১৮৩৬ সালে গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে গদাই নামে পরিচিত। গদাধর তাঁর গ্রামবাসীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অঙ্কন ও মাটির প্রতিমা নির্মাণে তাঁর ছিলো সহজাত দক্ষতা। যদিও প্রথাগত শিক্ষায় তাঁর আদৌ মনোযোগ ছিলো না। সে যুগে ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাকে তিনি "চালকলা–বাঁধা বিদ্যা" (অর্থাৎ পুরোহিতের জীবিকা উপার্জনী শিক্ষা) বলে উপহাস করেন এবং তা গ্রহণে অস্বীকার করেন। তবে নতুন কিছু শিখতে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিলো না। গানবাজনা, কথকতা ও ধর্মীয় উপাখ্যান অবলম্বনে যাত্রাভিনয়ে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী ও গ্রাম্য পুরাণকথকদের কথকতা শুনে অতি অল্প বয়সেই পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন গদাধর।

শ্রী রামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, ৬/৭ বছর বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবতন্ময়তা দেখা দিত। পিতৃবিয়োগের পর তাঁর অগ্রজ রামকুমার পরিবারের ভার গ্রহণ করেন ও পুরোহিতের বৃত্তি গ্রহণ করেন। দাদাকে পৌরোহিত্যে সহায়তা করার মানসে গদাধর কলকাতায় পদার্পণ করেন।

১৮৫৫ সালে কলকাতার নিম্নবর্ণের কৈবর্ত্য সমাজের এক ধনী জমিদারপত্নী রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করলে রামকুমার সে মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ সালে রামকুমারের মৃত্যু হলে গদাধর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম আঙিনায় তাঁকে একটি ছোট ঘর দেয়া হয়। এ ঘরেই তিনি অতিবাহিত করেন তাঁর অবশিষ্ট জীবন।

রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণের ভাবতন্ময়তা বৃদ্ধি পায়। তার ১২ বছরের তপস্যা জীবনে তিনি দুজন গুরুর দীক্ষা লাভ করেন। তারা হলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তোতাপুরী। ভৈরবী তাকে তান্ত্রিক সাধনা সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং তোতাপুরী শিক্ষা দেন বৈদান্তিক সাধনা সম্পর্কে। দীক্ষা লাভের পর তার নাম হয় শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস। একইসঙ্গে রামকৃষ্ণ বৈষ্ণব সাধনায়ও সিদ্ধি লাভ করেন।

তিনি প্রথাগত সন্ন্যাসীদের সাথে একমত ছিলেন না বা তাদের মতো পোশাকও পরতেন না। ব্রাহ্মণের জাত্যাভিমান দূর করার জন্যে তিনি নিম্নবর্ণীয়দের হাতে খাদ্যগ্রহণ, অন্ত্যজ পারিয়াদের (চাকর ও ঝাড়ুদার) সেবা করতে থাকেন।

লোকশিক্ষক হিসেবে রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। গ্রামবাংলায় ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে দেয় তাঁর উপদেশাবলি জনমানসে বিস্তার করেছিলো ব্যাপক প্রভাব। ঈশ্বর-উপলব্ধিকেই তিনি মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে মনে করতেন। শ্রী রামকৃষ্ণের মতে, কাম ও অর্থই মানুষকে ঈশ্বরের পথ হতে বিচ্যুত করে; তাই 'কাম-কাঞ্চন' বা 'কামিনী-কাঞ্চন' ত্যাগের পথই তাঁর কাছে ছিলো ঈশ্বরের পথ। জগতকে তিনি 'মায়া' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে জগতের অন্ধকার শক্তি 'অবিদ্যা-মায়া' (অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ) মানুষকে বন্ধনে ফেলে আর বিদ্যা-মায়া (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গুণাবলি, জ্ঞান দয়া শুদ্ধতা প্রেম ভক্তি) মানুষকে চৈতন্যের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যায়।

একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরভাবনা বা ধ্যানের মধ্য দিয়েই সমাধির স্তরে যাওয়ার কথা বলেছেন শ্রী রামকৃষ্ণ। পুনঃপুনঃ চেষ্টার মধ্য দিয়ে এ অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে। আবার তিনি বলেছেন,খালি পেটে ধর্ম হয় না। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিলো তিনি হিমালয়ে বসে ধ্যান করে করে তার শরীর ত্যাগ করবেন। শুনে শ্রী রামকৃষ্ণ ধমক দিয়েছিলেন, তুই নিজের মুক্তি চাস শুধু, এ-তো স্বার্থপরতা। আর্তের সেবা করলে তা ধ্যানেরই সহায়ক।

'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা'– তাঁর এ উপদেশ স্বামী বিবেকানন্দের কর্মের পাথেয় হয়েছিলো। শ্রী রামকৃষ্ণ সংগঠিত করেন একদল অনুগামী, যারা ১৮৮৬ সালে তাঁর প্রয়াণের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাঁর কাজ চালিয়ে যান। এঁদেরই নেতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্যের সমক্ষে উপনীত করেন। বিবেকানন্দ যে বিশ্ব মানবতাবাদের বার্তা প্রেরণ করেন তা সর্বত্র সমাদৃত হয় এবং তিনিও সকল সমাজের সমর্থন অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুদর্শনের সার্বজনীন সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেদান্ত সোসাইটি এবং ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন।

একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরভাবনা বা ধ্যানের মধ্য দিয়েই সমাধির স্তরে যাওয়ার কথা বলেছেন শ্রী রামকৃষ্ণ। তিনি এ-ও বলেছেন– শুধু চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেই ধ্যান হয় না যদি না যাবতীয় লোভ-কামনা-বাসনা ও শত্রুভাবনা থেকে মনকে মুক্ত করা না যায়। পুনঃপুনঃ চেষ্টার মধ্য দিয়ে এ অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে। আবার তিনি বলেছেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিলো তিনি হিমালয়ে বসে ধ্যান করে করে তার শরীর ত্যাগ করবেন। শুনে শ্রী রামকৃষ্ণ ধমক দিয়েছিলেন, তুই নিজের মুক্তি চাস শুধু, এ-তো স্বার্থপরতা। আর্তের সেবা করলে তা ধ্যানেরই সহায়ক। আত্মমুক্তি ও জগতের কল্যাণসাধন– এ দুধারী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্যেই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন।

ধ্যান ও অপরের কল্যাণের জন্যে আমাদের সমাজে যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে কোয়ান্টাম তাদের একটি। পাশাপাশি বিবিধ ধর্মের বাণী নিয়ে কণিকা প্রকাশের যে উদ্যোগ কোয়ান্টাম নিয়েছে তা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার এক চমৎকার পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি ধর্মবাণীর ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও ভাবগত পার্থক্য নেই। আমাদের সবারই লক্ষ্য– দুঃখমুক্তির মধ্য দিয়ে পরমানন্দ লাভ। ফলে আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং নিজস্ব বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। এ কাজে কোয়ান্টাম আরো এগিয়ে যাক, শ্রী ভগবানের কাছে এ প্রার্থনাই করছি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল



ধ্যান প্রজ্ঞা নির্বাণ

শুদ্ধানন্দ মহাথের

মহামান্য শুদ্ধানন্দ মহাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের সভাপতি ও ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের অধ্যক্ষ।

মহামতি বুদ্ধ একদিন তার শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় এক লোক এসে তার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিলো। বুদ্ধ থুতু মুছে বললেন, আর কিছু বলবে? লোকটি হতবাক। কারণ কারো মুখে থুতু দেয়ার পর আজ পর্যন্ত এরকম প্রশ্ন কেউ কাউকে করে নি। বুদ্ধের শিষ্যরা রেগে উঠলেন। তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ শিষ্য আনন্দ বলে উঠলেন, এ ধৃষ্টতা সহ্য করা যায় না। এ পাপাচারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। বুদ্ধ বললেন, তোমরা থাম। সে নয়, তোমরাই আমার অবমাননা করছো। এত বছর আমার সাথে থেকেও তোমরা ক্রোধ সংবরণ করতে শিখলে না! এ লোকটির কোনো দোষ নেই। সে এখানে নতুন এসেছে। সম্ভবত সে আমার সম্পর্কে এমন কিছু শুনেছে যা তাকে ক্ষুব্ধ করেছে। নিশ্চয়ই ওর আমাকে আরো কিছু বলার আছে। কারণ একজন মানুষ যখন কাউকে খুব বেশি ভালবাসে, বেশি ক্ষুব্ধ হয় বা বেশি ঘৃণা করে সে তখন কিছু বলার আগে কোনো আচরণের আশ্রয় নেয়। বুদ্ধ লোকটিকে নিরাপদে চলে যেতে দিলেন।

এদিকে লোকটি বাড়ি গিয়ে সারারাত চিন্তা করলো। যতই চিন্তা করছিলো ততই বিস্মিত, হতভম্ব হচ্ছিলো। কে এই বুদ্ধ? কী করে একজন মানুষ এত শান্ত সৌম্য হতে পারেন, পারেন এত জাদুকরী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে?

সকাল হতে না হতেই সে আশ্রমে ছুটে এলো। লুটিয়ে পড়লো বুদ্ধের পায়ে। এবারও বুদ্ধ জানতে চাইলেন, আর কিছু বলবে? আনন্দকে ডেকে বললেন, দেখ মানুষ কীভাবে তার আবেগ প্রকাশ করে! অব্যক্ত কথা বলতে চায়! থুতু যেমন সে দিয়েছিলো কিছু বলার জন্যে, পায়ে লুটিয়েছেও কিছু বলার জন্যে। লোকটি তখন বললো, প্রভু আমার গতকালের ঘৃণ্য কাজের জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন। বুদ্ধ বললেন, আমি কিছুই মনে করি নি। কারণ তুমি তো আমাকে থুতু দাও নি। থুতু দিয়েছ আমার সম্পর্কে তোমার মনের ভ্রান্ত ধারণাকে। তাতে তো আমার কোনো ক্ষতি হয় নি।

এটাই বুদ্ধের শিক্ষা। ধ্যানের মধ্য দিয়ে যে পরম শাশ্বতবোধ বা জ্ঞানে তিনি উদ্ভাসিত হয়েছিলেন তা তাকে দিয়েছিলো এক অসাধারণ নির্লিপ্ততা। ঈর্ষাপরায়ণ চাচাতো ভাই দেবদত্তের বারংবার চালানো হত্যাপ্রচেষ্টাও তাকে বিচলিত করে নি। হত্যার জন্যে পাঠানো তীরন্দাজ বাহিনী তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে দেয়া পাথর তার পদতলে এসে থেমে গেছে, মদপান করিয়ে ছেড়ে দেয়া হাতি হাঁটু গেড়েছে বুদ্ধের উত্থিত অভয়মুদ্রার সামনে।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে যখন ভারতীয় সমাজ কঠোর জাতিভেদ প্রথার নিগড়ে বন্দি, তখন মহামতি বুদ্ধই ঘোষণা করেন, জন্মে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্মে কেউ অচ্ছুত হয় না, কর্মই মানুষকে ব্রাহ্মণ করে, কর্মই মানুষকে অচ্ছুত করে। নরসুন্দর উপালি জানতে চেয়েছিলেন– তার মতো একজন অস্পৃশ্য কি অড়হৎ (সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু) হতে পারবে? বুদ্ধ জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই এবং উপালিকে প্রধান দশ শিষ্যের একজন হিসেবে গ্রহণ করে তার প্রতি অন্য শিষ্য রাজপুত্রদের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করতে বলেছিলেন।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৩ সালে শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের ঘরে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের সপ্তম দিনে মা মায়াদেবীর জীবনাবসান হয়। পরে তিনি মায়ের ছোট বোন মহা প্রজাপতি কর্তৃক লালিত হন। জন্মের পঞ্চম দিনে রাজা ৮ জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে সদ্যোজাত শিশুর নামকরণ ও ভবিষ্যৎ বলার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর নাম দেয়া হয় সিদ্ধার্থ– 'যে সিদ্ধিলাভ করেছে বা যার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে'। তাদের মধ্যে একজন বলেন, রাজকুমার গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবেন।

জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মাথায় রেখে পিতা শুদ্ধোদন তাকে কখনো ধর্মচিন্তা বা জীবনের করুণ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে দেন নি।

কথিত আছে, একদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ বেড়াতে বেরুলে ৪ ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। প্রথমে তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ, অতঃপর একজন অসুস্থ এবং শেষে একজন মৃত মানুষকে দেখতে পান। তিনি তাঁর সহিস চন্নকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে চন্ন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, এটিই সকল মানুষের নিয়তি। আবার তিনি চন্নকে নিয়ে বেরুলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সেই রাত্রেই ঘুমন্ত স্ত্রী পুত্র পরিবারকে নিঃশব্দ বিদায় জানিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন।

দুঃখ ও দুঃখের কারণ সম্বন্ধে জানতে সিদ্ধার্থ যাত্রা অব্যাহত রাখেন। তিনি গ্রহণ করলেন সাধনার মধ্যপন্থা। দীর্ঘ ৬ বছর সাধনার পর এক পূর্ণিমা তিথিতে ৩৫ বছর বয়সে বুদ্ধ বোধিলাভ করলেন।

বুদ্ধ দুঃখের কারণ, দুঃখ দূর করার উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। বাসনা সব দুঃখের মূল। আর এর মূল অবিদ্যা। নির্বাণ লাভে এই দুঃখের অবসান।

ধ্যান বৌদ্ধত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কারণ বৌদ্ধধর্মে মনের গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধ বলেছেন, মন হলো সকল কর্মের চালক। আর এই মনের শুদ্ধি এবং ঋদ্ধির জন্যেই ধ্যান।

এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের চারটি উপদেশ যা চতুরার্য সত্য নামে পরিচিত– দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিরোধ আছে, দুঃখ নিরোধের পথ আছে। তিনি অষ্টবিধ উপায়ের মাধ্যমে মধ্যপন্থা অবলম্বনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো সম্যক ধারণা, সম্যক সংকল্প, সম্যক আচরণ, সম্যক জীবনধারণ, সম্যক মনন এবং সম্যক ধ্যান।

আর্যসত্য এবং অষ্টবিধ উপায় অবলম্বনের পূর্বে ত্রিশরণ মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়। এ মন্ত্রের তাৎপর্য : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি– আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। বোধিলাভ জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য। বুদ্ধত্ব মানে পূর্ণ সত্য, পবিত্রতা, চরম আধ্যাত্মিক জ্ঞান। ধম্মং শরণং গচ্ছামি– আমি ধর্মের শরণ নিলাম। যে সাধনা অভ্যাস দ্বারা সত্য লাভ হয়, আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ বিকাশ হয় তা-ই ধর্ম। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি– আমি সঙ্ঘের শরণ নিলাম। যেখানে পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্যে ধর্মের সাধনা সম্যকভাবে করা যায় তা-ই সঙ্ঘ।

ধ্যান বৌদ্ধত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কারণ বৌদ্ধধর্মে মনের গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধ বলেছেন, মন হলো সকল কর্মের চালক। আর এই মনের শুদ্ধি এবং ঋদ্ধির জন্যেই ধ্যান। ধ্যানের পথেই রাগ ক্রোধ দুশ্চিন্তা অস্থিরতা লোভ কামাসক্তি দূরীভূত হয়ে মন শান্ত হয়। তথাগত বুদ্ধ তাই বলেন, প্রজ্ঞা ছাড়া ধ্যান নাই। ধ্যান ছাড়া প্রজ্ঞা সৃষ্টি হয় না। যার ধ্যান ও প্রজ্ঞার সমন্বয় হয়েছে তিনিই নির্বাণ স্তরে পৌঁছেছেন।

কোয়ান্টাম মেথড আমাদের দেশে ধ্যানের ব্যাপকভিত্তিক চর্চার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এটা খুবই ইতিবাচক লক্ষণ। কারণ একজন ধ্যানী মানুষ কোনো অন্যায় করতে পারে না। তার মুখ থেকে কোনো খারাপ কথা নিঃসৃত হয় না। আমাদের দেশের মানুষ যত বেশি ধ্যানী হবে তত প্রশান্তি কল্যাণে ভরে উঠবে জীবন।

রক্তদান কার্যক্রম ও অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সেবার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে তা অসাধারণ। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর জীবনের ভ্রমণময় অবশিষ্ট ৪৫ বছর মহামতি বুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ এই সেবার অতুলনীয় দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছিলেন। গত ১৭ বছর ধরে ধারাবাহিক কাজের মধ্য দিয়ে গুরুজী মহাজাতক এবং তার সহযাত্রীরা যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তার ফসলই এই ৩০০ কোর্স। এ অভাবনীয় সাফল্যের জন্যে তাদের প্রতি আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন।

অনুলিখন : নাজমুন নাহার রুমী

আলোকিত জীবনের পথ

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ



বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বাংলাদেশে তরুণদের বই পড়া আন্দোলনের মূল স্থপতি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই পরিবেশবিদ তার সামাজিক অবদানের জন্যে ২০০৪ সালে পেয়েছেন ম্যাগসেসে পুরস্কার।

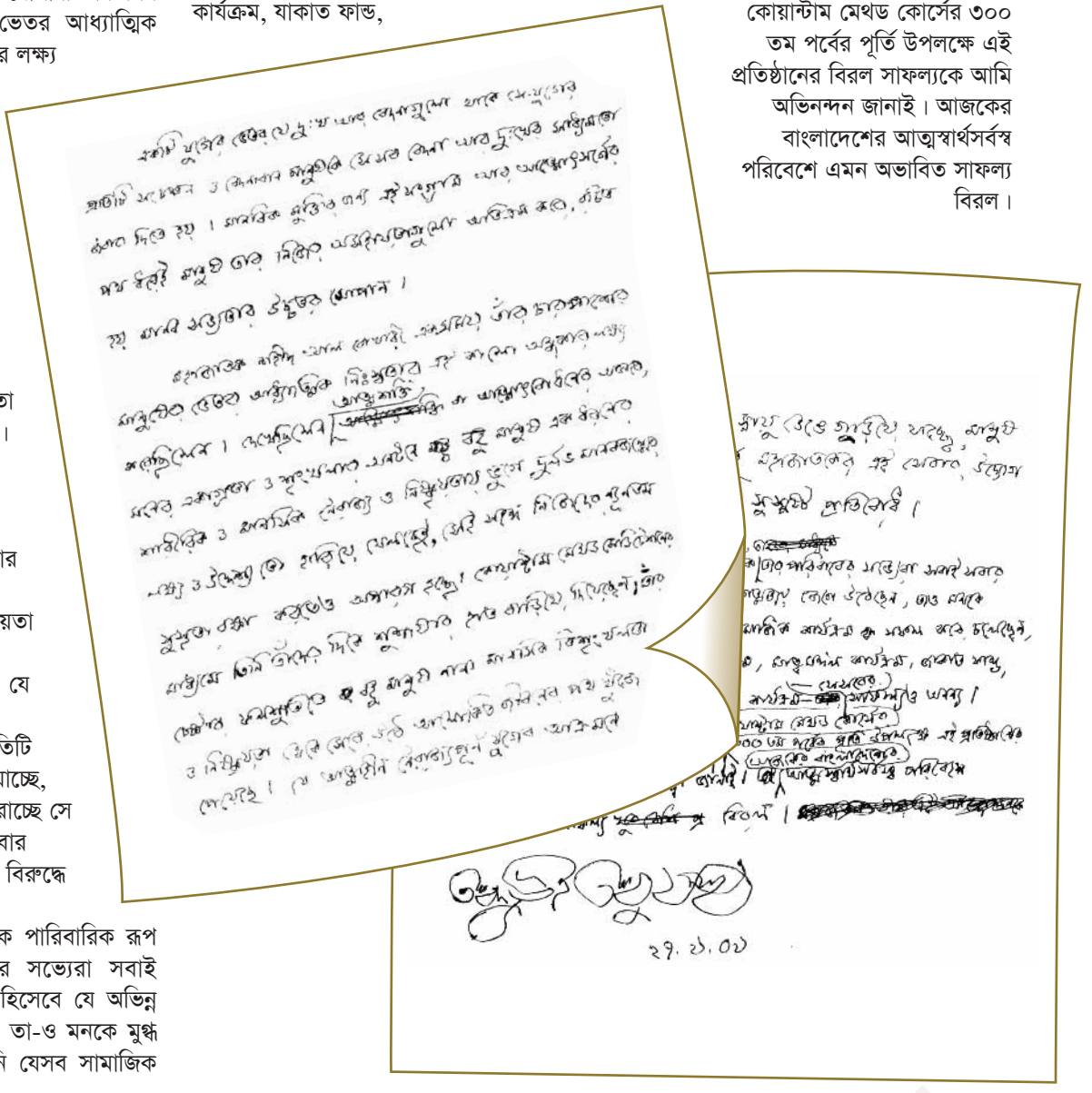
একটি যুগের ভেতর যে দুঃখ আর বেদনাগুলো থাকে সে যুগের প্রতিটি সচেতন ও বেদনাবান মানুষকে সেসব বেদনা আর দুঃখের সাধ্যমতো জবাব দিতে হয়। মানবিক মুক্তির জন্যে এই সংগ্রাম আর আত্মোৎসর্গের পথ ধরেই মানুষ তার নিজের অসহায়তাগুলো অতিক্রম করে, রচিত হয় মানবসভ্যতার উচ্চতর সোপান।

মহাজাতক শহীদ আল বোখারী একসময় তার চারপাশের মানুষের ভেতর আধ্যাত্মিক নিঃস্বতার এই কালো অন্ধকার লক্ষ্য করেছিলেন। দেখেছিলেন আত্মশক্তি বা আত্মোৎবোধনের অভাবে, মনের একাগ্রতা ও শৃঙ্খলার অনটনে বহু মানুষ এক ধরনের শারীরিক ও মানসিক নৈরাজ্য ও নিষ্ক্রিয়তায় ভুগে দুর্লভ মানবজন্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তো হারিয়ে ফেলছেই, সেই সঙ্গে নিজেদের ন্যূনতম সুস্থতা রক্ষা করতেও অপারগ হচ্ছে।

কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশনের মাধ্যমে তিনি তাদের দিকে শুশ্রূষার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তার চেষ্টার ফলশ্রুতিতে বহু মানুষ নানা মানসিক বিশৃঙ্খলতা ও নিষ্ক্রিয়তা থেকে সেরে উঠে আলোকিত জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছে। যে আত্মাহীন নৈরাজ্যপূর্ণ যুগের আক্রমণে আজ আমাদের প্রতিটি মানুষের স্নায়ু ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষ প্রতি মুহূর্তে সুস্থতা হারাচ্ছে সে মুহূর্তে মহাজাতকের এই সেবার উদ্যোগ সেই মানবিক ধ্বসের বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট প্রতিরোধ।

আজ তিনি কোয়ান্টামকে পারিবারিক রূপ দিয়েছেন। তার পরিবারের সভ্যেরা সবাই সবার দোসর হিসেবে বন্ধু হিসেবে যে অভিন্ন একাত্মতায় জেগে উঠেছেন, তা-ও মনকে মুগ্ধ করে। তাদের মাধ্যমে তিনি যেসব সামাজিক কার্যক্রম সফল করে চলেছেন যেমন– রক্তদান কর্মসূচি, স্বেচ্ছা দাফন কার্যক্রম, মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম, যাকাত ফান্ড, মেডিকেল ক্যাম্প থেকে শুরু করে অন্যান্য কার্যক্রম– সেসবের সাফল্যও অনন্য।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩০০ তম পর্বের পূর্তি উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের বিরল সাফল্যকে আমি অভিনন্দন জানাই। আজকের বাংলাদেশের আত্মস্বার্থসর্বস্ব পরিবেশে এমন অভাবিত সাফল্য বিরল।



প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য লাভের পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক পন্থা

কোয়ান্টাম মেথড

মনই সৃচনা করেছে চিন্তা বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সভ্যতার। মনের ধ্যানাবস্থা তথা তন্ময় ভাবনার মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে বৈজ্ঞানিক সত্য। মনোশক্তির সৃজনশীল প্রয়োগে উদ্ভাবিত হয়েছে নতুন প্রযুক্তি। নীরব মুহূর্তেই সৃষ্টি হয়েছে অমর কাব্য, সাহিত্য, সংগীত। আত্মনিমগ্ন অবস্থায়ই মহাপুরুষেরা দুনিয়াকে দিয়েছেন নতুন দর্শন, ধর্ম, জীবনবিধান।

পৃথিবীর সকল বড় বড় বিপ্লবের সৃচনা হয়েছে মৌনতার মাঝে মনের ধ্যানাবস্থায়। দুনিয়ায় মানুষের তৈরি দৃশ্যমান সবকিছুই প্রথম বাস্তবতা লাভ করেছে মনে।

ধর্মবেত্তা দার্শনিক দরবেশ ঋষি কবি সাহিত্যিক বিজ্ঞানী সবাই মনের ধ্যানাবস্থার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সফল হয়েছেন, বরণীয় হয়েছেন। সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। প্রতিভার রহস্য এখানেই। আমরা যাকে প্রতিভা মনে করি, তা অলৌকিক কিছু নয়। প্রতিভা মানে ইচ্ছেমতো তৎক্ষণাৎ মনে 'ধ্যানাবস্থা' সৃষ্টি করার ক্ষমতা, সবার অলক্ষ্যে মুহূর্তে তন্ময় ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়ার সামর্থ্য।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, ধ্যানাবস্থায় মন অপ্রয়োজনীয় সবকিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে নির্দিষ্ট বিষয়ে নিমগ্ন হয় এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ও নিখুঁতভাবে ব্যবহার করতে পারে।

ইলেক্ট্রো এনসেফেলোগ্রাফ (ইইজি) এবং ব্রেন ইমেজিং পরীক্ষা থেকে তারা দেখেছেন, নিয়মিত মেডিটেশনের ফলে ব্রেনের কর্মকাঠামোতে ঘটে কিছু স্থায়ী পরিবর্তন। এমিগডালা এবং বাম প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের এসব পরিবর্তনের ফলে তার মধ্যে মুহূর্তে রেগে যাওয়ার প্রবণতা কমে, বাড়ে মনোযোগ ও পরিকল্পনার দক্ষতা। মনে সুখানুভূতি সৃষ্টির সাথে সাথে সচেতনতা পায় এক ভিন্নমাত্রা। শুধু তা-ই নয়, ধ্যানের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ সমমর্মী এবং মমতাময় হয়ে ওঠে যা তার মস্তিষ্কের কর্মকাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটায়। গবেষণার মাধ্যমেই এর প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

ধ্যানাবস্থায় ব্রেনে আলফা ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি বিরাজ করে অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি থাকে প্রতি সেকেন্ডে ৮-১৩ সাইকেল। বিজ্ঞানীরা দেখেন, এই সাইকেলেই ব্রেন সবচেয়ে সুন্দরভাবে কাজ করে। সাধারণ কর্মতৎপর অবস্থায় ব্রেন থাকে বিটা লেভেলে। প্রতি সেকেন্ডে ব্রেনওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি থাকে ১৪-২৬ সাইকেলে। উত্তেজিত অবস্থায় ব্রেনওয়েভ থাকে গামা লেভেলে। আর তন্দ্রা ও নিদ্রার সময় ব্রেনওয়েভ থাকে যথাক্রমে থিটা লেভেলে ৪-৭ সাইকেলে ও ডেল্টা লেভেলে ০.৫-৩ সাইকেলে।

দরবেশ ও ঋষিরা ইচ্ছেমতো মুহূর্তে মনের ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি করতে পারতেন। ব্রেনওয়েভকে আলফা/থিটায় নিয়ে গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার পরিবর্তে হয়ে উঠতেন অতি সচেতন। চেতনা হয়ে উঠতো শাণিত। ব্রেনের ঐ ফ্রিকোয়েন্সিতেই তাদের চেতনা যুক্ত হতো দৃশ্যমান সবকিছুর পেছনে ক্রিয়াশীল প্রকৃতির নেপথ্য স্পন্দন ও ছন্দের সাথে। এ প্রক্রিয়ায় তিনি নিজের আত্মিক উন্নয়ন যেমন করতেন, তেমনি মানুষকে নিরাময় করতেন, বিপদমুক্ত করতেন, সাফল্য ও কল্যাণের পথে নিয়ে যেতেন।

প্রাচ্যের সাধকদের মনের শক্তি ব্যবহারের এ সূত্রগুলোই পাশ্চাত্যের সবকটি মন নিয়ন্ত্রণ ও মেডিটেশন পদ্ধতিতে কিছুটা হেরফের করে প্রয়োগ করা হয়েছে।

সাধকদের অনুসৃত ধ্যানাবস্থার ক্ষমতাকে প্রশান্তি, নিরাময় ও সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োগের সর্বশেষ সফল উদ্যোগ কোয়ান্টাম মেথড। গত ১৭ বছরে ৩০০টি কোর্সে ৩০০ বার একই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর মধ্য দিয়ে যার কার্যকারিতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত।

ব্রেন ওয়েভ প্যাটার্ন সারণি

	মোটামুটি ফ্রিকোয়েন্সি সীমা	প্রধান লক্ষণসমূহ
বাহ্যিক সচেতন অবস্থা স্থান-কালে সীমাবদ্ধ	**গামা** ২৭ সাইকেল ও তার বেশি	পুরোপুরি অনুসন্ধান চালানো হয় নি। ক্রোধ ও অতি উত্তেজিত অবস্থায় এটা ঘটে থাকে।
	বিটা ১৪-২৬ সাইকেল	সাধারণ জাগ্রত অবস্থা, সক্রিয় মন, পারিপার্শ্বিক চিন্তা, দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ, অস্থিরতা।
অন্তর্চেতনা অতিচেতনা প্রজ্ঞা স্থান-কাল দ্বারা সীমিত নয়	**আলফা** ৮-১৩ সাইকেল	মনের প্রশান্ত অবস্থা, শিথিল অবস্থা। মেডিটেশন ও শিথিলায়নে এই ওয়েভ বজায় থাকে এবং ভাবাবেগ বা কোনো ধরনের ক্ষোভ সৃষ্টি হলে এ ওয়েভে ছেদ পড়ে।
	থিটা ৪-৭ সাইকেল	গভীর নিদ্রার পূর্বাবস্থা। থিটা লেভেল হচ্ছে উচ্চস্তরের সৃজনশীলতা ও সচেতনতার স্তর। মেডিটেশন কালে সাধকরা আলফা থেকে থিটা স্তরে প্রবেশ করেই মহাচৈতন্যের (super consciousness) সাথে সংযোগ স্থাপন করেন।
অনন্ত চেতনা	**ডেল্টা** ০.৫-৩ সাইকেল	গভীর নিদ্রা। দরবেশ-ঋষিরা এ স্তরেও সজাগ থাকেন। আবার মহাচৈতন্যে লীন হতে পারেন।

প্রশান্তি আনন্দ ও সাফল্যের পথে

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণের আগে মনে থাকে নানা প্রশ্ন– এত টাকা দিয়ে কোর্স করছি উপকার পাবো তো? ধর্মের সাথে এর বিরোধ নেই তো? ১০ ঘণ্টা করে প্রতিদিন ক্লাস করতে পারবো তো? এরকম হাজারো সংশয়।

তারপর প্রতিদিনই তার সামনে উন্মোচিত হতে থাকে জীবনের সত্যগুলো। প্রাপ্তির তুলনায় কোর্স ফি-কে মনে হয় নেহায়েতই কম। নিজের অফুরন্ত সম্ভাবনার ওপর আস্থা বাড়তে শুরু করে। প্রত্যেকেই আফসোস করতে শুরু করেন– আরো আগে কেন শুরু করলাম না! নতুন বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে শুরু করেন জীবনের নতুন অভিযাত্রা– প্রশান্তি নিরাময় ও সাফল্যের পথে।

নিজের জীবন বদলের সাথে সাথে উদ্যোগী হন পরিবারের পরিচিতদের কোয়ান্টামের স্বাদ দিতে। এই বদলে যাওয়া হাজার হাজার মানুষের আন্তরিক প্রয়াসেই সম্পন্ন হয়েছে ৩০০ কোর্স। কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস সৃষ্টির নেপথ্য নায়ক এঁরাই। এঁদের মাত্র কয়েকজনের অনুভূতি সংযোজিত হলো এ অধ্যায়ে।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! ৮০ বছর বয়সেও আমি ভালো আছি ॥

সাহেরা খাতুন



বন্যাত্রাণ কার্যক্রমে ফাউন্ডেশনের স্যালাইন প্রকল্পে কাজ করছেন সাহেরা খাতুন

১৭ বছর আগে ১৯৯৩ সালে ষাটোর্ধ্ব বয়সে আমি আমার মেয়ে, জামাই, নাতনি, ভাইবিসহ পরিবারের মোট ৫ জনকে নিয়ে অংশ নিয়েছিলাম ১ম ব্যাচে। কোর্সে যে আলোচনাগুলো হতো সেগুলো সবসময় মেনে চলতাম। মেডিটেশন করতাম। ওয়ার্কশপসহ ফাউন্ডেশনের প্রতিটি প্রোগ্রামে যেতাম প্রতি সপ্তাহে। এজন্যে কোয়ান্টাম উৎসবে নিয়মিত অংশগ্রহণকারীর পুরস্কারও পেয়েছিলাম।

কোর্সে আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক কথা বলার যে শিক্ষা পেয়েছি, এ বয়সেও তা অনুসরণ করি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! তাই এই ৮০ বছর বয়সেও আমি ভালো আছি।

২০০৪ সালের বন্যার সময় ফাউন্ডেশনের স্যালাইন প্রকল্পে কাজ করেছি নাতি-নাতনির বয়সী প্রো-কোয়ান্টিয়ারদের সাথে। এখনো সুযোগ পেলেই যেকোনো সেবামূলক কাজে অংশ নিতে চেষ্টা করি যা আমাকে দেয় তৃপ্তি ও আনন্দ।

১ম ব্যাচে আমরা ছিলাম প্রায় ৩০ জনের মতো। আর এখন শুনলাম ৩০০ তম কোর্সে অংশ নিয়েছে হাজার জন। এটাই কোয়ান্টামের সফলতা। আজ আমি আনন্দিত ও গর্বিত। মানুষ কোর্স করে উপকৃত হচ্ছে। আমার মতো তারা তাদের পরিবারকেও অন্তর্ভুক্ত করছে এতে। যুগ যুগ ধরে এ কোর্স চলুক, সব মানুষ এ থেকে উপকৃত হোক এই কামনা করি।

[সাহেরা খাতুন, গৃহিণী, ১ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



আমি আবার মেডিটেশন শুরু করতে চাই

শমী কায়সার

কোয়ান্টাম মেথডের ৩০০ কোর্সপূর্তিতে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। লাখো মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এ কোর্স। আমিও এ কোর্সটি করেছিলাম। তবে আমি নিয়মিত হতে পারি নি। এজন্যে মাঝে মাঝে নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

আমার সাথে যারা কোর্স করেছিলেন আমি দেখেছি তাদের জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। খুব সুন্দরভাবে তারা তাদের জীবনে এর উপকার পেয়েছেন। আমার মনে হয়, মানুষের মধ্যে যে নেতিবাচক দিকগুলো আছে, জীবন চলার পথে যে বাধা আসে, সেটাকে শক্ত হাতে মোকাবেলা করা যায় মেডিটেশন জানা থাকলে।

মেডিটেশনের সবচেয়ে বড় উপকার হলো– এতে একজন মানুষের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। কোনো সমস্যাকেই আর সমস্যা মনে হয় না। এজন্যে যারা নিয়মিত করতে পেরেছেন আমি তাদের আবারো সাধুবাদ জানাই।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি নিজে যদি আবার শুরু করতে পারতাম! হয়তো করতেও পারবো। যারা এ পর্যন্ত ফাউন্ডেশন থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন তাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আর যারা এ ফাউন্ডেশনের পেছনে কাজ করছেন– গুরুজী, মা-জী– তারা যে সেবামূলক মানবতাধর্মী কাজগুলো করছেন, একজন বাঙালি হিসেবে আমি যে তাদের চিনি, এটাও আমার জন্যে একটা গর্বের বিষয়। তাদেরকে আমি এ সাফল্যের পুরো কৃতিত্ব দিতে চাই। আমি আবার মেডিটেশন শুরু করতে চাই।

[জনপ্রিয় টিভি অভিনেত্রী ও নির্মাতা শমী কায়সার, ৩য় ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

৩০০ তম কোর্স কোয়ান্টাম মেথডের সাফল্যের স্বাক্ষর

ড. কাজী মফিজুর রহমান



১৭ বছরে ফাউন্ডেশন একটি ইনস্টিটিউশনে পরিণত হয়েছে। মেডিটেশন এ ইনস্টিটিউশনের একটি অংশ। ফাউন্ডেশনের আত্ম উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি সৃষ্টির সেবামূলক কাজ– যেমন, কোয়ান্টাম শিশুকানন, শিশুসদন, ব্লাড প্রোগ্রাম– নিঃসন্দেহে মহতী উদ্যোগ ও প্রশংসার দাবিদার।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১ম ব্যাচের সদস্য আমি। কোর্স হয়েছিলো হোটেল সোনারগাঁও-এ। মাত্র ৩০ জন কোর্সটিতে অংশ নিয়েছিলাম আর এখন ৩০০ তম ব্যাচে অংশ নিচ্ছেন হাজার জন। এই যে মানুষের আগ্রহ, এত বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ– এটাই এ কোর্সের সাফল্যের স্বাক্ষর। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত হোক। ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত সকল সদস্য ও কর্মীর প্রতি আমার শুভ কামনা রইলো।

[অধ্যাপক ড. কাজী মফিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র প্রফেসর ও সাবেক পরিচালক, ১ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বছরের ৩৬৫ দিনই মেডিটেশন করা সম্ভব

কাজী রওনাক হোসেন



আমি খুব শুকরিয়ার সাথে বলতে পারি ৪র্থ ব্যাচে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার পর থেকে আজ অবধি একদিনের জন্যেও আমার মেডিটেশন মিস হয় নি। তা সময় কম হোক বা বেশি। কিন্তু বাদ দিই নি কোনোদিন। এর জন্যে আমার কিছু টেকনিক আছে আর তা হলো– মেডিটেশনকে আমি দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গে পরিণত করেছি। আমরা অনেক প্রস্তুতি নিয়ে মেডিটেশন করতে যাই, তখনই অজুহাত সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা না করে আমরা যদি এটা ভাবি যে, মেডিটেশন আমি দিনে অন্তত একবার করবোই, তা যখনই সুযোগ পাই। তাহলে বছরের ৩৬৫ দিনই মেডিটেশন করা সম্ভব।

[কাজী রওনাক হোসেন, দেশের সংগীত বিষয়ক একমাত্র নিয়মিত পত্রিকা সরগম-এর সম্পাদক। ৪র্থ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মেডিটেশনকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে

নাজিমুদ্দিন মোস্তান



ধ্যান বা মেডিটেশন নিয়ে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মহাজাতক উদ্ভাবিত কোয়ান্টাম মেথড নিয়ে কোনো প্রশ্ন শুনি নি। তিনি নিজে যেমন একজন সিদ্ধ পুরুষ। তার যোগাযোগ ও আধ্যাত্মিকতা তেমনি পুরোদস্তুর সিদ্ধ। তিনি ৩০০ কোর্স সমাপ্ত করেছেন। এ থেকে তার জ্ঞানের পরিধি ও অভিজ্ঞতা বোঝা যায়।

মেডিটেশন বা ধ্যান মানুষের শুধু বাহ্যিক বিষয়েই উন্নতি ঘটায় না; তার অভ্যন্তরীণ অনুভূতিকেও নাড়া দেয়। অন্তরের ভেতরে উন্নয়ন ঘটায়। সাংবাদিকতাসহ সব পেশার মানুষই মেডিটেশন চর্চা করে জবস্ট্রেস দূর করতে পারেন। পারেন জীবনের নানা ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে। মেডিটেশনকে মানুষের ঘরে ঘরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। একে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

[নাজিমুদ্দিন মোস্তান। ২০০৩ সালে সাংবাদিকতায় একুশে পদকপ্রাপ্ত এ সাংবাদিক বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন। ১৯৯৩ সালে শিথিলায়ন ক্যাসেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ওপর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্টটি তারই লেখা। তিনি ১ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মনের আবর্জনা পরিষ্কারের উপায় মেডিটেশন

ড. শওকত আরা হোসেন



পেশাজীবনে একজন মানুষের পরিতৃপ্তি যেমন থাকে তেমনি থাকে কিছু বঞ্চনা, দুঃখজনক ঘটনা। এমন অনেক কাজ আমাদের করতে হয় যে কাজগুলো আমরা পছন্দ করি না। কিন্তু তারপরও করতে হয়।

এ যাতনা, এ বিড়ম্বনা মনের মধ্যে পুষে রাখলে আমরা প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবো না। কাজেই এগুলো বের করে দেয়া প্রয়োজন। আর মনের এ আবর্জনা পরিষ্কারের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে মেডিটেশন। মেডিটেশনকে একটি পদ্ধতি হিসেবে কোয়ান্টামই আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি প্রচার করেছে। এজন্যেই কোয়ান্টামের এত বিস্তৃতি।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন, ১ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মহাজাতকের পদ্ধতিটি আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে

প্রয়াত কবি শামসুর রাহমান



বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি প্রয়াত শামসুর রাহমান অংশ নিয়েছিলেন কোয়ান্টাম মেথডের ২৭ তম ব্যাচে। কোর্স নিয়ে তার অনুভূতি ছিলো :

'বেশ কিছুদিন আগে আমারই বয়েসী এক সাংবাদিক বন্ধু আমাকে এ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে বলেছিলেন। সেসময় আমি কথাটার তেমন গুরুত্ব দিই নি। কিন্তু এখন বিশ্বাস করছি, এটি আগে করতে পারলে বহু রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারতাম।'

তিনি আরো বলেন, 'মহাজাতকের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে। মহাজাতকের বলার ভঙ্গি এতই মুগ্ধকর যে, মাঝে মাঝে কবিতা শুনছি বলে মনে হয়েছে। মনছবি এমন এক ধারণা যা প্রতিটি সৃজনশীল কাজে অনায়াসে প্রয়োগ করা যেতে পারে।'

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও অনুভব করেছি গুরুজীর দোয়া

খায়রুল আনোয়ার মুকুল



১৭ বছর আগে যখন কোর্স করতে আসি, তখন অনেক দ্বিধা, প্রশ্ন ছিলো। কিন্তু ৪ দিন পর আমিসহ অন্য সবারই অভিমত ছিলো যে, একটা নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছি। সেই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানসিকভাবে আমি গুরুজী এবং ফাউন্ডেশনের সাথে সবসময়ই একাত্ম। ২০০৬ সালে কাওরান বাজারের যে ভবনটিতে আমার কর্মস্থল, সেখানে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। ১১ তলার ছাদে প্রায় ৪ ঘণ্টা আমরা বেশ কয়েকজন অবরুদ্ধ ছিলাম। সেই দুঃসময়েও অনুভব করেছি গুরুজী এবং কোয়ান্টাম পরিবারের দোয়া। আল্লাহর রহমতে বেশ ভালোভাবেই সবাইকে নামিয়ে সবশেষে নেমে এসেছিলাম আমি।

বান্দরবানের লামায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্যে যে শিশুকানন করা হয়েছে সেখানে আমি দুবার গিয়েছি। পাহাড়ের বুকে এরকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বিশাল ব্যাপার। সত্যিকার শিক্ষিত জাতি গড়তে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই কোয়ান্টাম করছে লামায়।

[খায়রুল আনোয়ার মুকুল, এনটিভির প্রধান বার্তা সম্পাদক, ২য় ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ইতিবাচক চিন্তা সাধারণ প্রতিভাকে কালজয়ী করে



কাজী ফজলুর রহমান

আমি দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনেক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। দেখেছি, যারা সফল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত তাদের দু-একজন ছাড়া অন্য সবাই সাধারণ প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা, আত্মবিশ্বাসের জন্যেই তারা সফল হয়েছেন। আবার এর উল্টোটাও সত্য। অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি নেতিবাচক ও অগোছালো চিন্তাভাবনার কারণে কিছুই করতে পারেন নি। আমার এ স্বীকারোক্তির মধ্যে গ্লানি নেই যে, ব্যর্থতা গ্লানি বা সমালোচনার ভয়ে জীবনে অনেক ভালো কিছু, বড় কিছু করতে পারি নি। তরুণ বয়সে কোয়ান্টাম মেথডের মতো ইতিবাচক চিন্তার প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পেলে সমাজকে কিছু দিয়ে যেতে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস।

[কাজী ফজলুর রহমান বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য এবং রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। 'শিকড়' নামে এক অসাধারণ কথাসাহিত্যের তিনি স্রষ্টা। ১৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

যেন খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পাওয়া এক বটগাছ

দন্তস্য রওশন

ছোটবেলায় বড়রা আমাদেরকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্যে যেমন বলতেন– ওঠ, জাগ, আর কত ঘুমাস। আমার মনে হয়, কোয়ান্টামও যেন এভাবে আমাদেরকে সারাজীবনের জন্যে জাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। বলে, তুমি জাগো! চোখ মেলে দেখ! জীবনটা তুমি একবারের জন্যেই পেয়েছো। যা কিছু কাজে লাগানোর তার সুযোগ এ জীবনেই। কেন শুধু দুঃখ-কষ্ট বয়ে বেড়াবে। তার চেয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়।

কোয়ান্টামের বই পড়ে আমি প্রথম আগ্রহবোধ করেছিলাম। তখন কোনো একটা কারণে কিছুটা হতাশায় ভুগছিলাম– দেখলাম প্রশান্তি আসছে। এরপর আমি যখন মেডিটেশন করলাম তখন মনে হলো যে, অনেক কিছু থেকে মুক্ত, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। তবে শুধু প্রশান্তি না, কোয়ান্টাম নিজেকে চিনতে, জানতে, নিজের ভেতরের অঢেল সম্পদের ভাণ্ডারে চোখ মেলে তাকাতে সাহায্য করে। দুঃখ বেদনা হতাশা গ্লানি অপরাধ– এর বাইরেও যে বড় কিছু থাকতে পারে তা তুলে ধরে।

কোয়ান্টামের যে সঙ্ঘশক্তি– এ সঙ্ঘশক্তির মধ্যে যারা থাকে তারা বরাবরই ভালো থাকে বলে আমার ধারণা। কারণ সৎসঙ্ঘ মানবজীবনের ওপর বড় ভূমিকা রাখে। আজকাল পরিবারগুলো যান্ত্রিক হয়ে গেছে। বাবা-মার কাছ থেকে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছে ছেলে-মেয়েরা। স্কুল-কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– সেটাও স্বল্প সময়ের জন্যে। এর বাইরে তার যে জীবন সে জীবনে যদি একটা ভালো সঙ্ঘ বা সভার প্রভাব থাকে তাহলে সে অনেক পরিশুদ্ধ, ঋদ্ধ, আলোকিত মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। কোয়ান্টামে আমরা সে আলোই পাচ্ছি।

এখন মানুষের যাওয়ার কিন্তু কোনো জায়গা নেই। একটা ভালো সিনেমা হল নেই, মাঠ নেই, পাড়া-মহল্লায় আগে যেরকম লাইব্রেরি বা নানা ধরনের সঙ্ঘ ছিলো সেসব নেই। কিন্তু আমাদের যাওয়ার অনেক অনেক জায়গা দরকার। কোয়ান্টামকে বলা যেতে পারে মানুষের যাওয়ার একটা জায়গা, একটা ভালো প্লাটফরম যেখানে



অজস্র মানুষ যাচ্ছে। কোর্সে যাচ্ছে, আলোকায়নে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিড় করছে। জীবনে চলার পথে যা যা করণীয়, তার একটা পথ-নির্দেশ সে পাচ্ছে এখানে। এই যেতে পারি বলেই আমরা ভালো থাকি। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পাওয়া একটা বটগাছের মতোই কোয়ান্টাম, ক্লান্ত-শ্রান্ত পথিককে দেয় প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য আর সাফল্যের সুবাতাস।

[দন্তস্য রওশন, সিনিয়র সাব এডিটর, দৈনিক প্রথম আলো; সাধারণ সম্পাদক, প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ এবং দন্তস্য রওশন নামে অনুকাব্য লিখে খ্যাতি অর্জনকারী, ২৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পারফরমেন্স ভালো হচ্ছে

সোহানা সাবা



আমি খুব চঞ্চল মেয়ে। কোর্সে ৪ দিন এক জায়গায় বসে থাকার কথা শুনে ভেবেছিলাম, প্রথম দিন করার পর আর হয়তো আমি যেতে পারবো না। কিন্তু কোর্সের প্রথম আধঘণ্টা গুরুজীর কথা শুনেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এখনও সেই মুগ্ধতাটা আমার মধ্যে এমনভাবে বিরাজ করছে যে, যখনই আগামী কোনো কোর্সের কথা শুনি– মনে হয়, আহা, যদি রিপিট করতে পারতাম! আমার মনে হয়, গুরুজীর আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের কারণেই এ মুগ্ধতা।

মেডিটেশন করার পর অভিনয়ে এখন আমি অনেক বেশি কনসেনট্রেট করতে পারি। আগে একটা চরিত্রে ঢোকার আগেই হুট করে বেরিয়ে যেতাম– আবার সাবা হয়ে যেতাম। দেখা যেতো যে, লাফালাফি করছি, গল্প করছি। পরেরবার ঐ চরিত্রটা ধারণ করতে আমার অনেক সময় লাগতো। ফলে পারফরমেন্স ভালো হতো না। এখন আমি এটা খুব ভালো করতে পারি।

যেমন, চন্দ্রগ্রহণ ছবির একটা উদাহরণ দেই। ছবির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দৃশ্য ছিলো এরকম– যখন আমার প্রেমিকের বাবা দাবি করছেন যে, তিনিও আমার বাবা– তা শুনে আমার রি-অ্যাকশন। দৃশ্যটিকে আমি মেডিটেটিভ লেভেলে অনুভবের চেষ্টা করলাম। অভিনয়ে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম– সত্যি সত্যি চম্পা আপা (অভিনেত্রী চম্পা এ ছবিতে আমার মায়ের ভূমিকায় ছিলেন) যেন আমারই মা এবং তার সাথে এত খারাপ ব্যাপারটা করা হয়েছে। এ ঘটনার জন্যে দায়ীদের প্রতি আমার ক্ষোভ-ঘৃণার এত বাস্তবানুগ অভিনয় করতে পারলাম যা চরিত্রটি দাবি করে।

মাঝখানে কাজের চাপে বা অন্যান্য কারণে প্রচণ্ড রেগে যাওয়া বা ভাঙচুর করার ব্যাপারটা যখন ছিলো তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, মেডিটেশন করতে হবে। এখন আমি অনেক উত্তেজনা ও ইমোশনকে কন্ট্রোল করতে পারি।

বিশ্বাস করলে হবে, এটাই আমার বিশ্বাস। একবার ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে চ্যানেল ওয়ানের একটা লাইভ অনুষ্ঠানে যাবো। রাত ১২টায় অনুষ্ঠান। উত্তরায় আমার শুটিং থেকে রওনা দিয়েছি রাত ১০টায়। রাস্তায় এমন অবস্থা যে, ১৫ মিনিট মাত্র বাকি, অথচ গুলশানের পথে অর্ধেকও ততক্ষণে যেতে পারি নি। এদিকে টিভির স্ক্রলে আমাদের নাম দেখানো হচ্ছে। কী বিব্রতকর অবস্থা! আমার হাজবেন্ড মুরাদ ওদেরকে বললো, আমরা আসতে পারবো না। অন্য অনুষ্ঠান চালিয়ে দিন। আমি বললাম– দেখো, আমরা ঠিক যেতে পারবো। মনে মনে কোয়ান্টা ধ্বনি করতে লাগলাম এবং আমরা পৌঁছেছিলাম ঠিকসময়েই।

[অভিনেত্রী সোহানা সাবা, আয়না চলচিত্রের জন্যে মেরিল প্রথম আলো তারকা জরিপে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেছেন, ২৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বিশ্বাসের কথা জানাতে হবে

আহমেদ নূরে আলম



কোয়ান্টামের যাত্রা যখন শুরু হয় সৌভাগ্যক্রমে আমি তাতে শরীক হতে পেরেছিলাম। যখন সমাজের বেশিরভাগ মানুষই নেতিবাচক চিন্তায় আচ্ছন্ন তখন এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কাজটাই কোয়ান্টাম করছে। খুব ক্ষীণ হলেও সমাজে একটা পজিটিভ স্পন্দন অনুভব করছি। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে চেতনার একটা ভবন নির্মাণ আমরা দেখে যেতে পারবো। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের তিনটি কর্তব্য পালন করা উচিত বলে মনে হয় আমার। এক, দিনে যতটুকু সময়ই হোক নিজের সাথে সংযোগ অর্থাৎ মেডিটেশন করতে হবে। দুই, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তিন, প্রথম সুযোগেই নিজের চেতনার কথা, বিশ্বাসের কথা অন্যকে জানাতে হবে।

[বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী প্রবীণ সাংবাদিক আহমেদ নূরে আলম, ১ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমার তো মাত্র একটি সিটই দরকার

সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুহু



যখন বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, সে সময় একদিন গুরুজীর সাথে দেখা। মাত্র ২৮টি সিটের জন্যে হাজার হাজার প্রতিযোগীর ভিড়ে চান্স পাবো কীভাবে বলতেই তিনি খুব বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, '২৮ সিট নিয়ে তুমি ভাবছো কেন! তোমার তো দরকার মাত্র ১টি। মনছবিতে সেই ১টি নিজের জন্যে রেখে বাকিগুলো অন্যদেরকে দিয়ে দাও।' সাথে সাথেই আমার মনে হলো, সত্যিই তো! আমার তো মাত্র একটি সিটই দরকার এবং আমি তা পাবো। মনছবি করলাম। এখন আমি আমার মনছবিরই বাস্তবায়িত অবস্থানে আছি।

কোয়ান্টামের যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে এটি আমাদের সমাজের অস্থিরতাগুলোকে দূর করতে পারে। এখন সময় এসেছে জেগে ওঠার। যেমন, আমার বাবা কবি ফররুখ আহমদ বলেছিলেন– 'ঘুম থেকে তুমি উঠে এসো কারিগর ॥ চল একসাথে তুলে নিই হাতে পাহাড় গড়ার ভার।'

[সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুহু, সহকারী অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, ২য় ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মাত্র ১১ জনকে নিয়ে হয়েছিলো পায়োনিয়ার ব্যাচের যাত্রা

নায়লা শাম্‌স চৌধুরী



মাত্র ১১ জনকে নিয়ে পায়োনিয়ার ব্যাচের মধ্য দিয়ে গুরুজী শুরু করেছিলেন যে প্রক্রিয়া তা আজ লক্ষ মানুষের জীবন বদলে দিচ্ছে– ভাবতেই ভালো লাগে!

মেডিটেশনকে কাজে লাগাবার বহুবিধ সুযোগ আমার প্রবাস জীবনে ঘটেছে। পড়াশোনা থেকে শুরু করে এখন আমি অস্ট্রেলিয়ায় যে যোগ্যতা ও সুনামের সাথে কাজ করছি তার সবই সম্ভব হয়েছে মেডিটেশনের ফলে।

[পায়োনিয়ার ব্যাচের গ্রাজুয়েট নায়লা শাম্‌স চৌধুরী, স্বামী ৫ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট ওমর ফারুক এবং দুই কন্যাকে নিয়ে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী]

মন থেকে বলতে পারি শোকর আলহামদুলিল্লাহ

মুনিমা সুলতানা



১৯৯৩ সালে যখন সাংবাদিকতায় প্রবেশ করি তখন থেকেই নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষত নারী হওয়ায় সহপাঠী, সহকর্মী ও পরিবারের সদস্য– সবার কাছ থেকেই নেতিবাচক মন্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি। এসব কারণে অস্থিরতা বোধ করতাম। মানসিক চাপ অনুভব করতাম। মেডিটেশনের মাধ্যমে এসব চাপ মোকাবেলা করতে পারছি। হতাশা, হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। কাজের স্বীকৃতি না পেলে বা কারও নেতিবাচক আচরণের মুখে এখন থাকতে পারি অনেক সহজ ও শান্ত। বলতে পারি, শোকর আলহামদুলিল্লাহ।

[মুনিমা সুলতানা, সিনিয়র স্টাফ করেসপনডেন্ট, ডেইলি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ব্যতিক্রমী হতে গেলে কষ্ট স্বীকার করতে হয়

নাসিমুল কাদের উলফাত



পায়োনিয়ার ব্যাচে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলেও ব্যস্ততার কারণে ৩য় ব্যাচে অংশ নিয়েছিলাম। কিন্তু সেসময় মেডিটেশনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের তেমন ধারণা না থাকায় 'পাগল' সম্বোধন শুনতে হতো। অবশ্য ভালোই লাগতো। কারণ তখন মনে করতাম ব্যতিক্রমী হতে গেলে পায়োনিয়ারদের কিছু কষ্ট স্বীকার করতেই হয়।

মেডিটেশন ও ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম থেকে আত্মবিশ্বাস ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার যে মানসিক দৃঢ়তা আমি পেয়েছি তা আমার ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। ফাউন্ডেশনের সাথে আমার এ বন্ধন আমৃত্যুর।

[নাসিমুল কাদের উলফাত, ব্যবসায়ী, ৩য় ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জ্বলে উঠেছে শত প্রদীপ

ফরিদা হোসেন



অনেকটা কৌতূহলের বশে যোগ দিয়েছিলাম কোয়ান্টামের অষ্টম ব্যাচে। বিস্ময়করভাবে কেটে গেল চারটি দিন। অন্যরকম এক আনন্দ পাওয়ায় মনে হচ্ছিলো দিগ্বিজয় করার সম্ভাবনা সমাগত। আমার পক্ষে এখন আর কিছুই অসাধ্য নয়।

কোয়ান্টাম মেথডের স্বপ্নদ্রষ্টা গুরুজী শুরু করেছিলেন একটি প্রদীপ হাতে। এখন জ্বলে উঠেছে শত শত প্রদীপ। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর থেকে গভীরতর অঞ্চল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অজস্র তারার মালার মতো জেগে উঠেছে অসংখ্য আলোকিত মুখ। এক একটি সম্ভাবনাময় উদ্ভাসিত ব্যক্তিত্ব। এ আনন্দলোকের অভিযাত্রায় সবাইকে অভিনন্দন।

[একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখিকা ফরিদা হোসেন, ৮ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমি ক্রমাগত সুন্দরের দিকে এগিয়ে যাই

কবি আবদুল হাই শিকদার



মহাজাতক আমাকে অনন্য, অসাধারণ, অনাস্বাদিত, অবর্ণনীয়, অনির্বচনীয়, সবুজ, শ্যামল, সজল, শান্ত, স্নিগ্ধ, প্রাণপঙ্কময় প্রাণবন্ত এক অভিজ্ঞতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন মেডিটেশনের মাধ্যমে। তার কাছে আমার অশেষ ঋণ।

এ হলো এমন এক পুলক, এমন এক জোছনা– যার প্রতিটি কণা মমতার রেণু দিয়ে বোনা। এই রেণুর মায়ায় আমার দিন যায়, রাত যায়। আর আমি ক্রমাগত সুন্দরের দিকে এগিয়ে যাই। সাফল্য আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমি একের পর এক উপত্যকা পার হয়ে যাই, আর আত্মশক্তির অভূতপূর্ব জাগরণের ঢেউয়ে দুলে উঠি। ফলে উঠি।

[একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি আবদুল হাই শিকদার প্রবীণ সাংবাদিক, কলামিস্ট এবং নজরুল ইনস্টিটিউট-এর সাবেক নির্বাহী পরিচালক, ২২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জীবন যতটা বদলেছে

সীমান্ত খোকন

নিজের বদলে যাওয়াটা যখন অন্যের মুখে শুনি তখন বেশ ভালো লাগে। ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরে সস্ত্রীক কোর্স করার আগের দিন পর্যন্ত আমি ছিলাম নানা সমস্যায় জর্জরিত। আর কোর্স করার ৯ মাস পর এ অনুভূতি যখন লিখছি, তখন এসব অনেক সমস্যা থেকেই আমি মুক্ত।

আমার অন্যতম শারীরিক সমস্যা ছিলো ব্যাকপেইন। পিঠের ব্যথায় সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠতাম প্রায় প্রতিদিন। একসময় কোমর হয়ে পায়ের গিরায় সংক্রমিত হলো এ ব্যথা। ঢাকার কয়েকজন বড় ডাক্তার দেখিয়েছি অনেকবার। অনেক টেস্ট। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ। আতঙ্ক। অস্থিরতা।

ডাক্তার বললেন, ইউরিক এসিড আমার শরীরে অনেক বেশি। একাধিক ডাক্তারও আমাকে আশ্বস্ত করতে পারলেন না পুরোপুরি সুস্থ হতে পারবো কি না। এর সাথে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা তো আছেই। হাতের কাছে সবসময় সেকলো-২০, নিউটেক, রেনিটিড থাকতোই। অফিসের ড্রয়ার, ব্যাগ, বাসার কৌটা কোথায় নেই।

মহল্লার ফার্মেসির লোকজন ছিলো আমার নিকটাত্মীয়ের মতো। আর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের একদল ডাক্তার তো আমার বন্ধুই হয়ে গেল ঘন ঘন তাদের দ্বারস্থ হওয়ার জন্যে। আল্লাহর রহমতে সেপ্টেম্বরে কোর্স করার পর থেকে সবরকম ওষুধকে গুডবাই করেছি। কেবল হলি ফ্যামিলির বন্ধুরাই নয়, মহল্লার ওষুধের দোকানিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক টানাপোড়েন হওয়ার মতো। কোর্স করার পর আমি এক টাকার ওষুধও সেবন করি নি। গ্যাস্ট্রিকের ওষুধগুলো ফেলে দিয়েছি ডাস্টবিনে। পিঠের ব্যথায় নয়– আমি এখন সকালে শান্তির ঘুম ঘুমিয়ে উঠি। ডাক্তারের নির্দেশমতো ব্যায়াম করি। ফজরের নামাজ ও মেডিটেশন করি। দিন শুরু হয় বেশ ভালোভাবে।



সস্ত্রীক সীমান্ত খোকন

কোর্সের নির্দেশনার আলোকে আমার পরিবারে খাবার-দাবারের তালিকাতেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। আজেবাজে খাবার বাদ দিয়ে সবজি, ডিম, মাছ ইত্যাদি খাচ্ছি রুটিনমতো। বাইরের দুধ-চা, কনডেন্সড মিল্ক, ফাস্ট ফুড, প্যাকেটজাত খাবার, কোমল পানীয়, সিগারেট, ড্রিংকস বাদ দিয়েছি। দেশি ফল খাওয়ার চেষ্টা করি। রুটিনমতো খাওয়ায় আমার খাবারের বাজেট নেমে এসেছে অর্ধেকে। যেখানে আগে মাসে ৬ হাজার টাকার বাজার করতাম, সেখানে এখন ৩ থেকে ৪ হাজার টাকায় চলে যাচ্ছে।

আমাদের একমাত্র ছেলে কাব্যকে চিপস, কোল্ড ড্রিংকস, প্যাকেট জুস, গুঁড়ো দুধ, হরলিক্স, চকলেটসহ প্যাকেজ খাবার দিচ্ছি না। যেসবের জন্যে আমাকে মাসে বাজেট করতে হতো ২/৩ হাজার টাকা। টাকাগুলো বেঁচে যাচ্ছে। কাব্যও আমাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে নিজেকে। মেডিটেশন করার পর আমি সাবান পেস্ট পারফিউম শেভিং ক্রিম ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশজ পণ্য ব্যবহার ও সংযমী হয়েছি। বাসায় এরোসল ব্যবহার করছি না। এসি কম চালাচ্ছি। এসব দিক দিয়েও আমার প্রচুর সাশ্রয় হচ্ছে যার একটা অংশ দিতে পারছি মাটির ব্যাংকে।

কোর্স করার পর এ পর্যন্ত দুবার রক্ত দিয়েছি। ৩৭ বছর পর জীবনে প্রথম রক্তদান করে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমনি আফসোস করেছি এতদিন কেন মানবসেবার এই সহজ কাজটি থেকে বঞ্চিত ছিলাম। অনেক চেষ্টা করেও দীর্ঘদিন যা সম্ভব হয় নি, মেডিটেশন কোর্স করার পর গত বইমেলায় আমার উপন্যাস বের করতে পেরেছি। আগে শুক্রবার ছাড়া নামাজ হতো না। কোর্স করার পর ৫ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত পড়ছি। অনেকসময় মনে হয় আমার চাওয়ার চেয়ে পাওয়া অনেক বেশি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! বেশ ভালো আছি।

[সীমান্ত খোকন, বিশেষ প্রতিনিধি, আরটিভি, ২৭৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



বাবা মরহুম প্রকৌশলী এ কে এম আনিসুর রহমানের সঙ্গে

বাবা যে টাকা দেখে যেতে পারেন নি

দিমা নেফারতিতি

আমাকে কোয়ান্টাম মেথডের সন্ধান দিয়েছিলেন আমার বাবা। প্যারালাইসিসে আক্রান্ত তিনি জীবনের শেষ ৪টি বছর কোয়ান্টামের সঙ্গে ভীষণ রকম জড়িয়ে ছিলেন। রংপুর থেকে নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রাখতেন। এমনকি আইসিইউ-তে থাকার সময়ও মেডিটেশন করেছেন। বাবার কিছু অভাবনীয় পরিবর্তন– যেমন, অসম্ভব দৃঢ় মনোবল, রাগী স্বভাব বদলে যাওয়া ইত্যাদি আমাকে কোর্স করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো।

তখন নানা কারণে খুব অস্থির ছিলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কোর্সের রেজিস্ট্রেশনের জন্যে যেদিন প্রথম ফাউন্ডেশনে আসি সেদিনই অদ্ভুত একটা প্রশান্তিতে আমার মন ভরে গিয়েছিলো। কোর্সের পর এখন আমি সাহস, মানসিক প্রশান্তি, বিচক্ষণতা সবকিছু মিলিয়ে খুব ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে পারছি।

মাটির ব্যাংক এবং হিলিং-কে ম্যাজিকের মতো মনে হয় আমার। কিছুদিন আগে এরকমই একটি সাফল্য পেয়েছি। ১০ বছর আগে আমার বাবা চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর তার সৎ উপার্জনের সমস্ত সঞ্চয় ২২ লাখ টাকা এক বন্ধুর ফার্মে বিনিয়োগ করেন। কথা ছিলো তিন মাস পর ফেরত দেবেন। কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্তও বাবা সে টাকা দেখে যেতে পারেন নি। এই টাকার টেনশনেই তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন। একজন সৎ মানুষের শেষ বয়সের সমস্ত সম্বল খোয়া গেলে যে অবস্থা হয়, গত ১০টা বছর ধরে আমাদের পরিবার ছিলো তার ভুক্তভোগী।

বাবা মারা যাওয়ার পর আমি মাটির ব্যাংকে মানত করি এবং হিলিং-এ নাম দেই যেন টাকাটা ফেরত পাই। আল্লাহর অশেষ রহমতে ছয় মাসের মধ্যে পুরো টাকা ফেরত পাই। এখন আমার মনে হয় আমি একা নই– এক বিশাল কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য। এখানে এলেই প্রশান্তির সন্ধান পাই।

[দিমা নেফারতিতি, সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার, এটিএন বাংলা এবং প্রভাষক-ইউডা, ২৫৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রতিনিয়ত ধ্যানী মানুষে পরিণত হতে হবে



কবি মুহাম্মদ নুরুল হুদা

আমরা সবাই কম-বেশি ধ্যানের জগতে যাই। কিন্তু বিক্ষিপ্ত মনের কারণে সেই জগতে আমরা প্রলম্বিত সময়ের জন্যে থাকতে পারি না। এই মনটাকে নিজের ভেতরে এনে এর ওপর সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারের জন্যেই ধ্যান।

এখানে আসার আগে আমার ব্যক্তিগত-পারিবারিক জীবনের কিছু ঘটনা আমাকে একটু বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিলো। আমার স্ত্রী ৪০ বছর ধরে মাইগ্রেনে ভুগছিলেন। আমি হোমিওপ্যাথি করি। তার মাইগ্রেন ভালো করার জন্যে আমিও চেষ্টা করেছি। কিন্তু সাময়িক উপশম হলেও পুরোপুরি ভালো হয় নি। অথচ কোর্সের ৪ দিনে আমার স্ত্রী বুঝতেই পারেন নি কখন তার মাইগ্রেন সেরে গেছে। এখন পর্যন্ত তার মাইগ্রেন আর সেই ভয়াবহ রূপে ফিরে আসে নি।

আমি ধ্যানকে কাজে লাগিয়েছি লেখালেখির ক্ষেত্রে মনকে সংবদ্ধ করতে। এমনকি শারীরিক অস্বস্তিকেও আমি এভাবে নিরাময় করতে পারি। আর সৃজনশীলতার জন্যে তো ধ্যানের বিকল্প নেই। আমি মনে করি সমাজটাকে পাল্টাতে হলে মানুষকে তার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে প্রতিনিয়ত ধ্যানী মানুষে পরিণত হতে হবে।

[জাতিসত্তার কবি মুহাম্মদ নুরুল হুদা, ১৫৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মেডিটেশন প্রয়োজনীয় মনোযোগ বাড়ায়

আলিফ



আমি প্রায় ১০ বছর ধরেই রহস্য পত্রিকায় মেডিটেশনের কথা পড়তাম। গুরুজীর বই কিনে মেডিটেশনের চেষ্টাও করতাম। কিন্তু ঠিক সেভাবে হতো না। কোর্স করে বিস্তারিত শেখার সুযোগ হলো। একটা বিষয় বুঝলাম মেডিটেশন করলে আমার যেটা প্রয়োজন, সেটাতেই আমি কনসেনট্রেট করতে পারবো। যেগুলো আমার প্রয়োজন নেই যেমন, রাগ-ক্ষোভ-হিংসা-বিদ্বেষ এগুলো থেকে মুক্ত থাকতে পারবো।

ঐ সময় আমি একটা বিষয়ে খুব আপসেট ছিলাম। সেটা থেকে বের হয়ে নিজেকে গুছিয়ে নিতে মেডিটেশন আমাকে সাহায্য করেছে। নিজেকে জানার বোঝার নিয়ন্ত্রণ করার একটি কার্যকরী টেকনিক হলো মেডিটেশন– যেটা কোয়ান্টাম মেথড খুব ভালোভাবে শেখায়।

[উপস্থাপক, মডেল ও অভিনয়শিল্পী আলিফ, ২৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিজে ভালো থাকার জন্যেই এ সঙ্ঘ

মেজর (অব.) কামাল রেজা



ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সরকারি চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করলাম। কিন্তু জটিলতা ক্রমশ বাড়তে লাগলো। কোর্স করে মনে হলো, পানিশূন্যতায় অসুস্থ একজন রোগীর শিরায় স্যালাইন প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনে যেমন প্রাণচাঞ্চল্য বাড়তে থাকে, আমিও তেমনি নতুন সম্ভাবনার খোঁজ পেলাম। বিশ্বাস করতে শুরু করলাম মানুষ হিসেবে নিজের এবং অন্যের প্রতি অনেক দায়িত্ব আমার রয়েছে। আসলে অন্যের জন্যে কিছু করার মধ্যেই নিজের জীবনকে ভালবাসার উপকরণ নিহিত। তাই স্রেফ ভালো থাকার জন্যেই এই সঙ্ঘকে বেছে নিয়েছি।

[মেজর (অব.) কামাল রেজা, ব্যবসায়ী, ২১০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মানুষ যা ভাবতে পারে,
যা বিশ্বাস করতে পারে,
তা অর্জন করতে পারে।

মেডিটেশন মনের বদ্ধ দরজা খুলে দেয়

ইঞ্জিনিয়ার শাফাত খৈয়াম



ব্যক্তিগত জীবনে একজন প্রকৌশলী, কবি ও গীতিকার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে মেডিটেশন আমার চিন্তাকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। ডিজাইনের ক্ষেত্রে বা গানের থিম, সুর ও বিন্যাসের কোনো কাজে যখনই আটকে যেতাম, কিছুসময় মেডিটেশন করলে অনুভব করতাম যেন দরজা খুলে গেল। সামনে এগুনোর পথ পেতাম।

পেশাগত জীবনে প্রতিনিয়ত যে সিদ্ধান্তগুলো নিতে হয়, সেক্ষেত্রেও মেডিটেশন প্রয়োগ করে উপকৃত হয়েছি। কোয়ান্টাম মেথডের ৩০০ তম কোর্স সম্পন্ন হওয়া থেকেই বোঝা যায় জীবন সুন্দর করার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে।

[ইঞ্জিনিয়ার শাফাত খৈয়াম, ১ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ঋণ জর্জরিত অবস্থা থেকে প্রাচুর্যের শীর্ষে

ইনামুল হক খান

অনন্ত গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ ছিলো আমার ভগ্নিপতির প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৩ সালে তিনি আকস্মিকভাবে নিহত হওয়ার পর এক চরম দুঃসময়ে আমাকে এর হাল ধরতে হয়। ১৯৯৬ সালে স্ত্রী এবং বোনকে নিয়ে আমি যখন কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি তখন অনন্ত গ্রুপ ঋণে জর্জরিত।

আগে আমি কিছুটা বদমেজাজী ছিলাম, কোর্স করার পর একেবারেই ঠান্ডা মাথার মানুষে পরিণত হলাম। আগে আমার সামনে কোনো লক্ষ্য ছিলো না। যখন যা ইচ্ছে হতো, তখন তা-ই করতাম। এই প্রথম ভেবেচিন্তে লক্ষ্য স্থির করতে শিখলাম– যাকে কোয়ান্টামের ভাষায় বলা হয় 'মনছবি'।

সেই থেকে অনন্ত গ্রুপকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয় নি। ১৯৯৮ সালের মধ্যে সব ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। অনন্ত ফ্যাশন, অনন্ত স্পোর্টস ওয়্যার– যোগ হতে থাকে একের পর এক নতুন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এলিফেন্ট রোডের ছোট্ট কারখানা ছেড়ে চলে আসি আশুলিয়ায় ৯ তলা কারখানায়, যার একেকটি তলা-ই ৪৪,০০০ বর্গফুটের।

ক্রমাগত এ সাফল্যের অন্যতম চালিকাশক্তি কোয়ান্টাম। নিজে কোর্স করার পর যাদের নিয়ে কোম্পানির ভবিষ্যৎ কল্পনা করছিলাম তাদেরও ধীরে ধীরে কোর্স করতে উদ্বুদ্ধ করি। রক্তদান ও মাটির ব্যাংকে উৎসাহিত করি। যাদেরকেই কোম্পানির খরচে কোর্স করতে সাহায্য করেছি তারা সবাই পরবর্তীতে কোম্পানির সম্পদে পরিণত হয়েছে। তাদের অনেকেই এখন নিজেরাই একেকটি শিল্প কারখানার মালিক।

আমরা কোম্পানিতে নিয়মিত যৌথ মেডিটেশন করি। গার্মেন্টস ব্যবসায় সবচেয়ে টেনশন বেশি যখন ক্রেতারা পরিদর্শন করতে আসেন। অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়ার পর অর্ডার বাতিল হলে বড় ক্ষতি হয়ে যায়। এরকম সম্ভাবনা দেখা দিলেই আমরা মেডিটেশন করি। এরপর ক্রেতার সাথে নেগোসিয়েশনে বসি। তখন ক্রেতাকে বোঝানো খুব সহজ হয়।

পরিণতিতে স্বীকৃতি ও সম্মান এসেছে একের পর এক। ২০০২ সালে তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে আমরা পাই বেস্ট এক্সপোর্টার অফ দি ইয়ার পুরস্কার। ২০০৪ সালে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পোশাক প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্ট সমগ্র বিশ্বের অসংখ্য সাপ্লাইয়ারের মধ্য থেকে আমাদের 'বেস্ট সাপ্লাইয়ার অফ দি ইয়ার' ঘোষণা করে। ২০০৭ সালে আমি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের (BGMEA) ডিরেক্টর নির্বাচিত হই। একই বছর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট পারসন (CIP) ঘোষিত হই। ২০০৮ সালে অনন্ত গ্রুপ সারাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্পোরেট সোশাল রেসপন্সিবিলিটি চর্চাকারী কোম্পানি নির্বাচিত হয়।



ফ্যাক্টরি ভবনের সামনে সহকর্মীদের সাথে ইনামুল হক খান (সর্ব ডানে)

এত সাফল্য আমার নিজের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়। কীভাবে যে সবকিছু হয়ে যাচ্ছে আমি নিজেই জানি না। জীবনে যখনই যা করেছি, স্রষ্টার অনুগ্রহের স্পর্শ পেয়েছি। জীবনের শেষার্ধে এসে পূর্ণতা পেয়েছি, তার জন্যে কোয়ান্টামের অবদান অনেক বেশি।

[ইনামুল হক খান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অনন্ত গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, ৪৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অনার্স চালু হয়ে গেল

ইফফাত আরা নার্গিস



সংগীত প্রতিযোগিতায় তাসখন্দে ৪৮টি দেশের প্রতিযোগীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩য় স্থান অর্জন করেছিলাম। সেটি ছিলো আমার একটি মনছবি। তখনই মনে হয়েছিলো এ কোর্সটি আরো আগেই করা উচিত ছিলো। কোর্স করার পর থেকে মেডিটেশন আমার দৈনন্দিন জীবনের অংশ।

৬১ বছরের পুরনো কলেজ আমার। কিন্তু এখানে সমাজকল্যাণে অনার্স নেই। ডিপার্টমেন্টের হেড হওয়ার পর থেকে প্রচণ্ড ব্যগ্রতা নিয়ে মনছবি দেখতে লাগলাম– অনার্স চালু হচ্ছে। কিছুদিন পর অনেকটা আকস্মিকভাবে কলেজের প্রিন্সিপাল বদল হলেন। নতুন প্রিন্সিপাল এসে বললেন, এত ভালো সাবজেক্ট অথচ অনার্স নেই কেন। এক সপ্তাহের মধ্যে কাগজপত্র তৈরি হয়ে গেল। চালু হলো অনার্স।

[সংগীতশিল্পী ইফফাত আরা নার্গিস, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ বিভাগ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ১৮০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জন্মদিনে রক্ত দেবো

রেজোয়ানুল হক রাজা



১৭ বছর আগে কোর্স করেছিলাম। অনেকদিন আগের কথা। তবুও সব মনে আছে। একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে গেছে টানা ৪টি দিন। ঘোরটা নিজের ভেতরের শক্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ায়।

প্রথম কিছুদিন করলেও পরবর্তীতে এ চর্চা নিয়মিত করা হয় নি। তবে এটা সত্যি কোয়ান্টাম মেথডের প্রতি আকর্ষণ এই ১৭ বছরেও একটুও কমে নি। তাই যখনই সুযোগ হয়, তখনই ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানে যাই।

কিছুদিন আগে ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে জানতে পারি রক্তদান কার্যক্রম আরো জোরদার করতে গুরুজী নতুন এক শ্লোগান ঠিক করেছেন। সেটি হলো– 'জন্মদিনে রক্ত দিন'। ধারণাটি খুব ভালো লাগে আমার। সবকিছু ঠিক থাকলে নভেম্বরে জন্মদিনে রক্ত দেবো যা হবে আমার রক্ত দেয়ার প্রথম ঘটনা। সেইসাথে অন্যদের কাছেও ধারণাটি জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছি।

[রেজোয়ানুল হক রাজা, বার্তা সম্পাদক, এনটিভি, ৩য় ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টাম আমাকে প্রশান্ত থাকতে শিখিয়েছে

আশফাহ হক লোপা



আগে অনেকের মতো আমিও ভাবতাম– মেডিটেশন করার দরকার কী? নামাজ-রোজা করলেই তো হয়। কিন্তু কোর্স করার পর দেখেছি নামাজ শেষে যখন কিছুক্ষণের জন্যে একটু মেডিটেশনে বসি তখন আমি গভীর প্রার্থনায় মগ্ন হতে পারি। প্রার্থনায় এই গভীরতা সৃষ্টির কৌশল আমাকে শিখিয়েছে কোয়ান্টাম।

কোয়ান্টাম আমাকে প্রশান্ত থাকতে শিখিয়েছে। বিরক্তিকর হোক, উত্তেজনাপূর্ণ হোক কিংবা অস্থির– যেকোনো অবস্থায়ই এখন নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি, শান্ত রাখতে পারি। এরকম একজন শিক্ষক পাওয়া খুব বড় ব্যাপার যিনি আমাকে জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দিলেন।

[আশফাহ হক লোপা, সিইও, আর্ট এবং ইআর মিডিয়া, ২৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সারাদেশে মেডিটেশন জনপ্রিয় করা প্রয়োজন

জগলুল আহমেদ চৌধুরী



মেডিটেশন একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কোয়ান্টাম মেথডও বিজ্ঞানসম্মত বিষয়। কোর্সটি করে মেডিটেশনের মানসিক ও শারীরিক প্রভাব অনুধাবন করতে পেরেছি। মেডিটেশন মানুষকে বিভিন্নভাবে উজ্জীবিত করে। সারাদেশে মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করা প্রয়োজন। ১৭ বছরে ৩০০টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমি খুব আনন্দিত।

[বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট জগলুল আহমেদ চৌধুরী বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, ১৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অনিদ্রা ও অস্থিরতা কেটে গেছে



সামিয়া রহমান

বছরখানেক ধরে আমার ঘুমের সমস্যা হচ্ছিলো। ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুমই হতো না। ওষুধের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকে। কোর্স করার পর থেকে এখন বেশ আরামে ঘুমাতে পারছি। কোনো ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে না। এছাড়া আগে যেকোনো সমস্যাই আমাকে মানসিকভাবে অস্থির করে ফেলতো। এখনও সমস্যা আসছে কিন্তু সমস্যাকে নিতে পারছি স্বাভাবিকভাবে।

[সামিয়া রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং টেলিভিশন সংবাদ পাঠিকা, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সবার জন্যে সহজ ধ্যানের সুযোগ

মনিকা দেবী বড়ুয়া



সত্য, সুন্দর, ন্যায়ের প্রতি আমার আকর্ষণ সবসময়ের। তাই যখন শুনলাম দলে দলে মানুষ এ কোর্সে এসে টেনশনমুক্ত হচ্ছে, রোগ ভালো হচ্ছে তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম আমিও অংশ নেবো। এখন অনুভব করছি জীবনের জানাগুলোকে মানায় রূপ দেয়ার আনন্দ। পেয়েছি নতুন পথের সন্ধান। এ কল্যাণপথের দরজা দেশ-জাতি-ধর্ম সবার জন্যেই খোলা।

[মনিকা দেবী বড়ুয়া, প্রিন্সিপাল, ভারতেশ্বরী হোমস, ১৪০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রিভ সিস্টেমস ॥ মেডিটেশন দিয়ে শুরু হয় দিনের কাজ

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। স্পেনের বার্সেলোনা শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে GSM World Mobile Congress. মোবাইল ফোন ও এর কারিগরি বিষয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মেলা। বড় বড় কারিগরি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রিভ সিস্টেমস-এর পক্ষ থেকে আমরাও মেলায় অংশ নিই আমাদের মোবাইল ভিওআইপি সলিউশন প্রদর্শন এবং বিপণনের জন্যে।

তখন মোবাইল ভিওআইপিতে রিভ সিস্টেমস-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো ইসরাইলি একটি প্রতিষ্ঠান। মেলার তৃতীয় দিন আমি ও আমার সহকর্মী ঠিক করলাম আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির বুথ ঘুরে আসবো। আমি ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিতেই কোম্পানির এমডি উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, `Because of your company I can't sell a single piece of my mobile VOIP Solution. Every potential client has your software' প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এরকম মধুর বাস্তবতা শোনা এক মজার অভিজ্ঞতা।

আরেকবার একটি North American ICT কোম্পানিতে কর্মরত একজন বাঙালি আমাদের বিপণন বিভাগের প্রধানকে ফোন করে বললেন, 'রায়হান ভাই, এই মাত্র আমরা বসের কাছে খুব বকা খেয়েছি। কিন্তু বকা খাওয়ার পরও এত ভালো লাগছে যে, বলার মতো না'। রায়হান তো বিস্মিত! তখন ভদ্রলোক বললেন, তাদের প্রেসিডেন্ট ঐ সভায় এই বলে সবাইকে তিরস্কার করেছিলেন যে, একটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান ভিওআইপি সলিউশন দিয়ে বাজারে এসে পরিচিতি লাভ করছে অথচ তারা পারছে না। একজন বাংলাদেশি হিসেবে এ তিরস্কার ছিলো ভদ্রলোকের জন্যে গর্বের।



কাজ শুরুর আগে মেডিটেশন

রিভ সিস্টেমস-এর আজ যে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি তা যাত্রা শুরু করেছিলো ২০০৩ সালে একটি বিল্ডিং-এর গ্যারেজের পাশের তিনটি রুম নিয়ে। ৩ জন কর্মকর্তা, ১ জন ড্রাইভার ও ১ জন বাবুর্চি নিয়ে আমাদের পথ চলা শুরু।

বর্তমানে রিভ সিস্টেমস-এ আছেন প্রায় ৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি। কর্পোরেট অফিস সিঙ্গাপুরে। প্রধান ডেভেলপমেন্ট এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় বাংলাদেশ থেকে। পাশাপাশি বিপণন রয়েছে ভারত ও ইংল্যান্ডে।

বিশ্বব্যাপী বিপণনের জন্যে দুবাই সিঙ্গাপুর আবুধাবী ইন্দোনেশিয়া ভারত স্পেন জার্মানি ডেনমার্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মেলায় আমরা অংশ নিয়েছি এবং নিচ্ছি। ৫০টিরও বেশি দেশে আমাদের সুইচ, মোবাইল ভিওআইপিসহ বিভিন্ন সফ্টওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে।

মাত্র ৬ বছরে আজকের এ অবস্থানে আমরা আসতে পেরেছি শুকরিয়া বিশ্বাস সবর মনছবি আর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে।



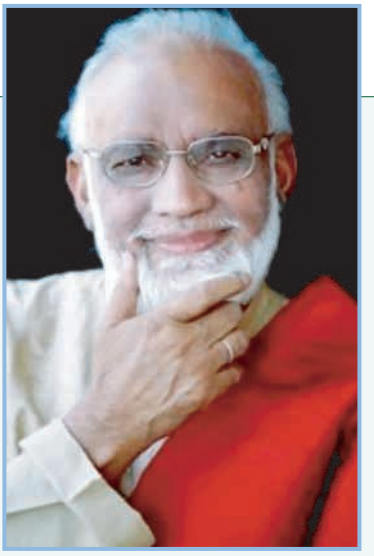
অফিসের কাজ আমরা শুরু করি মেডিটেশন দিয়ে। চেষ্টা করি কোয়ান্টামের সাধারণ শিক্ষাগুলো মেনে চলতে। আমাদের কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠানের ড্রাইভার, কুক, ক্লিনার– সবার সাথেই 'আপনি' সম্বোধনের চেষ্টা করেন। অফিস কথোপকথনে আমরা সুবচন কণিকার শিক্ষা ব্যবহার করি। যেকোনো কঠিন পরিবেশেও আমাদের কর্মীরা হাসিমুখে কাজ করেন এবং মনে রাখেন 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'। মাটির ব্যাংকে দানসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজে রিভ সিস্টেমস নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। ২০০৩ সাল থেকেই রোজার মাসসহ অন্যান্য সময়ে নিয়মিত রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত হচ্ছে।

কোয়ান্টামের সজ্ঞাচার এবং সৃষ্টির সেবাসহ এ সকল কাজেরই সামষ্টিক ফল হলো আমাদের আজকের সাফল্য।

[এম রেজাউল হাসান, সিইও, রিভ সিস্টেমস, ৪৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এমন একটি কোর্সের ফি খুব কম

মুস্তাফা জামান আব্বাসী



মহাজাতক যে কোর্সটি প্রবর্তন করেছেন এবং নবীন-প্রবীণ নির্বিশেষে যে হাজার মানুষ তার কোর্সে অংশ নিয়েছেন, আমিও তাদের একজন। আমি অনেক বয়স্ক হলেও সেখানে গিয়েছি একটি ছোট্ট শিশু হিসেবেই। মহাজাতকের বক্তব্য শুনেছি, উপভোগ করেছি এবং নোটও নিয়েছি। নবীন বয়সের কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– আপনি কেন এসেছেন? আমি বললাম, দেখ, তোমরা এসেছ তোমাদের ক্যারিয়ার সম্পর্কে জ্ঞান নিতে অথবা বৈজ্ঞানিকভাবে মনের নিয়ন্ত্রণ ও একাগ্রতা বৃদ্ধির কৌশল শিখতে। আর আমি মেডিটেশন কোর্স করছি কারণ আমি নামাজ পড়ি, রোজা রাখি– জানতে চাই যে, এগুলোর মধ্যে কীভাবে সমন্বয় হতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি আমি উপকৃত হয়েছি। কোর্সের বিষয়বস্তু এবং আমার বিশ্বাসকে সমন্বয় করতে পেরেছি। আমি মনে করি যারা সত্যিকার জীবনবোধ সম্পর্কে ধারণা নিতে চান তাদের উচিত হবে এরকম একজন সত্যিকারের গুরু যার কাছে মানুষ দীক্ষা নিতে পারে তার কাছে যাওয়া এবং জীবনযাপনের এ বিজ্ঞান শিখে নেয়া।

আমি আমার জীবনীগ্রন্থ 'জীবন নদীর উজানে'-তে মহাজাতকের কথাও লিখেছি। তার কাছ থেকে যে অনেক কিছু শিখেছি তা উল্লেখ করেছি। মহাজাতকের সহাস্য উপস্থাপন, সুন্দর বাচনভঙ্গি, সহজভাবে কথা বলার সাবলীলতায় আমি মুগ্ধ। আমি তার একজন ভক্ত।

আমি তার কাছে গিয়ে খুব উপকৃত হয়েছি। উপকৃত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তার সাথে আমার কোনো ধরনের লেনদেন আছে। তবে লেনদেন আছে, সেটি হলো আত্মিক ব্যাপার অর্থাৎ তিনি একজন আত্মিক গুরু। মেডিটেশনের গুরু। তার কাছে না গিয়েও অনেক কিছু পাওয়া যায়। এটাই হলো আধ্যাত্মিক শিক্ষার একটি ছন্দ।

আমি প্রতিবছর আমেরিকা যাই। সেখানে বড় বড় মেডিটেটর আছেন– যেমন, দীপক চোপড়া। সেখানে মেডিটেশন কোর্স আছে কম করে হলেও ১০০টি। বিভিন্ন শহরের এই যোগ সেন্টারগুলোতে লাখো আমেরিকান এ ধরনের কোর্সে অংশ নিচ্ছে।

আমি মনে করি, এমন একটি কোর্সের জন্যে কোয়ান্টামের যে ফি তা অত্যন্ত কম। আমেরিকায় এ ধরনের একটি কোর্সের ফি কমপক্ষে ১,০০০ ডলার অর্থাৎ ৭০ হাজার টাকা। আবার দীপক চোপড়ার যেসব স্পেশালাইজড কোর্স রয়েছে, সেগুলোর ফি ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ ডলার। এটা অনেকে জানে না। কিন্তু আমি যেহেতু নিয়মিত সেখানে যাই এবং এ ধরনের ব্যক্তিত্বদের সাথে যোগাযোগের সুবাদে আমি তা জানি।

সেজন্যে আমি মনে করি যে, মহাজাতক প্রবর্তিত এ কোর্সের ফি আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে মানানসই একটি ফি এবং তাদের জন্যে এ কোর্স অবশ্য কর্তব্য। যারা জীবনকে সুন্দরভাবে দেখতে চান অর্থাৎ জীবনের সাথে আরো অনেক কিছুকে যোগ করে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে চান তারা কোয়ান্টাম থেকে জীবনযাপনের এ বিজ্ঞান শিখতে পারেন।

[সংস্কৃতি জগতের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব, লোকসংস্কৃতির পুরোধা পুরুষ মুস্তাফা জামান আব্বাসী, ২৫৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সামগ্রিক পরিবর্তন আনতে কোয়ান্টামের ভূমিকা ইতিবাচক

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন



৪ দিন সময় সবকাজ বন্ধ রেখে কোর্সে অংশ নেয়া ছিলো অসম্ভব এক ব্যাপার। তারপরও স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে আসতেই হলো। কিন্তু ৪টি দিন যে কীভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারি নি। আমার জীবনের স্মরণীয় ৪টি দিন ছিলো এটা।

বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সবসময় গুরুজীর কাছ থেকে সাহস ও উৎসাহ পেয়েছি। আমার হাতে প্রচণ্ড একটা ব্যথা ছিলো। বিদেশে গিয়েও কোনো লাভ হয় নি। কিন্তু কোর্সের সময় যৌথ হিলিং মেডিটেশনের পর থেকেই সেই যে ব্যথা চলে গেল আর কখনো হয় নি। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক পরিবর্তন আনতে কোয়ান্টাম খুবই ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

[শিল্পপতি মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, মাননীয় সংসদ সদস্য, ফেনী-৩ আসন, ১১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আগের ভীরু স্বভাবটা মেলাতে পারি না

ডা. সেলিনা খাতুন



আমার ভেতরে সবসময় ভাইভা-ভীতি কাজ করতো। পড়াশোনা, লেখালেখি সম্পর্কে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস ছিলো কিন্তু ভাইভা বোর্ডের মুখোমুখি হতে হবে শুনলেই অজানা এক আতঙ্ক এসে ভর করতো। মাইক্রোফোন নিয়ে স্টেজে উঠে কথা বলার সাহস আমার ছিলো না।

হঠাৎ করেই মনছবির পর্দায় ভেসে উঠলো আমি স্টেজে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছি। স্লাইড, প্রোজেক্টর দেখিয়ে পড়াচ্ছি, মাইক্রোফোনে কথা বলছি। কিছুদিনের মধ্যেই এর হুবহু বাস্তবায়ন ঘটলো। হাসপাতালে একটি সেমিনারে নিজস্ব পেপার উপস্থাপন করলাম স্লাইড শো দেখিয়ে। আমার সাবলীলতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আর এখন সাদাকায়ন, আলোকায়নে শত শত মানুষের সামনে যখন স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা করি তখন আগের ভীরু স্বভাবটাকে কিছুতেই মেলাতে পারি না।

[ডা. সেলিনা খাতুন, ডেন্টাল সার্জন, ১১৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বরেণ্য জাতি হিসেবে আমরা আত্মপ্রকাশ করবো

খান টিপু সুলতান



১৫ বছর আগে একবার আমার কিছু অস্থিরতা নিয়ে গুরুজীর সাথে যখন কথা বলছিলাম, তখন তিনিই আমাকে কোর্সে আসতে বললেন। স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে অংশ নিলাম। এরপর থেকে সে লেখাপড়ায় খুব ভালো করতে থাকে। আর আমিও কাটিয়ে উঠি অস্থিরতা।

সফল হবার যে চাবিকাঠি গুরুজী কোর্সে তুলে দেন তা ব্যবহার করে যে কেউই জীবনে সফল হতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে শারীরিক সুস্থতা, পারিবারিক সফলতা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে আমি এটিকে ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছি। ৩০০ তম কোর্সপূর্তিকে আমি মনে করি বাংলাদেশের সামাজিক পরিমণ্ডলে এক নীরব বিপ্লব। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আত্ম উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে এক বরেণ্য জাতি হিসেবে আমরা আত্মপ্রকাশ করবো।

[সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী খান টিপু সুলতান, যশোর-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, ৪১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



এ কী শক্তি!

বিশু চৌধুরী

যারা পাহাড়ি দেশ ভুটানে গেছেন এবং থিম্পুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন তাদের কাছে ভুটানের স্মৃতি চিরজাগরূক থাকবার কথা। ভুটানের এমনি মায়া। তবে পারো বিমানবন্দরে নামার পর পরই যে টুরিস্ট গাইড পর্যটকদের হাতে তুলে দেয়া হয় তা দেখে শুধুমাত্র অভিভূত হয়ে গেলেই হয় না, খুঁটিয়ে দেখারও প্রয়োজন রয়েছে। বিস্ময়করভাবে ঐ গাইডলাইনে লেখা 'কুকুর হইতে সাবধান!' বাক্যটি। অর্থাৎ সমগ্র থিম্পুতে কুকুর– ক্ষুদ্র, মাঝারি, তরুণ, শুকনো (নেই তেমন), মোটা– সব ধরনের কুকুরের অবাধ বিচরণ রয়েছে। কুকুর চেনা কি অচেনা হোক, তাকে বিরক্ত, আহত বা মারা যাবে না। কুকুরকে ভুটানিরা পিতৃপুরুষের আত্মা বলে মনে করে। এমনকি সাঁঝবেলাতে কলাপাতায় পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে রাস্তার এখানে ওখানে রাখা হয়। ধরে নেয়া হয় পিতৃপুরুষ তা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করবেন এবং খাদ্য সরবরাহকারী পুণ্য অর্জন করবেন।

এহেন নিরাপদে, স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণকারী কুকুরকূল কিন্তু বিদেশিদের জন্যে নিরাপদ নয়। যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। এ যেন সরকারিভাবে পাওয়া লাইসেন্স। অবাক কথা হলো– কে দেশি কে বিদেশি– কুকুরগুলো কেমন করে যেন টের পায়। টের যে পায় তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম আমি নিজে।

২০০৫ কি '০৬ সালের কথা। ভুটান গেছি সরকারি কাজে। থাকি এম্ব্যাসির রেস্ট হাউজে। হাঁটাহাঁটির অভ্যাস। একে তো পাহাড়ি দেশ, তার ওপর অনুপম নিসর্গ, ঘরে থাকতে চাচ্ছে না মন। সকালবেলা গেট দিয়ে বেরুতেই ঘেউ ঘেউ করে উঠলো রাস্তার ওপারের বাড়ির ভেতর থেকে ভয়ালদর্শন এক কালো কুকুর। আতঙ্কিত আমি ভুলেই গিয়েছিলাম টুরিস্ট গাইডের লেখা। অগত্যা আর বেরুনো হলো না। এরপর যখনই রাস্তায় গেছি সবসময় একজন ভুটানিকে সঙ্গে নিয়েছি। নিরাপদে ছিলাম। সম্ভবত দেশি মানুষের গায়ের গন্ধ কুকুরকে হিংস্র হতে বারণ করেছে। এভাবে গেল দিন পনের। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। ভাবলাম থিম্পুর কুকুরগুলো তাদের পাশের দেশের মানুষজনকেও চিনে গেছে।

একদিন হাঁটার জুতো পায়ে দিয়ে বিকেলবেলা একাই বেরুলাম রেস্ট হাউজ থেকে। আকাশ খানিকটা মেঘলা। গেট পার হলাম। পায়ে পায়ে এগুচ্ছি। যদিও ধারে পাশে কোনো কুকুর দেখছি না। তবুও ভয়, যদি থাকে! তাহলে তো ছুটে আসতে পারে। শঙ্কিত পায়ে পায়ে এগুচ্ছি। উঁচু-নিচু টিলা পার হচ্ছি। উদ্দেশ্য রেস্ট হাউজটাকে মাঝখানে রেখে যতদূর সম্ভব পাহাড়ি ঘুরপথে বেড়িয়ে আসবো।

আরও খানিকটা এগিয়েছি। রেস্ট হাউজ এখন চোখের আড়ালে। বাঁয়ে বাঁক নিলাম। ঠিক সেসময়ে একসঙ্গে ৫/৬টি কুকুর, বিচিত্র রঙের, বিচিত্র আকৃতির, টিলার ওপরে একটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সরাসরি আমার দিকে ঘেউ ঘেউ করে এগিয়ে এলো। আমি নিশ্চিত– এই হাফ ডজন কুকুরের প্রত্যক্ষ আক্রমণ থেকে আজ কোনোভাবেই নিস্তারের উপায় নেই। কী করবো আমি! ধারে পাশে কোনো মানুষ নেই। কুকুরগুলোর সামনে আমি বিদেশি শত্রু। কী করি! বিদেশ-বিভুঁইয়ে এভাবে বেঘোরে প্রাণ হারাবার আতঙ্কে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাওয়ার অবস্থা। কুকুরগুলো এগুচ্ছে। হঠাৎ সে মুহূর্তে মনে পড়লো কোয়ান্টা ভঙ্গির কথা। নিজের ভেতর থেকে কে যেন বললো, 'ডান হাত ওঠাও, কোয়ান্টা ভঙ্গি কর'। আমি তা-ই করলাম। বিস্মিত হয়ে দেখলাম কুকুরগুলো যে যেখানে ছিলো ঠিক সেখানেই থমকে গেল। আমিও দাঁড়িয়ে আছি। নড়তে পারছি না। এই মহাবিপদের মুহূর্তে স্রষ্টার অপার করুণায় কোয়ান্টা ভঙ্গি প্রয়োগের অকল্পনীয় ফলাফলে আমি স্তম্ভিত! কুকুরগুলো নিজে থেকেই ফিরে গেল। আমিও রওনা হলাম আবার।

বিপদ যে তখনও কাটে নি তা বুঝি নি। পাহাড়ি পথের আরেক বাঁক ঘুরলাম। এবার প্রায় ডজনখানেক কুকুর আগের চাইতেও দ্রুতগতিতে আমাকে তাড়া করলো। এগুচ্ছে কুকুর। হিংস্র চোখ। ক্রুদ্ধ চিৎকার। একশ গজ দূরে। মুখোমুখি। নিশ্চিত আজ একটা রক্তারক্তি হবে। বেওয়ারিশ কুকুর, বিদেশি মানুষ ছিঁড়েফুঁড়ে ফেলবে। এবার দুই হাত একসঙ্গে মাথার ওপর তুলে আবার কোয়ান্টা ভঙ্গি করলাম। থমকে দাঁড়ালো কুকুরগুলো। ওরা যেন আমাকে দেখতেই পাচ্ছে না। ফিরতি পথ ধরলো। কোনো চিৎকার নেই কণ্ঠে। আমি দুহাত তখনও তুলে রেখেছি। মুদ্রা আমার তেমনি রয়েছে। চোখে পানি। এ কী বিস্ময়! এ-ও কী হয়!

[জনপ্রিয় গ্রন্থ স্বর্ণশিখরের লেখক বিশু চৌধুরী। কর্মজীবনে তিনি গভর্নমেন্ট অডিট এন্ড একাউন্টসের পদস্থ কর্মকর্তা, ৪৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মনের বাঘকে ঘায়েল করার বড় অস্ত্র

আশীষ উর রহমান শুভ



মেডিটেশন করে ছাড়তে পেরেছি দীর্ঘদিনের ভাত ঘুমের অভ্যাস। আগে দুপুরে ভাত খাওয়ার পর না ঘুমালে একদমই চলতো না। শরীর ম্যাজম্যাজ করতো, কাপের পর কাপ চা খেতে হতো। এখন দুপুরে খাওয়ার পর ৫/১০ মিনিট মেডিটেশন করে শরীরকে শিথিল করি। ব্যস, সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আসলে 'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়' এটি খুব সত্য কথা। এই মনের বাঘকে ঘায়েল করার বড় অস্ত্র কোয়ান্টাম মেথড।

[আশীষ উর রহমান শুভ, সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো, ২৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ব্যথা চলে গেল

মো. আশরাফ আলী



২০০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। হবিগঞ্জ থেকে বাসে করে ফিরছিলাম। নরসিংদীর কাছে এক স্থানে দুর্ঘটনায় পড়লো বাস। আমার মাথা নিচের দিকে, পা ওপরের দিকে। প্রচণ্ড আঘাত পেলাম ঘাড়ে, মাথায়, সারা শরীরে।

ঘাড়ের ব্যথার জন্যে অনেক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছি। খেয়েছি অনেক ব্যথানাশক ওষুধ। কিন্তু কিছুতেই ব্যথা কমার লক্ষণ নেই। মেডিটেশনে অংশ নিলাম। কী আশ্চর্য! ব্যথা ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল। এখন পর্যন্ত আর ব্যথা হয় নি।

[মো. আশরাফ আলী, সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৬৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছি

ডালিয়া পারভীন



কখনো ভাবি নি জীবনে কী হতে চাই। জানতাম না কোন সত্যের সন্ধান আমি করে চলেছি। মনছবির মেডিটেশনে আমার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছি। মনছবি দেখেছি আমার সন্তানেরা মানবজাতির কল্যাণে কাজ করবে। অবলোকন করেছি মৃত্যুর পর আমার অসংখ্য ছাত্রছাত্রী আমাকে ঘিরে বসে আছে– যাদের জীবনে ন্যূনতম হলেও অবদান রাখতে পেরেছি, সেবা দিতে পেরেছি– তারা সবাই পাশে বসে আমার জন্যে দোয়া করছে। মনে হলো– এটাই জীবনের পরিপূর্ণ মনছবি।

[ডালিয়া পারভীন, সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টামের বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে

বিচারপতি মো. আবু তারিক



আমার খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর বিস্ময়কর ইতিবাচক পরিবর্তন দেখে উদ্বুদ্ধ হলাম। সন্তানদের জন্যে প্রয়োজন ভেবে ছেলে-মেয়েকে নিয়েই কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলাম। কোর্সের পরে ছেলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ্য করে অবাক হলাম। আসলে 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'– এ বাণী যদি সবার কাছে পৌঁছে দেয়া যায় তাহলেই দেশের কল্যাণ হবে।

[মো. আবু তারিক, মাননীয় বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট, ২৫৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সঠিক ধারণা পেতে হলে কাছ থেকে দেখতে হয়

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ



এক বন্ধুর খানিকটা জোরাজুরিতেই আমি যখন এ কোর্সে আসি তখন কিছুটা শঙ্কিতই ছিলাম যে, কি জানি এখানে ইসলামবিরোধী কিছু আছে কি না। কোর্সের প্রথম দিন আসরের ওয়াক্তে গুরুজীও জামাতে শরীক হলেন। আমি দাঁড়ালাম ওনার পাশে। আমার সব ভয় দূর হয়ে গেল।

তাই আমি কোর্স করেছি শুনে আমার পরিচিত কাউকে কাউকে যখন ভ্রূকুটি করতে দেখি তখন খুব অবাক হই না। কারণ দূর থেকে অনেক ভুল ধারণাই করা যায়। সঠিক ধারণা পেতে হলে কাছ থেকে দেখতে হয়, ভালোমতো জানতে হয়।

কোর্স আমার জীবনে অনেক প্রভাব ফেলেছে। কোর্সে পাওয়া ইতিবাচক চিন্তা, কর্ম বা আচরণের শিক্ষাগুলো আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের দেই।

২৫ বছর ধরে আমার ডায়াবেটিস। কোর্সের পর ৪/৫ বছরে একবার আমি ডাক্তারের কাছে যাই। মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুমিয়ে বাকি ২০ ঘণ্টার প্রায় পুরোটাই কাটে আমার কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে।

[বিশিষ্ট গবেষক, লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, ৬৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ধ্যান শিল্পীকে শুদ্ধতার চর্চা করতে শেখায়

কাজী কৃষ্ণকলি ইসলাম



আমার বয়স যখন ৩ বছরও হয় নি, তখনই মা আমাকে গান শেখাতে শুরু করেন। আমার আবছাভাবে এখনও মনে পড়ে যে, ছোট্ট আমি একটা হারমোনিয়ামের ওপর উঠে বাজাচ্ছি। তবে মা আমাকে কখনো স্টেজে গাইতে দেন নি। কারণ মা-র ধারণা ছিলো তাহলে আমি হাততালি আর বাহ্‌বার মোহে পড়ে যাবো। আমাদের পড়ার বিষয়টাকেও মা খুব যত্ন করে তত্ত্বাবধান করেছেন। এরকম একটা বেড়ে ওঠার পরিবেশের ফলে শুদ্ধ-অশুদ্ধ, চমক আর স্থায়িত্ব, নৈতিকতা আর নীতিহীনতার মধ্যে প্রভেদ করার অভ্যস্ততা ছোটবেলা থেকেই হয়ে গিয়েছিলো।

আমার মনে হয়েছে আমার যে বোধ, ভাবনা, চেতনা– এ সবকিছুকে ফুটিয়ে তুলতে হবে আমার গানের মধ্য দিয়ে। যে গানের মধ্য দিয়ে আমি প্রতিবাদ জানাতে পারবো শিল্পের করপোরেটকরণের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। প্রচলিত স্রোতের বিপরীতে বক্তব্য-সুরনির্ভর গানকে প্রতিষ্ঠা করতে।

মেডিটেশনের অভিজ্ঞতাটা ছিলো আমার জন্যে আরো একটি শুদ্ধতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ। ধ্যান বা আত্মমগ্নতা একজন শিল্পীকে যথার্থভাবেই শুদ্ধতার চর্চা করতে শেখায়। ধ্যানমগ্নতার মধ্য দিয়ে আমিও তাই খুঁজে নিতে চেষ্টা করি আমার আত্মবোধকে।

ফাউন্ডেশনে সবাই তার নিজস্ব মত-পথ-আদর্শকে অক্ষুণ্ন রেখেও আত্মবোধনের চেষ্টা করে যেতে পারে। আমি মনে করি, কোয়ান্টাম চেতনাবিকাশের এটা একটা বড় কারণ। সেবামূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও ফাউন্ডেশন স্থাপন করে চলেছে অনন্য দৃষ্টান্ত। লামায় কোয়ান্টাম শিশুকাননে আমি গিয়েছি। আদিবাসী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিকাশের জন্যে এ এক অতুলনীয় উদ্যোগ।

[কাজী কৃষ্ণকলি ইসলাম, সংগীতশিল্পী, ১৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রবাসে শিক্ষকতার সুযোগ হলো

নিয়ামুশ শাবানা



ছোটবেলা থেকেই মনছবি ছিলো শিক্ষক হওয়ার। স্কুল, কলেজ– যখন যেখানে পড়েছি, সেখানেই শিক্ষকতা করার ইচ্ছে হতো। যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে পড়ার সুযোগ হলো তখন মনছবি দেখা শুরু করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবো। পড়াশোনা শেষ করার পর প্রথমে স্কুল, তারপর কলেজ এবং বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এক্ষেত্রে আমার শৈশব থেকে দেখে আসা ৩টি মনছবিই পূরণ হয়েছে।

এরপর মনছবি দেখতাম দেশের বাইরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করবো। সৌদি আরবের কিং খালেদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করি। উদ্দেশ্য ছিলো এতে আমার হজ করার মনছবিও পূরণ হবে। স্রষ্টার অশেষ রহমত– ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টিতেই আমি নিয়োগ পেয়েছি। খুলে গেছে আমার মনছবি পূরণের দুয়ার।

[নিয়ামুশ শাবানা, লেকচারার, কিং খালেদ ইউনিভার্সিটি, সৌদি আরব, ১৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বিস্মিত হয়েছি! মুগ্ধ হয়েছি!

মুন্নী সাহা



আত্মবিশ্বাসের অভাব বা হতাশা– এ জাতীয় কোনো সমস্যা নয়, শুনেছিলাম কোর্সের প্রশিক্ষক মহাজাতক দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেন। এটা দেখার জন্যেই আমি গিয়েছিলাম। বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি একজন মানুষকে দিনে ১০ ঘণ্টা বক্তৃতা করতে দেখে। নিশ্চয়ই কোনো শক্তি তার আছে। এটাই মনে হয় মেডিটেশনের শক্তি।

আমার বন্ধুবান্ধবরা যখন নিজ নিজ ধর্মের আচার পালন করতো তখন আমার মধ্যে এক রকম অপরাধবোধ তৈরি হতো। কারণ আমি এ ধরনের কোনো ধর্মাচার পালন করতাম না। কোর্সে এসে আরো ভালো করে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, সততা একাগ্রতা মনোযোগ দিয়ে কাজ করাটাই সবচেয়ে বড় প্রার্থনা।

[মুন্নী সাহা, প্রধান বার্তা সঞ্চালক, এটিএন বাংলা, ২০৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়েছে

তারিন

কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমি দ্বিধায় ভুগি খুব বেশি। এ কোর্সের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। কিন্তু কোর্সে অংশ নেয়ার পর এখন যে পরিবর্তন উপলব্ধি করছি তা হলো– দৃঢ় আত্মবিশ্বাস যা সিদ্ধান্ত নেয়াকে সহজ করবে।

পারিবারিক মেডিটেশন খুব ভালো লেগেছে। পরিবারের সবাইকে এভাবে অনুভব করার অভিজ্ঞতা সত্যিই অবর্ণনীয়। কোর্সের প্রতি ক্ষেত্রেই আমার মনে হয়েছে নতুন থেকে নতুনতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি। আমি মনে করি, জীবনের সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত যদি নিয়ে থাকি, তবে তা হলো এই মেডিটেশন কোর্সটি করা।

[অভিনেত্রী তারিন ১৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মিউজিক ও মেডিটেশন খুব কাছাকাছি ॥ রূপম



কোর্স করার আগেই সৌভাগ্য হয়েছিলো লামায় যাওয়ার। লামার প্রকৃতি, পাহাড়, শিশু– সবকিছুই এক অদ্ভুত ভালো লাগার বিষয়। কোর্স করে মনে হলো– এটা অসম্ভব প্রশান্তির একটা উৎস। এটি করলে একজন মানুষ শুদ্ধ চিন্তায় অনুপ্রাণিত হবেই। সেই সাথে সে পারবে তার চিন্তা-সমুদ্রে দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটতে।

মেডিটেশন করার পর মিউজিকে এটি কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছি। যেমন, স্বরায়ন চর্চা করে কণ্ঠের অনুশীলনটি খুব ভালো হচ্ছে। প্রাকটিসে মনোযোগ বেড়েছে। যেতে পারছি মিউজিকের গভীরে। আমার এ পর্যন্ত ৫টি এলবাম বেরিয়েছে। এর মধ্যে কোর্সের পর আসা 'মন ভাসিয়ে দে' এলবামটি খুব ভালো করেছে। মেডিটেশন নিয়ে আমার পরিমণ্ডলে যাকেই বলেছি, দেখেছি তাদের ইতিবাচক মনোভাব।

[সংগীতশিল্পী রূপম, ২৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এগিয়ে যাচ্ছি গ্রাউন্ড জিরো ধারণায়

তিনকড়ি চক্রবর্তী



ছাত্র অবস্থাতেই পেশাজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম, কোয়ান্টামে এসে জানলাম সেটিই ছিলো মনছবি। রসায়নে মাস্টার্স করার পর চাকরির পাশাপাশি সামান্য পুঁজি দিয়ে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করি। জটিল প্রযুক্তির কারণে প্রথম উৎপাদিত পণ্যটি ব্যবসাসফল হলো না। পুঁজি হারিয়ে দেনার মধ্যে পড়ে গেলাম। হতাশায় সময় ব্যয় না করে নতুন একটি পণ্য নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। সবকিছু ভালোভাবেই চলছিলো। হঠাৎ সৃষ্টি হলো আরেকটি আর্থিক সংকট। ব্যবসার সব পুঁজি আত্মসাৎ করলো পার্টনার।

খালি হাতে ফিরে এলাম চট্টগ্রাম। পূর্ণ উদ্যমে শুরু করলাম। মূলধন গেছে, মেধা তো যায় নি। অভিজ্ঞতাই হবে নতুন মূলধন। ইতোমধ্যে বাজারে টেকনোক্র্যাট হিসেবে নিজের একটা অবস্থান গড়ে ওঠে। ব্যাংক থেকে খুব সহজেই লোন পেলাম। সেই ধারাবাহিকতায় আমার বর্তমান অবস্থান। মনছবির সাথে গ্রাউন্ড জিরো ধারণাকে সম্বল করে আমি এগিয়ে যাচ্ছি।

[তিনকড়ি চক্রবর্তী, শিল্পপতি, ৫৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রোগী দেখা হলো সহজ

ডা. মোখলেসুর রহমান



আমি পেশায় একজন শিক্ষক এবং হোমিও চিকিৎসক। ৩৫ বছর ধরে চিকিৎসাসেবায় আছি। যখন থেকে মেডিটেশন শিখেছি আমার পরিশ্রম কমে গেছে কিন্তু সফলতা বেড়েছে অনেকগুণ। প্রতিদিন মেডিটেশন করে চেম্বারে বসি। ফলে রোগীর জন্যে ওষুধ নির্বাচন করতে খুব কম সময় লাগে। রোগীর সমস্যা শোনার সাথে সাথে তার প্রয়োজনীয় ওষুধটি চোখে ভেসে ওঠে।

রাতে ঘুমানোর আগে মেডিটেশনে মনের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যেকের সাথে মমতা নিয়ে কথা বলি, প্রত্যেককে আলাদা আলাদা হিলিং করি। আমার সফলতার হার শতকরা ৯৫ ভাগ।

[ডা. মোখলেসুর রহমান, প্রেমময় হোমিও হল, প্রধান শিক্ষক- কুড়িল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মনে হয় এই তো সেদিন

মাহমুদুর রহমান



মনে হয় এই তো সেদিন ঢাকার হোটেল অবকাশে কোর্স করলাম। অথচ এর মধ্যেই ১৭ বছর হয়ে গেছে। চট্টগ্রামে একসময় কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ছিলাম কয়েকজন, সেখানে আমরা এখন কয়েক হাজার। এসোসিয়েট ও শুভানুধ্যায়ীরা তো আছেনই। সমাজে প্রশান্তির বাণী নিয়ে এসেছে ফাউন্ডেশন। যে ধ্যান ছিলো গভীর অরণ্যে পাহাড়ে পর্বতে সংসারত্যাগী সাধকদের জন্যে, আজ তা চলে এসেছে সাধারণ মানুষের আয়ত্তে। ধ্যানের গভীরে গিয়ে তারাই আজ উপলব্ধি করছেন– মনই শক্তির উৎস।

[মাহমুদুর রহমান, চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক, ২য় ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

যথাসময়ে পদোন্নতি হলো

অধ্যাপক বিজিত কুমার ভট্টাচার্য



কোয়ান্টাম মেথড বইটি দেখে কোর্স করার সিদ্ধান্ত নিলেও নানা প্রতিকূলতায় পিছিয়ে গিয়েছিলাম ১২ বছর। একযুগ পর কোর্সে এসে অভূতপূর্ব অনুভূতি তো পেলামই সেই সাথে লাভ করলাম পদোন্নতি। প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ পেলাম সিরাজগঞ্জের একটি সরকারি কলেজে।

মনছবি দেখতে লাগলাম। দেড় মাসের মাথায় বাড়ির পাশে হবিগঞ্জের সবচেয়ে বড় কলেজটিতে অধ্যক্ষ হিসেবে আমাকে নিয়োগ দেয়া হলো।

[অধ্যাপক বিজিত কুমার ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ, ২৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পরিবার পেশা এবং মনছবি

মাঈনুল ইসলাম



কোর্স করার পর থেকেই মনছবির বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠি। বাবা মারা যাওয়ার পর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিলো পাওনাদারদের চাপে। কিন্তু সাহস হারাই নি। মনছবির জোরে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। একসময় পাওনা শোধ করেও আমাদের হাতে আসে আরো টাকা যা দিয়ে চট্টগ্রাম শহরে জায়গা কিনে একটি বাড়ি করার সংস্থানও হয়ে গেল।

[মাঈনুল ইসলাম, আইআইইউসি'র প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ২৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মেডিটেশন ॥ চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপূরক

প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ তাহির



ওষুধ দিয়ে কিছু রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায় কিন্তু ওষুধে সব রোগ ভালো হয় না। অসুখের কারণ যদি টেনশন, মানসিক উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা হয়, তাহলে তা দূর করতে মেডিটেশন চর্চা মেডিকেল সায়েন্সে স্বীকৃত। তাই আমি অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে একথা বলছি যে, কোয়ান্টাম মেডিটেশন পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং এটি মেডিকেল সায়েন্সের পরিপূরক হিসেবে সফলভাবে ভূমিকা রাখছে।

[প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ তাহির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, ১৩২ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন]

মনছবি মিসাইলের মতো লক্ষ্য অর্জন করলো

জেসমুল হাসান



২০০৬ সালের কোনো একদিন। আমার ধ্যান-সাধনার একযুগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করার পর ১০ বছর পেরিয়ে গেছে। তখন আমি একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত। ফোন পেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যানের অফিস থেকে। তিনি আমার সাথে দেখা করতে চান। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর নিজের লেখা একটি বইয়ে স্বাক্ষর করে আমার হাতে তুলে দিলেন। সরাসরি প্রস্তাব দিলেন বিভাগে শিক্ষক নেয়া হবে সহকারী অধ্যাপক পদে। আমি যেন আবেদন করি। উনি আমাকে শিক্ষক ও সহকর্মীরূপে পেতে চান।

আমি বিস্মিত অভিভূত আনন্দিত! একযুগের মনছবি দর্শন এভাবে সফল হবে ভাবি নি। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করার পর থেকেই মনছবি দেখছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ক্লাস নিচ্ছি।

কিন্তু ১০ বছরে সাংবাদিকতা ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার পেশায় অনেকটা থিতু হয়ে গিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রস্তাবটি তখন সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তবে যে বিষয়টি এখনো আমাকে আন্দোলিত করে তা হলো একযুগ আগে দেখা মনছবি গাইডেড মিসাইল হয়ে ২০০৬ সালে ঠিকই তার লক্ষ্য অর্জন করলো।

[জেসমুল হাসান, পলিটিকেল এডভাইজার, রাজকীয় নেদারল্যান্ড দূতাবাস, ২৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

একসাথে অংশ নিই ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামে

কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ



স্ত্রী অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাবের সঙ্গে

আন্তর্জাতিক মানের প্রসাধন সামগ্রী কিউট-এর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান মৌসুমী গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ তার আজকের যে অবস্থানে আছে তার পেছনের অনেকটা কৃতিত্বই ফাউন্ডেশনের, মেডিটেশনের। যেকোনো টার্গেটকেই আমার এখন অর্জনযোগ্য মনে হয়। গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি ও তা ভোক্তার হাতে পৌঁছে দেয়াকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। এক্ষেত্রে মেডিটেশন আমার ও আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সকালে কাজ শুরু করি যৌথ মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে। একসাথে অংশ নিই কোয়ান্টায়নসহ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে। মাটির ব্যাংক আমাদের প্রতিষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ফলে আমাদের কর্মীরা অনেক বেশি ইতিবাচক, উদ্যমী এবং বিশ্বস্ত। কাজে তারা অনুপস্থিত থাকে না বললেই চলে। গত ১৮ বছরে মাত্র একজন কর্মীকে বরখাস্ত করতে হয়েছে। মনছবি করে আমাদের বিক্রয়কর্মীরা এখন সাফল্যের সঙ্গে তাদের টার্গেট পূরণ করতে পারছে।

গুণগত মান বজায় রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লি. অর্জন করেছে গোল্ডেন ইউরোপ এওয়ার্ড ফর কোয়ালিটি।

কর্মীরা যাতে এ প্রতিষ্ঠানকে তাদের একটা পরিবার বলেই ভাবতে পারে সেজন্যে সবসময় সচেষ্ট থাকি। তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক সুখ-সুবিধার দিকে খেয়াল রাখি। আর এ সবকিছুই কোয়ান্টাম চেতনার আদর্শ থেকে উৎসারিত। যে চেতনার আলোকে আমার পরিবারও এখন সুখী-সমৃদ্ধ পরিবার।

[বিশিষ্ট শিল্পপতি কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ, মৌসুমী গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর চেয়ারম্যান, ৯ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমার অহমকে ভাঙতে পেরেছি

মুরশীদা খানম



উচ্চশিক্ষার জন্যে দুবছর আমাকে দেশের বাইরে থাকতে হয়েছিলো। যদি মেডিটেশন না করতাম তাহলে বিদেশের মাটিতে টিকে থাকা এক কথায় অসম্ভব ছিলো। প্রতিদিন আর কিছু না হোক অটোসাজেশন দিতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, ভালো রেজাল্ট, দেশের বাইরে পড়াশোনা– ভাবতাম আমার আর কিছু অর্জনের বাকি নেই। ধারণাটা যে কত ভুল এ উপলব্ধিটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। কারণ একসময় অনুভব করলাম এতদিন যা পড়েছি তার সব ছিলো ডিগ্রি অর্জনের জন্যে। জীবনে আমার কী করা উচিত, কীভাবে চলা উচিত এমনকি কীভাবে কথা বলা উচিত তা-ও যেন ফাউন্ডেশন থেকেই শিখলাম।

মেয়ে হিসেবে একটা জটিল এবং কুটিল পারিপার্শ্বিকতা আমাকে সবসময়ই পার হতে হয়েছে। কিন্তু এখন আর আমি আগের মতো ভেঙে পড়ি না।

[মুরশীদা খানম, সহকারী অধ্যাপক– পরিসংখ্যান, প্রাণ পরিসংখ্যান ও তথ্য পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আগের চেয়েও কমে বাড়িটি ভাড়া দিলেন

নাজনীন সুলতানা



স্বামীর সঙ্গে নাজনীন সুলতানা

বিয়ের পর ২০০৮-এ আমাকে পাড়ি দিতে হয় অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে কোয়ান্টাম পরিবারকে খুব মিস করতাম। মিস করতাম গুরুজী, মা-জীকে। তাই কয়েকজন বাঙালি মিলে শুরু করলাম যৌথ মেডিটেশন।

অস্ট্রেলিয়ায় আবাসনের খুব সংকট। আমি ও আমার স্বামী মেডিটেশনে একটি ভালো থাকার জায়গার জন্যে মনছবি দেখতে থাকি। একদিন আমার স্বামী একটি বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে সেখানে যান। বাসাটি খুব সুন্দর এবং ঠিক আমাদের মনছবির মতোই। মালিক বললেন, এ বাড়িটির জন্যে আরো অনেকেই আগ্রহী কিন্তু আমরা যদি সেদিনই বুকিং দিতে পারি তাহলে বাসাটি আমরা পাবো। আশ্চর্যজনকভাবে আগের ভাড়ার চেয়েও ২০ ডলার কমে বাড়িটি আমরা পেলাম।

[নাজনীন সুলতানা, গৃহিণী, ১২৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ধ্যান মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনে

মওলানা ছায়ীদুল হক

নিজের চেয়ে বড় কিছুকে অনুভব করা, অনুসন্ধান করা এবং তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করার তাড়নাকে আল্লাহ জন্মগতভাবেই মানুষের ভেতরে দিয়েছেন। এই বড় কিছুর সন্ধান করতে গিয়েই হজরত ইবরাহীম (আ) ধ্যানমগ্ন হলেন এবং পেলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্রষ্টাকে। পরম মুক্তিদাতাকে খুঁজে পেতে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন হলেন শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (স)।

জীবন, জগৎ ও মুক্তির পথের সন্ধান লাভে এই গভীর মনোনিবেশ এই আত্মমগ্নতার নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা কোরআনের একাধিক জায়গায়ই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'কেন তোমরা ধ্যান বা গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তাভাবনা কর না?' সূরা আলে-ইমরানের ১৯০-১৯১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন-রাত্রির আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে, বসে বা শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে ধ্যানে (তাফাক্কুর) নিমগ্ন হয় এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি কর নি'।

এমনকি নবীজী (স)-কে আল্লাহ বলেছেন, 'যখনই অবসর পান সাধনায় রত হোন এবং আপনার সৃষ্টিকর্তার দিকে মনোনিবেশ করুন।' –সূরা আল ইনশিরাহ, আয়াত (৭-৮)।



শুধু সৃষ্টিরহস্যের সন্ধানে নয়, সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং কর্মকাণ্ডেও গভীর মনোনিবেশের তাগিদ আল্লাহ দিয়েছেন। সূরা আল-মুমিনুনের (১-২) আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'বিশ্বাসীরাই সফল যারা তাদের নামাজে বিনয়ী ও নম্র হয়েছে'। অর্থাৎ অন্তরকে স্রষ্টার জন্যে স্থির করতে পেরেছে।

একবার ফেরেশতা হজরত জিব্রাইল (আ) নবীজী (স)-কে ৫টি প্রশ্ন করলেন। তার মধ্যে ৩য় প্রশ্নটি ছিলো, 'ইবাদতের সর্বোচ্চ মানটি কী?' নবীজী (স) বললেন, 'এমনভাবে সকল ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তা না পারো, তাহলে চিন্তা কর যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন'।

মেডিটেশন বা মোরাকাবা বা ধ্যান মানুষকে তার মনের ওপর এ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেই সাহায্য করে। ফলে মানুষ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তি পায়। ভয়-হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রেনকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে পারে। মেডিটেশনের মাধ্যমেই মানুষ জীবন-জগৎ-স্রষ্টা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে। তাই বলা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে মেডিটেশন স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ এবং আখেরাতে সফলতা প্রাপ্তির একটি কার্যকর কর্মপদ্ধতি।

[মওলানা ছায়ীদুল হক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও খতিব, ৩৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মানুষের মতো মানুষ হওয়ার স্কুল

মেজর (অব.) এম মোজাম্মেল হোসেন



আমার দীর্ঘ ৬০ বছরের জীবনে ঘটেছে বহু দর্শন, বহু অর্জনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু তারপরও কোথায় যেন একটা অতৃপ্তি, অস্থিরতা ছিলো। এসময়ই একদিন কোয়ান্টামের মিরপুর সেন্টারে যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে সবার আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করলো। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে প্রথম সুযোগেই কোর্স করলাম। আমার মনে হলো, মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্যে আমি যে স্কুল খুঁজছিলাম, ফাউন্ডেশন ঠিক তা-ই। যেকোনো মানুষ এ প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে অনন্য মানুষ হতে পারে।

কয়েকদিনের মধ্যে লামায় গেলাম। লামা ভ্রমণ আমার দেশে-বিদেশে আর সব ভ্রমণকে হার মানিয়েছে। আমি পাঁচটি মাটির ব্যাংক রেখেছি বাসা ও অফিসে। এর ফলও পাচ্ছি দারুণভাবে। মিরপুরে গত ৭ বছর ধরে আমার একটা বাড়ি বিদ্যুৎ-পানি-গ্যাসের বিল পরিশোধ না করার ফলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিলো। ৪০ দিনের হিলিং ও মাটির ব্যাংকে নিয়তের মাধ্যমে আমার অনেকদিনের পুরনো কিছু পাওনা অদ্ভুতভাবে ফেরত পেলাম যা দিয়ে বাড়িটিতে বিদ্যুৎ-গ্যাস সংযোগ দিয়ে ভাড়া দিতে সক্ষম হয়েছি।

[মেজর (অব.) এম মোজাম্মেল হোসেন, ডিরেক্টর, বিল্ডিং টেকনোলজি এন্ড আইডিয়াস লি., ২৮৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মনছবি বাস্তবায়িত হলো

আহসানুল বারী



যখন কোর্স করি নি, তখনও সুন্দর ও সুখী ভবিষ্যতের জাল বুনতাম। কিছুটা হতো, কিছুটা হতো না। কোর্স করার পর সুন্দর গোছানো মনছবি দেখা শুরু করলাম। সফলতার হার বেড়ে গেল প্রায় শতভাগ। কোর্স করার পরে যে একাগ্রতা ও বিশ্বাস নিয়ে মনছবি দেখেছি তা আগে ছিলো না। ফলে চারদিক থেকে এলো সফলতা। পারিবারিক সামাজিক পেশাগত আর্থিক বৈষয়িক এবং ইবাদতে এমন সফলতা পেলাম যা লিখতে গেলে একটা বই হয়ে যাবে। এর মধ্যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো, গত ৬ বছরে ৪ বার মক্কার পবিত্র হেরেম শরীফে গিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পিত হয়ে ক্ষমা চাইতে পারার সুযোগ।

[এফসিএমএ আহসানুল বারী, চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কোম্পানি লি.– ১৭১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সেই গাড়িটাই আব্বু কিনলেন

ফাতেমা আক্তার মেরী



আমার ও ছোট বোনের ভার্সিটি বাসা থেকে বেশ দূরে। যাতায়াতে খুব সমস্যা হচ্ছিলো। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে আব্বুকে একটা গাড়ি কেনার কথা বলছিলাম। কিন্তু কীভাবে কেনা হবে তা নিয়ে নানা জটিলতা দেখা দিলো। আমি ও আমার ছোট বোন মনছবি দেখা শুরু করলাম। গুরুজীকে চিঠি লিখলাম। হিলিং-এ নাম দিলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই আব্বুর এক বন্ধু জানালেন তিনি একটা নতুন গাড়ি কিনেছেন এবং কয়েক মাস আগের কেনা গাড়িটা বিক্রি করে দিতে চান। সেই গাড়িটাই আব্বু কিনলেন।

[ফাতেমা আক্তার মেরী, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে এমবিএ করছেন, ২৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

টনিকের মতো কাজ করে

শংকর কুমার দে



কোয়ান্টাম মেথড মানুষের চরিত্র গঠনে, সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে এবং ইহজাগতিক শান্তি স্থাপনে টনিকের মতো কাজ করে। সমাজ-সংসারে যারা অশান্তির মধ্যে আছে, না পাওয়ার অস্থিরতায় ভুগছে বা ডুবে আছে হতাশায়, কোর্স করে তারা উপকৃত হচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমি আধ্যাত্মিকতার চর্চা করি। আমি মনে করি, কেউ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে চান তাহলে তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন কোয়ান্টাম মেথড চর্চা করে উপকৃত হবেন এবং উন্নতি করতে পারবেন।

[শংকর কুমার দে, দৈনিক জনকণ্ঠের বিশেষ সংবাদদাতা, ১৯৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আজ তারাই প্রস্তাব দেন ব্যবসা সম্প্রসারণের

মাসুদা আক্তার আবেদীন



আমার স্বামী সর্দার নূর-উজ-জামান যেদিন আকস্মিকভাবে মারা যান তার ৩ দিনের মাথায় আমাকে তার অফিসে বসতে হয়েছিলো। ব্যাংকের এমডি থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, পরিবার ও আত্মীয়দের অনেকেই পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে ব্যবসাটা বিক্রি করে দেই। কিন্তু আমি এর শেষ দেখতে চেয়েছি।

এমনিতেই আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্প চলছে নানা সংকটের মধ্য দিয়ে। তার ওপর একজন নারী উদ্যোক্তা যিনি এসব কাজের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই হাজবেন্ডের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তার অবস্থাটা কী হয় তা সহজেই অনুমেয়। একটা সময় ছিলো যখন একদিকে প্রতিষ্ঠানের ভেতরের কোন্দল, অন্যদিকে বাইরে বায়ার সাপ্লায়ার কন্ট্রাক্টর ব্যাংকার– সবার চাপ সামলাতে হচ্ছে। যদি মেডিটেশন না জানতাম তাহলে আমাকে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য করতে এ ঝামেলাগুলোর অর্ধেকই যথেষ্ট ছিলো।

কিন্তু আমি ধৈর্য ধরেছি। সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করেছি ভিন্নভাবে। যেমন, একবার আমাকে বলা হলো ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছে। আমি সরাসরি চলে গেলাম সেখানে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললাম। ব্যস, অসন্তোষ শেষ। বেতন দিতে পারছি না, হাতজোড় করে বলেছি, 'আমার কাছে টাকা নেই। আপনারা চাইলে কাল থেকে না-ও আসতে পারেন। আমার কিছু করার নেই।' শত শত মানুষের মধ্যে কেউ একটা কথা বলে নি। কারণ সমস্যা হয় তখন যখন মালিক-শ্রমিকের মাঝখানে স্বার্থান্বেষী তৃতীয় পক্ষ কলকাঠি নাড়ে এবং সম্পর্কে স্বচ্ছতা না থাকে।

অনেক সময় এসেছে যখন মুহূর্তের মধ্যে আমাকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যার প্রভাব খুব সুদূরপ্রসারী। মেডিটেশন আমাকে দিয়েছে সেই প্রজ্ঞা সাহস বুদ্ধিমত্তা– যার ফলে আমি তা পেরেছি। ফলে যে এমডি একদিন সব বিক্রি করে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, আজ তিনিই এজেন্ট পাঠান ব্যবসা সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব দিয়ে। গত ৪টি বছর ধরে প্রতিনিয়ত আমাকে ব্যবসা বুঝতে হয়েছে এবং তারপর একজন সফল ব্যবসায়ীর মতো সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যা আমাকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। মেডিটেশন এবং ফাউন্ডেশনের ছায়া ছাড়া সম্ভব ছিলো না এ সাফল্যের।

[মাসুদা আক্তার আবেদীন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এপকট গ্রুপ, ২৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোর্স করেই সেঞ্চুরি

মোহাম্মদ আশরাফুল



কোয়ান্টামের মনছবি ২০২৫ সালের মধ্যে সেরা দশ জাতির এক জাতি হওয়া। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলই তার প্রথম রূপকার। আমরা এখন সেরা দশ জাতির এক জাতি হয়েছি। ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে এক নম্বর হবো। কোর্সে এসে আমার আত্মবিশ্বাস ও ধৈর্যশক্তি অনেক বেড়েছে। কোর্স করার ৭ দিনের মাথায় আমি আমার ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ২য় সেঞ্চুরি করি। ক্রিকেট যেহেতু দলীয় খেলা তাই দলগতভাবে মেডিটেশন চর্চা করা উচিত। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে শেখা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনছবির কলাকৌশল আমার খেলার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি মনে করি, প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই এ কোর্সে অংশ নেয়া উচিত।

[সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল, ২৭২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সেরা পাঁচের এক

নিয়াজুর রহমান



ইংল্যান্ডের একটি বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করে চাকরি খুঁজছি। কোথাও কিছু হচ্ছে না। অর্থসংকট, ভিসা সমস্যা আর ঋণ জর্জরিত অবস্থায় দিন কাটছিলো। এমনসময় লন্ডনে কোর্সটা করি। চাকরি খোঁজা বন্ধ করে এমবিএ করলাম। গুরুজীর অনুপ্রেরণায় আপ্রাণ চেষ্টা করলাম ভালো রেজাল্ট করতে। যেখানে ঠিকমতো পাশ করতেই কষ্ট হতো সেখানে শেষ সেমিস্টারে সবগুলো বিষয়েই মেরিট পেলাম এবং পুরো ভার্সিটিতে একমাত্র আমিই পেলাম ডিসটিংকশন। একসময় চাকরি তো দূরের কথা, একটা ইন্টারভিউতে পর্যন্ত ডাক আসতো না। আর এখন আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বীমা কোম্পানি AIG-তে ফিনান্সিয়াল এডভাইজার হিসেবে কাজ করছি। বৃটেনের ৩২২ জন এডভাইজারের মধ্যে আমার অবস্থান চতুর্থে।

[নিয়াজুর রহমান, বৃটেন প্রবাসী, ২৩০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমি এখন ইচ্ছেমতো বৃষ্টিতে ভিজি

চৌধুরী মুজাদ্দিদ আহমেদ



আমার বন্ধুরা যখন মজা করে বৃষ্টিতে ভিজতো, খেলতো– আমি তখন অসহায়ের মতো জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম। আমার মা, নানু সবসময় বলতেন, তুই বৃষ্টিতে ভিজিস না, তোর ঠান্ডা লাগবে। বৃষ্টি বা একটু ঠান্ডা হলেই শুরু হতো প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট। এমনকি হাসপাতালে গিয়ে দুদিন, তিনদিন ধরে অক্সিজেন দিয়ে রাখতে হতো। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের প্রথম দিন শেষে বাসায় ফিরে মাকে বললাম, আমার সামনে ইনহেলার আনবে না। আমি এখন সুস্থ। সেই থেকে আমার আর ইনহেলার ব্যবহার করতে হয় না। যখন বৃষ্টি হয়, ভিজি ইচ্ছেমতো। স্কুলে যাওয়ার আগে গোসল করি, ফেরার পর রাতে আবার গোসল করি, কোনো সমস্যা হয় না।

[চৌধুরী মুজাদ্দিদ আহমেদ, ৯ম শ্রেণীর ছাত্র, ২৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিজেকে নিয়ে ভাবার সুযোগ

মিশু রহমান



দৈনন্দিন কাজের নানা ঝামেলায় একজন মানুষ নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় খুব কম পায়। কিন্তু আমার মনে হয় কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে একজন নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় ও সুযোগ পায়। তার চাওয়াগুলো বুঝতে পারে। মানুষ হিসেবে নিজের শক্তি, ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। নিজের সেই শক্তি ও ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েই একজন নিরাময় লাভ করে, রাগ দমন করে, অনিদ্রা থেকে মুক্তি পায়। এ কোর্সে অংশ নিয়ে একজন খুব সহজেই তার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। এজন্যে চর্চাটা জরুরি।

[মিশু রহমান, টিভি সংবাদপাঠক, ২৯০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



মনের শক্তিই যুগিয়েছে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করার সাহস

প্রফেসর রওশন আরা ফিরোজ

কৌতূহলী হয়ে কোর্স করতে আসা। কোর্সে ইতিবাচকতার শক্তির কথা শুনেছি। পরে নিজেই এর প্রমাণ পেলাম। ১৯৯০ সালে ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়ে ৪০ দিন কোমাতে থাকার পরও বেঁচে উঠেছিলাম শুধু মনের শক্তিতে। পঙ্গুত্ব বা স্মৃতিশক্তি লোপের আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করে আবারও ফিরে এলাম স্বাভাবিক জীবনে।

১৯৯৩-এ এলো আরেক সংকট। আমার ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়লো। অপারেশন হলো। রেডিওথেরাপি, ওরাল থেরাপি এবং ওষুধ চলতে লাগলো। দেশের বাইরেও চিকিৎসা নিতে হয়েছিলো। ফাঁকে ফাঁকে ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের আর্থ-সামাজিক সংকট নিয়ে একটি উপন্যাসও লিখলাম। দেশে ফিরেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কনসালটেন্ট হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছি আড়াইশটি উপজেলায়, কাজ করেছি প্রায় পাঁচশ যুব সংগঠনের সাথে। ক্যান্সারকে বহন করেও জীবনের ব্যস্ততম সময় কাটাতে পেরেছি। কোয়ান্টামের শিক্ষা মানুষের জন্যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকর। আমি এর প্রতিটি কাজের সাথেই একাত্ম।

[রওশন আরা ফিরোজ, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যুব প্রশিক্ষক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবেও রয়েছে তার পরিচিতি। ৩য় ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সমস্ত বৈরী প্রতিকূলতাকে জয় করে নেয়ার সেই চাবি

শুচি সৈয়দ



বছর কয়েক আগে সাংবাদিক দলের সাথে গিয়েছিলাম লামা ভ্রমণে। চোখের পলকে কেটে গেল দুটো দিন। ঢাকায় ফিরে আবারও প্রাত্যহিক জীবন। এর মধ্যে ২৬৩ তম ব্যাচে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হওয়ার সৌভাগ্য হলো। 'সৌভাগ্য' শব্দটি ব্যবহার করছি সত্যিকার অর্থেই সৌভাগ্য বোঝাতে। আমি ফিরে পেলাম আমাকে।

শোকর গোজারির মধ্যে যে অসাধারণ আত্মিক শক্তি আছে তা কোয়ান্টামের অভিযাত্রায় শরিক না হলে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না।

একটি দাগেস্তানী প্রবাদ আছে 'দরজাটা ভেঙো না, কারণ ওটা চাবি দিয়ে খোলা যায়।' কোয়ান্টাম হচ্ছে সমস্ত বৈরী প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে জয় করে নেয়ার সেই চাবি।

[শুচি সৈয়দ, সিনিয়র সাব এডিটর, দৈনিক যুগান্তর, ২৬৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

থানায় খোঁজার কথাই প্রথম বললাম

মামুন রশিদ



কোর্স করে শিখলাম ইতিবাচক চিন্তা করতে। নিয়মিত মেডিটেশন করে এখন আমি যেকোনো কাজের চাপকে নিতে পারি অনেক সহজে। একদিন সন্ধ্যায় আমার ড্রাইভার এসে হাউমাউ করে কেঁদে বললো তার ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছে না। মুহূর্ত চিন্তা করে আমি তাকে থানায় যেতে বললাম। কমান্ড সেন্টারেও একই অনুভূতি পেলাম। থানায় গিয়েই তাকে পাওয়া গেল। সহপাঠী এক প্রভাবশালীর ছেলের সাথে হাতাহাতি হওয়ায় সে থানায় আটকে ছিলো। আমি তো অন্য জায়গায় খোঁজার কথাও বলতে পারতাম। থানার কথাই প্রথম বললাম এটা বিস্ময়কর।

[মামুন রশিদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, ২৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দুস্থ তাঁতীদের জন্যে কিছু করতে চেয়েছিলাম

নাসিহা নূর আফজা কুইনী



২০ তম ব্যাচের গ্রাজুয়েট স্বামী ইঞ্জিনিয়ার আলী মনসুরের সঙ্গে

নাকের একটা সমস্যার কারণে কোর্স করে আমি ভালো হয়েছিলাম। তবে আমার সবচেয়ে বড় যে উপকার হয়েছে তা হলো– বেকার তাঁতীদের নিয়ে কাজ করার স্বপ্ন বাস্তবায়ন।

দেশীয় ঐতিহ্য জামদানি ও মসলিন শাড়ি নিয়ে ছোট্ট পরিসরে আমার বুটিক শপের কাজ শুরু করেছিলাম। তারপর আর পেছনে তাকাতে হয় নি। ছোট্ট বুটিক শপটি বিস্তৃত হয়েছে। এমনকি দেশের বাইরেও যাচ্ছে আমার শাড়ি। এক আমেরিকান মহিলা শুধু আমার শাড়ি দেখেই বাংলাদেশে এসেছিলেন আমাকে দেখার জন্যে। কাজ করার মনোবল এবং বিশ্বাস, স্ট্রেস মোকাবেলা ও নিরলস পরিশ্রম করার মানসিকতা– সবকিছুই আমি পেয়েছি কোয়ান্টাম থেকে।

[ফ্যাশন ডিজাইনার নাসিহা নূর আফজা কুইনী, ৪১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমি বিস্মিত!

মওলানা আবদুল মান্নান তালিব



কর্মব্যস্ততার মাঝেও কোর্সে এসে মনে হলো– এ যেন সাগর সৈকতে একজন দক্ষ সাঁতারুর সাঁতার কাটার মতোই সহজ ও সাবলীল।

আমাদের সুফি-এ-কেরাম, ভারতের সাধু-সন্ন্যাসী আর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মহানির্বাণ– এসব সম্পর্কে জানাশোনাও ছিলো। আমি শুধু কৃচ্ছ্রসাধনার ব্যাপারটিই জানতাম। কিন্তু কোয়ান্টাম এ ধ্যানসাধনাকে সাধারণ মানুষের নাগালে যেভাবে নিয়ে আসতে পেরেছে তা দেখে সত্যিই আমি বিস্মিত হয়েছি।

[মাসিক পৃথিবী পত্রিকার সম্পাদক, ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা আবদুল মান্নান তালিব, ৪৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মনছবির সাফল্য সাত দেশ ভ্রমণ

তাহমিনা ইসলাম



২০০৭ সালে সুইডেনের গোথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলাম। নিজের খরচে পড়তে হবে জেনে গেলেও ২ মাসের মাথায়ই পেলাম স্কলারশিপ যা ছিলো মনছবির ফসল। সুইডেনের যে অভিজাত এলাকায় আমি থাকতাম এত সুলভে কোনো বিদেশি ছাত্রছাত্রীর সেখানে থাকার সুযোগ পাওয়া ছিলো একটা বিরল ব্যাপার।

এরপর দেখতে লাগলাম দেশ ভ্রমণের মনছবি। আমার ক্লাসের ২০ সহপাঠী এসেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের ১৬টি দেশ থেকে। তাদের এবং আত্মীয়-বন্ধুদের সুবাদে আমি একে একে নরওয়ে ডেনমার্ক বৃটেন জার্মানি ফ্রান্স বেলজিয়াম এবং আমার অবস্থানস্থল সুইডেনসহ ইউরোপের ৭টি দেশ ভ্রমণ এবং দেখার সুযোগ পাই। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলো লন্ডন সফর। বড়দিনের লম্বা ছুটিতে আমার এ সফরের সময় ফাউন্ডেশনের লন্ডন শাখায় একটি সেমিনারে অংশ নিই। বার বারই মনে হচ্ছিলো গুরুজীর কথা, একসময় দেশের মাটি ছাড়িয়ে বিদেশেও যাবেন কোয়ান্টামের বাণীবাহকরা। সে কথারই সার্থক রূপকার আজ হলাম আমি।

[তাহমিনা ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মানুষের নির্ভরতার প্রতীক কোয়ান্টাম

ড. মুহম্মদ শাহ আলম খান



১৭৫ তম ব্যাচে সক্রীক কোর্স করার সময়

আমার বাসার দক্ষিণ দিকে একটি বারান্দা আছে। বারান্দাটি আমাদের খুব প্রিয়। রাতে মেডিটেশনের পর যখন বারান্দায় দাঁড়াই, বাইরের গাছপালাগুলো যেন গভীর মমতায় ঝুঁকে আসে কাছে; যেন জানাতে চায় প্রকৃতির সাথে মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কের কথা। এ বোধটিই আমার ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কক্ষের দেয়ালে একটি ছোট্ট নোটিশ বোর্ড আছে। তাতে এক টুকরো কাগজে লিখেছি– 'আমরা এক মহান জাতি'। নিজেকে প্রতিদিন মনে করিয়ে দিতে চাই– আমরা এক মহান জাতির উত্তরসূরি। আমাদের গৌরবময় অতীত আছে, রয়েছে প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ।

ফাউন্ডেশনে যখনই আসি, দেখি তারুণ্যে দীপ্ত সদাহাস্যমুখ একদল বিনম্র মানুষকে, এই সম্ভাবনা তখন এক নিকট বাস্তবতার রূপ নিয়ে দাঁড়ায় আমার সামনে। মনে হয়, এ দেশের এ জাতির পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। কারণ একদল মানুষ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছেন। এই দলটি অতি দ্রুত বিশাল একটি আকার নেবে। নতুন নেতৃত্ব, নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বিভিন্ন বয়সের এই নতুন প্রজন্মের মানুষদের মাঝ থেকে।

ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পৃক্ততার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে অপূর্ব সব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি হয়েছে। লামার কোয়ান্টাম পল্লী, শিশুকানন, কেন্দ্রের আলোকায়ন, কোয়ান্টায়নে জালালি কিংবা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকেই নতুন উপলব্ধি আর অনির্বচনীয় অনুভূতি হয়েছে।

গত ১৭ বছরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে ধ্যানচর্চাকে জনপ্রিয় করেছে। রোগ ও সমস্যামুক্তির জন্যে হিলিং-এর সেবার মাধ্যমে অজস্র মানুষের নিশ্চিত নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স মানুষকে দিয়েছে জীবনযাপনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনের শক্তিকে ব্যবহারের সহজ প্রক্রিয়া। মাত্র ১৭ বছরে ৩০০টি কোর্স সম্পন্ন করার ইতিহাসই বলে দেয় ফাউন্ডেশনের গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা কতটুকু।

[ড. মুহম্মদ শাহ আলম খান, অধ্যাপক, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টাম মেথড বইটি আমার সারাক্ষণের সঙ্গী

সুমনা সোমা



কোর্স করে আমার ঘুমের সমস্যা দূর হয়ে গিয়েছিলো। কোয়ান্টাম মেথড বইটি হয়ে গেল আমার সারাক্ষণের সঙ্গী। গাড়িতে, শুটিংয়ে যেখানে যাই আমার ব্যাগে আছে এ বই। এমনকি কিছুদিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আমার বড়ভাই মারা যান। ক্লিনিকে সারাক্ষণ ওর পাশে বসে এ বই থেকেই পড়ে শোনাতাম। যারা দেখতে আসতো আমার কাছে শুনে তারা সবাই কোর্স করতে চেয়েছে। পরিবারের সবচেয়ে ছোট হওয়ায় সবার আগলে রাখা পরিবেশেই আমি বড় হয়েছি। সেই আমি যে কীভাবে ভাইয়ের মৃত্যুর এত বড় একটা ঘটনাকে সামাল দিলাম, ভাবতে আমার নিজেরই অবাক লাগে। আমি বিশ্বাস করি আমার এ মানসিক শক্তির উৎস কোয়ান্টাম মেথড।

নানা কাজের ভিড়ে সারাক্ষণই আমি যেন অপেক্ষা করি কখন একটু ফুরসত পাবো, একটু নিরিবিলি পাবো মেডিটেশন করার জন্যে, মনের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে। আমার ইচ্ছে আছে ফাউন্ডেশনের পরবর্তী সবগুলো কোর্সেই অংশ নেয়ার।

[সুমনা সোমা, টিভি ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, ২৯৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও দেখতাম

সামিনা মুস্তারীন



কোয়ান্টাম আমার জীবনে এনে দিয়েছে অনেক অনেক বিস্ময় আর ইতিবাচক বাস্তবতা। মনছবি করে বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে এমএসসি করছি। রেজাল্টও আগের চাইতে অনেক ভালো হয়েছে।

এমএসসি পড়াকালীন চাকরির আবেদন করেছি আমেরিকার ৪টি প্রতিষ্ঠানে। অনেকে বলেছিলো– মাথায় স্কার্ফ পরি বলে আমার ভালো চাকরি হবে না। আমি শুধু বিশ্বাস করেছি, শয়নে স্বপনে মনছবির সাথে একাত্ম থেকেছি। হয়তো অপেক্ষা করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসের জন্যে– মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে 'চাকরির বেতন পেয়ে কী কী করবো, চাকরি করার অনুভূতি কেমন হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি যেখানে চাকরি করতে চাই সে প্রতিষ্ঠানের পোশাকে নিজেকে আয়নায় অবলোকন করার চেষ্টা করেছি। স্রষ্টার অপার করুণায় যে কটি প্রতিষ্ঠানে চাকরির আবেদন করেছি– সব কটি থেকে ইন্টারভিউয়ের ডাক পেয়েছি এবং ইন্টারভিউয়ের ৩/৪টি ধাপ পেরিয়ে কোম্পানিতে Day visit করতে গিয়েছি প্রায় সবক্ষেত্রে। অবশেষে কিছুদিন আগে ৬ ধাপ ইন্টারভিউ প্রসেস পেরিয়ে Procter & Gamble (P&G)-এর ফাইনাল অফার গ্রহণ করেছি।

[প্রকৌশলী সামিনা মুস্তারীন, ১৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

লক্ষ্য এবার অলিম্পিক

আসিফ হোসেন খান



২০০২ সালে কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ের পর থেকে আমি লাইমলাইটে চলে আসি। কিন্তু এরপর প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারছিলাম না। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনায় আমার ক্যারিয়ারই প্রায় শেষ হতে চলছিলো। একসময় চিন্তা করেছিলাম শুটিং-ই ছেড়ে দেয়ার। কোর্সে এসে আমি সেই হারানো ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। আমি পুরনো সেই আসিফকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবো।

কোর্স করার ৩ মাসের মাথায় দীর্ঘ ৪ বছর পর পাকিস্তানে চতুর্থ সাফ শুটিংয়ে ব্যক্তিগত ও দলীয়– দুটি ইভেন্টেই স্বর্ণ জয় করি। এখন আমার মনছবি হলো অলিম্পিক জয়। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, ভাগ্য সহায় থাকলে বাংলাদেশকে অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণ আমিই এনে দিতে পারবো। ২০০২-এর কমনওয়েলথ গেমসের মতো আগামী অলিম্পিকও হচ্ছে ইংল্যান্ডে। আমার সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ স্কোর হচ্ছে ৫৯৫। গত অলিম্পিকে সোনাজয়ী বিন্দ্রার স্কোর ছিলো ৫৯৬। আর বিন্দ্রাকে হারিয়েই কমনওয়েলথে আমি সোনা জিতেছিলাম।

[জাতীয় শুটার আসিফ হোসেন খান, ২৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দীর্ঘ জীবন • অনন্ত যৌবন • কালজয়ী মন • সুখ প্রতিক্ষণ ॥ পৃথিবী আমারই



৪ টি দিন কীভাবে কেটে গেল!

শাহজাহান সরদার

৬ বছর আগে যখন কোর্স করি, ৪টা দিন যে কীভাবে কেটে গিয়েছিলো বুঝতেই পারি নি। ৪০ ঘণ্টার আলোচনা, মেডিটেশনে কোথাও কোনো রিপিটেশন নেই। বিরক্তি তো দূরের কথা বক্তব্যের পরের অংশ শোনার জন্যে মন যেন আকুল হয়ে থাকতো। কোর্সের শিক্ষা ও নির্দেশনাগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি সবসময়। স্ত্রী ও ৩ ছেলেসহ পরিবারের সবাই আমরা কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। বিদেশে উচ্চশিক্ষারত বড় ২ ছেলের মতো স্ত্রী ও কলেজ পড়ুয়া ছোট ছেলেটিরও নিয়মিত সঙ্গী এখন মেডিটেশন।

[ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রাক্তন সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক শাহজাহান সরদার, ১৫৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ম্যানেজার বলেছিলেন তিন বছরেও পদোন্নতি হবে না

মনজুর ইলাহী চৌধুরী



আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যে যখন যাত্রা করি তখন আমার কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার এবং অপারেশন ম্যানেজার দুজনই বলেছিলেন, আমি যে পোস্টে (ক্লার্ক) যাচ্ছি সেখানে ৩ বছরের মধ্যে কোনো প্রমোশন বা বেতন বাড়ার সম্ভাবনা নেই। দেশে বেকার ছিলাম। তাই এ নিয়ে আর ভাবি নি।

প্রথম দিন যখন কাজে যোগ দেয়ার জন্যে অফিসে গেলাম, তখনও জিএম আমাকে খুব কড়াভাবে একই কথা বললেন। বেতন ছিলো মাত্র ১,৩০০ দেরহাম। মনছবি করলাম এ অফিসের ম্যানেজার হবো। ৩ মাস পর হঠাৎ আমার অফিসের একাউন্টেন্ট বিশেষ প্রয়োজনে বাড়িতে গেলেন। আমাকে জিএম জিজ্ঞেস করলেন একাউন্টসের কাজ জানি কি না। এতদিন পর আমার বিকম পড়া কাজে লেগে গেল। শুরু করলাম এসিস্টেন্ট একাউন্টেন্ট হিসেবে। বেতন হলো ১,৭০০ দেরহাম। কিছুদিন পর হলাম সেলস এক্সিকিউটিভ এবং বর্তমানে এ অফিসের সেলস ম্যানেজার অর্থাৎ দ্বিতীয় কর্ণধার ব্যক্তি। বেতন ৩,৫০০ দেরহাম। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে কোম্পানি থেকে গাড়িও দিয়েছে। আর এ সবকিছুই হয়েছে মাত্র দেড় বছরে।

[ব্যবস্থাপক মনজুর ইলাহী চৌধুরী, ২০৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দুজন প্রফেসরই মেইল ব্যাক করলেন

সানিয়া বিনতে মাহতাব



ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় আমি কোর্স করি। তখন থেকেই মেডিটেশন আমার নিত্যসঙ্গী। বুয়েটে আমি বরাবরই ফার্স্ট ছিলাম। কিন্তু ডিপার্টমেন্টে পোস্ট খালি না থাকায় ৪ বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ ছিলো। আমার ক্লাসমেটরা মজা করে বলতো ফার্স্ট হয়ে কী করবে? কিন্তু আমি আশাবাদী ছিলাম। বিএসসি শেষ হলে এমএসসি-তে ভর্তি হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই আমার এক স্যার আমাকে ডেকে বললেন যে, উচ্চশিক্ষার জন্যে তিনি রিজাইন করছেন এবং আমি যেন তার পোস্টে আবেদন করি। অতঃপর প্রসেসিং শেষ করে কিছুদিনের মধ্যে প্রভাষক হিসেবে বুয়েটে যোগ দিলাম।

পিএইচডি-র জন্যে ভাবলাম খুব বেশি জায়গায় চেষ্টা না করে পছন্দমতো জায়গায়ই এপ্লাই করবো। ওয়েবসাইটে নর্থ আমেরিকার অন্যতম সেরা ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির দুজন প্রফেসরের প্রোফাইল দেখে ভালো লাগলো। দুজনই খুব ব্যস্ত প্রফেসর। টানা ১০ দিন মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে তাদেরকে এনে বোঝাতে লাগলাম– আমি তাদের সাথে কাজ করতে চাই এবং তারা যেন সহজেই আমাকে রেসপন্ড করেন। সাথে সাথে মাটির ব্যাংকেও মানত করলাম। ১০ দিন পর সিভিসহ তাদের দুজনকে ই-মেইল করলাম। রাত ৮টায় মেইল করেছি। রাত ১টার মধ্যে একজন এবং পরদিন সকালে আরেকজন প্রফেসর মেইল ব্যাক করলেন। দুজনই আমাকে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী এবং ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে ফর্মাল এপ্লিকেশন করতে বলেছেন। অথচ এ ধরনের কাজে প্রফেসরদের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের সম্মতি পেতে ২ থেকে ৩ মাস চলে যায়।

একবার বুয়েটে আমার অফিসরুমে তালা দেয়া হয় নি। আমার ল্যাপটপ, পিসিসহ পরীক্ষার খাতা ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ছিলো যা অন্যের হাতে গেলে আমাকে অনেক সমস্যায় পড়তে হবে। এত রাতে কী আর করা যায়। মাটির ব্যাংকে দান করে ঘুমালাম। পরদিন অফিসে গিয়ে দেখি রুম খোলা ঠিকই কিন্তু ভেতরে জিনিসপত্র সব ঠিকঠাক আছে। কিছুই খোয়া যায় নি। স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম।

[সানিয়া বিনতে মাহতাব, লেকচারার, বুয়েট, ১০ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সঞ্চয় প্রবণতা বেড়েছে

মোহাম্মদ শরীফুল আকিব



মনছবি ছিলো আমাদের একটা নিজস্ব বাড়ি থাকবে যেখানে শাক-সবজির বাগান, হাঁস-মুরগির খামার থাকবে। পরিবার হবে স্বাবলম্বী। কিন্তু অর্থের অভাব, জায়গা নিয়ে জটিলতা ইত্যাদি কারণে তা হয়ে উঠছিলো না। মনছবি দেখতে লাগলাম। মা-বাবাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকলাম। অবশেষে মাত্র ৭ লক্ষ টাকা নিয়ে শুরু করলেও ৬ মাসের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল আমাদের নিজস্ব বাড়িটি। বাড়ির আঙিনায় এত পরিমাণ মৌসুমী সবজি হয় যে, মাছ-মাংস ছাড়া আমাদের আর কিছুই কিনতে হয় না। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্যে প্রতিদিনের বরাদ্দ একটি করে ডিম যা আমাদের বাড়িতে পালিত দেশি মুরগি থেকেই পাই। আগে আমাদের পরিবারে সঞ্চয় প্রবণতা ছিলো না। এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিমিতি অবলম্বন করি বলে আর্থিক সচ্ছলতাও বেড়েছে।

[মোহাম্মদ শরীফুল আকিব, এসিসিএ-র ছাত্র, ২৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

হকিতে আমাদের পক্ষেও চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব

আজিজউল্লাহ হায়দার জামাল



কোয়ান্টাম কোর্সে অংশ নেয়ার কিছুদিনের মধ্যে জাতীয় হকি দলের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব লাভ করি। বিকেএসপি'র শিবিরে কোচিংয়ের সঙ্গে কোর্সে শেখা আত্মবিশ্বাস ও অখণ্ড মনোযোগের চর্চা সংযুক্ত করলাম। পাশাপাশি চললো মেডিটেশন এবং সাফল্যের মনছবি। ২০০৬ সালে ১ম বারের মতো এশিয়ান গেমস হকির বাছাই পর্বে ৭টি দেশের মধ্যে একমাত্র অপরাজিত দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এশিয়াড হকিতে খেলেছে বাংলাদেশ। সফলতার এ ধারা অব্যাহত রাখুক বাংলাদেশ হকি টিম।

[আজিজউল্লাহ হায়দার জামাল, ২০০২ সালে হকিতে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত দেশবরেণ্য ক্রীড়াবিদ ও প্রশিক্ষক। জাতীয় হকি দলের সাবেক অধিনায়ক ও ১৯৮৭ সালে এশিয়া অলস্টার একাদশের একমাত্র বাঙালি খেলোয়াড়, ২১৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

খেলোয়াড়রা উপকৃত হবেন



ডা. অনুপম হোসাইন

আমি অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। ফলে কাজের চাপ সইতে হয় অনেক। দেখা যায়, এক জায়গার চাপ আরেক জায়গায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। মূলত এজন্যেই কোর্সে আসা। আমার কাছে মনে হয়েছে মেডিটেশনের মাধ্যমে ফলপ্রসূভাবে টেনশন মোকাবেলা করা যায়।

ক্রীড়াঙ্গনে টিকে থাকতে হলে মাথা সবসময় ঠান্ডা রাখতে হয়, প্রো-একটিভ হতে হয়। সবকিছু মিলিয়ে যে ধরনের মনস্তত্ত্ব একজন ক্রীড়াবিদের থাকা জরুরি তা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে শেখানো হয়। কোর্সটি করলে খেলোয়াড়রা উপকৃত হবেন।

[ডা. অনুপম হোসাইন, এটিএন বাংলার ক্রীড়া অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও ক্রীড়া ধারা ভাষ্যকার, ২৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

যেকোনো পরিস্থিতিতে মনে সাহস রাখাই কোয়ান্টামের মূল সুর

ফেরদৌসী মজুমদার



দীর্ঘদিন ধরে পায়ের আর্থ্রাইটিসে ভুগছিলাম। ভেষজ থেকে শুরু করে নানা চিকিৎসাপদ্ধতি গ্রহণ করেছি। কিন্তু কিছুতেই রোগমুক্ত হতে পারছিলাম না। তখন নিরুপায় হয়ে আমার স্বামী কোয়ান্টামের কথা বলেন। আমিও রাজি হয়ে যাই।

কোর্সের ৪টি দিনকে এক কথায় চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা বলা যায়। যেন এক অন্যরকম সুখানুভূতিতে নব উদ্যমে জেগে উঠেছিলাম আমি। গুরুজীর বক্তব্যগুলো শুনতাম মুগ্ধ হয়ে। সেইসাথে ভালো লেগেছিলো কোয়ান্টামের পরিবেশ ও শৃঙ্খলা। আর এ ভালোলাগা থেকেই মনের জোরটা বেড়ে গেল। পায়ের প্রচণ্ড ব্যথার মধ্যে কোয়ান্টাম কোর্স আমাকে তাৎক্ষণিক শান্তি দিয়েছিলো।

রোগমুক্তি স্রষ্টার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু নিজের চেষ্টা করতে তো দোষ নেই। কোয়ান্টামের মূল সুর হচ্ছে যেকোনো পরিস্থিতিতে মনে সাহস রাখা। কোয়ান্টামে এসে বুঝলাম, রোগে হতাশায় কীভাবে মনোবল দৃঢ় রাখতে হয়। নেতিবাচক চিন্তার বিপরীতে 'আমি রোগমুক্ত হবো, ব্যথা চলে যাবে'– এ ইতিবাচক চিন্তা লালন এবং সবসময় 'আমি ভালো আছি' বলার মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্যে প্রত্যেকের কোয়ান্টামে যাওয়া উচিত।

[একুশে পদকপ্রাপ্ত জাতীয় নাট্যব্যক্তিত্ব ফেরদৌসী মজুমদার। চার দশক ধরে মঞ্চ ও টিভি নাটকের এই সফল অভিনেত্রী কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১৫৬ তম ব্যাচে অংশ নেন]

সাফল্যের সহজ ফরমুলা

মীর নাহিদ মাহমুদ



২০০১ সাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়েছি। স্বপ্ন– প্রথম হবো, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবো। স্বপ্নপূরণের অভিযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ নিতেই হোঁচট খেলাম। প্রথম দুটো ইনকোর্সে পুওর মার্কস পেলাম। আত্মবিশ্বাস একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকলো। যে আমি এইচএসসিতে রেকর্ড নম্বর পেয়ে সারাদেশে প্রথম হয়েছি সেই আমি ভুগতে লাগলাম হীনম্মন্যতায়। আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি, অর্থনীতিতে ভালো রেজাল্ট করতে পারবো তো? এমন সময় কোর্সটি করলাম।

অবিশ্বাস্য স্বপ্নময়তায় ভরা ৪টি দিন পার হলো। ডুবন্তপ্রায় আমাকে শক্ত মাটিতে দাঁড় করালো কোয়ান্টাম মেথড। নিজের সামর্থ্যে বিশ্বাস পুনরুদ্ধার তো হলোই, সাথে পেলাম জীবনযাপনের চমৎকার সব সূত্র। শুরু হলো নব আনন্দে পথ চলা। দুবেলা মেডিটেশন আর রুটিন করে পড়ালেখা– গুরুজীর শেখানো এ সহজ ফরমুলা ছাত্রজীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি।

পাশাপাশি কোয়ান্টামের সেবামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করে জীবনকে আরো অর্থবহ করে তুলতে পেরেছি। অনার্স আর মাস্টার্স– দুটোতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে প্রভাষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছি। আর এখন উচ্চশিক্ষার্থে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে এসেছি ইংল্যান্ডের ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

[মীর নাহিদ মাহমুদ, ১২৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অটোসাজেশনে নিরাময়

এডভোকেট মো. শাহজাহান বিশ্বাস



দীর্ঘজীবন পরিক্রমায় একসময় যে অবসাদ ভর করে, প্রেরণা উদ্দীপনা হারিয়ে যেতে থাকে, আমিও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না। সাথে দেখা দিলো নানা রোগ-ব্যাধি। দুকানের ভেতর এবং দাঁতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বললেন কানের পর্দায় ইনফেকশন হয়েছে। এর কোনো চিকিৎসা নেই। এভাবে কাটাতে হবে বাকি জীবন। দাঁতের ডাক্তারও বললেন– ইনফেকশন হয়ে দাঁত নষ্ট হয়ে গেছে। ফেলে দিতে হবে কয়েকটা দাঁত। কিন্তু ডায়াবেটিসের কারণে জটিলতা হতে পারে ভেবে সেটা করা যাবে না বলে রায় দিলেন আবার তারাই। অগত্যা কান ও দাঁতের প্রচণ্ড ব্যথা আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকলো।

এমন সময় কোয়ান্টাম মেথড বইটি হাতে পেলাম। নিরাময় অধ্যায়টি বার বার পড়ে অটোসাজেশন দিতে লাগলাম। ৩ মাসের মধ্যেই আমার অসহনীয় ব্যথা সম্পূর্ণ উধাও। আমি বিস্মিত! এ কী নতুন উদ্ভাবনী শক্তি যা চিকিৎসা বিজ্ঞানকেও অতিক্রম করে যায়! আর কোর্স করে আমার স্থবির জীবনে সঞ্চারিত হলো এক নতুন গতিবেগ।

[মো. শাহজাহান বিশ্বাস, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ২৯৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমার জীবনে অনেক কিছুই হচ্ছে

রফিকুর রহমান রেকু



মানুষ কখনো কখনো বিশৃঙ্খল হয়ে যায়, বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এ থেকে আবার জীবন ফিরেও পাওয়া যায়। কোয়ান্টামে আপাদমস্তক সুশৃঙ্খল একটি জীবনযাপনের বিজ্ঞান খুঁজে পেয়েছি। জীবনকে আগের চেয়ে গোছাতে পারছি অনেক বেশি। বিশ্বাসের মাত্রাও বেড়েছে। আগে অনেক কিছুই মনে হতো 'হবে না'। এখন সেগুলোই মনে হয় 'হবে' এবং তা হচ্ছে।

নিয়মিত মেডিটেশন করে শুধু নিজেরই না, অন্যেরও উপকার করতে পারছি। কোর্সের শেষ দিন খবর পেলাম বাবা ভীষণ অসুস্থ। যদি বাবাকে দেখতে দিনাজপুর চলে যাই তাহলে পরদিন গুরুজীর সাথে সাংবাদিকদের বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবো না। আবার বাবার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে সারাজীবনের জন্যে আক্ষেপ থেকে যাবে। তবু বিশ্বাস করে থেকে গেলাম এবং মেডিটেশনে বসে অন্যকে নিরাময়ের যে শিক্ষা কোর্সে শিখেছি তা কাজে লাগিয়ে বাবাকে হিলিং করলাম। একদিন পরে দিনাজপুরে গিয়ে বাবাকে দেখলাম অনেক সুস্থ।

[রফিকুর রহমান রেকু, ফটো সাংবাদিক, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৭২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

হ্যালো আপনাকে বলছি...



হ্যালো আপনাকে বলছি– বিটিভির লাইভ অনুষ্ঠানে 'দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে'-এর ওপর দীর্ঘ আলোচনা প্রচার করা হয় ১৮ মার্চ, ২০০৫। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও টিভি ব্যক্তিত্ব জনাব আলী ইমামের উপস্থাপনায় সরাসরি সম্প্রচারিত এ অনুষ্ঠানে আলোচনা ও টেলিফোনে দর্শকদের প্রশ্নের জবাব দেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান, বিশিষ্ট ব্যাংকার শ্রী সুকুমার চক্রবর্তী, বিশিষ্ট শিল্পপতি কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ, গবেষক রাবিয়া নাজরীন এবং বুয়েটের প্রভাষক সানিয়া বিনতে মাহতাব।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থাপক আলী ইমাম বলেন, 'আমাদের কাছে প্রচুর প্রশ্ন এসেছিলো যে, আমরা নিজেদেরকে পরিবর্তিত করতে চাই। চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী বা গৃহিণী– কেউই নিজের অবস্থান নিয়ে তৃপ্ত নন। অসুস্থ মানুষ জানেন না কীভাবে তিনি ভালো হবেন। আমরা খোঁজ করলাম কোথায় এগুলোর সমাধান হয়। খোঁজ পেলাম কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কেন্দ্রের।'

আলোচকদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেন, আমরা বুঝলাম যে, কোয়ান্টাম মেথডের মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তিত করা যায়। নিজের ভেতরের সুপ্ত ক্ষমতাকে বিকশিত করা যায়। নিজেকে চেনা যায়। বোঝা যায়।

অনুষ্ঠানের উপসংহারে তিনি বলেন, 'আমি আজকের এ অনুষ্ঠান থেকে একটা ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হলাম যে, দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আশাবাদী হতে হবে। প্রবল আশার রক্তিম সূর্য আমাদের জীবনের চারপাশের অন্ধকারের ওপারেই আছে।'

দর্শকদের বিপুল আগ্রহের প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানটি বেশ কয়েকবার পুনঃপ্রচারিত হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ২২ জুলাই, ২০০৫ প্রচারিত হয় 'হ্যালো আপনাকে বলছি'-তে কোয়ান্টামের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'। এতে আলোচনায় অংশ নেন মিসেস সুরাইয়া রহমান, ডা. মনিরুজ্জামান, অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব, এসিএমএ রানা প্রতাপ ঘোষ এবং রাবিয়া নাজরীন। এ অনুষ্ঠানে শারীরিক মানসিক পারিবারিক ও পেশাগত ক্ষেত্রে রাগের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার নিয়ে তারা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

দর্শকদের বিপুল আগ্রহে এ অনুষ্ঠানটিও অনেকবার পুনঃপ্রচারিত হয়।

প্রতিটি প্রমোশন হয়েছে সময়মতো

এবিএম মাহবুবুল আলম



আমি একটি প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে কাজ করি। কর্মজীবনে প্রমোশন একটি বিরাট বিষয়। নির্ধারিত সময়ে প্রমোশন না হলে অন্যদের চেয়ে আর্থিক সুবিধার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়তে হয় আর মানসিক যন্ত্রণার তো শেষ থাকে না। আমার প্রতিটি প্রমোশন হয়েছে নির্ধারিত সময়ে যা আমার সমসাময়িক কোনো সহকর্মীর ভাগ্যে জোটে নি। নিয়মিত মেডিটেশন আর ফাউন্ডেশনের সকল সৎকর্মের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে নীরবে স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে যাওয়াই আমার পেশাগত জীবনে সাফল্যের মূল ভিত্তি বলে আমি বিশ্বাস করি।

[ব্যাংকার এবিএম মাহবুবুল আলম ১ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

শিক্ষকতায় সাফল্যের নেপথ্যে

সুমন ধর



শিক্ষক হিসেবে যতটুকুই সাফল্য অর্জন করেছি তার মূলে রয়েছে মনছবি। মনছবি দেখতাম– ক্লাস নিচ্ছি, ছাত্ররা তন্ময় হয়ে শুনছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গেলেও খেয়াল করছে না। ক্লাসে কারো মোবাইল বাজলে বা কেউ অনর্থক শব্দ করলে ছাত্ররাই বিরক্ত হচ্ছে। আমার পড়ানোটা হচ্ছে মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে। জীবনের মৌলিক বাস্তবতাগুলো তাদের সামনে উপস্থাপন করায় তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকছে। ছাত্রদেরকে সম্মান করছি, তারাও আমাকে সম্মান করছে। আর এ মনছবির পাশাপাশি বাস্তবে নিয়মিত স্বরায়ন, নাসায়নসহ আমার সাবজেক্ট সোশিওলজি সম্পর্কে আরো জানার জন্যেও প্রতিনিয়ত আমি চেষ্টা করি। সারাক্ষণই ভাবতে থাকি আরো ভালো কীভাবে পড়ানো যায়।

[সুমন ধর, সিনিয়র লেকচারার, স্কুল অফ বিজনেস, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ১১৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সেই পরিমাণ অর্থ পেয়ে গেলাম

আনিসুর রহমান



বলা হয়, স্রষ্টার কাছে চাওয়ার মতো করে চাইলে তার প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। মেডিটেশন বা ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ নিজের মধ্যে লীন হয়। আর স্রষ্টার উপস্থিতি সেই মানুষের মধ্যেই। যে কেউ নিজের মধ্যে লীন হয়ে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করে যেকোনো চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরিত করতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি একাধিকবার এ চর্চার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছি। যেমন, পেশাগত কাজে কয়েকবছর আগে একটি দেশের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমাকে যেতে হয়েছিলো। সেখানে মনে হলো, সঙ্গে আরো অন্তত ৩০০ ডলার থাকলে ভ্রমণটা সচ্ছন্দ হতো। মেডিটেশনে অটোসাজেশন দিলাম। সেদিনই কাঙ্ক্ষিত পথে পেয়ে গেলাম ঠিক সে পরিমাণ অর্থ। আমার অনেকগুলো ছোট-বড় প্রাপ্তির মধ্যে এটি একটি ছোট উদাহরণ।

[আনিসুর রহমান, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) বিশেষ সংবাদদাতা এবং প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) ও গালফ নিউজের বাংলাদেশ প্রতিনিধি, ১৯২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাস্তবে নীরবে নিরলস কাজ করুন। প্রয়োজনীয় গুণ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগান। এভাবেই আপনি সাফল্য গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হবেন।

মনছবি ছিলো অসহায় শিশুদের সেবা করা

ডা. আহমেদ মরতুজা



মনছবি ছিলো দেশের গরিব অসহায় শিশুদের সেবা করবো। সেজন্যে বিদেশে না থেকে ফিরে এলাম দেশে। যেহেতু সরকারি চাকরিতে এ সুযোগটা বেশি, তাই আমার মনছবির প্রথম ধাপ হলো সরকারি চাকরিতে যোগদান। ইন্টারভিউতে উপস্থিত হলাম। সেখানে শর্ত দেয়া হলো, রিসার্চ পেপার থাকতে হবে। সৌভাগ্যের বিষয়, আমার রিসার্চ পেপার ছিলো সবচেয়ে বেশি। ১৯৯৯ সালে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দিলাম। উল্লেখ্য, পিএসসি-তে সরাসরি নিয়োগ পাওয়া একটি বিরল ঘটনা। এর আগে মাত্র দুজন ডাক্তার এ সুযোগ পেয়েছিলেন।

মনছবির ধারাবাহিকতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসার জন্যে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে চালু করি শিশু নিউরোলজি ক্লিনিক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে চালু করি শিশু নবজাতক ইউনিট (স্পেশাল কেয়ার বেবি ইউনিট)। বর্তমানে এ ইউনিটটি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও অভিভাবকহীন নবজাতকদের চিকিৎসার একমাত্র ভরসাস্থল।

[গবেষক লেখক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আহমেদ মরতুজা, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক। ৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পেয়েছি বাঁচার মন্ত্র

সালমা নাসরীন



সততা বজায় রাখার কারণে চাকরির নানা পর্যায়ে ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়েছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতাম। ফলে বদলিসহ নানারকম হয়রানির শিকার হয়েছি। এক পর্যায়ে মানসিকভাবে নেতিবাচক হয়ে উঠি। কমে যায় আত্মবিশ্বাস। এমনকি বেশ কিছুদিন ধরে মনে হচ্ছিলো, আমি আর এ পৃথিবীতে টিকতে পারবো না। কিন্তু কোর্স করে আমি যেন নতুনভাবে বাঁচার প্রেরণা পেয়েছি। আজ আর আমার কোনো অতৃপ্তি নেই। এতদিন ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুমাতে পারতাম না। আর এখন ওষুধ না খেয়েও ঘুমাতে পারছি ভালোভাবে।

[সালমা নাসরীন, উপসচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ২৭২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিঃস্বার্থ সেবার দৃষ্টান্ত

অধ্যাপক নূরুর রহমান খান



একবার আমার স্ত্রীর রক্তের প্রয়োজন হলে সেসময় কোয়ান্টামের মোবাইল ডোনার পুলের সদস্যরা হাসপাতালে গিয়ে রক্ত দিয়ে এসেছেন। সেই রক্তদান কার্যক্রম এখন দেশের প্রধান নির্ভরযোগ্য একটি সেবা কার্যক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে। পাশাপাশি চলছে লামায় শিশুকানন এবং প্রকৃতি পুনরুদ্ধারের কাজ।

এই হানাহানি স্বার্থপরতা আর নিষ্ঠুরতার যুগে যে মমতা আর নিঃস্বার্থ সেবার দৃষ্টান্ত কোয়ান্টাম স্থাপন করেছে তা সত্যি অসাধারণ।

[অধ্যাপক নূরুর রহমান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, ২২৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

হীনম্মন্যতা দূর হয়েছে

বিউটি বড়ুয়া



আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি মেডিটেশন। এখন কোনো সমস্যাকেই সমস্যা মনে হয় না, দূর হয়ে গেছে হীনম্মন্যতা। কোর্সে জীবনযাপনের যে দিক-নির্দেশনা পেয়েছি তা প্রয়োগ করে আমার প্রতিটি দিন হয়ে উঠেছে সহজ সচ্ছন্দ। সারাদিন কর্মব্যস্ততার মাঝেও লক্ষ্য থাকে মেডিটেশনের জন্যে সময় বের করে নেয়া।

[বিউটি বড়ুয়া, শিক্ষিকা, ২৯২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দাবায় মনোযোগ বেড়েছে

সেখ নাসির আহমদ



১৯৯৩ সাল থেকে জাতীয় দাবা লীগে পর পর ৪ বার দল প্রধান হিসেবে এবং বিশ্ব অলিম্পিয়াডসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে উপলব্ধি করেছি, দাবা খেলায় মনোযোগের ধারাবাহিকতা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মেডিটেশন আমার অস্থিরতা টেনশন নার্ভাসনেস দূর করে বাড়িয়ে দিয়েছে মনোযোগ। ফলে ২০০৮ সালে জাতীয় ১ম বিভাগ দাবা লীগে চ্যাম্পিয়ন হই যার ক্যাপ্টেন ছিলাম আমি।

[দাবাড়ু সেখ নাসির আহমদ, ফিদে মাস্টার, ২৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আত্ম উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক পরিবর্তন আসতে পারে



জাহিদ আহসান রাসেল

আমার বাবা মরহুম আহসানউল্লাহ মাস্টারের কাছ থেকে শিখেছিলাম সততা আর কোর্সে এসে গুরুজীর কাছ থেকে শিখেছি মমতা। রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার কারণে মানুষের জীবনের অনেক কাছাকাছি পৌঁছানোর সুযোগ আমি পাই। তাদের কষ্টকে দেখি খুব কাছ থেকে। মানুষের দুঃখ-কষ্টকে অনেক গভীরভাবে অনুভব করতে পারি এখন। আর মেডিটেশনের মাধ্যমেই এটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। কোর্স করে আমার সমমর্মিতা বোধ আরো প্রবল হয়েছে।

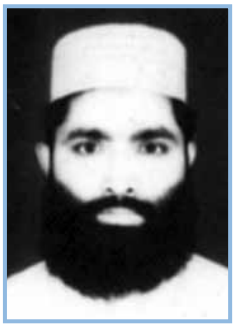
আমি বিশ্বাস করি, যে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করবে, নিয়মিত মেডিটেশন করবে তার পক্ষে অন্যের অকল্যাণ চিন্তা করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় ক্ষতিকর কিছু করা। সে পরিণত হবে একজন উপকারি মানুষে।

কোয়ান্টাম মেথডের যে ব্যাপ্তি, এটাই প্রমাণ করে– আমরা আত্ম উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক একটি পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছি। বর্তমানে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তনের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি সেটি বাস্তবায়নে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন অত্যন্ত ইতিবাচক ও সহায়ক ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

[জাহিদ আহসান রাসেল, গাজীপুর-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, ৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আলেমদের জন্যে এ কোর্স খুব প্রয়োজন

মওলানা আবুল হাসনাত মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ



মেডিটেশনকে মনে করতাম জাদু। কিন্তু কোর্স করে বুঝলাম, আল্লাহ মানুষের মনে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তা যথাযথভাবে কাজে লাগানোর হাতিয়ার হচ্ছে মেডিটেশন। গুরুজীর প্রতিটি আলোচনা জীবনকে সুন্দর করার জন্যে খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে আমি আলেমদের জন্যে এ কোর্সটি খুব প্রয়োজনীয় মনে করছি।

[টিভি ব্যক্তিত্ব মওলানা আবুল হাসনাত মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ কুরআন শিক্ষা ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের প্রধান পরিচালক। 'একশব্দে কুরআন শিখুন' নামে কোরআন শিক্ষার জনপ্রিয় পদ্ধতির উদ্ভাবক, ১৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



দুই মেয়ের সঙ্গে তানিয়া তাহমিনা

পেশাগত সাফল্যে মনছবি

তানিয়া তাহমিনা

ক্যারিয়ারের এক পর্যায়ে আমাকে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়র লেকচারার পদে যোগ দিতে হয় যদিও আগের জায়গায় আমি ছিলাম ফুল লেকচারার। এর কারণ এখানে লেকচারার হতে গেলে ৪ বছরের অনার্স লাগে। কিন্তু আমার ছিলো ৩ বছরের।

এখন তাই আমার প্রয়োজন ১ বছরের আরেকটি মাস্টার্স ও প্রকাশনা। কিন্তু তখন আমাদের দেশে ইংরেজিতে আরেকটি এমএ করার কোনো সুযোগ ছিলো না। এদিকে সন্তানদের রেখে বিদেশে যাওয়াও সম্ভব না। মনছবি দেখতে লাগলাম। কিছুদিন পর জানলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের ওপর একটি মাস্টার্স কোর্স চালু হচ্ছে। ভর্তি হলাম। রেজাল্টে ১ম হলাম। ইতোমধ্যে জার্নালে লেখা ছাপা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে পেপার প্রেজেন্ট করেছি। প্রমোশন হয়ে গেল।

কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তী প্রমোশন পেতে হলে বিদেশি পিএইচডি লাগবে। নইলে সারাজীবন লেকচারার হয়েই থাকতে হবে। আবার মনছবি করলাম। ইন্টারনেটে জব সার্চ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে এপ্লাই করলাম। নিয়োগও হয়ে গেল। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি সহকারী অধ্যাপক পদে, এটি প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মনছবির জোরে তা বাস্তবায়িত হলো।

[তানিয়া তাহমিনা, সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি

শাহরিয়ার নাফীস

যেকোনো পেশাতেই মানসিক চাপ থাকে। আমাদের অর্থাৎ খেলোয়াড়দের মধ্যে তা থাকে আরো বেশি পরিমাণে। কোর্সে ইতিবাচক শিক্ষা ও মেডিটেশনের মাধ্যমে আমি আমার চিন্তাধারাকে সঠিক পথে আনতে পেরেছি। মনোযোগ ও আত্মবিশ্বাসও ফিরে পেয়েছি। মেডিটেশন চর্চার পাশাপাশি কোর্সে শেখানো কোয়ান্টা ভঙ্গিরও অবাক করা সাফল্য পেয়েছি।

[বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ওয়ানডে সেঞ্চুরিয়ান ক্রিকেটার শাহরিয়ার নাফীস, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



সব পারার দল

সায়েদা মাহবুব

যেদিন খো-খোতে জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হলো আমাদের শিশুকাননের খেলোয়াড়রা সেদিন বড় উচ্ছ্বসিত আমি বার বার আনন্দে চোখ মুছে ভাবছিলাম ওরা সব পারে, সব পারবেও ওরা। মনে পড়লো লামায় শিশুকানন দেখতে যাবার ইচ্ছেটাকে মনের মধ্যে লালন করে করে একদিন কেমন করে তা সত্যি হয়েছিলো। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শিশুকাননে যখন পৌঁছি, মুগ্ধ হই অপরূপ প্রকৃতিকে দেখে, তবে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম কোয়ান্টাম শিশুকাননের বিশাল আয়োজন দেখে।

আবেগাপ্লুত আমি শিখতে চেষ্টা করেছি স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা। খাবার সামনে রেখে শিশুরা যখন প্রার্থনা করে, আমি সেই প্রার্থনায় একাকার হয়ে যাই। সকালে শিশুরা যখন 'বেশ ভালো আছি' বলে নতুন একটা দিনের জন্যে ধন্যবাদ জানায় সৃষ্টিকর্তাকে, সে প্রার্থনা করুণাময় কি না শুনে পারেন?

শিশুকাননের দায়িত্বশীলদের বিনয়, ব্যবহার, আতিথেয়তা আর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হই। ভাবতে থাকি চমৎকার সবকিছুর পেছনের স্থপতিকে। মনে মনে বার বার সালাম জানাতে থাকি যিনি অবিরাম সব পারার দল তৈরি করে চলেছেন।

[সায়েদা মাহবুব, প্রোগ্রাম প্রডিউসার, এবিসি রেডিও, ১৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কমান্ড সেন্টারে বুঝলাম মা বাসেই আছেন

সৈয়দ আবু সোহেল



কিছুদিন আগে মা ভারতে গিয়েছিলেন। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের কাজ সেরে মা-কে বাংলাদেশের শেষ সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর মা-কে ওপার থেকে নিয়ে যাওয়ার কথা যে আত্মীয়ের, তিনি ফোন করে বললেন– তার আসতে দুঘণ্টা দেরি হবে। কিন্তু একথা যে মা-কে ফোন করে জানাবো সে উপায়ও নেই। কারণ ভারত সীমান্তের ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় তার মোবাইলে নেটওয়ার্ক পাচ্ছিলো না।

দুশ্চিন্তা আরো বাড়লো যখন ২ ঘণ্টা পর সেই আত্মীয় আবার জানালেন মা-কে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রচণ্ড টেনশনে আমি যখন কোনো উপায় পাচ্ছি না, হঠাৎ মনে হলো মেডিটেশনের কথা। বাসে বসেই কমান্ড সেন্টারে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম মা কোথায় আছেন।

মনে হলো, কান্দি নামে এক জায়গায় চলন্ত বাসে তিনি বসে আছেন। স্বস্তি অনুভব করলাম। আরো কয়েক ঘণ্টা পর ফোন এলো যে, মা নিরাপদে পৌঁছেছেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার– আমি মেডিটেশনে যা অনুভব করেছিলাম ঠিক তেমনই আমার মা বাসে ঐ সময় ঐ জায়গাতেই ছিলেন।

[সৈয়দ আবু সোহেল, ব্যবসায়ী, ২৯৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সবকিছু যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে

খান এ আলম মানিক



গ্রাজুয়েট স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে খান এ আলম মানিক

রাগের কারণে সুযোগ হাতছাড়া করেছি, লজ্জিত হয়েছি। ভালো বেতন-কমিশন-সুবিধার চাকরিতে রিজাইন দিয়েছি মুহূর্তে। একবারও মাথায় আসে নি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সঞ্চয়হীন আমার চলবে কী করে। বাবা-মা, স্ত্রীর সাথে সামান্য বিষয় নিয়ে তুলকালাম বাঁধাতাম। রিকশাওয়ালা, বাসের কন্ডাক্টর, অফিসের সহকর্মী বা অভ্যাগত– কার সাথে না রাগ করতাম!

খুব দুর্বল মনের মানুষ ছিলাম। সারাক্ষণই মনে হতো, এই বুঝি কোনো বিপদ আসবে, দুঃসংবাদ আসবে। হীনম্মন্যতা ছিলো নিত্যসঙ্গী। কোর্স করলাম। ভীষণ প্রশান্তি পেলাম। মনে হলো, সবকিছু কত সহজ। আমি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছিলাম। না বুঝে রাগ করছিলাম।

চাকরি ছেড়ে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করলাম। সবকিছু এত অনুকূল হয়ে গেল যে, আমার মনে হতো সবকিছু যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। সচ্ছলতা সমৃদ্ধি মমতা প্রশান্তি– এ সবকিছুতেই ঘিরে আছে এখন আমার পরিবার।

[খান এ আলম মানিক, ব্যবসায়ী, ১৬৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ঘুম ভাঙতেই বলি শোকর আলহামদুলিল্লাহ

জহিরুল ইসলাম



সন্তানদের সঙ্গে জহিরুল ইসলাম

স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আমি জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হই। সন্তানের সব দায়িত্ব, বাসা আর ব্যবসা– সব একসাথে দেখতে হয় আমাকেই। তখন আমার বড় ছেলে ক্লাস ফোরে পড়তো। আজ সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রাতে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে ঘুমুতে যাই। আর উঠি সবার আগে। এই অক্লান্ত কাজ করার শক্তি আমি পেয়েছি ২ বেলা মেডিটেশন থেকে।

গত আড়াই বছরে একদিনও সকালে ঘুম থেকে উঠে 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলা মিস হয় নি। আর অটোসাজেশন তো আমার নিত্যসঙ্গী। শুকরিয়া আদায় করি যে, আমি যখন যা মনছবি করি তা হয়ে যায়। ধানমণ্ডিতে ১০ কাঠার ওপর বাড়ি পাওয়া অসম্ভব একটি ব্যাপার। কিন্তু আমি পেয়েছি। একইভাবে মোহাম্মদপুরে আরেকটি এবং বর্তমানে ১০ তলা অফিস ভবনের জমি– এ সবই আমার মনছবির ফসল। আর এখন একটি শিল্পপার্ক করার মনছবি নিয়ে এগুচ্ছি।

[শিল্পপতি জহিরুল ইসলাম, প্রোপ্রাইটর, ট্রেড কর্পোরেশন, ৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মৃত্যুভয় আর নেই!

শেখ তুহিন



প্রিম্যাচিউরড বেবি হিসেবে মাত্র ৬ মাস ১৩ দিনে আমার জন্ম। চোখ ফোটে ২১ দিন পরে। সবাই বলতো– এ-তো দুর্বল, রোগাটে। বড় হওয়ার পর থেকেই আমার মনে সবসময় মৃত্যুভয় কাজ করতো। অসুস্থ হলেই ভাবতাম কিডনি শেষ, লিভার শেষ। জ্বর হলে ভাবতাম ক্যান্সার হলো নাকি। কোর্সের দিন থেকেই বদলে গেল আমার চিন্তার জগৎ। নিরাময়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনে বুঝলাম– সারাক্ষণ মৃত্যুচিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। এরপরে কয়েকবার বেশ বড় রকম অসুস্থতায় পড়লেও স্বাভাবিক চিকিৎসায়ই সেরে উঠেছি।

[শেখ তুহিন, ব্যবসায়ী, ৯৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বিরল সাফল্য পেলাম

ফাদিয়া তাসনীম



দেশেই সিএ কোর্স সম্পন্ন করেছিলাম। অস্ট্রেলিয়ায় এসে একাউন্টিংয়ে মাস্টার্সে ভর্তি হলাম। মাস্টার্সে প্রতিটি কোর কোর্সে হাই ডিসটিংকশন অর্থাৎ ৯৫%-এর বেশি নম্বর পেয়েছি। ছাত্রী থাকাকালীন একটি ব্যাংকে চাকরিও হয়ে যায়। বর্তমানে চাকরি ও সংসারের পাশাপাশি সিপিএ অর্থাৎ সার্টিফাইড প্র্যাকটিসিং একাউন্টেন্ট কোর্সও চালিয়ে যাচ্ছি।

আমার দিন শুরু হয় মেডিটেশন দিয়ে। লেখাপড়া, চাকরি, ঘরের কাজ, বাচ্চার দেখাশোনা– সবকিছুর জন্যে যে প্রাণশক্তির প্রয়োজন তা যোগায় মেডিটেশন।

দুঃসময়েও পাশে ছিলো কোয়ান্টাম। আমার মেয়ের বয়স যখন মাত্র ১৪ দিন তখন হঠাৎ করে তার ভাইরাল ইনফেকশন হয়। ডাক্তাররা বললেন, এর আগে যে কয়টি শিশু এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলো তাদের একজনও বেঁচে নেই। এ খবর জানার পর সারাদেশের কোয়ান্টামের সদস্যরা ওর জন্যে প্রার্থনা করতে থাকেন। কিছুদিন পর আমার মেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ডাক্তার বার বারই বলছিলেন, এটা একটা মিরাকল। এখন পর্যন্ত আমার মেয়েই একমাত্র শিশু যে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পরও বেঁচে আছে।

[ফাদিয়া তাসনীম, ৪৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বাবাও আমাকে ভালবাসেন

সবিতা চাকমা



ছোটবেলা থেকেই কঠোর নির্মম পরিবেশে বড় হয়েছি। পরিবারে ঠাকুমা ছাড়া আর কারো স্নেহ পাই নি। কর্মক্ষেত্রে শিক্ষকতা পেশায় থেকে দেখছিলাম ছেলে-মেয়েরা চোখের সামনে হয়ে উঠছে বখাটে, মাদকাসক্ত। করতে পারি নি কিছুই।

একসময় মনে হতে লাগলো মৃত্যুই সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান। কোয়ান্টামে এসে পেলাম সত্যিকার জীবনের স্বাদ। পারিবারিক মেডিটেশনে জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলাম যে, বাবাও আমাকে ভালবাসেন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খুঁজে পেলাম আমার পরিবারকে।

[সবিতা চাকমা, শিক্ষিকা, ১৯১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

স্মৃতিশক্তি বেড়েছে

মুসতাকিম আহমেদ



গুরুত্বপূর্ণ কিছুই আমার মনে থাকতো না। পড়াশোনায় রেজাল্ট ছিলো খুব খারাপ। কোর্স করার পর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। কোর্সে শেখানো নানা টেকনিক অনুসারে স্মৃতিশক্তি চমৎকারভাবে কাজ করতে শুরু করলো। ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে সুযোগ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ-তে পড়ার। নিয়মিত মেডিটেশন ও অটোসাজেশন অনুশীলন আমাকে দিয়েছে এ সফলতা।

[মুসতাকিম আহমেদ, ছাত্র, ২৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মেডিটেশনের সাথে পরিচয় নাচের সুবাদেই

শামীম আরা নীপা



মেডিটেশনের সাথে আমার প্রথম পরিচয় নাচের সুবাদেই। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবগুলোতে গিয়ে দেখতাম প্রোগ্রামের আগে অনেক দেশের নাচের সদস্যরা কিছুক্ষণের জন্যে উধাও হয়ে যেতো। পরে শুনতাম তারা মেডিটেশন করছিলো।

নাচে প্রথমে আমরা একটা গান বা সঙ্গীতের কম্পোজিশন করি। এটা চিন্তার স্তরেই হয়। তারপর বাস্তবে তার প্রতিফলন করি নাচের মুদ্রা তুলে। সেখানেও আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পারফর্ম করছি কোনো কিছু না-দেখে না-পড়ে। ফলে এক্ষেত্রে ভিজুয়ালাইজেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এ জিনিসটিই হয় মেডিটেশনে।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই সমস্যা আছে। সমস্যাগুলোর সমাধানও আমাদের জানা আছে। যা জানা নেই তা হলো কীভাবে তা করা যায়। এখানে এসে আমি তা জানলাম। আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে এবং কাজেরও উৎসাহ বেড়েছে। এখন আমি যা শিখলাম তা কাজে লাগিয়ে দেশ ও দশের কল্যাণ করাই আমার লক্ষ্য।

[খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী শামীম আরা নীপা, ২২১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পথচলাকে সহজ করেছে মেডিটেশন

তাসনুতা ইফফাত আলম



কোর্স করার পর থেকেই নিয়মিত মেডিটেশন, মাটির ব্যাংকে দান ও গুরুর দিক-নির্দেশনা পালন আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো। তাই প্রবাসে পথচলা ছিলো সবসময় আমার অনুকূলে। ইউকে-তে আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি ভালো চাকরি পেয়ে যাই যা ছিলো সত্যিই অবাক করার মতো। লন্ডন ছেড়ে এবারডিনে চলে আসার সময় আমার দুশ্চিন্তা ছিলো একটি ভালো বাসা পাওয়া নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা একটি চমৎকার বাসা পেয়ে যাই যেখান থেকে শপিং মল, ইউনিভার্সিটি, অফিস– সবকিছুই হাঁটা পথ এবং ভাড়াও আমাদের সাধ্যের মধ্যে।

দ্যা রবার্ট গর্ডন ইউনিভার্সিটিতে অয়েল এন্ড গ্যাস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এমএসসি করছেন আমার স্বামী। মেডিটেশনের মাধ্যমে তার রেজাল্টও হচ্ছে আশাতীত। শত ব্যস্ততার মাঝেও পড়াশোনা, চাকরি, এবারডিন সেলের কাজ– সবকিছুই করছি স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে।

[স্বামী ওয়াহিদ সাদিকের সাথে তাসনুতা ইফফাত আলম, ১০১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

লন্ডনে ছিনতাইকারীর কবলে!

তন্ময় আহমেদ



২০০২ সালে লন্ডনে আসি। একদিনের কথা– সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমরা চার বন্ধু বাসায় ফিরছি। এমন সময় প্রায় ৭/৮ জন কৃষ্ণাঙ্গের একটি দল আমাদেরকে ঘিরে ধরলো। সবাই আমাদের পকেট হাতড়াতে লাগলো মোবাইলের জন্যে। আমি খুব শান্ত অবস্থায় সাথে সাথে কোয়ান্টা ভঙ্গি করলাম। অবাক বিষয়, কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে তারা গায়েব হয়ে গেল। সবার মোবাইল নিতে পারলেও আমার মোবাইল নিতে পারে নি। কোয়ান্টা ভঙ্গি করা অবস্থায় কোন ফাঁকে যে আমি নিজেই পকেট থেকে মোবাইল বের করে রাস্তার পাশে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছি, ছিনতাইকারীরা তা টেরও পায় নি।

[তন্ময় আহমেদ, আইটি কনসালটেন্ট, ১৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিজেকে প্রতিবন্ধী মনে করি না

মুহম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন



আমি যখন কোর্স করি তখন আমার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো খুবই করুণ। কোর্স করে আমার চোখের জ্যোতিই যেন বদলে গেল। ৪র্থ দিন ক্লাস শেষে আমি ৪ মাইল হেঁটে চললাম ক্রাচে ভর করেই।

পড়াশোনা শেষ হলো। আমার জীবনে কখনো বেকারত্ব আসে নি। এমনও হয়েছে– একসাথে আমি ৩টা চাকরি পেয়েছি। বিয়ে হলো একজন সুস্থ-শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে। আমি পারিবারিকভাবে অত্যন্ত সুখী মানুষ। নিজেকে প্রতিবন্ধী মনে করি না

নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্যে অফিসে আমি অর্জন করেছি সুনাম। একবার ব্যাংক থেকে টাকা তোলার সময় ভুল করে ৫০ হাজার টাকা বেশি দিয়ে দিলো। বুঝতে পেরেই কর্তৃপক্ষকে জানালাম এবং ফেরত দিলাম। লোভকে জয় করার এ শক্তি আমি পেয়েছিলাম কোয়ান্টামের শিক্ষা থেকেই।

[মুহম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামে একাউন্টেন্ট হিসেবে কর্মরত। ১৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জীবন চলার পাথেয়

নুসরাত শারমিন



হঠাৎ করে আমেরিকায় চলে এসে নিজেকে কোয়ান্টাম থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হতো, খুব অসহায় লাগতো। কিন্তু যখনই হতাশা এসেছে, মনে করেছি 'সারা পৃথিবী আমার, যেখানে দরকার সেখানে যাবো, যা প্রয়োজন তা-ই নেবো'। আমার এবং আমাদের কাজকে সারা পৃথিবীতে ছড়াতে হবে। নিজের ও অন্যের উপকার করতে হবে। এই বোধটা উপলব্ধি করেছি কোয়ান্টাম থেকে। নিজেকে আর একা মনে হয় না।

[নুসরাত শারমিন, ছাত্রী, ১০৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছি

নাহিদ কাজী নাহিন



এটা শুধু মন নিয়ন্ত্রণ নয়। জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান এখানে পেয়েছি। খাবার-দাবার, পোশাক থেকে শুরু করে বৈষয়িক পারিবারিক আত্মিক অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে খুব প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী কথা অন্তরকে ছুঁয়ে গেছে। এত কঠিন বিষয় এত সহজে উপস্থাপন করা যায় জানা ছিলো না।

[বিউটি কনসালটেন্ট নাহিদ কাজী নাহিন ২৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বিরক্তি পরিণত হলো আনন্দে

ড. আকিমুন নাহার



যখন কোর্সে আসি আমি ছিলাম খুব বিরক্ত, আবেগহীন। কিন্তু এ কোর্সে ১ম মেডিটেশনের পরই মনে হলো আমি যেন জাগতে শুরু করেছি। আমি এখন যেমন সাহসী, তেমনি প্রত্যয়ী, আবেগময়। আজ শত প্রাণ আমরা জেগেছি। আরো শত শত প্রাণ এভাবে জেগে উঠবে। কোয়ান্টাম আমাদের জাতিকে একটি স্বপ্ন দেখিয়েছে। আমাদের জন্যে এর চেয়ে খুশির আর কী হতে পারে।

[ড. আকিমুন নাহার, সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ২৩১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জীবনের শ্রেষ্ঠ কোর্স

মাসুদ ইমাম



পেশাগত জীবনে এ যাবৎ আমাকে কমপক্ষে ৪০টি সেমিনারে অংশ নিতে হয়েছে। নিঃসংকোচে বলতে পারি এর মধ্যে ৩০টির বেশি সেমিনারে আমি ঘুমিয়েছি।

কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে আমার মনে হয়েছে কোর্সটি আরো ১২ বছর আগে করা উচিত ছিলো। জীবনের শ্রেষ্ঠ কোর্সে আমি অংশ নিয়েছি।

[মাসুদ ইমাম, ডেপুটি ডিরেক্টর, সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, ২৩৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

শিক্ষায় সাফল্য

শিক্ষায় সাফল্যের জন্যে প্রথম প্রয়োজন মনোযোগ। দ্বিতীয় প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। মেডিটেশন দ্রুত মনোযোগ বাড়ায়, বাড়ায় আত্মবিশ্বাস।

১৭ বছরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে সাধারণ মেধার হাজার হাজার শিক্ষার্থী অস্থিরতা জড়তা পরীক্ষাভীতি ও হীনম্মন্যতা দূর করে দেশে-বিদেশে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

শুধু ক্লাসে প্রথম হওয়ার মধ্যেই শিক্ষার্থীদের অর্জন সীমিত নয়। ব্যক্তিজীবনে পরিবর্তন, বিনয় ও সদাচরণ প্রভাবিত করেছে তাদের পরিবারকে, চারপাশের মানুষকে। তারাও সম্পৃক্ত হয়েছেন কোয়ান্টামের সাথে।

কোয়ান্টামের সেবামূলক সকল কাজের মূল কর্মশক্তি এই শিক্ষার্থীরা। এমন হাজারো শিক্ষার্থীর কয়েক জনের অনুভূতিই সংযোজিত হলো এ অধ্যায়ে।



৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজেই বেছে নিলাম একটিকে

রুবাব মো. ইমরোজ খান সৌরভ

স্বপ্ন ছিলো জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার। পিএইচডিতে ভর্তি হওয়ার সময় মনছবি করলাম এবার আমাকে নয়, আমিই বেছে নেবো পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়কে। এর মধ্যে আমেরিকার ৫টি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়– ইয়েল, টেক্সাস-অস্টিন, ইলিনয় (আরবানা-শ্যাম্পেন), ফ্লোরিডা (জেইনসভিলে) এবং ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে আমন্ত্রণপত্র এলো। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ঘুরে দেখে বেছে নিলাম ওহাইও-কে। বাংলা মিডিয়াম থেকে নামকরা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুল স্কলারশিপে পড়বো– এ স্বপ্নকে ২০০৩ সালেও অনেকে মনে করতেন অসম্ভব। আর আজকে তা বাস্তব।

এইচএসসি-র পর ভর্তি হলাম যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে বছর ৬ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ফুল স্কলারশিপ পেয়েছিলো যাদের একজন ছিলাম আমি। বিস্ময় তারও পরে। এস্ট্রোফিজিক্সে আমার ব্যাচে একমাত্র আমিই পেলাম ডিপার্টমেন্টাল অনার্স। আর এ সাফল্যের পেছনে ছিলো আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র থাকাকালীন ৫০০ গবেষকের নামের তালিকায় আমার নামের অন্তর্ভুক্তি। যাদের প্রত্যেকের রয়েছে প্রকাশিত গবেষণাপত্র। আসলে অসম্ভব তা-ই যা কোনোদিন কেউ করতে পারে নি। আর কেউ করে নি মানে ভবিষ্যতে কেউ তা করবে এবং তখন তা হবে সম্ভব। আপাত অনেক অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে যদি কী চাই সে উত্তর নিজের কাছে পরিষ্কার থাকে। সুস্পষ্ট লক্ষ্যের মনছবি তখন প্রতিটি পদক্ষেপকে ছকে ছকে এঁকে নিতে সাহায্য করে।

[রুবাব মো. ইমরোজ খান সৌরভ, ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এস্ট্রোনমিতে পিএইচডি করছেন, ৪২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



ডীন'স লিস্টে দুবার নাম এসেছে

সামিরা ফারাহ মিশু

আমি সবসময় মনছবি দেখতাম নিউইয়র্কের অন্যতম সেরা বিজনেস স্কুল 'পেস ইউনিভার্সিটি'তে গ্রাজুয়েশন করার। কিন্তু স্বভাবতই প্রতিযোগিতা খুব বেশি এবং প্রাইভেট ভার্সিটি হওয়ায় ফিনান্সিয়াল এইড ম্যানেজ করাটাও খুব দুরূহ। কিন্তু মনছবি একসময় সফল হলো এবং চলে এলাম নিউইয়র্কে। এখানে প্রথম দিককার দিনগুলো যে কী দুর্বিষহ ছিলো তা বলে বোঝানো যাবে না। ভিনদেশের রান্না-খাবারে অভ্যস্ত হতে পারছিলাম না। প্রায়ই না খেয়ে থাকতে হতো। আশেপাশে এমন কেউ ছিলো না যার সাথে একটু কথা বলা যায়।

এর মধ্যে হঠাৎ খবর এলো যেখানে আছি, এ বাসাটা ছেড়ে দিতে হবে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো– কিচ্ছু চিনি না, কোথায় যাবো এখন? ঐ সময়টায় শুধুমাত্র গুরুজীর কথাগুলো মনে সাহস যোগাতো– পথে নামলে পথই পথ দেখায়। ঠিকই, একসময় পথ পেয়েও গেলাম। একটা খাবারের দোকানে কাজ নিলাম। সেই সাথে ভীষণ কম্পিটিশনের মধ্যে পড়াশোনা। কিন্তু একবারের জন্যেও হাল ছেড়ে দেই নি। যখনই একা লাগতো, মেডিটেশনে বসে যেতাম, ফিরে পেতাম আগের উদ্দীপনা।

কৃতিত্বের সাথে এসোসিয়েট ইন বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন সম্পন্ন করলাম। ডীনের লিস্টে দুবার আমার নাম আসে। আমার মার্কিন সহপাঠীরা অবাক হয়ে বলতো– এতটুকু বয়সে একা একা তুমি কীভাবে সবকিছু করছো! আমি হাসতাম, কারণ আমি জানি সারা পৃথিবী আমার। এ আত্মবিশ্বাসই প্রবাসে আমার জীবনকে করেছে সহজ।

[সামিরা ফারাহ মিশু, ১৮৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পার্থক্য শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসে

সামসুন্নাহার



আমি তখন ঢাকা মহিলা পলিটেকনিকের 'আনুষঙ্গিক' বিভাগের প্রধান। স্থাপত্য বিভাগের ২য় শিফটের ছাত্রীদের ক্লাস নিতাম। ওখানকার মেয়েদের খুব সাধারণ পরিচয় ছিলো যে, ওরা হলো 'খারাপ ছাত্রী'। ওরাও যেন এ বিশেষণটাকে নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছিলো। ভালো করা তো দূরের কথা, পাশ করতে পারলেই ওরা খুশি। এমনসময় কোর্স করি। কোর্সে কথাগুলো এত ভালো লাগলো যে, বার বার মনে হচ্ছিলো আমার ছাত্রীদের যদি এটা করানো যেতো!

কোর্সের পর আমি নিজেই ওদের মেডিটেশন শেখালাম। বোঝালাম, 'খারাপ ছাত্রী' বলে কিছু নেই। মনোযোগ দাও, চেষ্টা কর, তোমরা ভালো করতে পারবে। নানাভাবে ওদের অনুপ্রাণিত করতাম। প্রতিক্লাসে একটু সময় মেডিটেশন করাতাম। ক্লাস শেষে পরীক্ষা নিতাম। আস্তে আস্তে ওরা ভালো করতে শুরু করলো। যে কি না ইংরেজি বলতে পারতো না, সে এখন ইংরেজি বলছে, লিখছে। অবাক হতাম– শুধু আত্মবিশ্বাস একজনকে কীভাবে পাল্টে দেয়! দুবছর পর বোর্ড ফাইনালের রেজাল্ট দেখে হতবাক হয়ে গেলাম– প্রত্যেকেই ভালো করে পাশ করেছে এবং তাদের কয়েকজন মেধা তালিকায় স্থানও পেয়েছে।

[সামসুন্নাহার, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, সরকারি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৯৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমার পক্ষেও সম্ভব

আফিয়া ফারজানা



ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমি ছিলাম ফার্স্ট। অনেক আশা নিয়ে বাবা-মা ক্লাস সিক্সে পাঠালেন শহরের বড় স্কুলে। প্রথম ধাক্কা খেলাম যখন দেখলাম সহপাঠীরা প্রত্যেকেই আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে। ব্যস্, হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করলাম। হোস্টেলের রুমে একা বসে কাঁদতাম।

প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় গণিতে ফেল করলাম। কোনোরকম পাশ করে সেভেনে উঠে আবার ফেল করলাম বিজ্ঞানে, পেলাম মাত্র ৫ মার্কস। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিলাম। সেটা তো পেলামই না, বেসরকারি পরীক্ষায়ও বৃত্তি পেলাম না। একসময় আমার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, ভালো করা আর কখনই সম্ভব নয়। অতএব চেষ্টা করাও ছেড়ে দিলাম। কোনোমতে পাশ করে করে ক্লাস নাইনে উঠলাম। তখন একটাই দুশ্চিন্তা– এসএসসিতে পাশ করতে পারবো তো?

এমনসময় একদিন স্কুলের লাইব্রেরিতে কোয়ান্টাম মেথড বইটি পড়লাম। ঐ একটি বই আমার সবকিছু পাল্টে দিলো। 'আগের আমি'-কে ফিরে পেলাম যেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সাময়িক পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধায় ৬ষ্ঠ ও বার্ষিক পরীক্ষায় ৩য় হলাম। ক্লাস টেনে চূড়ান্ত মডেল টেস্টে হলাম ফার্স্ট। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। এসএসসি ও এইচএসসি– দুটোইতে এ-প্লাস পেয়ে এখন দিনাজপুর মেডিকেলে পড়ছি।

[আফিয়া ফারজানা, ২৩৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমি পারবো আমি পারবোই

সাদিয়া নওরোজ খান



কোর্সের আগে বিদেশে পড়াশোনা করার কল্পনা করাও ছিলো আমার জন্যে অসম্ভব। কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড আমাকে শিখিয়েছে স্বপ্ন দেখতে, বিশ্বাসী হতে এবং শুধুমাত্র এই বিশ্বাসটুকু সম্বল করেই একসময় পাড়ি জমালাম সুদূর কোরিয়ায়, স্কলারশিপ পেয়ে মাস্টার্স করতে।

কিন্তু নতুন পরিবেশে গিয়েই সমস্যায় পড়তে লাগলাম। ওখানকার সংস্কৃতি, খাওয়া-দাওয়া, মানুষজন– কোনো কিছুর সাথেই খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। হারাচ্ছিলাম আত্মবিশ্বাস, খারাপ করতে লাগলাম পড়াশোনায়-পরীক্ষায়। এভাবে যখন আমি সবদিক দিয়ে বিপর্যস্ত তখন একমাত্র মেডিটেশনের সময়টুকুতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম।

প্রতিদিন সকালে মেডিটেশনে মনছবি দেখতাম– ক্লাস পারফরমেন্স ভালো হচ্ছে, সবাই সহযোগিতা করছে। যখনই মনে হতো, চোখ বন্ধ করে অটোসাজেশন দিতাম 'আমি পারবো, আমি পারবোই'। আস্তে আস্তে সমস্যাগুলো দূর হতে লাগলো। আবার আগের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। রিসার্চের বেলায় প্রতিটি বিষয়ের প্ল্যানিং আগে মেডিটেশনে বসে ঠিক করে নিতাম। আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত সবগুলো পরীক্ষায় এ-প্লাস পেয়ে সর্বোচ্চ অবস্থানে আছি।

[সাদিয়া নওরোজ খান, দক্ষিণ কোরিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ উলসনে বায়ো-ইনফরমেটিক্সে এমএসসি করছেন, ২২১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

শিক্ষার্থী কোর্স করে পরীক্ষা দিলাম চমৎকার

কামরুল হাসান



শিক্ষার্থী কোর্স করে আমার পরীক্ষাভীতি কেটে গেছে। এখন পরীক্ষাকে আমি একেকটি সুযোগ হিসেবে দেখি। কোর্সের পরীক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশনা আমাকে আমার পরীক্ষার খাতা সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে সাহায্য করেছে। ফলে এবছর এসএসসি-তে জিপিএ-৫ পেয়েছি। পরীক্ষা মোকাবেলার জন্যে শিক্ষার্থী কোর্সের দিক-নির্দেশনাগুলো অসাধারণ।

[কামরুল হাসান, এইচএসসি-র ছাত্র, ২৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

শিক্ষকের অনুপ্রেরণা শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে

অধ্যাপক ড. শ্যামল কান্তি বিশ্বাস



আমার শিক্ষক সাবের আহম্মদ চৌধুরী সবসময় বলতেন, 'লেখাপড়া সহজ। তুই পারবি।' শুনতে শুনতে এ বিষয়টি আমার মধ্যে গেঁথে যায়। তার অনুপ্রেরণার কারণেই আমি আজ এতদূর আসতে পেরেছি। আত্মবিশ্বাসটা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন ছাত্র একবার যদি বিশ্বাস করে সে পারবে, তাহলে সে পারবেই।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এই আত্মবিশ্বাসের কথাই গুরুজী খুব জোর দিয়ে বলেছেন। আত্মবিশ্বাসী হওয়ার মাধ্যমে জীবনে সফল হওয়ার জন্যে কোয়ান্টাম মেথড একটি কার্যকর প্রক্রিয়া। দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর যে শিক্ষা কোয়ান্টাম দিচ্ছে সে বার্তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের এ কোর্সে আসা বেশি প্রয়োজন– প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেডিটেশন চর্চার প্রসার ঘটানো। এক্ষেত্রে ডিবেটিং ক্লাবের মতো মেডিটেশনের ওপরও আলাদা ক্লাব করা যেতে পারে। এজন্যে যারা মেডিটেশন বিষয়ে জানেন তাদেরকে উদ্যোগ নিতে হবে।

[চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. শ্যামল কান্তি বিশ্বাস। তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ২৯২ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন]

শিক্ষার্থীদের জন্যে সহায়ক

ফিরোজ মুকুল



মানুষ তার অসাধারণ শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসী হতে পারলে সে শক্তিকে ব্যবহার করে তার পক্ষে অনেক কিছু করা সম্ভব। মেডিটেশন এ কাজটিই করে। ছাত্রজীবনে আত্মবিশ্বাস ও মনোযোগ বাড়াতে, নেতিবাচক আবেগ থেকে মুক্ত থাকতে মেডিটেশন হতে পারে চমৎকার সহায়ক শক্তি।

[ফিরোজ মুকুল, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জনপ্রিয় পদ্ধতি FM Method-এর প্রবক্তা, ২৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সমস্যা নয়, সম্ভাবনা

মোহাম্মদ তানভীরুল ইসলাম

সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপান্তরের যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা কোর্সে আমরা জেনেছি, নিজের জীবনে তা প্রয়োগের ঘটনাটিই বলি। ৫/৬ বছর বয়সে পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে আমার শরীরের ডানদিক প্যারালাইজড হয়ে গেল। এদিকে চিকিৎসা শুরু হলো মেনিনজাইটিসের অর্থাৎ ভুল ডায়াগনোসিস। ফলে অবস্থা আরো খারাপের দিকে যেতে লাগলো। একসময় ডাক্তাররা বললেন– এখন আর কিছু করার নেই। এভাবেই থাকতে হবে বাকি জীবন। আমার পরিজনরা এরপরও আকুপাংচার থেরাপিসহ নানা চিকিৎসা চালিয়ে গেলেন।

কিসে কী হলো জানি না তবে একসময় দেখলাম ভালো হয়ে উঠছি। শুধু ডান হাতটা আর ভালো হলো না। খুব কষ্ট করে কিছুটা লেখালেখি ছাড়া আর কোনো কাজ করতে পারতাম না।

এদিকে ততদিনে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। ছোট ক্লাসের পরীক্ষাগুলো পেরিয়ে গেলেও বড় ক্লাসে উঠে পড়লাম কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। কারণ হাতের লেখা এত ধীর যে, পরীক্ষায় সব কমন পড়লেও লিখে আসতে পারছি না। অনেক ভালো প্রস্তুতির পরও পিছিয়ে পড়ছি। হতাশ হয়ে পড়লাম। হঠাৎ মনে হলো আমি হয়তো আমার ক্লাসমেটদের মতো একটা প্রশ্নের উত্তরে ১০ পৃষ্ঠা লিখতে পারি না, কিন্তু ৫ পৃষ্ঠা তো পারি। তাহলে এ ৫ পৃষ্ঠাতেই দেখি না ১০ পৃষ্ঠার তথ্য কীভাবে দেয়া যায়।



শুরু করলাম নিজের নোট তৈরি (কারণ এরকম স্পেশাল নোট তো অন্য কারো কাছ থেকে পাওয়া যাবে না)। ফলে ৩টি লাভ হলো, প্রথমত, পড়াশোনার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল। টেক্সট বই ছাড়াও নোটবই, রেফারেন্স বই এবং ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে যেকোনো বিষয়ের খুব গভীরে যেতে পারলাম। দ্বিতীয়ত, লেখার শারীরিক কষ্টকে এড়াতে গিয়ে অভ্যাস হয়ে গেল কম্পিউটারে লেখার। যে দক্ষতা পরবর্তী কর্মজীবনে কাজে লেগেছে। তৃতীয়ত, এ সফল চেষ্টা, ভালো রেজাল্ট, ভালো কর্মজীবন– সবকিছু মিলিয়ে আমি এখন আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ। সমস্যাকে ঝামেলা হিসেবে নয়, দেখি সুযোগ হিসেবে, সম্ভাবনা হিসেবে।

[মোহাম্মদ তানভীরুল ইসলাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ করছেন, আনন্দ গ্রুপে কর্মরত, ২৬৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোনোমতে পাশ থেকে ভালো রেজাল্ট

তানিয়া মাহবুব



এইচএসসি পরীক্ষার কিছুদিন আগে যখন এ কোর্সে অংশ নিই তখন আমি ছিলাম হতাশা ও হীনম্মন্যতায় পুরোপুরি নিমজ্জিত। কারণ এসএসসি-র পর কলেজে ভর্তি হয়ে নতুন ধরনের পড়াশোনার সাথে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। পরীক্ষাগুলো ক্রমাগত খারাপ হচ্ছিলো। টেস্ট পরীক্ষাতেও গ্রেড ছিলো মাত্র ২.০০। ধরেই নিয়েছিলাম যে, এইচএসসিতেও কোনোরকমে পাশ করবো। কিন্তু চারদিনের কোর্সে আমার সমস্ত নেতিচিন্তা দূর হয়ে যায়। বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে, আমার পক্ষেও ভালো করা সম্ভব। আবার নতুন উদ্যমে পড়াশোনা শুরু করলাম। পরীক্ষার আগে সামান্য যে কদিন বাকি ছিলো সেগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগালাম। আল্লাহর রহমতে আমি ৪.৯ পেয়ে উত্তীর্ণ হই।

[তানিয়া মাহবুব, ২৯০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সাফল্যের পর উচ্ছ্বসিত নয়,
শোকর গোজার হোন।
পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিন।

ডিপার্টমেন্টে রেকর্ড মার্কস

নূরুদ্দিন মো. শিবলী নোমান



বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনগুলোতে নিজের ভেতর প্রচণ্ড ক্ষোভ বয়ে বেড়াতাম। নিজের প্রতি ক্ষোভ, ঠিকমতো আর্থিক সহযোগিতা পাই না বলে বাবা-মার প্রতি ক্ষোভ। আর এর ছাপ পড়ছিলো পড়ালেখায়, একটু একটু করে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলাম। যেখানে আমি ভর্তি পরীক্ষায় ২য় হয়েছিলাম, সেখানে প্রথম বর্ষে আশানুরূপ কিছু করতে পারলাম না। ঐ সময় কোয়ান্টাম মেথড বইটি হাতে পেয়ে যেন নতুন এক উদ্দীপনা খুঁজে পেলাম। ফলাফল– প্রথম বর্ষের মানোন্নয়ন পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করলাম। এর মধ্যে টাকা ধার করে কোর্সে অংশ নিই। মনছবি করলাম– আমি প্রথম হবো। কী কী পেতে চাই– সব একটা কাগজে লিখে ফেললাম। সবসময় ওটি আমার সাথে থাকতো। যখনই মনে পড়তো অটোসাজেশন দিতাম। সেই সাথে ছিলো রুটিনমাফিক পড়াশোনা। রাতে মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুমাতাম। মনছবির সাথে পুরো একাত্ম হয়ে যেতে পেরেছিলাম। আর এর ফলও মিলেছিলো হাতেনাতেই। ২য় বর্ষে জিপিএ ৩.৬৩ পেয়ে আমি ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে রেকর্ড করে ফার্স্ট হলাম।

[নূরুদ্দিন মো. শিবলী নোমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্স করছেন, ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এমএস কাম পিএইচডি-তে স্কলারশিপও পেয়ে যাই

অন্তরা চক্রবর্তী



ক্লাস নাইনে থাকতে বাবা-মার অনুপ্রেরণায় কোর্সটি করি। আজ পর্যন্ত মেডিটেশন আমার সবসময়ের সঙ্গী। শিক্ষাজীবনে প্রতিটি কৃতিত্বের পেছনে রয়েছে মনছবি এবং সে লক্ষ্যে আমার নিরলস পরিশ্রম। এসএসসি ও এইচএসসি– দুটোতেই এ-প্লাসসহ উত্তীর্ণ হয়ে আইসিসিআর স্কলারশিপ নিয়ে দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাই। তখন থেকেই আমার ইচ্ছে ছিলো এমএস করবো ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) থেকে। কিন্তু ওখানে প্রতিযোগিতা খুব বেশি এবং স্কলারশিপ পাওয়াও কঠিন। আমি মনছবি দেখতে থাকি। একসময় ভর্তি পরীক্ষা দেই এবং এমএস কাম পিএইচডিতে স্কলারশিপও পেয়ে যাই। এখন আমি আইআইটি-তে এনার্জি সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এমএস ফাইনাল ইয়ারে পড়ছি।

[অন্তরা চক্রবর্তী আইআইটি-তে অধ্যয়নরত, ৯৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুপারভাইজার বিস্মিত হলেন

নাফিস ফারুক



লন্ডনের গ্রীনউইচ বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্টারপ্রাইজ সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স করার সময় আমার প্রজেক্টের বিষয় বেছে নিলাম কোয়ান্টাম ব্লাড ব্যাংক। প্রজেক্টের ভাষা নিলাম ওরাকল এবং জাভা। সুপারভাইজার বললেন, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না; যা করার আমাকেই করতে হবে। কাজ শুরু করার পর দেখা গেল প্রজেক্টটি কঠিন শুধু নয়, আকারেও বিশাল। সবাই বলতে লাগলো, আমি কোনোভাবেই সময়মতো প্রজেক্ট শেষ করতে পারবো না। কিন্তু মনছবি, মাটির ব্যাংকে দান– সবকিছুর মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত প্রজেক্ট শুধু শেষ হলো তা-ই নয়, এতই ভালো হলো যে, সুপারভাইজার পর্যন্ত হতবাক হলেন।

[সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার নাফিস ফারুক, ১২৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

শেষ বর্ষে গিয়ে পার্সেন্টেজ কভার করলাম

সুমাইয়া ফারাহ খান



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়ো-টেকনোলজি বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী আমি। জীববিজ্ঞান অনুষদে প্রতিবছর ভালো রেজাল্টের জন্যে ডীন'স এওয়ার্ড দেয়া হয়। এর পূর্বশর্ত হলো অনার্সে গড়ে ৬৫% নম্বর পেতে হবে, কোনো পরীক্ষায় ইমপ্রুভমেন্ট দেয়া যাবে না এবং ক্লাসে ৮০% উপস্থিতি থাকতে হবে।

অনার্সে ঢোকার প্রথম থেকে আমার মনছবি ছিলো ডীন'স এওয়ার্ড পাওয়া এবং সে লক্ষ্যেই প্রস্তুতি নিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষে আমার এলো ৬২%, ৬৪% ও ৬২% অর্থাৎ গড়ে ৬৩%। যদি সব মিলিয়ে আমি ৬৫% পেতে চাই তাহলে চতুর্থ বর্ষে আমাকে ৭১% নম্বর পেতে হবে। কিন্তু প্রথম তিন বছরের তুলনায় শেষ বছরটি খুব কঠিন এবং ৭০% এর বেশি নম্বর তোলা খুবই কষ্টকর।

কিন্তু আমি মনছবিতে অটল থাকলাম এবং সবসময় মেডিটেশনে দেখতাম যে, ডীনের পদক পাচ্ছি। ৪র্থ বর্ষের রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল আমি ঠিক ৭১%-ই পেয়েছি। আমার মনছবি সফল হলো এবং চমৎকার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের ডীন'স এওয়ার্ড দেয়া হলো।

[সুমাইয়া ফারাহ খান, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়ো-টেকনোলজি বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী, বর্তমানে বারডেমে রিসার্চ অফিসার হিসেবে কর্মরত। ৪২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বাবার ইচ্ছে পূরণ করেছি

কে এম তাহসীন হাসান রাহিত



যখন কোর্স করি তখন আমি স্কুলে পড়ি। পড়াশোনায় মনোযোগ তো কম ছিলোই, আর ছিলো তীব্র মাথাব্যথা। ফলে রেজাল্ট হতো মাঝারি মানের। কোর্স করার পর মেডিটেশন হলো আমার নিত্যসঙ্গী। স্কুল, কোচিং বা স্যারের বাসা– যেখানেই যাই বাসায় ফিরেই আমি বসতাম মেডিটেশনে। সেরে গেল সেই ভয়ংকর মাথাব্যথা। চশমা ছাড়তে পারলাম। আর রেজাল্টও দিন দিন ভালো হতে লাগলো।

ফাউন্ডেশনে কাজ করতে খুব ভালো লাগতো। এসএসসি-র আগে বাবা বললেন, রেজাল্ট যদি ভালো না হয় এবং নটরডেম কলেজে যদি চান্স না পাই, তাহলে আর ফাউন্ডেশনে আসতে দেবেন না। রুটিন অনুসারে পড়াশোনা, মেডিটেশন, ফাউন্ডেশন– সবকিছুই করতে লাগলাম। এসএসসি-তে রেজাল্ট হলো গোল্ডেন এ-প্লাস এবং এখন বাবার পছন্দের সেই নটরডেম কলেজেই আমি পড়ছি।

[তাহসীন হাসান রাহিত, নটরডেম কলেজে এইচএসসি ১ম বর্ষের ছাত্র, ১৮৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ভালো রেজাল্টের জন্যে সুনির্দিষ্ট মনছবির পাশাপাশি সফল জীবনের মনছবিও করুন সুস্পষ্টভাবে।

জড়তা ভাঙতে পেরেছি

কাজী শামীম



আমার একসময় প্রচণ্ড জড়তা ছিলো। কোথাও গিয়ে কারো সামনে সাহস করে কিছু বলতে পারতাম না। শিক্ষার্থী কোর্স করার পর জড়তা কেটে গেছে। একবার ভার্সিটিতে একটা কোর্সে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা বিষয়ের ওপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করতে হবে। শুনে প্রথমে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। একে তো ইংরেজিতে কখনও এভাবে কথা বলি নি, তার ওপর ম্যাডামের সামনে দাঁড়িয়ে একা বলা। কিন্তু শিক্ষার্থী কোর্সে শেখা টেকনিকগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলাম। স্থির করলাম, আমি চমৎকার প্রেজেন্টেশন করবো।

অনেক খাটাখাটুনি করে তৈরি করলাম সবকিছু। কিন্তু প্রেজেন্টেশনের দিন একের পর এক বিপত্তি ঘটতে লাগলো। সারা সকাল লোডশেডিং চললো, পিসি থেকে কিছুই কপি করতে পারছি না। যখন বিদ্যুৎ এলো, ক্লাস শুরুর মাত্র ১ ঘণ্টা বাকি। সব ইনফরমেশন পিসি থেকে কপি করতে অনেকটা সময় লাগলো। মিরপুরের বাসা থেকে যখন বেরুলাম– হাতে আছে মাত্র ২০ মিনিট। রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম, যেতে হবে সেই মহাখালি। যা-ই হোক, পৌঁছলাম কোনোরকমে। শেষ বিপত্তিটা হলো যখন দেখি কম্পিউটারে প্রেজেন্টেশন ওপেন হচ্ছে না। তবে নিজেকে সামলে নিতে পারলাম। কারণ মেডিটেশন আমাকে প্রশান্ত প্রত্যয়ী হতে শিখিয়েছে। সেদিন আমার আত্মবিশ্বাস ও স্বতঃস্ফূর্ততা সবাইকে মুগ্ধ করেছিলো। আমিই হয়েছিলাম 'বেস্ট প্রেজেন্টার'।

[কাজী শামীম, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ফার্মেসির ছাত্র, ১৩৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পেলাম

অধ্যক্ষ মাহফুজুল হক



১০ থেকে ৮০ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা সবাই একসাথে এ কোর্সে ডিগ্রিপ্রাপ্ত হলাম। একই সনদ পেলাম। ফাউন্ডেশনকে তাই বলা যেতে পারে একটি বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ। এখানে এসে পেলাম নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান। বোঝা গেল মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে অনেক কিছু সম্ভব। ২০০৩ সালে এ কোর্সটি করার সুযোগ হয়েছিলো। কিন্তু তখন করি নি; করলে এতদিনে অনেক এগিয়ে যেতে পারতাম।

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজেও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের শিক্ষার্থী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কলেজের ক্যারিয়ার ক্লাব সংগঠক ইমাম উদ্দীন-এর সহযোগিতায় এসব কার্যক্রমের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উন্নতিসহ নৈতিক ও মানবিক বিকাশেও ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

ভোগ এবং বস্তুকেন্দ্রিক আধুনিক জীবন ব্যবস্থার প্রভাবে মানুষের মানসিক সন্তুষ্টি এবং আনন্দের ভাগটা কমে গেছে অনেক। এখনকার কিশোর-তরুণদের জীবনেও পড়েছে এই অস্থিরতা আর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভাব। ধ্যানচর্চা এবং নৈতিক-মানবিক বোধের পুনর্জাগরণের মাধ্যমেই সম্ভব এ বুভুক্ষার অবসান ঘটানো। কোয়ান্টাম মেথড এবং ফাউন্ডেশন সে কাজটিই করছে।

[মাহফুজুল হক, অধ্যক্ষ, ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ, ২৭২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ভালো মানুষ হতে চাই

মুমতাহিন আহমেদ



ছোটবেলা থেকে প্রশংসা, উপহার বা লেখাপড়ার পর একটা ভালো জব– এসবই ছিলো ভালো রেজাল্টের উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন একজন ভালো মানুষ হওয়ার তাগিদ প্রবলভাবে অনুভব করছি। যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে আছি সেখানে ভালো করতে হলে আমাকে অনেক বেশি চেষ্টা করতে হবে, আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। এ প্রেরণাও আমি পাচ্ছি এখানে এসে।

[মুমতাহিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিনান্সে বিবিএ করছেন, ২৬৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মালয়েশিয়াতেও আমি বেশ ভালো আছি

মাহমুদুর রহমান ইরেশ

২০০৬ সালে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত টেলিকমিউনিকেশনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয় মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসি। স্কলারশিপ পাওয়া মালয়েশিয়ায় খুব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আমার মনছবি, মায়ের দোয়া এবং ফাউন্ডেশনের দিক-নির্দেশনার আলোকে কঠোর চেষ্টার ফলে এখনো পর্যন্ত তা ধরে রেখেছি।

লেখাপড়ার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সামাজিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রমেও নেতৃত্ব দিচ্ছি। ২০০৭-'০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। সবচেয়ে বড় ক্রীড়া সংগঠনে পরিণত করা ছাড়াও ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলংকা থেকে আগত বিশ্ববিদ্যালয় টিমগুলোর সাথে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে নেতৃত্ব দিয়েছি সাফল্যের সাথে। এর ফলে মালয়েশিয়ান জাতীয় দলের সদস্য হিসেবে থাইল্যান্ডে খেলতে যাওয়ার সুযোগ পেলাম।

সুযোগ পেয়েছি আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার প্রেসিডেন্ট মাহাথির মোহাম্মদের সাথে দেখা করার, কথা বলার। সব মিলিয়ে অন্যান্য বাংলাদেশি বন্ধু ও সহপাঠীদের যখন দেখি ক্ষোভ, হতাশা বা ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত তখন ভেতর থেকেই অনুভব করি যে, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমি বেশ ভালো আছি।

[মাহমুদুর রহমান ইরেশ, মালয়েশিয়ার মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অধ্যয়নরত, ১৩০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



জিপিএ ৪.৭০ নিয়েও মেডিকেলে চান্স পেলাম

মো. সামিউল ইসলাম অনি



ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিলো ডাক্তার হওয়ার। বাবা-মায়ের ইচ্ছেও ছিলো তা-ই। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমার এইচএসসি-র রেজাল্ট। জিপিএ-৫ এর ছড়াছড়ির এ যুগে যেখানে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার্থী অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই জিপিএ-৫ পাওয়া, সেখানে মাত্র ৪.৭০ নিয়ে চান্স পাওয়াটা একটা দূর-কল্পনার মতো মনে হতে লাগলো।

এমন সময় কোর্স করি। কোর্সের কিছু কথা আমার সবসময় কানে বাজতো। শৃঙ্খলকে ভাঙতে হবে। মনছবি যদি দৃঢ় হয় তবে সেটা পূরণ হতে বাধ্য। সেই গল্প যেখানে ২৮টা পোস্ট আর পরীক্ষা দেবে হাজার হাজার। ঘুরে দাঁড়ালাম। মনছবি, মাটির ব্যাংক, হিলিং আর পরিশ্রমের জোরে এ-প্লাসধারী অনেক ছাত্রকে পেছনে ফেলে আজ আমি মেডিকেলের ছাত্র।

[মো. সামিউল ইসলাম অনি, রংপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্র, ২৭১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পেয়েছি এগিয়ে চলার শক্তি

হেলেনা আক্তার শিকদার



২০০৫ সালে আমার স্বামীর সাথে জাপানে আসি। প্রবাস জীবন অনেক কষ্টকর। ভাষার ব্যবধান, মানসিক চাপ, একাকীত্ব ইত্যাদি নানা সমস্যা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। কিন্তু নিয়মিত মেডিটেশন, মাটির ব্যাংকে দান ও কোয়ান্টামের সাথে যোগাযোগ আমাকে শক্তি যোগায়।

কয়েক মাসের মধ্যে ৫ বছরের জন্যে জাপান সরকার প্রদত্ত মুম্বুসু স্কলারশিপ পেলাম। আমার সন্তানের জন্মের পর পরিবারের দেখাশোনা ও পড়াশোনা একসাথে চালিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। আমি নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করতে থাকি ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কোয়ান্টাম বুলেটিন ও কণিকা পড়ে অনুপ্রাণিত হই। স্রষ্টার অসীম কৃপায় এ বছরের এপ্রিল মাসে টোকিও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করে পিএইচডি প্রোগ্রাম শুরু করেছি। আমার সুখ ও সাফল্যের জন্যে আমি কোয়ান্টামের কাছে চিরঋণী।

[হেলেনা আক্তার শিকদার, ১৩৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট, টোকিও মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি-র ছাত্রী]

কেন ভালো রেজাল্ট

এ কে এম সাদাত



আগে আমার পড়াশোনায় মন বসতে চাইতো না। কিন্তু এখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, কারণ আমি বুঝতে পেরেছি ভালো রেজাল্ট করার গুরুত্ব। ক্লাসে ১ম হলে অনেক সুযোগ সুবিধা যেমন পাওয়া যাবে তেমনি জীবনে ১ম হওয়ার পথেও এগিয়ে থাকা যাবে। তাই আমি এখন মনোযোগী।

[এ কে এম সাদাত, সাউথ পয়েন্ট স্কুলে স্ট্যান্ডার্ড ফোর-এর ছাত্র, ২৭২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

চাওয়া থেকে পাওয়ায়

সৌমেন সরকার



এসএসসি পরীক্ষার পর মনছবি দেখতাম আমি জিপিএ-৫ পাচ্ছি। তা-ই হলো। নটরডেম কলেজে ভর্তি হলাম। এখানেও মনছবি। ১ম বর্ষে একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম। মনছবি করলাম সুন্দরভাবে সব প্রস্তুতি শেষ করে এইচএসসি দেবো এবং জিপিএ-৫ পাবো। সেটাও হলো। এবার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন। ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি আর মনছবি করছি। পরম করুণাময়ের আশীর্বাদে ভর্তি পরীক্ষায় ১৮০ স্কোর করে সুযোগ পেলাম ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে। আমার প্রতিটি চাওয়াই পাওয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে।

[সৌমেন সরকার, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র, ১৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বাবা-মায়ের স্বপ্নপূরণ করতে চাই

তাহরিন তাসলিম জ্যোতির্ময়



কোর্স করার পর একটাই লক্ষ্য হয়ে গেল যে, ক্লাসে ১ম হতে হবে এবং সেই সূত্র ধরে জীবনে ১ম হওয়ার পথে এগুতে হবে। মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলাম। যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়ে গোল্ডেন এ পেলাম এইচএসসি-তে। সরকারি বৃত্তিও পেয়েছি। এখন উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। ভালো রেজাল্ট করে বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ এবং ফাউন্ডেশনের সম্পদে রূপান্তরিত হতে চাই।

[তাহরিন তাসলিম জ্যোর্তিময়, ২৪৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রতিকূলতাই শক্তি

কামরুন নাহার তোফা



কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর পরই করলাম শিক্ষার্থী কোর্স। আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। জীবনছবি হলো স্পষ্ট। ফলে শিক্ষাজীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা 'ও' লেভেলে ৪টি সাবজেক্টেই 'এ' পেলাম। সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছি ম্যাথে। অথচ ম্যাথের ১ বছরের কোর্সটি আমাকে করতে হয়েছিলো মাত্র ৬ মাসে। পরীক্ষার ১ মাস আগেও সহপাঠীরা সবাই যখন রিভিশনে ব্যস্ত, আমি তখন সিলেবাস শেষ করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু বিশ্বাস করতাম– কোর্সে শেখা 'প্রতিকূলতার মধ্যেই মানুষ তার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা খুঁজে পায়' কথাটি। শেষমেষ তারই প্রমাণ পেলাম।

[কামরুন নাহার তোফা, ছাত্রী, ২৪২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রুটিন করে পড়তে শিখলাম

মো. নাকিব হায়াৎ চৌধুরী



প্রথমবার এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারলাম না অসুস্থতার কারণে। দ্বিতীয়বার উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে। ১ম বর্ষের পরীক্ষাও দিতে পারলাম না ব্যক্তিগত কারণে। এর মধ্যেই কোর্সে অংশ নিই। আগের চেয়ে অসুস্থতার পরিমাণ অনেক কমে যায়। কিছুদিন পর শিক্ষার্থী কোর্সে অংশ নিই। এই একটি কোর্স পড়ালেখার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পুরো পাল্টে দেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, রুটিন করে পড়তে শিখলাম। এর কমাস পর দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষায় আমার ৬৫% নম্বর আসে যা ১ম বর্ষের তুলনায় অনেক বেশি।

[মো. নাকিব হায়াৎ চৌধুরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ২৪৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ইংলিশ মিডিয়াম থেকেই চান্স পেয়েছি

তপেশ সোপান



কোর্স করার পর পড়াশোনায় সাফল্য লাভই ছিলো আমার মনছবি। নিয়মমাফিক পড়াশোনা ও মনছবির বদৌলতে ও লেভেলে সব বিষয়ে 'এ' পাই। এরপর এ লেভেলেও প্রতিটিতে 'এ'সহ কেমিস্ট্রিতে পুরো বাংলাদেশে সর্বোচ্চ মার্কস পাই। এরপর দেশের সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মনছবি দেখলাম। এক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থীরা জাতীয় পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পায় না। কিন্তু মনছবি আমাকে সাহস যুগিয়েছে গন্তব্য ঠিক করে নিতে। এর মধ্যে শিক্ষার্থী কোর্সে অংশগ্রহণ আমার আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে দেয়। করুণাময়ের কৃপায় বুয়েট ও চুয়েটে পরীক্ষা দেই এবং দুটোতেই চান্স পেয়ে বর্তমানে বুয়েটে পড়ছি।

[তপেশ সোপান, বুয়েটে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অধ্যয়নরত, ১৮৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জেগেও মনছবিই দেখতাম

আল-আমিন আবু আহমেদ



এইচএসসি পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় ভালো কোথাও চান্স হবে না ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল। এসময়ই শাবিপ্রবি সেলের ভাইয়াদের দেখে খুব অনুপ্রাণিত হলাম। মনছবি দেখলাম আর্কিটেকচারে পড়ছি শাবিপ্রবিতে। রেজাল্ট হলো ৪.৭০। মনছবি আরো দৃঢ় হলো। মেডিটেশনে তো বটেই জেগেও মনছবি দেখতাম। আর তারই ফল আমার আজকের বাস্তবতা।

[আল-আমিন আবু আহমেদ, আর্কিটেকচার বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ২১০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমার পরিচিতি এখন ভালো স্টুডেন্ট

প্রাঙ্গন দাস বন্যা



টেস্টে অনেকগুলো বিষয়ে ফেল করে কোনো রকমে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম এইচএসসি পরীক্ষার জন্যে। জিপিএ খারাপ থাকায় ভালো কোথাও ভর্তি হতে পারছিলাম না। কিন্তু এখন আমার সর্বশেষ রেজাল্ট হচ্ছে ৬টা সাবজেক্টের মধ্যে ৫টাতেই এ-প্লাস। এটাই আমার ব্যাচের টপ রেজাল্ট। ভালো স্টুডেন্ট বা গুড প্রেজেন্টার কিংবা 'এই মেয়েটার কোনো নার্ভাসনেস নেই'... এ মন্তব্যগুলোই এখন ক্লাসে আমার পরিচিতি।

[প্রাঙ্গন দাস বন্যা, মাইক্রোবায়োলজি ২য় বর্ষ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ২১৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



নেশা কী?

নেশা হচ্ছে কোনো কিছুর ওপর একধরনের মানসিক নির্ভরতা। সাধারণভাবে নেশা বলতে এলকোহল বা মাদকাসক্তিকে বোঝালেও নেশা যেমন হতে পারে ধূমপান, তেমনি কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস, ওষুধ, টনিক থেকে শুরু করে জুয়া, যৌনাচার এমনকি কেনাকাটাও পরিণত হতে পারে নেশায়। মোবাইল, ইন্টারনেট বা ভিডিও গেমস হতে পারে নেশার বিষয়।

প্রচলিত চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা

মাদকাসক্তির প্রচলিত চিকিৎসায় রোগীকে কিছু ওষুধ দেয়া হয়। সেই সাথে চলে পুনর্বাসন কেন্দ্রে রেখে কাউন্সেলিং এবং আচরণ বদলানোর প্রয়াস। মাদকাসক্তি নিরাময়ে যে ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয় তার বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। আর এ চিকিৎসাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো এতে একজন রোগীর নিজস্ব প্রয়োজনকে আলাদাভাবে দেখা হয় না। তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, মাদকাসক্ত হওয়ার কারণ, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি কোনোকিছুই বিবেচনায় আনা হয় না। ফলে দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদে এতে কোনো লাভ হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে তারা আবারও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

মেডিটেশন কেন?

প্রচলিত অন্য যেকোনো চিকিৎসাব্যবস্থার চেয়ে সিগারেট, মাদক ও অন্য কোনো ড্রাগের আসক্তি থেকে নিরাময়ে মেডিটেশনই এখন বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত হচ্ছে নানা গবেষণায়।

৭০-এর দশক থেকে এ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত সবগুলো গবেষণায়ই ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। এ গবেষণাগুলোর একটা মেটা এনালিসিস করেছেন মহাঋষি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্টের চার্লস আলেক্সান্ডার ও তার সহযোগীরা। তারা দেখেছেন সবগুলো ফলাফলেই আসক্তি থেকে রোগীরা অন্য যেকোনো প্রক্রিয়ার চেয়ে মেডিটেশনে কার্যকরীভাবে নিরাময় হয়েছেন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই। তাদের পুনরায় মাদকাসক্ত বা ধূমপানে আসক্ত হওয়ার হারও অনেক কম।

২০০৬ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের ড. সারা বাওয়েন ও তার সহযোগীরা জেলখানার মাদকাসক্ত বন্দিদের ওপর বিপাসন মেডিটেশনের প্রভাব বিষয়ে এক গবেষণা চালান। এতে দেখা যায়, জেলে থাকার সময় যারা মেডিটেশন কোর্সে অংশ নিয়েছে, জেল থেকে বেরিয়ে তাদের মাদকাসক্তির পরিমাণ কমেছে। এসব মাদকের মধ্যে এলকোহল যেমন আছে তেমনি আছে কোকেন, মারিজুয়ানা ইত্যাদিও। মেডিটেশনকারী গ্রুপের মধ্যে মাদকের প্রভাবজনিত মানসিক সমস্যাও কম। সামাজিক পরিবেশের সাথে তারা আরো ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পারছে।

ক্যালিফোর্নিয়া স্কুল অফ প্রফেশনাল সাইকোলজি, বার্কলের গবেষক ক্যারোল বলেন, মেডিটেশন জীবনে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণতা তৈরি করে যা মাদকাসক্তি থেকে মুক্তির প্রধান কারণ।

মেডিটেশন এবং সুস্থ জীবনদৃষ্টির এ অনন্য নির্দেশনার আলোকে গত ১৭ বছরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণকারী শত শত মানুষ ধূমপান, মাদকের মতো নেশা থেকে যেমন নিজেদেরকে মুক্ত করেছেন তেমনি সফট ড্রিংকস, এনার্জি ড্রিংকস, দুধ-চায়ের মতো ক্ষতিকর খাদ্যাভ্যাসকেও ছেড়েছেন অবলীলায়।

> নেশা হলো এক ধরনের মস্তিষ্কবিকৃতি। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নেশাগ্রস্ত তাদের ব্রেনের গঠন এবং কর্মকাঠামোয় এমন কিছু ক্ষতিকর পরিবর্তন আসে যা অন্যদের মধ্যে নেই। বিশেষ করে মাদকাসক্তদের চিন্তাপ্রক্রিয়ায়ও দেখা গেছে বিশেষ কিছু পরিবর্তন। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে মনোযোগ, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি– সবকিছুই প্রভাবিত হয় ঐ পরিবর্তিত অবস্থা দ্বারা।
>
> *–আমেরিকান সাইকোলজিকেল এসোসিয়েশন*

১৭ বছরের নেশার বৃত্ত ভেঙে মুক্তির আনন্দে

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় আমার প্রবেশ হয় নেশার জগতে। সচ্ছল পরিবারের ছোট ছেলে, চাকরির উচ্চ বেতন আর বন্ধুদের সঙ্গ– সবকিছুই ছিলো নেশার জন্যে সহায়ক। ১৭ বছর জড়িয়ে ছিলাম নেশার জালে। প্রতিদিন আমার ৫/৬ বোতল ফেনসিডিল এবং ৩/৪ প্যাকেট সিগারেট লাগতো।

ক্রমাগত অনিয়মের কারণে শরীর ভেঙ্গে যায়। দেখা দেয় উচ্চমাত্রার ডায়াবেটিস। এদিকে নেশার পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে টাকার চাহিদাও বেড়ে যায়। ফলে ভালো চাকরির সুযোগে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে শুরু করি। শুধুমাত্র নেশার চাহিদা মেটানোর জন্যে কয়েক বছরের মধ্যে আমি পুরোপুরি জড়িয়ে গেলাম ঋণের দুষ্টচক্রে।

ইতোমধ্যে নেশা থেকে মুক্ত করানোর চেষ্টায় আমার পরিবার আমাকে বিয়ে করায়। দুটি সন্তানের বাবা হলাম। মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্যে দেশে এবং দেশের বাইরে চিকিৎসাও করাতে লাগলাম। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভালো, তারপর আবার শুরু করা– এভাবেই চলছিলো জীবন। মনে হতো মৃত্যু ছাড়া বোধ হয় এ নেশা থেকে আমার মুক্তি নেই।

২০০৫-এর প্রথমদিকে বিদেশে চেকআপে গিয়ে আমার হেপাটাইটিস-সি ধরা পড়লো। ডাক্তাররা বললেন, নিরাময় সম্ভব নয়। সেইসাথে শুরু হলো ঋণ পরিশোধের চাপ। এদিকে ঠিকমতো অফিস করতে পারছি না বলে চাকরিও চলে যাওয়ার অবস্থা। সবাই ভাবতো আমি বোধ হয় মারা যাচ্ছি।

ঠিক সেসময় এক বন্ধুর প্রেরণায় কোর্স করার পর বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে, আমি পারবো। ফেনসিডিল আর সিগারেট পুরোপুরি ছেড়ে দিলাম। বন্ধ করে দিলাম আড্ডা আর নেশার সঙ্গীদের সাথে যোগাযোগ। প্রতি মঙ্গলবার অফিস থেকে ছুটি নিতাম ফাউন্ডেশনের আলোকায়ন অনুষ্ঠানে আসার জন্যে। কষ্টের কথা গুরুজীকে বলতাম। তিনি শুধু মাথায় হাত রেখে বলতেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

হেপাটাইটিস চিকিৎসার জন্যে অন্যদের ৪৮টি ইনজেকশন নিতে হলেও আমাকে নিতে হয়েছিলো ২৪টি। যদিও শরীরের ওপর এর প্রভাব হওয়ার কথা কেমোথেরাপির মতোই তীব্র। তারপরও আমি অফিস করেছি নিয়মিত। এর মধ্যে ১৪টি ইনজেকশনের পরই ডাক্তার আমাকে হেপাটাইটিসমুক্ত বলে জানালেন। ওষুধ ছাড়াই ডায়াবেটিস চলে এলো পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

ইতোমধ্যে চাকরিতে পেয়েছি দুবার পদোন্নতি। ঋণ থেকে মুক্ত হয়েছি। আমার পরিবারে এখন সবাই কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। প্রতিবছর সপরিবারে লামায় যাই।

আগে আমার জন্মদিন ছিলো দুটি। একটি এসএসসি রেজিস্ট্রেশনের সময় স্কুল থেকে দেয়া, আরেকটি আসল। গত কয়েক বছর ধরে আমার আরেকটি জন্মদিনও পালিত হয়। তা হলো ৮ এপ্রিল– যেদিন আমি কোয়ান্টাম কোর্স শুরু করেছিলাম।

–প্রকৌশলী আহমেদ



সফট এবং এনার্জি ড্রিংকস আপনি যে জন্যে খাবেন না

১. কারণ আপনি মোটা হতে চান না

মোটা হওয়া মানে শুধু দেখতে খারাপ বা শারীরিক অস্বস্তির ব্যাপারই নয়। ওজন বাড়লে আপনি খুব অনায়াসে যে অসুখগুলোতে আক্রান্ত হবেন তা হলো টাইপ টু ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, স্ট্রোক, হার্ট এটাক, ক্যান্সার, গলব্লাডারে পাথর, আর্থ্রাইটিস। পরিণামে অকাল মৃত্যু।

মোটা হওয়ার সঙ্গে সফট ড্রিংকস-এর একটা সরাসরি যোগাযোগ আছে। বোস্টনের শিশু হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগ এবং হার্ভার্ড স্কুল একসাথে গবেষণা করে যা বের করেছে তাহলো, একটি শিশু যদি প্রতিদিন একটা করে বাড়তি সফট ড্রিংকস খায় তাহলে তার ওজন বাড়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ৬০%। এক বোতল বা এক ক্যান সফট ড্রিংকসে ক্যালরির পরিমাণ হলো ১৬০ যা ১০ চামচ চিনির সমান। এ পরিমাণ ক্যালরি ঝরাতে সপ্তাহে আপনাকে ভারী ব্যায়াম করতে হবে সাড়ে ৪ ঘণ্টারও বেশি। কিন্তু আপনি কি তা করেন? তাহলেই বুঝুন পরিণতি!

২. কারণ আপনি আপনার দাঁত হলুদ বানাতে চান না

ধরুন, আপনি আপনার বন্ধুদের একটা জাদু দেখাতে চান। আপনার ধবধবে সাদা মুক্তোর মতো দাঁতগুলোকে আপনি ১ ঘণ্টার মধ্যে স্থায়ীভাবে হলুদ করে ফেলবেন। কিছুই না, এক ঢোক কোলা মুখে নিয়ে ১ ঘণ্টা ধরে রেখে দিন। ব্যস, এনামেল ক্ষয়ে দাঁতগুলো হলুদ হয়ে যাবে।

সফট ড্রিংকসের ঝাঁঝালো স্বাদ বাড়ানোর জন্যে এতে ফসফরিক এসিড ব্যবহার করা হয়। এ এসিড এত শক্তিশালী যে, একটা নখ এর মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে ৪ দিন পর আর আপনি নখটাকে খুঁজে পাবেন না। তাছাড়া সফট ড্রিংকসে যে চিনি ব্যবহার করা হয়, ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে এটাও এসিড তৈরি করে।

৩. কারণ আপনি ভঙ্গুর হাড় চান না

ফসফরিক এসিডের আরেকটি কাজ হলো হাড়ের ক্যালসিয়ামকে ক্ষয় করা। ১৯৯৪ সালে টিনএজ মেয়েদের ওপর চালানো হার্ভার্ডের এক গবেষণায় দেখা যায়, যে মেয়েরা সফট ড্রিংকস পান করে অন্যদের তুলনায় তাদের হাড়ভাঙার প্রবণতা ৫ গুণ বেশি। পরবর্তীকালে অস্টিওপরোসিস নামক হাড়ের ক্ষয়জনিত একটি রোগ এদের হতে পারে। এ রোগে হাড়ের ঘনত্ব কমে এবং গঠন দুর্বল হয়ে যায়। ফলে হাড় সহজে ভেঙে যায়। সাধারণত বয়স্ক মহিলাদের এ রোগটি বেশি দেখা দেয় আর আশঙ্কার কথা হলো, ভাঙা হাড় আর সহজে সেরে ওঠে না। ২,৫০০ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার ওপর এ ধরনের আরেকটি গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, এমনকি যারা নিয়মিত দুধ বা অন্যান্য ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করেন তারাও কোলাজাতীয় ড্রিংকসের ক্ষতিকর এ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেন নি।



৪. কারণ আপনি আসক্ত হতে চান না

প্রতি বোতল সফট ড্রিংকসে ক্যাফেইন আছে ৫০ মিলিগ্রামের মতো। সফট ড্রিংকস কোম্পানিগুলোর দাবি– এটা তারা ব্যবহার করছে স্বাদ বাড়ানোর জন্যে। কারণ ক্যাফেইনের তেতো স্বাদ অন্যান্য ফ্লেভারকে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু জন হপকিন্স মেডিকেল ইনস্টিটিউটের রোলান্ড গ্রিফিথ বেশ কয়েকজন মানুষকে বাজারের সাধারণ সফট ড্রিংকস এবং ক্যাফেইন ছাড়া ড্রিংকস খেতে দিয়ে দেখেন, ৯২% জনই এ দুটোর পার্থক্য বুঝতে পারে নি। তার মানে ক্যাফেইনের স্বাদের ব্যাপারটি সঠিক নয়।

তাহলে ক্যাফেইন দিয়ে কী হয়? ক্যাফেইন আসলে আসক্তি সৃষ্টি করে। আপনি একবার যখন এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন আপনি তখন শুধু এটাই চাইবেন।



বিশ্বব্যাপী কোকাকোলা বিরোধী প্রচারণার একটি নমুনা

আর সব আসক্তি সৃষ্টিকারী উপাদানের মতো ক্যাফেইনও সাময়িকভাবে আপনার মুডকে চাঙ্গা করলেও দীর্ঘমেয়াদে এর রয়েছে অনেকগুলো ক্ষতিকর দিক। যেমন, এক বা দুই বোতল সফট ড্রিংকসই আপনার অনিদ্রা, নার্ভাসনেস ও দ্রুত হৃৎস্পন্দন সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট। বেশি পরিমাণে খেলে তা অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন থেকে শুরু করে আতঙ্ক এবং উদ্বেগ প্রবণতা, পেশিতে টান লাগা, অসংলগ্ন কথাবার্তা, বিষণ্ণতা এবং উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভবতী মহিলা– যারা সফট ড্রিংকস খেয়েছেন তাদের গর্ভপাত, সময়ের আগেই প্রসব বা কম ওজনের বাচ্চা জন্ম দেয়ার ঝুঁকি বেশি।

ক্যাফেইনের আরেকটি প্রভাব হলো, এটা প্রস্রাবের প্রবণতা বাড়ায় এবং দেহকে পানিশূন্য করে ফেলে। তার মানে প্রখর রোদের মধ্যে সফট ড্রিংকস খেয়ে আপনি হয়তো ভাবছেন– যাক, শরীর থেকে যে ঘাম ঝরে যাচ্ছে তা পূরণ করছেন। আসলে ফল তার উল্টো। তার চেয়ে বরং পানি খান।

৫. কারণ আপনি বদহজমে ভুগতে চান না

আমরা অনেকেই রিচফুড খাওয়ার পর সফট ড্রিংকস খেতে চাই এ ধারণায় যে, এতে খাবার দ্রুত হজম হবে। অথচ এটা যে কত ভুল ধারণা তা একটু বললেই পরিষ্কার হবে। আমাদের দেহ সাধারণত ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় খাবার হজম করে থাকে। কিন্তু সফট ড্রিংকস যখন পরিবেশন করা হয়, তখন এর তাপমাত্রা থাকে ৩/৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাজেই খাবার গ্রহণের পর যখন ঠান্ডা কোমল পানীয় পান করা হয়, তখন হজমে তো সাহায্য করেই না, উল্টো তাতে পচন ধরায়।

তাছাড়া এসিডিক হওয়ার কারণে সফট ড্রিংকস পাকস্থলীর সংবেদনশীল এলকালাইন ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে। ফলে পেট ব্যথা, ফুলে যাওয়া, বদহজম, গ্যাস, টক ঢেকুর ইত্যাদি নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৬. কারণ আপনি ডায়াবেটিস বাঁধাতে চান না

চিনি এবং ওজনে এর ভূমিকার কারণে সফট ড্রিংকস ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। আমেরিকান ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের ৪ বছর ধরে চলা এক গবেষণায় দেখা গেছে, যে মহিলারা সফট ড্রিংকস বেশি খান, তাদের টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সাধারণ মহিলাদের চেয়ে ২ গুণ বেশি।

৭. কারণ আপনি ক্যান্সারের রোগী হতে চান না

সফট ড্রিংকস দেহে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। ক্যারামেলের রং আনার জন্যে সফট ড্রিংকসে পলি-ইথিলিন গ্লাইকোল নামে যে রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়, তা ক্যান্সার সৃষ্টির জন্যে দায়ী। মজার ব্যাপার হলো, 'ডায়েট কোলা' নামে লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে যে সফট ড্রিংকস বিক্রি হয় তাতে চিনির পরিবর্তে এসপার্টেম নামে একটি কেমিকেল ব্যবহার করা হয়। দেহের ওপর এ উপাদানটির রয়েছে ৯২ ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব। তার মধ্যে রয়েছে ব্রেন টিউমার, বন্ধ্যাত্ব, ডায়াবেটিস, মৃগী এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতা।

৮. কারণ কিডনি ডায়ালাইসিসকে আপনি খুব সুখকর কিছু মনে করেন না

সফট ড্রিংকস যাতে বরফের মতো জমে না যায় সেজন্যে এতে ইথিলিন গ্লাইকোল নামের একটি উপাদান ব্যবহার করা হয়। এটি প্রায় আর্সেনিকের মতোই একটি বিষ। কিডনির ওপর এর প্রভাব খুব ক্ষতিকর। ১ ঘণ্টায় আপনি যদি ৪ লিটার কোক খান তাহলে কিডনি ফেইলিওর হয়ে আপনার মৃত্যু নিশ্চিত। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন– যারা সফট ড্রিংকস খান না বা পরিমিত খান, তাদের তুলনায় যারা প্রচুর পরিমাণে খান, তাদের কিডনিতে পাথর জমার হার প্রায় তিনগুণ!

সফট ড্রিংকসে যে স্যাকারিন ব্যবহার করা হয়, তাতে ইউরিনারি ব্লাডার ক্যান্সার অর্থাৎ মূত্রাশয়ের ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

৯. কারণ আপনি শ্বাসকষ্টে ভুগতে চান না

সফট ড্রিংকসের তাৎক্ষণিক বিপদ হচ্ছে গলা বা শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি। আমাদের নাকে, গলায় তথা শ্বাসতন্ত্রের শুরুর দিকের অংশে থাকে অসংখ্য সিলিয়া। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়ত যে ধূলিকণা, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস গ্রহণ করি এই সিলিয়াগুলো সেগুলোকে শরীরের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়। সফট ড্রিংক খেলে এসব সিলিয়াগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শুরু হয় টনসিলাইটিস, ফেরিংজাইটিস, ল্যারিংজাইটিস, ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়ার মতো শ্বাসজনিত রোগ।



পপুলার সায়েন্স ম্যাগাজিনে সফট ড্রিংকসের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে গবেষণালব্ধ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়



১০. কারণ কীটনাশককে আপনি খাওয়ার জিনিস মনে করেন না

২০০৪ সালে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ ও ছত্তিশগড় রাজ্যে কৃষকরা কোকাকোলাকে কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে অন্ধ্র প্রদেশের রামকৃষ্ণপুরমের চাষী গটু লখমাইয়া বলেন, আমার তুলা চাষের কয়েক হেক্টর জমি জুড়ে আমি সফট ড্রিংকস স্প্রে করেছি। কারণ আমি দেখেছি এতে পোকা মরে যায়। অন্য চাষীরাও বলেছেন, সফট ড্রিংকস প্রচলিত কীটনাশকের তুলনায় দামে যেমন সস্তা, তেমনি ব্যবহারকারীর ত্বকের জন্যেও নিরাপদ।

১১. কারণ আপনি অকালে বুড়িয়ে যেতে চান না

ম্যাসাচুসেটসের ৫০ বছর বয়স্ক একদল নারী-পুরুষ যারা প্রতিদিন ১ ক্যান বা এর বেশি করে সফট ড্রিংকস পান করেছেন, তাদের ওপর ৪ বছর ধরে চালানো এক গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের মেটাবলিক সিনড্রোম বেড়ে গেছে ৪৪%। মেটাবলিক সিনড্রোম বাড়লে ডায়াবেটিস, হৃদরোগের ঝুঁকি যেমন বাড়ে তেমনি অকালে বুড়িয়ে যায় দেহ।

১২. আর আপনি মুসলিম হলে এটি আপনার জন্যে হালাল না-ও হতে পারে

গবেষক মার্ক পেন্ডারগ্রাস্ট কোকাকোলার ওপর দীর্ঘ গবেষণা করে লিখেছেন দীর্ঘ নামের একটি বই– ফর গড, কান্ট্রি এন্ড কোকাকোলা : 'দ্য ডেফিনিটিভ হিস্ট্রি অফ দ্য গ্রেট আমেরিকান সফট ড্রিংক এন্ড দ্য কোম্পানি দ্যাট মেকস্ ইট'। এ বইতে তিনি শতাব্দীব্যাপী গোপন করে রাখা কোকের ফরমুলা প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ ফরমুলার একটি উপাদান হলো এলকোহল। সুতরাং আপনি যদি মুসলিম হয়ে থাকেন, তাহলে চিন্তা করে দেখুন আপনি কী খাচ্ছেন আর আপনার সন্তানকেই বা কী খেতে উৎসাহিত করছেন।

এনার্জি ড্রিংকস মাদকাসক্তির কালো দরজা উন্মুক্ত করে

সফট ড্রিংকসের পর এখন বাজার সয়লাব হয়ে গেছে নানা নামের এনার্জি ড্রিংকসে। টেলিভিশনের পর্দায় প্রিয় তারকাদের দিয়ে তৈরি এসব ড্রিংকসের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন যখন দর্শক দেখে, তখন ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে সবারই হয়তো মনে হয় এটা খেলে এক্ষুণি বোধ হয় অসুরিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যাবে। 'একটু বুঝে শুনে খাও, কখন যে কী হয় কিচ্ছু বলা যায় না' কিংবা 'এই ড্রিংকস খেলে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারবেন' ইত্যাদি রীতিমতো আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করে নির্মিত এসব বিজ্ঞাপনগুলো কিছু মানুষকে আকৃষ্ট করছে তাতে সন্দেহ নেই। তারা দেদারসে খাচ্ছেন এসব এনার্জি ড্রিংকস নামের তথাকথিত শক্তি ড্রিংকস যা মাদকাসক্তির কালো দরজাকেই উন্মুক্ত করে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো এনার্জি ড্রিংকস নিয়ে মাতামাতি করলেও উন্নত বিশ্ব ইতোমধ্যেই এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হয়ে একের পর এক ব্র্যান্ডকে নিষিদ্ধ করছে।

১৯৯৭ সালে আমেরিকার বাজারে আসে 'রেড বুল' নামের একটি এনার্জি ড্রিংক যা বাজারের ৪৭% ভাগই দখল করে ফেলে। কিন্তু সম্প্রতি ফ্রান্সে ১৮ বছর বয়সী এক কিশোর বাস্কেটবল খেলার পর ৪ ক্যান রেড বুল খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে ফ্রান্স সরকার রেড বুলকে সে দেশে নিষিদ্ধ করে। ময়না তদন্ত রিপোর্টে কিশোরটির মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয় উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে এনার্জি ড্রিংকসের উচ্চমাত্রার ক্যাফেইন মিশে 'সাডেন এডাল্ট ডেড সিনড্রোম' থেকেই এ মৃত্যু হয়েছে।



কী আছে এনার্জি ড্রিংকসে?

এনার্জি ড্রিংকসে ক্ষতিকর অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি আছে উচ্চমাত্রার ক্যাফেইন যা মৃগীরোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দেহে ৪০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইনই যথেষ্ট। একজন নারীর জন্যে এ মাত্রা ৩০০ মিলিগ্রাম। অথচ একটা এনার্জি ড্রিংকের ক্যানেই থাকে ৩৬০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন। তাহলেই বুঝতে পারছেন একের পর এক এনার্জি ড্রিংক যখন আপনি গিলতে থাকেন তখন কী অবস্থা হয়! ক্রমাগতই উচ্চমাত্রার ক্যাফেইন নিতে থাকলে নার্ভাসনেস, বদমেজাজ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, পেশির টান, অনিদ্রা, মাথাব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

এছাড়া এনার্জি ড্রিংকসের আরেকটা ক্ষতিকারক দিক হলো সন্তানধারণে জটিলতা। যেসব নারী বা পুরুষ এনার্জি ড্রিংকসে অভ্যস্ত তাদের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়ে। তাছাড়া দুর্বল শিশু বা সময়ের আগেই বাচ্চা হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও দেখা দিতে পারে। এছাড়া কোমল পানীয়ের অন্যান্য ক্ষতিকর সবদিকই এর মধ্যে রয়েছে।

একজন ডাক্তার হয়েও কীভাবে!

ডা. মো. হাবিবুল ইসলাম



আমার দীর্ঘ ১২/১৩ বছরের ধূমপানের অভ্যাস ছিলো। সেইসাথে ৭ বছর ধরে দাঁতে ব্যবহার করতাম গুল (তামাক পাতা)। চিকিৎসক হিসেবে এর ক্ষতি সম্পর্কে জেনেও ছাড়তে পারছিলাম না। কোনো রোগীকে যখন পরামর্শ দিতাম বা ছোট কাউকে নিষেধ করতাম, তখন অনুশোচনা কাজ করতো। দোকানে সিগারেট বা গুল কিনতে গেলে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো– একজন ডাক্তার হয়েও আমি কীভাবে ধূমপান করছি।

এ নেশা থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা হলেই আর কিছু মনে থাকতো না। একসময় জেদ চেপে গেল, কেন পারবো না। অবশেষে কোর্সে অংশগ্রহণ করে প্রথম দিনের আলোচনা শুনেই নিজের ভেতর দৃঢ় বিশ্বাস চলে এলো যে, আমিও পারবো। তারপর থেকেই আজ দশ বছর যাবত আমি পুরোপুরি ধূমপানমুক্ত।

[ডা. মো. হাবিবুল ইসলাম, এনেসথেসিয়া বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

যোগ ধ্যানে নেশা টুটে

প্রদীপ সান্যাল

"একটা লোক। সে নবছর ধরে সময় কাটায় মদ খেয়ে। সপ্তাহের অন্তত পাঁচদিন। একদিন ভাবলো বেশি হয়ে যাচ্ছে। তখন সিদ্ধান্ত নিলো এখন থেকে শুধুমাত্র 'উইক-এন্ডে' খাবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার সে যখন মদ খাওয়া শুরু করলো, তখন ভাবলো যেহেতু সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে সে মদ খাচ্ছে না, সেহেতু তার ঐ দুদিন বেশি করে খাওয়া উচিত। সেভাবেই খেতে থাকলো। এই লোকটি আড়াই বছর আগে চমৎকার একটি ফুটফুটে ছেলের বাবা হলো। প্রথম সন্তান। যেদিন স্ত্রী-পুত্রকে হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে এলো সেদিন সিদ্ধান্ত নিলো তার বিছানা অন্য আরেকটা রুমে স্থানান্তর করার। অজুহাত? বাচ্চার কান্নাকাটি, বৌকে পছন্দ হয় না– এমনি নানা অজুহাত। ঐ রুমে চমৎকার একটা ক্যাসেট প্লেয়ার, প্রচুর গজলের ক্যাসেট আর পর্যাপ্ত মদের স্টক নিয়ে সে প্রত্যেকটা উইক-এন্ডে এবং বাদবাকি সময় বসতে লাগলো। প্রচুর দুঃখ তার। উসিলার অভাব নেই। যখন মদ খায় জিজ্ঞেস করলে বলে– 'প্রচুর দুঃখ আজকে'। কোনো কোনো দিন ভালো অবস্থাতেও খায়। বিবেকের উত্তরে অজুহাত দেয়– আজকে তো আনন্দে আছি, তাই একটু রিল্যাক্স করি না। কখনো খুব রিল্যাক্সড, কোনো অসুবিধা নেই, তখন বলে, 'বহুদিন তো ভালো সময় কাটাই না, আজকে একটু আনন্দ করি। ঘুমটাও ভালো হবে।' এরকম উসিলা লেগেই আছে। সে চালিয়ে যাচ্ছে। এরকম করতে করতেই এক সন্ধ্যায় কোনো কারণে সে ঐ ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে। মদের বোতল তখনও খোলে নি। হাতে পত্রিকা নিয়ে একটা লেখা পড়লো। যদিও সে কখনও রহস্য পত্রিকা পড়ে না। কাকতালীয় হলেও সে পরদিন খবরের কাগজের ভেতরের পৃষ্ঠায় বইমেলায় কি কি বই বেরিয়েছে তা দেখলো। তাতে তার কোনো প্রয়োজন যদিও নেই।

একটা বই 'কোয়ান্টাম মেথড'। এ সম্পর্কে সে শুনেছে– যাদের সময়ের অভাব নেই তাদের জন্যে– ফালতু! এরকম বোধ তার। তার এক বন্ধু ফিলিপাইন থেকে ঘুরে এসেছে। সে জানায় ওখানে সে এ সম্পর্কে শুনেছে। সে যা বলছিলো সেই বিষয়গুলোই বইটির পরিচিতিতে একটু একটু লেখা। বইমেলা থেকে সে একটি বই কিনলো– 'কোয়ান্টাম মেথড'। পড়তে পড়তে রাতটা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বইটা শেষ করতে পারলো না, অফিসে যেতে হবে। পরদিন আবার বসলো। কাকতালীয়ভাবে আরো ৭/৮টি বই জোগাড় হয়ে গেল– ধর্ম, ধ্যান/যোগ ইত্যাদি সম্পর্কে। ৪র্থ দিনে সে যোগ ফাউন্ডেশনের অফিস খুঁজে বের করে শিথিলায়নের ক্যাসেট সংগ্রহ করলো। ওদিকে মদের বোতলগুলো ইনট্যাক্ট, ধুলো জমে গেছে, খোলা হয় নি। লোকটা ব্যস্ত, ৫ম দিন থেকে ব্যায়াম করলো, ঘুম থেকে উঠে ছ-টায়। বন্ধু-বান্ধব জিজ্ঞেস করে, 'কি ব্যাপার'! সে মুচকি মুচকি হাসে।

প্রচুর রোজগারও করে সে, তবু কোর্সের টাকা তার কাছে নেই। সে বন্ধুর কাছে ধার করে কোর্সে ভর্তি হয়। যদি মিস হয়ে যায়! আমি সেই লোক! যদি দেখেন কেউ নষ্ট হচ্ছে আমার মতো, তবে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক হয়ে যাবে।

[সাপ্তাহিক রাষ্ট্র থেকে]

আমি এখন এক অন্য মানুষ

এমজেড

'৯৮ সালে যখন ক্লাস টেনে পড়ি, বাবা খুব অসুস্থ হলেন। চিকিৎসার জন্যে দেশের বাইরে থাকলেন বেশ কিছুদিন। সেসময়ই বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাদক নিতে শুরু করলাম। দেশে আসার কয়েকদিন পর বাবা মারা গেলেন। আমিও দুঃখ, অনিশ্চয়তা, দুর্ভাবনা ভুলে থাকার অজুহাতে মাদকের নেশায় ডুবে যেতে লাগলাম। ঘুমের বড়ি দিয়ে শুরু করলেও আস্তে আস্তে গাঁজা ফেনসিডিল মদ বিয়ার হেরোইন ইয়াবা– সবকিছুতেই আমি আসক্ত হয়ে পড়লাম। মা-কে এড়িয়ে চলতাম। পড়াশোনায় মন নেই। নানা অজুহাতে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিই। না দিলে জোরাজুরি এমনকি একবার মায়ের মাথাও ফাটিয়ে দিয়েছিলাম।

এর মধ্যে আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে আমাকে বিদেশে পড়তে পাঠালেন আমার মা। বাড়ি বিক্রির পয়সা দিয়ে চালাতেন আমার খরচ। ভেবেছিলেন বিদেশের পরিবেশ হয়তো আমাকে নেশা থেকে মুক্ত করবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। বিদেশে নতুন বন্ধু, নতুন ড্রাগস খুঁজে নিতে আমার মোটেও দেরি হয় নি।

টাকাপয়সা সব খুইয়ে কয়েকমাস পরই ফিরে এলাম। আবার সেই ড্রাগস, আবার সেই নেশার সঙ্গী। অবস্থা এত খারাপ হলো যে, আমার অত্যাচারে মা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। আমার চেহারা দেখলেই সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে যেতো– এই বুঝি কোনো অঘটন ঘটাবো। পুনর্বাসন কেন্দ্রে গিয়েও কোনো লাভ হচ্ছিলো না। ৪/৫ মাস করে থাকি, বের হয়ে ওখানে যাদের সাথে পরিচয় হয়, তাদেরকে নিয়ে আবার জমিয়ে তুলি নেশার আড্ডা।

২০০৮ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করলাম, নেশার জগতের বাইরের জগতটা অনেক সুন্দর, জীবনটা অনেক অর্থপূর্ণ। গত ১২টি বছর এত আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত ছিলাম! আমি আর এ জীবনকে বঞ্চিত করবো না। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আমি এখন এক অন্য মানুষ। যে মা-কে একসময় ছুরি মেরেছিলাম, আমার অত্যাচারে যিনি পালিয়ে বেড়াতেন, বাসায় গেলে আমি এখন তার পাশে ঘুমাই। যে আত্মীয়রা আমাকে দেখলে ভয়ে ছুটে পালাতো, তারাই এখন বিস্মিত হয়ে দেখছে, আমি তাদের বলছি আলোকিত জীবনের কথা।

৮ বছরের ছেলেটিও বোঝে এতে বিষ আছে

প্রদ্যোত কুমার সাহা



মেডিটেশন প্রশান্তি লাভের সর্বোত্তম পন্থা– সহকর্মীর কাছে মেডিটেশনের কথা শুনে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ না থাকলেও ক্যাসেট বাজিয়ে চেয়ারে বসে ধ্যানের কথা শুনতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগতো। কোর্সে এলাম। যেখানে কোনো মিটিংয়ে একঘণ্টার আলোচনা ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতো সেখানে ৪ দিন সময় যে কীভাবে কেটে গেল টেরই পেলাম না। এরপর একে একে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে এলাম। কোর্স করার পর আমাদের পারিবারিক খাদ্যাভ্যাসে এসেছে অনেক পরিবর্তন। আমাদের বাসায় সফট ড্রিংকস খাওয়ার খুব চল ছিলো। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেতাম আমি নিজে। কিন্তু এখন চিপস, কোল্ড ড্রিংকসের মতো ক্ষতিকর খাবারগুলো আমরা বর্জন করেছি। এমনকি আমার ৮ বছরের একমাত্র ছেলে যে এখনো কোর্স করে নি সে-ও বোঝে এর মধ্যে বিষ আছে, খেলে ক্ষতি হবে।

[প্রদ্যোত কুমার সাহা, ডেপুটি ম্যানেজার, বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেড, ২৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ফ্রিজ ভর্তি থাকতো কোল্ড ড্রিংকসের বোতল

প্রিন্সিপাল মহিউদ্দীন আহমেদ



আমি ধূমপান ও কোল্ড ড্রিংকসের আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পেরেছি কোর্স করে। আমি ছিলাম চেইন স্মোকার। প্রতিদিন ২ প্যাকেট সিগারেট আমার লাগতোই। কোর্সে গুরুজীর একটি কথা মনে খুব দাগ কাটে। তা হলো, 'আজ আপনি সিগারেট খাচ্ছেন। একদিন সিগারেট আপনাকে খাবে।' ধূমপান ছাড়ার মেডিটেশনটিতে বিষাক্ত সাপের ছোবলের কল্পনাটা আমাকে বেশ প্রভাবিত করে। সিদ্ধান্ত নিলাম ছেড়ে দেবো এবং শুকরিয়া করে বলতে পারি যে, ১৯ বছরের চেইন স্মোকিং থেকে আমি আজ মুক্ত।

আগে কোল্ড ড্রিংকসে এত বেশি আসক্ত ছিলাম যে, বাসায় সবসময় ফ্রিজ ভর্তি ড্রিংকসের বোতল থাকতো। আমার ভাড়া দেয়া ডিপার্টমেন্ট স্টোরটি থেকে প্রতিমাসে বাকিতে এত পরিমাণ সিগারেট আর কোল্ড ড্রিংকস নিতাম যে, মাস শেষে তারা আমাকে ভাড়া দেবে কি, উল্টো আমাকে বকেয়া পরিশোধ করতে হতো। জীবনযাপন পদ্ধতির এ পরিবর্তন আমাকে যেমন দিয়েছে সাশ্রয়, তেমনি এক সুস্থ পরিপূর্ণ জীবন।

[প্রিন্সিপাল মহিউদ্দীন আহমেদ, সমাজ সেবক, বোর্ডবাজার, গাজীপুর, ২৪৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রতিনিধি দুঃখ প্রকাশ করলেন

আলম আরা বেগম



আমার প্রাক্তন কর্মস্থলে আমি অফিসার্স ক্লাবের সভাপতি ছিলাম। সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপ্যায়নের জন্যে সফট ড্রিংকস পরিবেশন করা হতো। সবার কাছে এর ক্ষতিকারক দিকগুলো যখন তুলে ধরলাম, তখন তারা সম্মত হলেন খাবারের মেনু থেকে সফট ড্রিংকস বাদ দিতে। অনেক কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগেও দেখেছি তাদের পরিবারে সফট ড্রিংকসের চল এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত।

একবার ধূমপানবিরোধী প্রচারণার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত একটি মিটিংয়ে আমি ছিলাম। এর উদ্যোক্তা ছিলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। সে মিটিংয়ে কোল্ড ড্রিংকস পরিবেশন করা হলো দেখে আমি আমার বক্তব্যে কোল্ড ড্রিংকসের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরলাম। বললাম, সিগারেটের মতো এ বিষয়েও সচেতন হওয়া উচিত। উপস্থিত কয়েকজন কর্মকর্তা আমাকে সমর্থন করলেন। ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোনো মিটিংয়ে আর কখনো কোল্ড ড্রিংকস পরিবেশন করা হবে না।

[আলম আরা বেগম, সচিব, জাতীয় জাদুঘর, ৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোল্ড ড্রিংকস বর্জন করে বাঁচিয়েছি ২৮ হাজার টাকা

গোলাম সারওয়ার



প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসের একটি অংশ ছিলো কোল্ড ড্রিংকস এবং দুধ-চা। ২০০১ সালে কোর্সে এসে বুঝলাম– এ দুটোই স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। সিদ্ধান্ত নিলাম– এ আসক্তি থেকে মুক্ত হবো। অবলীলায় ছেড়ে দিলাম। শারীরিকভাবে আমি এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো আর হিসেব করে দেখলাম– আর্থিকভাবেও অনেক লাভবান হয়েছি। শুধু কোল্ড ড্রিংকস-এর খরচ বাবদ মাসে অন্তত ৩০০ টাকা, বছরে ৩,৬০০ টাকা এবং ৮ বছরে ৩,৬০০x৮ = ২৮,৮০০ টাকা খরচ বাঁচিয়েছি। ২০০১ সালে সাড়ে ৪,০০০ টাকা দিয়ে কোর্স করেছিলাম। ৮ বছরে কোর্স ফি-র প্রায় ৭ গুণ টাকা বেঁচে গেছে আমার।

[গোলাম সারওয়ার, ব্যবসায়ী, ১১৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মাদক বা ড্রাগসের প্রতি আকর্ষণ কঠোরভাবে দমন করুন। নেশাগ্রস্ত বন্ধুদের সাথে দ্রুত সম্পর্কচ্ছেদ করুন।

ধূমপানে বিষপান

বিশ্বে প্রতিদিন যক্ষ্মা, এইডস বা ম্যালেরিয়ায় যত লোক মারা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি লোক মারা যায় ধূমপানের কারণে। খোদ আমেরিকাতেই প্রতিদিন ১,৪০০ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে ধূমপানের কারণে। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গ তার 'দ্য ওয়ে টু সেভ মিলিয়নস অফ লাইভস্ ইজ টু প্রিভেন্ট স্মোকিং' গ্রন্থে বলেন, আমরা যদি এখনই কোনো পদক্ষেপ না নিই তাহলে এ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে গিয়ে এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১ বিলিয়নে। ২০০২ সালে মার্কিন সিনেটে কর্মক্ষেত্রে ধূমপান নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করা হয়। এটি সাধারণ মানুষের কাছে যেমন প্রশংসিত হয়েছে তেমনি রেস্টুরেন্টগুলোতেও বেড়ে গেছে বিক্রি।

এর কিছুদিন পর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি এবং আয়ারল্যান্ডেও একই আইন প্রণয়ন করা হয়। সিগারেটের ওপর আরোপ করা হয় উচ্চহারের ট্যাক্স। ধূমপানবিরোধী প্রচারণা পায় ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা। এ সবকিছুর ফলে এখন সেখানে ধূমপানের হার কমে গেছে ২১%। কিশোর ধূমপায়ীর সংখ্যা নেমে এসেছে অর্ধেকে।

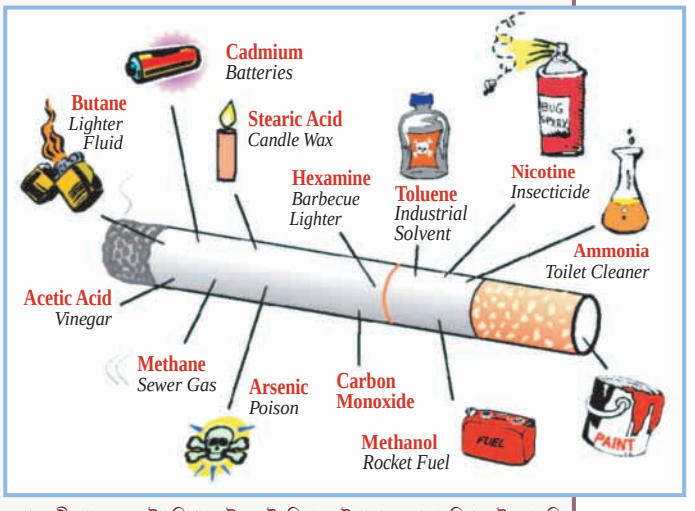
কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ চিত্রটা এত সুখকর নয়। বলা হয়, আগামী কয়েক দশকে ধূমপানজনিত কারণে মৃত্যুর ৮০ শতাংশই ঘটবে উন্নয়নশীল দেশে। আমাদের দেশে ধূমপানের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির প্রথম সফল উদ্যোগ নেন জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম। তার উদ্যোগেই গড়ে ওঠে 'আধূনিক' (আমরা ধূমপান নিবারণ করি)– ধূমপানবিরোধী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। অবশ্য তার আগে তিনি নিজে ধূমপান ছাড়েন। কলেজে পড়ার সময় থেকে ধূমপানে অভ্যস্ত হন তিনি। পরবর্তী ২০ বছরে সিগারেট ছিলো তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

তার আত্মজীবনী 'জীবনস্রোতে' বইয়ে তিনি বলেন, 'আমার ধূমপানের অভ্যাস ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায়ে এলো যখন সিগারেট পেতে কোনো সংকটের সম্ভাবনা থাকলে আগে থেকে কিনে এনে জমা করে রাখতাম। মনে হতো ধূমপান ছাড়া পড়াশোনা অসম্ভব। তাই বিলেতে থাকাকালীন শীতের সময় সিগারেট শেষ হয়ে গেলে বরফের মধ্যে যদি বেরুতে না পারি, এ আশঙ্কায় অনেকগুলো সিগারেট একসাথে কিনে আলমারিতে রেখে দিতাম।

জেনেশুনেও আমি ধূমপান করতাম। ক্লাসে, ওয়ার্ডে যেখানে যাই না কেন, সবসময় হাতে একটা সিগারেট থাকতো। ধূমপান করতে করতে ঠোঁটে এবং আঙুলে দাগ পড়ে গিয়েছিলো। এটাকে লজ্জার নয়, সামর্থ্যের লক্ষণ ধরে নিতাম। শুধু নিয়ম লঙ্ঘন নয়, আমি যেন একটা ঘৃণ্য উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করতাম।

একটা সময় ধূমপান ত্যাগের ইচ্ছা করলাম। এজন্যে অবলম্বন করলাম নানা উপায়। প্রথমে একটা সিগারেট কেটে দুভাগ করে খেতে লাগলাম। এতে কাজ হলো না। তারপর সকালে শপথ নিলাম যে, দুপুর পর্যন্ত ধূমপান করবো না। কিন্তু যেই সময় শেষ, অমনি একটার পর একটা খেতে থাকি। সারাদিনের বরাদ্দ ২/৩ ঘণ্টায় শেষ! প্রতিদিন মনস্থ করি পরদিন থেকে আর ধূমপান করবো না। কিন্তু সেদিন আর আসে না। এভাবে মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটতে থাকে।

একদিন সকালে নামাজ সেরে আল্লাহর নাম নিয়ে পর পর তিনবার শপথ নিলাম সিগারেট আমার জন্যে হারাম, জীবনেও আর ধূমপান করবো না। এবার চরম পরীক্ষা। একদিকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা, অন্যদিকে নেশার টান। শেষ পর্যন্ত বিবেক আর ধর্মবিশ্বাসই জয়ী হলো।



দেখুন কী থাকে একটা সিগারেটে? এই বিষাক্ত উপাদান-মোড়া সিগারেট আপনি যখন খান তখন তৈরি হয় ৪ হাজারেরও বেশি বিষাক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া যা আপনাকে এবং আপনার চারপাশের মানুষকে প্রতিনিয়ত ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যুর দিকে।

১৯৬৩ সালের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত ধূমপান করি নি। চিকিৎসক হিসেবে এ মারাত্মক অভ্যাস থেকে অনেককেই বিরত করতে সক্ষম হয়েছি। এঁদের মধ্যে আছেন সাবেক স্পিকার শামসুল হুদা চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনবিশারদ সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, চিত্রাভিনেতা এবং চিত্রপরিচালক খান আতাউর রহমান। পিজি থেকে অবসর গ্রহণের আগে 'এ' ব্লকের দক্ষিণ দিকের দেয়ালে বড় বড় হরফে 'ধূমপানে বিষপান' শব্দ দুটো লোহার পাতে লিখে লাগিয়ে দিয়েছিলাম।

বিগত দুযুগ ধরে যাদের ধূমপান বন্ধ করতে বার বার বলে এসেছি অথচ আমার উপদেশ গ্রহণ করেন নি, তাদের কেউ এখন ক্যান্সারে, কেউ হৃদরোগে, কেউ প্যারালাইসিসে, কেউ ক্রনিক ব্রংকাইটিস বা শ্বাসকষ্টে, কেউবা পায়ে গ্যাংগ্রিন বা পচনরোগে ভুগছেন দেখে ব্যথা পাই। ধূমপানে বিষপান– এটা এখন একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ

গড়ে ১০০/১২০টি সিগারেট খেতাম

এ কে এম রওশন উল ইসলাম

ক্লাস ওয়ানে পড়ার সময় বড় আব্বার ফেলে দেয়া সিগারেটের টুকরোয় টান দিয়েছিলাম। মাঝে মাঝেই পাটখড়ি বা নিউজপ্রিন্ট পুড়িয়ে টান দিতাম। তারপর ক্লাস সিক্স থেকে সেই যে হাতেখড়ি তা-ই চলেছে পরবর্তী ১৭ বছর।

স্মার্টনেসের প্রতীক মনে করতাম সিগারেটকে। অনেক বন্ধু-বান্ধবকে খেতে শিখিয়েছি। আমার জীবনের সবচেয়ে কালো অধ্যায় যে সময় পার করেছি তখন প্রতিদিন গড়ে ১০০ থেকে ১২০টি সিগারেট খেতাম। এভাবে চলেছে ৫ বছর। মাঝে মাঝে সিগারেট ছাড়তে চেয়েছি। কিন্তু ৩ দিনের বেশি থাকতে পারি নি।

২০০৮ সালে কোর্স করে জানলাম কীভাবে সিগারেট ছাড়তে হয়। যদিও প্রথম ৬ মাস কোনো চেষ্টা করি নি। ফাউন্ডেশনে প্রো-কোয়ান্টিয়ার হিসেবে কাজ করতে এসে প্রথম লজ্জা পাই। কেউ ধূমপান করে না, আমি করি। ওরা বুঝলেও কিছু বলতো না, এতে আমি আরো লজ্জা পেলাম।

এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলাম আর সিগারেট খাবো না। মেডিটেশন করতাম আর সারাক্ষণ অটোসাজেশন দিতাম 'আমি ধূমপান ঘৃণা করি'।

আজ ১ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি ধূমপানমুক্ত। ধূমপান ছাড়ার পর গায়ের রং, খাবারের রুচি, চিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অধূমপায়ীই বেশি। এক বড় ভাইয়ের দোকানে কোয়ান্টামের ধূমপানবিরোধী স্টিকারটি লাগাবার পর থেকে সে-ও সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে।

[এ কে এম রওশন উল ইসলাম, কাউন্সিলর, আশ্রয় মাদকাসক্তি চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ২৬৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সিগারেট আর হাতে তুলি নি

মনোয়ার হোসেন মামুন

কথায় বলে পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ সিগারেট ছেড়ে দেয়া। কারণ এটি যতবার ছাড়া হয়, ঠিক ততবার ধরা হয়। এভাবেই চলছিলো গত ১৩ বছর। স্ত্রীর সাথে প্রায়ই মনোমালিন্য হতো। তারপর একদিন ৩০০ তম কোর্সে নাম লেখালাম (সিগারেট ছাড়ার উদ্দেশ্যে নয় অবশ্যই)। কোর্সের ২য় দিন সিগারেট ছাড়ার কৌশল শেখালেন গুরুজী। রাতে বাসায় গিয়ে অটোসাজেশন দিলাম।

পরদিন সকালে কোর্সের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বেরুলাম। রিকশায় যেতে যেতে সিগারেট ধরালাম। কিন্তু হলের সামনে পৌঁছতেই বমি হয়ে গেল। সিগারেটটা হাত থেকে ফেলে দিলাম। এরপর আর ঐ জিনিস হাতে তুলি নি। ধন্যবাদ গুরুজীকে। নতুন উপলব্ধি নিয়ে নতুন এক 'আমি' বাসায় ফিরলাম।

[মনোয়ার হোসেন মামুন, ব্যবসায়ী, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টাম মেথড

কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনায়। বিশ্বাস করে অভাবকে প্রাচুর্যে ব্যর্থতাকে সাফল্যে রোগকে সুস্থতায় অশান্তিকে প্রশান্তিতে বদলে দেয়ার শক্তি সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে। শোকর আলহামদুলিলাহ! ২০ বছরে সাড়ে তিন শ কোর্স সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে এ বিশ্বাস পরিণত হয়েছে প্রমাণিত সত্যে। বদলে গেছে লাখো জীবন। জীবন বদলের বিশ্বাস পরিণত হয়েছে জীবন বদলের বিজ্ঞানে। সূচিত হয়েছে কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস। এ উচ্ছ্বাস আপনার জীবনকেও বদলে দিতে পারে পুরোপুরি।



কোয়ান্টাম মেথড
৩০০ তম কোর্সে
ধ্যানমগ্ন অংশগ্রহণকারীরা



কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড ॥ স্বাবলম্বী করেছে আব্দুল বারেকের মতো আরো অনেককেই



রাজশাহীর শিশুসদনে বেড়ে উঠছে ওরা কোয়ান্টাম পরিবারের ছায়ায়



বিশুদ্ধ পানির জন্যে সারাদেশে স্থাপিত শত শত টিউবওয়েলের একটি

সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টাম



২০১১ সালে সবুজায়ন কার্যক্রমে লামায় লক্ষাধিক গাছ লাগানো হয়



খতনা কার্যক্রমে এ পর্যন্ত সেবা নিয়েছে ৪০ হাজারেরও বেশি শিশু-কিশোর



ফাউন্ডেশনের অর্থায়নের অন্যতম উৎস মাটির ব্যাংক নিয়ে চলছে করসেবা



কোয়ান্টামমে খাদ্য ও পুষ্টি প্রকল্প 'মুরগান'



স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের উদ্বুদ্ধকরণে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ক্রেস্ট



লাইফ লং বাড ডোনার সিলভার ও গোল্ডেন ক্লাবের সদস্যদের সম্মাননা অনুষ্ঠান



সহস্র রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক আবদুলাহ আবু সায়ীদ, প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমান, গুরুজী ও মা-জীর সঙ্গে কোয়ান্টিয়ারবৃন্দ



কোয়ান্টাম ও ন্যাশনাল বাড সার্ভিস, ইউকে-এর যৌথ উদ্যোগে বাড ক্যাম্প



বিএনসিসির বাড ক্যাম্প



বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে র‍্যালি



ল্যাবে এখন একসঙ্গে ৮ জন রক্ত দিতে পারেন

প্রশান্তি ও নিরাময়ের মিলনভূমি

কোয়ান্টামম

লামা, বান্দরবান



মুখতারান ॥ লামায় গুরুজীর আবাস



অদ্ভুত দর্শন এই ঝিরবটটি কোয়ান্টামমে ছড়িয়ে থাকা ৩ শতাধিক প্রজাতির বৃক্ষের একটি



হাওয়া মঞ্চে মেডিটেশন



আরোগ্যশালায় মেডিটেশন। কোয়ান্টামমের শীর্ষদেশে গিরি ধাড়কানে নবনির্মিত নিরাময় মঞ্চ



প্রথম বাংলো রহমাতান



দফতারান–কোয়ান্টামমের প্রশাসনিক কেন্দ্র



হাজার বর্গফুটের বর্তমান ধ্যানঘর। একসঙ্গে ধ্যান করতে পারেন ২০০ ধ্যানী



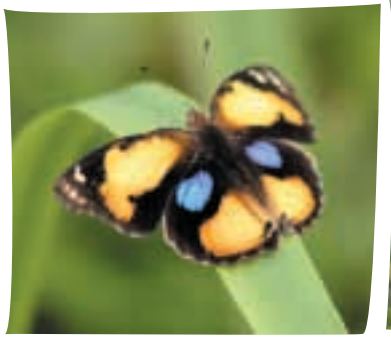
লামার কয়েকটি প্রাকৃতিক ঝর্নার একটি



বাকরান–কোয়ান্টামমের ভেড়া-ছাগল আর পশুসম্পদ প্রকল্প



মহিলা ধ্যানযাত্রীদের আবাসন ফাতিমান



এ পর্যন্ত কোয়ান্টামমে পাওয়া গেছে ৮০টিরও বেশি ধরনের প্রজাপতি



শিল্পাচার্য কামরুল হাসানের নামাঙ্কিত কামরুল চত্বরে নির্মিত মুক্তমঞ্চ 'ঐকতান'



কোয়ান্টামমে এখন যে ৩ শতাধিক ধরনের পাখি দেখা যায় এই নীলকণ্ঠ বাঁশপাতিটি তার একটি



গিরি ফিকরানে টিলার ধাপে ধাপে প্রকৃতিবান্ধব নির্মাণশৈলীতে গড়ে উঠছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল



দেশের সর্বোচ্চ খেলার মাঠ গ্রাউন্ড অলিম্পিয়ান উদ্বোধন



কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের পাঁচ শতাধিক আবাসিক ছাত্রের আবাসন



জাতীয় খো খো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১২-তে পুরস্কার গ্রহণের সময়



বিজয় দিবসের প্যারেড ও ডিসপেতে অংশ নিয়ে ওরা প্রতিবারই অর্জন করে প্রথম পুরস্কার



লামা কোরবানি ॥ ২০১০ সালে ১৭ হাজার কেজি মাংস বিতরণ করা হয় প্রায় ৯ হাজার পরিবারের মাঝে



কোয়ান্টামমে মা ও শিশু হাসপাতালের ভিত্তিফলক উন্মোচন করছেন ডা. এম আর খান



লামায় মেডিকেল ক্যাম্পে রোগী দেখছেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম



ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কোয়ান্টাম মেডিটেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন



কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কোয়ান্টাম | সকল ধর্মের সকল মানুষের





অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৮-এ প্রথমবারের মতো কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কণিকা স্টল কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ উপলক্ষে ৯ ফেব্রুয়ারি মেলার নজরুল মঞ্চে 'আলোকিত জীবনের জন্যে কোয়ান্টাম কণিকাসমগ্র'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। একই প্রতিষ্ঠান থেকে ৪টি প্রধান ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণীর সংকলন ও প্রকাশনাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বাঙালির হাজার বছরের উদার মানবিক চেতনাকেই ধারণ করেছে।



আল কোরআন ও হাদীসের কিছু মর্মবাণীর অডিও রূপ হচ্ছে 'হে মানুষ শোনো'। এ সিডি আপনাকে আলোকিত করবে ধর্ম ও মানবিকতায়। ইহকাল ও পরকালে সফল ও সম্মানিত হওয়ার পথ পাবেন আপনি।



সকল ধর্মের মূল সুরের ঐক্যেরই এক অভূতপূর্ব নিদর্শন 'পবিত্র ধর্মবাণী'। বেদ, ভগবদ্গীতা, ধম্মপদ, বাইবেল এবং কোরআন ও হাদীসের মর্মবাণী নিয়ে গ্রন্থিত এ অডিও সিডির বাণীগুলো শুনলেই আপনি অনুভব করবেন ধর্মাচারে পার্থক্য থাকলেও সকল ধর্মের মূল শিক্ষা আসলে এক।



কোয়ান্টাম মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী, শ্রদ্ধা করে সকল ভিন্নমতকে, স্বাগত জানায় সকল মতের সকল পথের গুণীজনদের। কোয়ান্টামে আমন্ত্রিত দেশের বরেণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ সমাজতাত্ত্বিক ধর্মবেত্তা কবি লেখক শিল্পীসহ সমাজের প্রায় সকল মতের পথের বিশিষ্টজনদের অনুভূতি নিয়ে এক অনবদ্য গ্রন্থনা 'কোয়ান্টাম ভাবনা ॥ সাফল্যগাথা'। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২–মহান ভাষাশহীদ দিবসে বইমেলার নজরুল মঞ্চে এ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী।

স্বতঃস্ফূর্ত নিরাময়ের পথে

সুখের অভাবই অসুখ। মনে সুখের অভাব হলেই তার প্রভাব পড়ে দেহে। মনের দুঃখ কষ্ট ক্ষোভ হতাশা গ্লানি জমে তা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা-বেদনা রূপে প্রকাশ পায়।

ব্যথা-বেদনার বেশিরভাগই মনোদৈহিক। মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, ব্যাকপেইন, বাত ব্যথাসহ ক্রনিক রোগগুলোর অবস্থাও তা-ই।

মেডিটেশনে এলে মনের ভেতর থেকেই অপ্রয়োজনীয় এ জঞ্জালগুলো বেরিয়ে যায়। বইতে শুরু করে নিরাময়ের সুবাতাস।

৩০০ কোর্সে ১৭ বছরে হাজার হাজার মানুষের তাৎক্ষণিক নিরাময়ের রহস্য এখানেই। আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হলেও মনোবৈজ্ঞানিক নিয়মেই ঘটেছে সবকিছু।

ধ্যান দোয়া দাওয়া ও দান একত্রিত হলে আপাতদৃষ্টিতে দুরারোগ্য ব্যাধিও কীভাবে নিরাময় হয় তারই মাত্র কয়েকটি ঘটনা–



আমি এখন পাহাড়েও উঠি

বেগম শামসুন্নাহার

পঙ্গুত্বকে নিয়তি ভেবেই দিন কাটছিলো। হাঁটা তো দূরের কথা, রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়া, এমনকি দাঁড়িয়ে কোনো কাজও করতে পারতাম না। কারণ ডাক্তার বলেছিলেন, হাঁটুর হাড় ক্ষয় হয়েছে, ভার পড়লে ব্যথা আরো বাড়বে। তাই পা থেকেও ছিলাম এক ধরনের পঙ্গু। ৪ বছর ধরে হাঁটুর ব্যথা নিরাময়ে ওষুধ, ফিজিওথেরাপি– সবরকম চিকিৎসায় যখন ব্যর্থ হলাম তখন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে বিশ্বাস ফিরে পেলাম। শিখলাম আত্মনিরাময়ের এক অনন্য প্রক্রিয়া। প্রথম দিন ১০ ঘণ্টা ক্লাস করেই মনে হয়েছিলো আমি পারবো। সত্যি সত্যি কোর্সের দ্বিতীয় দিনই নামাজ পড়লাম স্বাভাবিকভাবে রুকু-সেজদা দিয়ে।

আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। একটি ওষুধও খেতে হয় না। এখন আমি ৮ তলা বিল্ডিং-এর সিঁড়ি বেয়ে অনায়াসে উঠতে পারি। বছরে ২/৩ বার যাই লামায় কোয়ান্টাম পল্লীতে। সেখানকার পাহাড়ে ওঠানামা করি অবলীলায়। একবার অসতর্কতার কারণে পাহাড় থেকে পিছলে পা মচকে গিয়েছিলো। কিন্তু আত্মনিরাময়ের প্রক্রিয়া অনুশীলন করে কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলাম। বছরখানেক আগে কানাডা হয়ে লন্ডন থেকে একা ঘুরে এলাম। আমার পায়ে কখনো ব্যথা ছিলো একথা আর মনেই হয় না। এই ৬২ বছর বয়সেও এখন ইচ্ছামতো হাঁটছি, কাজ করছি। কোয়ান্টামের প্রতিটি কাজেই অংশ নিচ্ছি তারুণ্যের উদ্যম নিয়ে।

[প্রাক্তন শিক্ষিকা বেগম শামসুন্নাহার, ১৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মেডিটেশন ব্যথা নিরাময়ে অব্যর্থ

গভীর শিথিলায়ন দেহে ব্যথার অনুভূতি কমায়। জার্নাল অফ দি আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন-এর জুলাই ২৪-৩১, ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় যে, গভীর শিথিলায়ন বা মেডিটেশন পেইনকিলার ও সার্জারির মতোই দ্রুত ক্রনিক ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে। সার্জারি ও পেইনকিলারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকলেও কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই শিথিলায়ন বা মেডিটেশনের।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের বাঘা বাঘা ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেল এটি ঘোষণা করেন। এর মধ্য দিয়েই যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো প্রথিতযশা চিকিৎসা-বিদরা সরকারিভাবে শিথিলায়নকে কোমর ব্যথা, মাথাব্যথা বা মাইগ্রেন, আর্থ্রাইটিস, ব্যাকপেইন, পেশির ব্যথা, পায়ের ব্যথা, মহিলাদের মাসিকের সময়ের ব্যথা ইত্যাদি ক্রনিক ব্যথা নিরাময়ে কার্যকর প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন।

১৯৭৯ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস-এর মেডিসিনের অধ্যাপক ডা. জন কাবাত জিন তার বিখ্যাত স্ট্রেস রিডাকশন ক্লিনিকে ১৪ হাজারেরও বেশি রোগীকে ওষুধ ছাড়াই ব্যথা নিরাময়ে সাহায্য করেন। রোগীদের অধিকাংশই ক্যান্সার, এইডস বা ক্রনিক ব্যথায় আক্রান্ত ছিলেন। এমনকি জন কাবাত জিনের তত্ত্বাবধানে দুরারোগ্য চর্মরোগ সোরায়াসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও চিকিৎসার সময় মেডিটেশন করে ভালো হয়েছেন অন্যদের তুলনায় ৪ গুণ বেশি হারে।

আমেরিকার বিখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী প্রিভেনশন-এর জুন ১৯৯৭ সংখ্যায় সারাদেশে পরিচালিত এক জরিপের ফলাফলে বলা হয়, ২৭% আমেরিকান শিথিলায়ন করে ব্যথা কমান আর ২৩% আমেরিকান জানান যে, ডাক্তার তাদেরকে পেইনকিলারের পরিবর্তে শিথিলায়ন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

আমি এখন আর্থ্রাইটিসের ব্যথামুক্ত



ডা. আব্দুস সেলিম খান

১০/১২ বছরের পুরনো ব্যথা ২০০৬ সালে তীব্র রূপ নিলো। দুপায়ে পানি এলো। পরীক্ষায় ধরা পড়লো– রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস। প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন কড়া মাত্রার দুটি করে ইনজেকশন সাত দিন চললো। ডাক্তাররা বললেন, আজীবন কমবেশি ব্যথা থাকবে। তাই ওষুধ ও পেইনকিলার সবসময় চলবে। দেশের নামকরা এলোপেথিক ও হোমিওপেথিক ডাক্তারদের চিকিৎসায় যখন ব্যথা কমার কোনো লক্ষণ দেখছি না, তখন কোর্সে এলাম।

কোর্স শুরুর সপ্তাহখানেক আগে টানা ৩ দিন ছিলাম বিছানায়। একটু নড়লেই মনে হতো এই বুঝি প্রাণটা বেরিয়ে গেল! কোর্সের প্রথম দিন ২/৩ জনের সাহায্যে কোনোরকমে চেয়ারে এসে বসলাম। এত সময় ধরে ক্লাস করতে পারবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু পারলাম। আল্লাহর রহমতে দ্বিতীয় দিন একটু ভালো অনুভব করলাম। তৃতীয় দিন বেশ ভালো আর চতুর্থ দিন ব্যথা থেকে মুক্তির আনন্দে প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম।

এখন আমি ভালোভাবেই হাঁটি। কিছুদিন আগে লামায় গিয়ে জাবলে শামস, চিচিংফাঁক ঘুরে এসেছি। গত বছর হজ করতে গিয়ে জাবলে নূর অর্থাৎ ২,২০০ ফুট উঁচু হেরা পর্বতের চূড়ায় উঠে দুরাকাত নামাজও আদায় করেছি রুকু-সেজদা দিয়ে।

[ডা. আব্দুস সেলিম খান, ২৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এসেছিলাম ক্রাচে ভর দিয়ে

আবদুল হাদী সিদ্দিকী



শিক্ষকতা থেকে অবসর নেয়ার পরই বাতব্যথা মারাত্মক আকার ধারণ করে। ডান পায়ের হাঁটু ফুলে গিয়ে ব্যথা ও জ্বালাপোড়া হতো। দিন কাটতো বিছানায় শুয়ে। শুধু টয়লেটে যাওয়ার জন্যে যে কয়বার উঠতে হতো– ব্যস, এটুকুই ছিলো ওঠানামা।

প্রায় ২ মাস পর ৫ তলা বাসা থেকে নামছিলাম কোর্সের প্রথম দিন ক্লাসে আসার জন্যে। এক পা করে সিঁড়িতে রাখছি আর ব্যথায় চোখে পানি চলে আসছে। দুই ক্রাচে ভর দিয়ে কোনোরকমে এলাম। সারাদিন ক্লাস করে মনে আত্মবিশ্বাস এলো, সাহস ফিরে পেলাম। দ্বিতীয় দিন ক্রাচে চেপে এলেও ফিরেছি ক্রাচ দুটোকে হাতে তুলে নিয়ে। তৃতীয় ও চতুর্থ দিন ক্লাস করেছি ক্রাচগুলো বাসায় রেখে। প্রথমদিকে দাঁড়ালে পায়ে ঝিম ধরে থাকতো। এখন নিয়মিত হাঁটতে হাঁটতে চলাফেরা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। যে ক্রাচ ছিলো সার্বক্ষণিক সঙ্গী তা-ও এক ভিক্ষুককে দান করে দিয়েছি। স্রষ্টার নেয়ামত দুপায়েই এখন দিব্যি হাঁটছি, উঁচু রিকশায় কারো সাহায্য ছাড়াই উঠছি, সিঁড়ির ধাপ পেরুচ্ছি।

[আবদুল হাদী সিদ্দিকী, ২৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মায়ের নিরাময় দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি

ডা. ইসরাত জাহান



আমার মা নাদিরা খন্দকার দীর্ঘ ২৫ বছর স্পন্ডিলাইটিসের ব্যথার কারণে হাঁটাচলা করতে পারতেন না। ২০০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতেন আর নিজের মৃত্যু কামনা করতেন। ডাক্তার হয়েও আমি এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যে কোনো সাহায্য করতে পারি নি। সে বছরই অক্টোবরে মা কোর্সে অংশ নেন। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত তিনি দিব্যি সুস্থ। সংসারের কর্ত্রী হিসেবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করছেন। বাজার করা থেকে শুরু করে সবকিছু তদারকি করছেন। নিয়মিত ঘণ্টা ধরে দুবেলা হাঁটছেন। কিছুদিন আগে আমাদের কিছুটা আপত্তি সত্ত্বেও একাই অস্ট্রেলিয়া বেড়াতে গিয়েছেন।

মায়ের নিরাময়ে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এ কোর্সে এসেছি। আমার নিজেরও মাইগ্রেনের সমস্যা ছিলো। মেডিটেশন করে এখন দীর্ঘদিনের মাইগ্রেন থেকে মুক্তি পেয়েছি। পাশাপাশি রাগকেও নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি।

[ডা. ইসরাত জাহান, ২৮৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ঘামের সমস্যা থেকে মুক্তি

মো. আশফাক আলী পাপ্পু



সেই স্কুল থেকে চাকরিতে ঢোকা পর্যন্ত বহু বিব্রতকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি হাত-পা ঘামার কারণে। এত ঘাম হতো যে, পরীক্ষার খাতা ভিজে যেতো, জুতা-মোজা থেকে দুর্গন্ধ বেরুতো। কারো সাথে হাত মেলাতেও সংকোচ করতাম। চিকিৎসা করিয়েছি বহুবার, লাভ হয় নি। একসময় মনে হলো মেডিটেশন যখন শিখেছি তখন নিজেই এবার চেষ্টা করি। আস্তে আস্তে ঘামের পরিমাণ কমতে লাগলো। আজ ২/৩ বছর হয়ে গেল, হাত-পা ঘামার সমস্যা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

[মো. আশফাক আলী পাপ্পু, সহকারী অধ্যাপক, গোদাগাড়ী মহিলা ডিগ্রি কলেজ, ৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ভালো আছি ভালো থাকবো

মমতাজ বেগম

স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলেই কোর্সে এসেছিলাম রোগ নিরাময়ের জন্যে। ২০০৬ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আমার স্বামীর ঘাড় ভেঙে যায়। ব্যাংককে তার চিকিৎসার পাশাপাশি ডাক্তাররা আমারও থরো চেক-আপ করে বললেন, কোমরের হাড় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। যেকোনো সময় মারাত্মক কিছু হয়ে যেতে পারে। তাই বিছানায় বা চেয়ার-টেবিলে নামাজ পড়বেন। এর আগে '৯০ সাল থেকেই হাঁটুতে ব্যথা ছিলো। ডাক্তার বলেছিলেন, হাঁটুর হাড় ক্ষয় হয়েছে। তখন কষ্ট হলেও রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তাম। কিন্তু ব্যাংককের ডাক্তার বলার পর থেকে একদিনের জন্যেও চেয়ার-টেবিল ছাড়া নামাজ পড়ি নি।





বছরখানেকের মধ্যে আবার স্বামীর স্পাইনাল কর্ডের সমস্যায় হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত অবশ হয়ে যায়। প্রথমদিকে সারাক্ষণ হুইল চেয়ার ব্যবহার করলেও ধীরে ধীরে লাঠি অথবা কারো সহযোগিতা নিয়ে হাঁটতে হতো। কোর্সের দ্বিতীয় দিন বিকেলে তিনি একাই খানিকক্ষণ হাঁটলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় আমিও চেষ্টা করলাম মাগরিবের নামাজ রুকু-সেজদা দিয়ে পড়তে। দীর্ঘদিনের অভ্যাস না থাকায় হাঁটু ভাঁজ করতে পারলাম না। কিন্তু হাল ছাড়লাম না। পরদিন ফজরের ওয়াক্তে বিসমিল্লাহ বলে জায়নামাজে দাঁড়ালাম এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ আদায় করলাম– যেন এই ওঠাবসা আমার প্রতিদিনের অভ্যাস।

শুকরিয়া আদায় করে তৃতীয় দিনের ক্লাসে গেলাম। দুপুরের বিরতিতে হল থেকে বেরিয়ে মোবাইলে কথা বলতে বলতে কখন যে সিঁড়ির কাছে চলে এসেছি খেয়াল নেই। ফোন রেখে সামনে এক পা এগুতেই কাত হয়ে পড়ে গেলাম সিঁড়ির তিন ধাপ নিচে। বাকি ধাপগুলো গড়িয়ে গেলাম। মনে হলো কোমরের হাড়গুলো বোধহয়





মমতাজ বেগম, ৩০০ তম কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন স্বামী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা মো. আবদুল আজিজের সঙ্গে। লাঠি ছিলো যে মানুষটির নিত্যসঙ্গী তাকেই এখন নাতির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ছুটোছুটি করতে দেখে অবাক হন আত্মীয়রা।

টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। চোখের সামনে ভেসে উঠলো পঙ্গু হাসপাতালের হুইল চেয়ারে বসা রোগীদের কথা। আমিও বোধহয় তাদের মতো পঙ্গু হয়ে গেলাম। আর কখনোই দাঁড়াতে পারবো না। নেতিবাচক এসব দৃশ্যকল্প দেখতে দেখতেই হঠাৎ মনে পড়লো গুরুজীর কথা, কানে বাজলো কোর্সে শেখানো ইতিবাচক কথামালা। মুহূর্তে সচেতন হলাম। নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম যে, তেমন কিছুই হয় নি। বার বার অটোসাজেশন দিতে লাগলাম– আমি ভালো আছি। আমি ভালো থাকবো। ব্যথার অনুভূতি কমতে লাগলো। সহজভাবেই উঠে দাঁড়ালাম, হাঁটলাম। পরদিন পুরো সময় ক্লাস করলাম। দুদিন পর নাতির জোরাজুরিতে এক্স-রে করালাম। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সব দেখেশুনে বললেন, সব ঠিক আছে। কোথাও কোনো সমস্যা নেই। এখন আমি আগের চেয়েও প্রাণোচ্ছল। হাঁটছি, রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়ছি। ১৯ বছরের সঙ্গী হাঁটু-ব্যথাকে রেখে এসেছি আইডিইবি হলের সেই সিঁড়িতে।

শিথিলায়ন গুরুত্বপূর্ণ

ডা. মো. মঞ্জুরুল হক



শিথিলায়ন বা মেডিটেশনকে সবার জন্যে সহজভাবে উপস্থাপন করে গুরুজী অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন– শতকরা ৭০ ভাগ রোগই মনোদৈহিক। এর জন্যে ওষুধের প্রয়োজন নেই। দরকার শুধু শিথিলায়ন। আমার কাছে প্রতিদিন অনেক রোগী আসে গ্যাস্ট্রিক-আলসারের সমস্যা নিয়ে। তার মধ্যে ৬৫ ভাগ রোগীর কোনো অরগানিক সমস্যা থাকে না। তারা শুধু শিথিল হতে পারলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। কোর্স করে শিথিলায়নের গুরুত্ব নতুনভাবে অনুভব করেছি।

[রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সার্জন ডা. মো. মঞ্জুরুল হক, ১৫২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পেইনকিলার লাগছে না

লক্ষ্মণ সরকার শিশির



৯ বছর আগে গাড়ির নিচে ঢুকে যন্ত্রাংশ ঠিক করার সময় হঠাৎ করেই প্রায় পুরো গাড়ির ভার নেমে আসে আমার শরীরের ওপর। এ দুর্ঘটনার পর থেকে পেটে ও কোমরে ব্যথা হতো। হাঁটতে গেলে পিঠের রগে টান পড়তো। কখনো কখনো রাতে ব্যথার তীব্রতায় ঘুমাতে পারতাম না। ছিলো হজমের সমস্যাও। ঢাকা-কলকাতা-মাদ্রাজের নামিদামি চিকিৎসকের কাছে গিয়েছি, সমাধান পাই নি।

কোর্সের ৩য় দিন আত্মনিরাময়ের মেডিটেশনে অংশ নিয়ে শুরু হলো সুস্থতা ও ব্যথামুক্তির অনুভূতি। সেদিন রাতে ঘুমও ভালো হলো। পরদিন ক্লাসে এলাম পেটের ব্যথা বাইরে রেখে। এখন চমৎকার ঘুম হয়। ব্যথা আর সেভাবে হয় না, পেইনকিলারেরও প্রয়োজন পড়ে না।

[লক্ষ্মণ সরকার শিশির, ২৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সায়াটিকার ব্যথা নিয়ন্ত্রণে

রওশনারা সায়ীদ

১৯৯৩ সাল থেকে ভুগছিলাম সায়াটিকার ব্যথায়। ৩/৪ মাস পর পর ব্যথার তীব্রতা এত বেশি হতো যে, সারাদিন বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় থাকতো না। ব্যথামুক্তির জন্যেই মূলত কোর্সে অংশ নিয়েছিলাম। নিয়মিত শিথিলায়ন ও নিরাময়ের মেডিটেশন করে সায়াটিকার সেই ব্যথা এখন আমার নিয়ন্ত্রণে। বাড়তি পাওয়া হিসেবে যুক্ত হলো ঘুমের ওষুধ ছাড়াই চমৎকার ঘুম।



কোয়ান্টাম পল্লীর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পাঠাগার উদ্বোধন করছেন রওশনারা সায়ীদ

[অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সহধর্মিণী রওশনারা সায়ীদ, ১৪৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নির্ভরতাকে কাটিয়ে উঠছি

শাহ আলম



ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় ছাদ থেকে পড়ে স্পাইনাল কর্ডে মারাত্মক আঘাত পাই। তখন থেকেই কমবেশি ব্যথা ছিলো সবসময়ের সঙ্গী। কয়েক বছর আগে ভারী ব্যাগসহ সিঁড়ি থেকে পড়ে আবারও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই। সব মিলিয়ে ব্যথার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছিলো। এমআরআই রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বললেন, এখনই ভর্তি হয়ে যান। আপনার অপারেশন লাগবে। গেলাম আরেক নিউরোসার্জনের কাছে। তার দেয়া ওষুধ ৬ মাস খাওয়ার পর তিনিও অপারেশনের কথা বলায় একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম। কারণ পরিচিত যে কজন এ ধরনের অপারেশন করিয়েছেন তারা কেউই সুস্থ হন নি; বরং আগের চেয়ে খারাপ আছেন। ভাবলাম বিদেশে গিয়ে অপারেশন করাবো। পাসপোর্ট-ভিসা সব ঠিক, এমন সময় এক সহকর্মীর অনুরোধে কোর্সে এলাম।

প্রথম দিন কোনো ব্যথা ছাড়া ১০ ঘণ্টা সময় পার করায় মনে হলো নিশ্চয়ই কিছু একটা হচ্ছে। দ্বিতীয় দিন থেকে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে, আমি সুস্থ হবো। সেদিন একরকম জোর করেই মেয়েসহ স্ত্রীকে তার বোনের বাসায় বেড়াতে পাঠালাম। গত ৫ বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম স্ত্রী আমাকে একা রেখে কোথাও গেলেন। কারণ ঘুমানোর আগে ঘুমের ওষুধ ছাড়াও আমার লাগতো এক থেকে দেড় ঘণ্টার ম্যাসাজ কিংবা থেরাপি। দিনের পর দিন এই কষ্টকর কাজটি করা ছাড়াও খাওয়া-গোসল সহ আনুষঙ্গিক সব কাজে সার্বক্ষণিকভাবে স্ত্রী ছিলেন পাশে। সে রাতে কোনো ঘুমের ওষুধ ছাড়াই পরিতৃপ্তির ঘুম ঘুমালাম। ব্যথার অনুভূতিও কমতে শুরু করলো। কোর্সের ৪ দিন পর থেকেই নিজের ভেতর নিরাময়ের শক্তিকে অনুভব করলাম।

এতদিন স্কুল কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতিতে আমার ক্লাস কক্ষে চেয়ারের ব্যবস্থা থাকতো। কারণ ৫ মিনিট পর পর না বসলে ব্যথার তীব্রতা বেড়ে যেতো। একসঙ্গে দুটো ক্লাসও কখনো আমাকে দেয়া হতো না। কিন্তু ২০০৯-২০১০ সেশনের নতুন ক্লাস রুটিনে পর পর ৩টি ক্লাস আমাকে দেয়া হয়। ভাবলাম কর্তৃপক্ষ হয়তো খেয়াল করে নি। আমিও আর রুটিন সংশোধন করার জন্যে অনুরোধ করলাম না। সাহস করে সেদিন ক্লাসে গেলাম। ৪০ মিনিটের একেকটি ক্লাস পুরো সময় দাঁড়িয়ে নিতে পারলাম। ২ ঘণ্টায় একটিবারের জন্যেও আর চেয়ারে বসার প্রয়োজন অনুভব করি নি। এখন আমি আগের চেয়ে অনেক সুস্থ বোধ করছি। পারছি নিজের কাজগুলো যথাসম্ভব নিজে করে নিতে।

[শাহ আলম, সিনিয়র শিক্ষক, হার্ডকো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কখনো ভাবি নি আবার হাঁটবো

শামসুন্নাহার



দু বছর আগে আমার ক্যান্সার ধরা পড়ে। কেমোথেরাপি দেয়ার পর হাত-পা অবশ হয়ে যায়। তখন থেকেই আর হাঁটার শক্তি ছিলো না। ফিজিওথেরাপিসহ অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। চলাফেরার জন্যে সঙ্গী ছিলো হুইল চেয়ার অথবা অন্য কারো সাহায্য।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের আলোচনাগুলো আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই, একটু হাঁটি। দ্বিতীয় দিন থেকেই হাঁটতে শুরু করলাম। নতুন হাঁটতে শেখা শিশুর মতো আমিও সেদিন হাঁটি হাঁটি পা পা করে পুরো অডিটোরিয়াম ঘুরে এলাম। কখনো ভাবি নি আবার হাঁটবো। কোর্সে এসে আমি যে ১০ ঘণ্টা বসে থাকতে পারবো তা-ও ভাবি নি।

[শামসুন্নাহার, গৃহিণী, ২৯৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এখন লিখতে পারছি

বৃন্দাবন হালদার



২০০৫ সাল থেকে ভুগছিলাম এমন এক রোগে যার কারণে লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। প্রথমে ডান হাতের আঙুল বাঁকা হওয়া শুরু করলো। ধীরে ধীরে পুরো হাতের জোর কমতে লাগলো। প্রায় সারাক্ষণই হাত কাঁপতো। আঙুল থেকে ব্যথা শুরু হয়ে তা ছড়িয়ে যেতো ঘাড়ে ও মাথায়। সে হাতে লেখা এমনকি গ্লাসে পানি ঢালতেও পারতাম না। বেশিক্ষণ লিখলে হাত অবশ হয়ে যেতো। এজন্যে পরীক্ষায় কখনো কখনো পুরো একটি প্রশ্ন ছেড়ে আসতে হয়েছে।

বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে দেখিয়েছি, কিন্তু কেউ প্রকৃত রোগ নির্ণয় করতে পারেন নি। কোর্সে এসে মনে হলো হাতে যেন শক্তি পাচ্ছি। সাহস করে কোর্সের ৩য় দিন লিখতে বসলাম– এক পৃষ্ঠা লিখলাম একনাগাড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এখন পরীক্ষায় সব প্রশ্নের উত্তর লিখে আসতে পারছি।

[বৃন্দাবন হালদার, ছাত্র, ২৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সাহস করে ওষুধ ছেড়ে দিলাম

শাহিনা খানম



লো-প্রেশার, টেনশন ও অনিদ্রার কারণে বহু ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছি। একবার এক বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আমাকে ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে একেবারে নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছিলেন। যে ট্যাবলেট নাকি দিনে মাত্র দুবার সর্বোচ্চ দুসপ্তাহ খাওয়া যায়, সেটা তার কথায় আমি দিনে তিনটা করে ৫ মাস খাই। তারপর হঠাৎ একদিন সব ওষুধ বন্ধ করে দেন, যা কি না ধীরে ধীরে বন্ধ করতে হয়। এদিকে আমার শুরু হয় নরকযন্ত্রণা। ডাক্তারকে বলায় তিনি ওষুধ বদলাতে লাগলেন, কিন্তু আমার অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগলো। হঠাৎ একদিন কোয়ান্টামের কথা শুনি এবং কোর্স করার আগে থেকেই নিয়মিত শিথিলায়ন ও মনছবি করতে থাকি। একদিন সাহস করে সমস্ত ওষুধ ছেড়ে দেই। কোনো অসুবিধাই হলো না। কোর্সের পর আজ এতদিন হয়ে গেল, একদিনের জন্যেও প্রেশার লো হয় নি।

[শাহিনা খানম, গৃহিণী, ২১৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মাইগ্রেন আর নেই

শওকত আরা বেগম



কোর্সে আলোচনার এক পর্যায়ে গুরুজী জানতে চাইলেন 'মাথাব্যথা বা মাইগ্রেন আছে কার কার'। কয়েকজন সতীর্থের সাথে আমিও হাত তুললাম। আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আজকের পর থেকে আর মাথাব্যথা বা মাইগ্রেন থাকবে না। গুরুজীর এ কথা আমাকে অনুপ্রাণিত করলো।

সেই থেকে মুক্তির শুরু। আগে ব্যথা উঠলে পেইনকিলার খেয়ে আর টাইগার বাম কপালে, চোখে ও মুখে মাখিয়ে ঘর অন্ধকার করে নিঃশব্দে ২/৩ দিন কাটাতাম। কিন্তু এখন আমার কোনো ব্যথা নেই। কোর্স করে উপলব্ধি করলাম, ব্যথার মূল কারণ ছিলো টেনশন। নিয়মিত মেডিটেশনে টেনশন যত কমতে লাগলো, ব্যথাও আর আসার সুযোগ পেলো না। বাড়তি পাওয়া হিসেবে ব্যাকপেইনও ভালো হয়ে গেল।

[শওকত আরা বেগম, গৃহিণী, ৮১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ধ্যানীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি

প্রফেসর ডা. জন কাবাত জিন এবং ডা. রিচার্ড ডেভিডসন এক পরীক্ষায় দেখেছেন, যারা মেডিটেশন করেন তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে বেশি। মেডিটেশন করেন না এবং নতুন মেডিটেশন শিখেছেন এমন দুশ্রেণীর লোকদের মধ্যে ফ্লু-র জীবাণু সংক্রমিত করে দেখা গেছে, যারা মেডিটেশন করেছেন তাদের রক্তে এ সংক্রমণের ৪ সপ্তাহ এমনকি ৮ সপ্তাহ পরেও এন্টিবডির মাত্রা ছিলো বেশি।

হেল্‌থ ম্যাগাজিনের সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে সমস্যায় ভুগতেন এমন মহিলাদের ওপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৫ মাস নিয়মিত মেডিটেশন করার পর তাদের সমস্যা কমে গেছে।

মেডিটেশন বিষণ্নতা দূর করে

শারীরিক রোগের পাশাপাশি মানসিক রোগেও মেডিটেশনের ভূমিকা খুবই কার্যকরী। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির জন টিসডেল ক্রনিক বিষণ্নতায় ভোগা রোগীদের ওপর মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশনের প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন, এদের মধ্যে পুনরায় বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার হার অর্ধেক কমেছে। কারণ যে রোগের উৎস মন, সে রোগ শুধুমাত্র মনের প্রশান্তি ও আনন্দেই ভালো হতে পারে। মানসিক চাপ কমাতে ওষুধ খেতেন– এমন এক রোগী বলেন, এ এক বিস্ময়কর পরিবর্তন। কারণ দুবছর আগে মেডিটেশন শেখার আগ পর্যন্ত জীবনে আমি কখনো ওষুধ ছাড়া থাকি নি। আমি মনে করি, বিষণ্নতা বা টেনশনের জন্যে কোনো ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই।



প্রফেসর ডা. জন কাবাত জিন। মেডিটেশন তার জীবনের অঙ্গ

মাইগ্রেন নিরাময় করে মেডিটেশন

ডা. রশিদ হায়দার



দুই মেয়ের সঙ্গে ডা. রশিদ হায়দার ও মিসেস মেহবুবা আরেফীন হায়দার

আমার এক রোগীর উপহার দেয়া কোয়ান্টাম মেথড বইটি পুরোটা পড়ে ফেললাম প্র্যাকটিসের ফাঁকে ফাঁকে। একদিন তিনি ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোর্সটি করবো কি না। তার আগ্রহ দেখে বুঝলাম যে, নিশ্চয়ই মেডিটেশন করে তিনি নিজে উপকৃত হয়েছেন, তাই এখন অন্যদেরও বলছেন। স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে কোর্সে অংশ নিলাম।

নিজে চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন সময় মাথাব্যথা ও মাইগ্রেনের রোগীদেরকেও আমি মেডিটেশন করার পরামর্শ দেই। তাদের মধ্যে যারা নিয়মিত মেডিটেশন করছেন তারা ভালো আছেন। কারণ সারা বিশ্বে এখন অল্টারনেটিভ মেডিসিনের একটি কার্যকরী উপকরণ হিসেবে মেডিটেশনের জয়জয়কার চলছে। একজন চিকিৎসক হিসেবেও আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমরা যেখানে ব্যর্থ হই মেডিটেশন সেখানে কাজ করে, রোগ নিরাময়কে সহজ ও ত্বরান্বিত করে।

[বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. রশিদ হায়দার, ২৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মৃত্যুভয় কেটে গেছে

ডা. নিতীশ কৃষ্ণ দাস



আত্মহত্যা কেন করতে হয় না, মানুষের মন কীভাবে জয় করতে হয়, কীভাবে প্রশান্ত থাকতে হয়– এ নিয়ে যিনি বলে গেছেন সেই ডেল কার্নেগি নিজেই আত্মহত্যা করেছেন। এটা জানার পর আমার মনের মধ্যে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হলো। বুঝলাম– জানাই মূল কথা নয়, জীবনে প্রয়োগটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সে প্রয়োগের জন্যে প্রয়োজন সাধনা, ধ্যান। মৃত্যুভয় আমাকে অস্থির করে রাখতো। আমার সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত হতে দেয় নি। কোর্স করে সে মৃত্যুভয় এখন পুরোপুরি কেটে গেছে।

[ডা. নিতীশ কৃষ্ণ দাস, ২৫৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

যারা রোগ নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তায় ভোগে তারা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। আর যারা ব্যস্ত, রোগ নিয়ে ভাবার সময় পায় না, তাদের গড়পড়তা স্বাস্থ্য অনেক ভালো।

সুস্থতা এনেছে সাফল্য

মো. আলাউদ্দিন মিয়া



কোমরের জয়েন্ট থেকে বাম পা জুড়ে সায়াটিকার তীব্র ব্যথায় ভুগছিলাম। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখিয়েও ব্যথা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো না। অসহ্য এ ব্যথা নিয়েই কাটলো ৩ মাস। ব্যথার তীব্রতায় রীতিমতো শয্যাশায়ী, সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকাই একমাত্র কাজ। অফিসে যাওয়া তো দূরে থাক; বরং বসা দাঁড়ানো খাওয়া টয়লেটে যাওয়াসহ দৈনন্দিন সবকাজেই লাগতো অন্যের সহযোগিতা। একা কিছুই করতে পারতাম না।

কোর্সের ৪ দিন একটু একটু করে নিরাময়ের একটা স্পন্দন অনুভব করতে শুরু করলাম। মনে হচ্ছিলো আমি আগের মতোই সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবো। হলোও তা-ই। নিয়মিত মেডিটেশন ও পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতে ২ মাসে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম।

এ সুস্থতা আমাকে পেশাগত জীবনেও এনে দিয়েছে সাফল্য। কোর্স করার পর ২৫ বছরের ম্যানুয়াল প্যাকেজিং ব্যবসা ছেড়ে ২০০৪ সাল থেকে নতুন উদ্যমে শুরু করি অটো প্যাকেজিংয়ের ব্যবসা। ব্যবসার কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এখন মনছবি– নীট কম্পোজিটের একটি ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্যে সাড়ে দশ হাজার বর্গফুটের ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

অসুস্থতার কারণে যেখানে একসময় চলৎশক্তিহীন মানুষে পরিণত হয়ে পড়ছিলাম, সেই আমিই আজ স্রষ্টার অফুরন্ত অনুগ্রহে একজন সফল শিল্পপতি।

[আলাউদ্দিন মিয়া, ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বিলিরুবিন ৭১ নিয়েও বেঁচে ছিলাম এবং এখনো সুস্থ আছি



লিয়াকত আলী সাগর

নিজেকে যেন চালাতে পারছিলাম না। চোখ খোলার শক্তিটুকুও হারিয়েছি। আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা প্রহর গুনছে– কখন জেগে উঠবো। চারদিকে আমাকে নিয়ে ব্যস্ততা। আমি ছিলাম একটি ক্লিনিকে। জন্ডিসে আক্রান্ত। রিপোর্ট পেয়েছি ২ আগস্ট ১৯৯৫, একটি ডায়াগনোস্টিক সেন্টার থেকে।

১ অক্টোবর ১৯৯৫। রাত নয়টা নাগাদ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম পুরোপুরি। যেন জীবনের শেষবেলা। পরদিন থেকে অসুস্থতার মাত্রা বাড়তেই লাগলো। তন্দ্রাচ্ছন্ন আমি। এ অবস্থাতেই শরীরে স্যালাইন প্রবেশ করানো হলো। ব্লাড টেস্টে বিলিরুবিনের পরিমাণ এলো ২৩.৮০। অস্বাভাবিক। অক্টোবরের ৩ তারিখে অবস্থার চরম অবনতি। বিলিরুবিন ৬৭.৫০। সেদিন রাত সাড়ে দশটায় আমাকে কলাবাগানের একটি ক্লিনিকে ভর্তির ব্যাপারে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাদের অপারগতা প্রকাশ করলেন। জানালেন, আমার আয়ুষ্কাল আর মাত্র ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা। সকলের চেষ্টায় সে রাতেই আমাকে ধানমণ্ডির একটি ক্লিনিকে ভর্তি করানো হলো।

পরের দিন রক্ত পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হলো। বিলিরুবিনের মাত্রা ততক্ষণে ৬৭ ছাড়িয়ে ৭১-এ পৌঁছে গেছে। এবার সবাই নিশ্চিত যে, আমি আর বাঁচবো না।

৫ অক্টোবর ১৯৯৫। পরিস্থিতির ক্রম অবনতি হচ্ছে বলে মেডিকেল বোর্ড বসানো হলো। কিন্তু আমার অবস্থার কোনো উন্নতি হলো না। ২১ দিন পর ক্লিনিক থেকে বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। তখন আমিও মানসিকভাবে ভেঙে পড়লাম। আবার ভাবলাম মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। শুরু করলাম নিয়মিত মেডিটেশন। দিনে তিনবার মেডিটেশন করতে লাগলাম। পাশাপাশি চললো চুম্বক পানি পান। অন্যান্য সব নিয়মকানুনও অনুসরণ করছিলাম। দ্রুত ভালো হয়ে উঠলাম।

চিকিৎসকের কথামতো যার আয়ুষ্কাল ছিলো মাত্র ৬/৭ ঘণ্টা, আল্লাহর রহমতে সেই আমি আজও বেঁচে আছি। এখন সুস্থ এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপন করছি।

দীর্ঘ ১৪ বছর পরও আমি পরিপূর্ণ সুস্থ। পারিবারিকভাবে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে অত্যন্ত সুখী। আমার স্ত্রীও ২৬৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। আমি বিশ্বাস করি নিয়মিত মেডিটেশনে সকল সমস্যার সমাধান হয়।

[লিয়াকত আলী সাগর, ব্যবসায়ী, ২০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেলাম

আলহাজ মো. রুহুল আমীন



১৯৬৪ সাল থেকে ভুগছি কোষ্ঠকাঠিন্যে। জাপান জার্মানি সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড এবং সম্প্রতি ভারতের বিখ্যাত গ্যাস্ট্রোলিভার বিশেষজ্ঞকে দেখিয়েছি। কিন্তু আসল রোগটি ধরা পড়ছে না। কেউ বলছেন পায়ুপথ সরু হয়ে গেছে, কেউ বলছেন টেনশনের কারণে হয়েছে। এর কোনো স্থায়ী নিরাময় নেই, আজীবন ওষুধ লাগবে। মেডিসিন নিয়ে টয়লেটে ৪/৫ ঘণ্টা থাকলেও পেট পরিষ্কার হতো না। অসহ্য এই যন্ত্রণায় কখনো কখনো গলায় ফাঁস দিতে ইচ্ছে করতো। অথচ কোর্সের প্রথম দিনই সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতো টয়লেট করলাম। দ্বিতীয় দিনও তাই। জয় করলাম দীর্ঘদিনের অসহায়ত্বকে।

[মো. রুহুল আমীন, ব্যবসায়ী, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ডাক্তার বলেছিলেন আমি কোর্সে এলে বাঁচবো না

জিয়া ইসলাম



একটি ছেলে। ৮ বছর ধরে মারাত্মক এজমায় ভুগছে। চিকিৎসার জন্যে দেশের বাইরেও গেছে ৩ বার। সপ্তাহখানেক ধরে ভীষণ অসুস্থ। এমনি সময় সে শুনলো ৪ দিনের একটা কোর্স করে সে দেখতে পারে কোনো লাভ হয় কি না। কিন্তু বাধা দিলেন ডাক্তার। বললেন, এ কোর্স করতে গেলে এ ছেলেকে আর বাঁচানো যাবে না। কারণ ক্লাসের ৮/১০ ঘণ্টা এসি রুমে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। ছেলেটি অগত্যা স্বয়ং প্রশিক্ষকের সঙ্গে দেখা করলো। তিনি বললেন, তুমি তো ভালোই আছো। তুমি পারবে ইনশাল্লাহ। অবশেষে সে কোর্সে অংশ নিলো। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ছেলেটি সম্পূর্ণ এজমামুক্ত। অথচ এর আগে ইনহেলার ছাড়া তার চলতোই না। সেই ছেলেটি হলাম আমি। তখন ছাত্র ছিলাম। এখন একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করছি। আর এ সবকিছুই সম্ভব হয়েছে আমি সুস্থ আছি বলে– যা পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আমি পেয়েছি এ কোর্সের উসিলায়।

[জিয়া ইসলাম, সিলেটের আইবিআইটির শিক্ষক, ১১০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সাইনুসাইটিস থেকে মুক্তি পেয়েছি

মো. জাফর ইকবাল



শীত-গরম– সব ঋতুতেই সাইনুসাইটিস ছাড়াও ঠান্ডাজনিত বিভিন্ন সমস্যা লেগে থাকতো। শীতকালে যেন একটু বেশিই হতো। টনসিলের প্রচণ্ড ব্যথা কমাতে গ্রীষ্মের প্রতিরাতে গলায় মাফলার জড়িয়ে ঘুমাতাম। ১৫-২০ দিন পর পর অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা ছিলো নিয়মিত ঘটনা। সর্দিজ্বরের সাথে সাথে খুব মাথাব্যথা হতো। কিন্তু কোর্স করার পরবর্তী ৫৭ দিনের মধ্যে দুবেলা ৪০ ঘণ্টা মেডিটেশন করার পর থেকে এখন পর্যন্ত সাইনুসাইটিসের সমস্যা আর হয় নি।

[মো. জাফর ইকবাল, ব্যবসায়ী, ২৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ঠান্ডা-সর্দি আর কাবু করতে পারছে না

শিমুল মাহমুদ



সামান্য দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি মাথায় পড়লেই তা সর্দি হয়ে ঝরতো। নাক দিয়ে টপটপ পানি পড়তো। কোনো ওষুধ না খেলে ৭ দিন পর্যন্ত তার রেশ থাকতো। জ্বরজ্বরও লাগতো। এর মূল কারণ যে মানসিক তা বুঝতে পারি ১৯৯৮ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে। কোর্সের তৃতীয় দিন সকালে বৃষ্টিতে ভিজে এলাম, সারাদিন এসি রুমে ক্লাস করলাম। এরপর থেকে গত এগারো বছরে আর সর্দি লাগে নি।

[শিমুল মাহমুদ, সাংবাদিক, ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

লাখের মাঝে আমি একজন

জায়েদ আল হাসান জয়



গ্রাজুয়েট স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে জায়েদ আল হাসান জয়

১৯৯৯ সাল। ট্রেনে চট্টগ্রাম যাবো। কমলাপুর রেলস্টেশনের ম্যাগাজিনের দোকানে ঢুকে কোয়ান্টাম মেথড বইটি চোখে পড়লো। দামাদামি না করেই কিনে নিলাম। সারা পথ ট্রেনে যেতে যেতে পড়ছি। বইয়ের কল্পনা ও মনছবির অধ্যায়টি আমাকে খুব নাড়া দিলো। এতদিন এটাই তো খুঁজছিলাম! শুরু হলো ক্যারিয়ারের মনছবি দেখা। ঠিক ২৯ দিনের মাথায় একটি এনজিও-র প্রজেক্টে চাকরি হয়। এবার মনছবির দ্বিতীয় ধাপ শুরু অর্থাৎ চাকরিতে উন্নতি, বস-সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন। সেখানেও পেলাম বসদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর আনুকূল্য। ৩ মাসের মাথায় চাকরি স্থায়ী হলো, চাকরির বয়স যখন ৯ মাস তখন পেলাম বোনাস। সেই সাথে পেলাম ব্রিটিশ স্কলারশিপে অস্ট্রেলিয়ায় ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্টের ওপর কোর্স গ্রাজুয়েশন করার সুযোগ। যোগ্যতায় প্রায় ৩০০ প্রতিযোগীর মধ্যে শেষ দশজনের তালিকায় থাকলেও এটি ছিলো আমার প্রজেক্ট ওয়ার্কে প্রথম স্থান লাভের স্বীকৃতিস্বরূপ।

কর্মক্ষেত্রে যখন এত চমৎকার অবস্থা তখনই দেখা দিলো লাইকেন প্ল্যানাস নামে এক ধরনের চর্মরোগ। এ রোগে চামড়ার নিচ থেকে মাংস ফুলে উঠে ছোট-বড় গোল আলুর মতো আকার ধারণ করে। প্রথমে দুই পা, ধীরে ধীরে পিঠ ও ঘাড়ে তা বীভৎসভাবে ছড়িয়ে পড়লো। ডাক্তাররা বললেন আজীবন তা বহন করতে হবে। যদিও অস্ট্রেলিয়ার ডাক্তাররা সান্ত্বনা দিলেন যে, তাদের দেশে হরহামেশা এ রোগ হয়। তবে দীর্ঘমেয়াদে তা স্কিন ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। আর যাতে না বাড়ে সেজন্যে কড়া স্টেরয়েড ও রেডিওথেরাপি সবসময় নিতে হবে। কিন্তু বাবাকে দেখেছি স্টেরয়েডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় খুব কষ্ট পেয়েছেন। তাই স্টেরয়েড ও রেডিওথেরাপি– কোনোটাই নিলাম না। শুধুমাত্র হোমিওপেথিক ওষুধ খেতাম।

এবার শুরু হলো নিরাময়ের মনছবি। তখনও কিন্তু আমার ব্যাগে সবসময় কোয়ান্টাম মেথড বইটি থাকে। অনিয়মিত হলেও সপ্তাহে ২/৩ বার নিজে নিজে মেডিটেশন করি। আলফা লেভেল হচ্ছে কি না তা-ও বুঝি না। পরে অবশ্য কোর্সে এসে মেডিটেশনের ব্যাকরণ শিখেছি। বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে মনছবির নানা প্রক্রিয়া জেনেছি। তখন তাই নিজের মতো করে মনছবিতে দেখতাম যে, মাথার মধ্য দিয়ে আমি আমার দেহের ভেতরে প্রবেশ করছি। রক্ত, কোষ– সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখছি। যেখানে যেখানে মাংস ফুলে আছে তা কেটে ফেলে ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দিচ্ছি। ভেতর ও বাইরে ত্বক একেবারে মসৃণ দেখাচ্ছে। এভাবে চললো বেশ কিছুদিন। একদিন গোসল সেরে আসতেই আমার পিঠ দেখে স্ত্রী বললেন, ফোলাগুলো একদম মিশে গেছে, এমনকি দাগও বেশ ঝাপসা হয়ে আছে। ডাক্তারকে দেখালাম, তিনিও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কারণ আমার লাইকেন প্ল্যানাস হয়েছিলো সেরকম কোনো চিহ্নই আর নেই। তিনি ভাবলেন আগের রিপোর্টে হয়তো ভুল ছিলো। আবার অস্ট্রেলিয়ায় দেখালাম। ডাক্তার কম্পিউটার মেমোরিতে রাখা আমার সব রেকর্ড দেখে শুধু একটি কথাই বললেন, ইটস মিরাকল! কারণ ১ লাখে এ রোগে পূর্ণ নিরাময় লাভ করে মাত্র একজন। আমি হলাম সেই ভাগ্যবান।

ততদিনে প্রমোশন পেয়ে প্রোগ্রাম অফিসার থেকে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এর মধ্যে কোর্স করলাম। আবার নতুন চাকরির মনছবি দেখে যোগ দিলাম আরেকটি প্রতিষ্ঠানে ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট হিসেবে। তারপর স্বাধীন পেশায় থাকার মনছবি নিয়ে বছরখানেক আগে পারিবারিক উদ্যোগে ব্যবসা শুরু করলাম। কোর্স করার আগে খণ্ড খণ্ড যে চাওয়াগুলো পাওয়ায় রূপান্তরিত হয়েছিলো এখন তা পেয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত গতি। কোয়ান্টাম মেথডকে প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য– এই ৩টি শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়ায় তার চমৎকার সমন্বয় আমার আজকের জীবন।

[জায়েদ আল হাসান জয়, ২১৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আর নেই

শাহ্ তাজ আরা



২৫ বছর ধরে পেটের পীড়া আর গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা একসময় তীব্র আকার ধারণ করলো। এলোপেথিক-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় কিছুদিন ভালো থাকলেও আবার তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। ডাক্তার বললেন, পাকস্থলীতে ঘা হয়ে গেছে। শুরু হলো পথ্য। দেড় মাস শুধু দুধ-ভাত খেলাম। তারপরে সেদ্ধ খাবার। ভাজা-পোড়া তো একেবারে বন্ধ। এমনকি তখন মরিচের একটি বিচিও মুখে তুলতে পারি নি। এভাবে চললো ৬ বছর। গ্যাস ফর্ম হওয়া ছাড়া তখন বাকি সব সমস্যা কমে এসেছে। এর মধ্যে অংশ নিলাম রিয়েলাইজেশন কোর্সের ১৪ তম ব্যাচে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত একটি গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেটও খেতে হয় নি। আসলে পরিমিত ও বিশুদ্ধ খাবারের সাথে মনছবি যুক্ত করলে দীর্ঘমেয়াদি অসুখও ভালো হয়ে যেতে পারে।

[শাহ্ তাজ আরা, গৃহিণী, ২৩৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ব্রংকিয়াল এজমা ভালো হয়েছে

খোন্দকার সামসুজ্জামান সুজা



তীব্র ব্রংকিয়াল এজমা থাকার কারণে সবসময় ঠান্ডার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হতো। খাওয়ার সময় গরম পানি, গোসলও করতাম গরম পানিতে। কোর্স করার পর ওষুধের পাশাপাশি প্রতিদিন দুবেলা মেডিটেশন ও ৫ দফা দমচর্চা করতে থাকি। একে একে ওষুধ গ্রহণের পরিমাণ কমতে থাকে। একসময় ওষুধ সম্পূর্ণ ছেড়ে দেই। এখন যশোরের তীব্র শীতেও ফজরের আগে গরম পানি ছাড়াই গোসল করি। কিন্তু আল্লাহর রহমতে কোনো অসুবিধাই হয় না। ব্রংকিয়াল এজমা থেকে আমি পুরোপুরি মুক্ত।

[খোন্দকার সামসুজ্জামান সুজা, যশোর দাউদ পাবলিক ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের শিক্ষক, ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এলার্জি ভালো হয়ে গেল

এনামুল হক



গরুর মাংস, ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ, বেগুন ইত্যাদি খাবার খেতে পারতাম না। খেলেই সারা শরীর এলার্জিতে ফুলে যেতো। ওষুধ না খাওয়া পর্যন্ত চুলকানি ও ফোলা ভাব কমতো না। মেডিটেশন করে এলার্জি সমস্যা কমতে থাকে। ধীরে ধীরে আমি একটা-দুটো করে আমার জন্যে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া খাবারগুলো আবার খেতে শুরু করলাম। কোনো সমস্যা হলো না। একসময় এলার্জি একেবারে ভালো হয়ে গেল।

[এনামুল হক, ছাত্র, ২৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সবসময় বিশ্বাস করুন যে, আপনি সুস্থ হবেন। সুস্থতার আশাবাদ নিরাময় প্রক্রিয়াকে বেগবান করে।



ডা. ডেভিড ওরমে জনসন

মেডিটেশন অসুস্থতার হার কমায়

১৯৮৭ সালে গবেষক ডা. ডেভিড ওরমে জনসন এক ব্যাপক নিরীক্ষা চালান। তার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যারা মেডিটেশন করেন, তাদের ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বয়স অনুপাতে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে যাওয়ার পরিমাণ হচ্ছে শিশু-কিশোর (০-১৯ বছর) ৪৬.৮ ভাগ কম। যুবক (১৯-৩৯ বছর) ৫৪.৭ ভাগ কম। বয়স্ক (৪০-এর ওপরে) ৭৩.৭ ভাগ কম।

এ পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, মেডিটেশনে মনোদৈহিক স্বাস্থ্যের কী পরিমাণ উন্নতি হয়। একজন মধ্যবয়সী মেডিটেশনকারী যে সময়ে একবার ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন, ঠিক একই সময়ে যিনি মেডিটেশন করেন না, তিনি শরণাপন্ন হবেন ৪ বার।

টেনশন থেকেই হয় হাইপারটেনশন

উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রণে মেডিটেশনের সাফল্য প্রশ্নাতীত। হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপের সংকটসীমায় যাদের অবস্থান তারা মেডিটেশনে দ্রুত প্রশান্তি অনুভব করেন। কারণ টেনশন এবং শিথিলায়ন কখনোই একসাথে সম্ভব নয়। নিয়মিত শিথিলায়নে মনের প্রশান্তি এত দৃঢ়মূল হয় যে, বাস্তব জীবনের কোনো দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা বা ক্ষতিকর আবেগ এই প্রশান্তিকে নষ্ট করতে পারে না।

১৯৭৪ সালে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল পরিচালিত এক সমীক্ষায় বলা হয়, উচ্চ রক্তচাপ আক্রান্ত ২২ জন রোগীকে মেডিটেশন শেখানোর আগে ও পরে মোট ১,২০০ বার পরীক্ষা করা হয়। ১ মাস থেকে ৫ বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তাদের গড় রক্তচাপ ১৫০/৯৪ থেকে ১৪১/৮৮-তে নেমে এসেছে।

ডায়াস্টলিক প্রেশার সংকটসীমা থেকে নেমে যায় গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে। সিস্টলিক প্রেশার স্বাভাবিক সীমায় না নামলেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মধ্যবয়সী একজন মানুষের স্বাভাবিক প্রেশার ধরা হয় ১২০-১৪০/৬০-৯০; সেখানে হাইপারটেনশনের সংকটসীমা ধরা হয় ১৫০/১০০। শুধুমাত্র মেডিটেশন চর্চা করে অধিকাংশ রক্তচাপ আক্রান্ত রোগী অনায়াসেই নিজের প্রেশার সংকটসীমার নিচে অর্থাৎ ১৩০/৯০-এ নামিয়ে আনতে পারেন এবং এতে তার স্ট্রোক করার সম্ভাবনা বহুগুণ হ্রাস পায়।

দুশ্চিন্তা করে সচেতনভাবে রোগ সৃষ্টি না করে সচেতন সুচিন্তার মাধ্যমে আমরা সুস্বাস্থ্য সৃষ্টি করতে পারি।

আজও আমি বেঁচে আছি

অনিমা ঘোষ

হঠাৎ একদিন প্রেশারটা খুব বেড়ে গেল। ডাক্তার বললেন, হিমোগ্লোবিন কম থাকলে কখনো কখনো প্রেশার বেড়ে যেতে পারে। গেলাম রক্তরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। তার কথামতো ক্লিনিকে ভর্তি হলাম। সেখানে একদিনেই আমাকে পর পর ৪ ব্যাগ রক্ত ও স্যালাইন দেয়া হয়। হঠাৎ খেয়াল হলো সারাদিন টয়লেট হয় নি। এদিকে শরীরও ফুলতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছিলো পরনের সালোয়ার কামিজ ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ডাক্তাররাও কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না।

ভর্তি হলাম আরেক হাসপাতালে। টেস্ট রিপোর্টে ধরা পড়লো দুটো কিডনিই অকেজো। অথচ ক্লিনিকে ভর্তি হওয়ার আগের দিন রাত ৮টা পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামে ছিলাম। রাতে বাসায় ফিরে অন্যান্য দিনের মতোই কর্মব্যস্ত থেকেছি।



গ্রাজুয়েট স্বামী রানা প্রতাপ ঘোষ (এসিএমএ) ও ছেলের সঙ্গে অনিমা ঘোষ

ভারতে গিয়ে প্রথম ডায়ালাইসিস করাবো চিন্তা করে অপেক্ষা করছি। এদিকে সারা শরীরে পানি বাড়ছে, হাত-পা ক্রমশ ফুলছে। সেদিন দুপুর একটায় ফ্লাইট, সকাল থেকেই অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। শুরু হলো শ্বাসকষ্ট। দ্রুত আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো কিডনি ফাউন্ডেশনে। এম্বুলেন্সের মধ্যেই একসময় অচেতন হয়ে পড়লাম। পালস পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যরা তখন প্রায় নিশ্চিত যে, আমি আর নেই। পরে জ্ঞান ফিরলো। দুদিন পর রওনা হলাম ভেলোরের উদ্দেশ্যে।

কিডনি বিশেষজ্ঞ সব দেখেশুনে বললেন, দুটো পথ খোলা আছে। হয় কিডনি প্রতিস্থাপন করতে হবে নয়তো সারাজীবন ডায়ালাইসিস করাতে হবে। ভেলোরে ডায়ালাইসিস করার পরেও ঘটলো বিপত্তি। সেদিন কলকাতায় চলে এসেছিলাম। রাতে ঘুমের মধ্যে অনুভব করলাম গলার ডান দিকে যেখানে পাইপ বসানো আছে তার ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে যাচ্ছে। ধারে-কাছে কোনো ডাক্তারও নেই। অগত্যা আমার স্বামীই তার অনভিজ্ঞ হাতে ব্যান্ডেজ খুলে বাঁধন শক্ত করে দিলেন। রক্তপাত বন্ধ হলো। অথচ পাইপের বাঁধনে কোনো ভুল হলে শরীরের সব রক্ত সে ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতো এবং তার ফলাফল হতো নিশ্চিত মৃত্যু।

ফিরে এলাম দেশে। ট্রান্সপ্লান্টের প্রস্তুতি নিচ্ছি– এমন সময় জানা গেল আমার কিডনি টিবি হয়েছে। সম্ভবত কলকাতায় ডায়ালাইসিসের সময় পাশের বেডের টিবি রোগীর জীবাণু আমার মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিলো। কমপক্ষে ৬ মাস পর্যবেক্ষণে থাকার কথা। কিন্তু ৪ মাসের মাথায় ডাক্তার রাজি হলেন আমার অপারেশন করতে। মা তার একটি কিডনি দান করলেন। শুরু হলো আমার নতুন জীবন।

২০০৬ থেকে চলছিলো আমার জীবনের সবচেয়ে প্রতিকূল কিছু সময়। প্রতি মুহূর্তে যেন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা। এ চেষ্টায় আশীর্বাদ হয়ে এসেছে স্রষ্টার করুণা আর ফাউন্ডেশনের হাজার হাজার মানুষের প্রার্থনা। যে কারণে দুর্বিষহ সেই দিনগুলো পার করে আমি আবার ফিরে আসতে পেরেছি। সহ্য করতে পেরেছি রাতের পর রাত নির্ঘুম থাকার কষ্ট আর সারাদিন মাত্র আধলিটার পানি খেয়ে তৃষ্ণায় ছটফট করার যন্ত্রণাকে।

এক হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়ায় অন্য হাসপাতালগুলো যখন আমাকে ভর্তি করতে দ্বিধা করছিলো, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে এসেছেন সেখানকারই প্রথিতযশা চিকিৎসক, নার্স। দিনে ২২টি ওষুধ খেয়েও যখন প্রেশার কমতো না, তখন জালালিতে দোয়ার পর আর একটি ওষুধও খেতে হয় নি। রেহাই পেয়েছি অপারেশন পরবর্তী নানা জটিলতা থেকে। স্রষ্টার করুণা আর মানুষের ভালবাসার এ ঋণ কখনোই শোধ করার নয়।

[অনিমা ঘোষ, গৃহিণী, ১৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ প্রশান্তি

প্রণতী বড়ুয়া

দীর্ঘদিন চেপে রাখা মনোকষ্টগুলোর মারাত্মক প্রভাব একসময় শরীরের ওপর পড়লো। টানা আড়াই মাসের জ্বরে ২ বার কড়ামাত্রার এন্টিবায়োটিক ওষুধ গ্রহণ আর খাওয়ায় অনিয়মের কারণে খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। সুগার লেভেল কমে গেল। লো প্রেশারের সাথে সাথে পালস রেটও স্বাভাবিকের চেয়ে কম ছিলো।

কোর্সের প্রথম দিন কয়েকজন মিলে ধরে আমাকে চেয়ারে বসালেন। সেদিন চামচ দিয়ে পানি পর্যন্ত খাইয়ে দিতে হয়েছিলো। বাসায় চলে যাবো কি না ভাবতে ভাবতেই কানে বাজলো মাসীর কথাগুলো– 'শুধু গুরুজীর কথাগুলো মন দিয়ে শুনবি। দেখবি তাহলেই ভালো হয়ে যাবি।' মাসীর এ অনুরোধ রাখতেই মন দিয়ে কথাগুলো শুনতে লাগলাম। মেডিটেশনেও অপূর্ব আনন্দময় সময় কাটালাম। শুরু হলো ভালো লাগা। দ্বিতীয় দিন থেকে নিজের আগ্রহেই ক্লাসে এলাম। ফিরে পেলাম মনের জ্বর ভালো করার কার্যকরী ওষুধ প্রশান্তিকে। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কোর্সে শেখা বিশ্বাস, মনোবল ও জীবনদৃষ্টি– এ তিনটি শিক্ষাই এখন আমাকে সুস্থ থাকার প্রেরণা যোগাচ্ছে।

[প্রণতী বড়ুয়া, গৃহিণী, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রক্তদান করতে পেরেছি

আতিয়া সিদ্দিকী

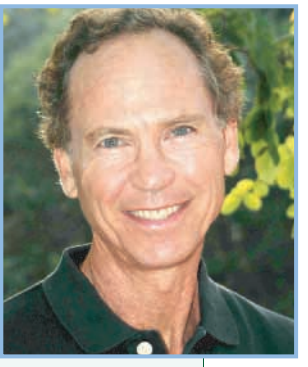


কলেজ জীবন পর্যন্ত ওজন কখনোই ৪০ কেজির বেশি হতো না। কোর্সে এসে রক্তদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শুরু হলো ওজন বাড়ানোর মনছবি। বন্ধ করলাম কারো ওপর অভিমান করে না খেয়ে থাকার ক্ষতিকর অভ্যাস। অবশ্য প্রথমবার রক্ত দিতে গিয়েও ফিরে এসেছিলাম। কারণ ওজন বাড়লেও হিমোগ্লোবিন কম থাকায় ডাক্তার ৩ মাস পর যেতে বলেছেন। কিন্তু এর ১৫ দিন পরেই রক্তদানের নিয়ত করে কোয়ান্টায়নে জালালিতে অংশ নিলাম। সেদিন পুরো সময় প্রার্থনা করলাম যেন আমি রক্তদাতা হতে পারি। জালালি শেষ করে ল্যাবে এসে রক্ত দিলাম। আগে আমি রাস্তায় বা মেলায় রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করছে এমন ক্যাম্পগুলো দেখলেই অন্য পথে হাঁটা দিতাম। সেই আমিই এ পর্যন্ত ৬ বার রক্তদান করেছি।

[আতিয়া সিদ্দিকী, শিক্ষিকা, ২২৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রোগমুক্তির ক্ষমতা রোগীর মধ্যেই রয়েছে

ডা. জন রবিন্স



আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি মূলত ওষুধ, রসায়ন এবং অপারেশন নির্ভর।

মাইন্ড-বডি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. দীপক চোপড়া বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে রোগীরা এক আক্রমণাত্মক যান্ত্রিক চিকিৎসাব্যবস্থার শিকার। চিকিৎসাব্যবস্থার এই যান্ত্রিকতাই যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর শতকরা ৩৬ ভাগ মৃত্যুর জন্যে দায়ী। একটি মার্কিন সাময়িকীর বিশেষ নিবন্ধে বলা হয়, যান্ত্রিক ও রসায়ননির্ভর এই চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। চিকিৎসাব্যবস্থা আসলে হয়ে উঠেছে 'চিকিৎসাব্যবসা' বা 'চিকিৎসাবাজার'। আর এ বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে বীমা কোম্পানি, ওষুধ কোম্পানি ও চিকিৎসা প্রযুক্তি নির্মাণ কারখানার মালিকরা। ফলে এ চিকিৎসাব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ শুধু রোগীদেরই নয়, চিকিৎসাদানে জড়িত অনেকের।

ডা. জন রবিন্স এ অবস্থার জন্যে চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে রোগীদের ভ্রান্ত ধারণাকেও দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, রোগীরা মনে করে যে, সুস্বাস্থ্য বা নিরাময় ডাক্তার, ড্রাগ স্টোর বা হাসপাতালে রয়েছে। ডাক্তার তাদেরকে ধন্বন্তরী ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা ইনজেকশন দিয়ে ভালো করে দেবেন। এ আশায় রোগীরা ডাক্তারের পর ডাক্তার আর ওষুধের পর ওষুধ বদলায়। কিন্তু নিরাময় লাভ করতে ব্যর্থ হয়। ডা. রবিন্স বলেন, আসলে নিরাময়ের ক্ষমতা, রোগমুক্তির ক্ষমতা রোগীর মধ্যেই রয়েছে। ডাক্তার শুধু সহায়ক শক্তিমাত্র।

অসময়ে ঘুমের সমস্যা এখন আর নেই

মুর্শেদা ফেরদৌস জাহান



আমার সমস্যা ছিলো ঘুম নিয়ে। তবে অনিদ্রার নয়, বরং যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ার সমস্যা। বেলা ১২টা থেকে ২টার মধ্যে প্রচণ্ড হাই ওঠা। তারপর টেবিলে মাথা রেখে গভীর নিদ্রা যাওয়া। অবশ্য বেশি না, মাত্র ১০/১৫ মিনিটের জন্যে। তখন কেউ আমাকে জাগাতে পারতো না। হয়তো কোনো জরুরি মিটিং চলছে আর আমি তখন গভীর ঘুমে– এরকম দৃশ্যে অভ্যস্ত সহকর্মীরা আমাকে না জাগিয়ে পরে সিদ্ধান্তগুলো জানিয়ে দিতেন। এদিকে খবর পেলাম স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে আমাকে নির্বাচনের কথাবার্তা চলছে। কিন্তু এই ঘুমের সমস্যা নিয়ে কীভাবে সে দায়িত্ব পালন করবো তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। ডাক্তার বললেন, নার্ভের সমস্যা, স্থায়ী সমাধান নেই। মনোচিকিৎসকের শরণাপন্ন হলাম, লাভ হলো না।

কোর্সে এসে পেলাম সমাধানের পথ। অটোসাজেশন দিয়ে ঘুমের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনার সাথে বাড়তি পাওয়া হিসেবে মেরুদণ্ডের ব্যথা কমে গেল। মাইগ্রেনের ব্যথাও নেই। স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবেও আমি নিয়োগ পেয়েছি।

[মুর্শেদা ফেরদৌস জাহান, ২৯৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আইবিএস থেকে আমি মুক্ত

সৈয়দ আসিফ আল আহমেদ



আইবিএস-এ ভুগছিলাম ২০০২ সাল থেকে। হজমেও খুব সমস্যা হচ্ছিলো। ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে তিনি ডিম দুধ আর সব ধরনের শাক খাওয়া আজীবনের জন্যে নিষেধ করে দেন। জ্বর-বমি-আমাশয়ের কারণে প্রায়ই ওজন কমে যেতো। কোর্সে এসে বুঝেছি, আমার নেতিবাচক চিন্তাই ছিলো এসবের নিয়ন্ত্রক। এখন ডিম দুধ শাক সবই খাই। কারণ আমার মধ্যে আইবিএস-এর কোনো লক্ষণ আর নেই। ওজন বাড়ায় রক্তদানও করতে পারছি।

[সৈয়দ আসিফ আল আহমেদ, ছাত্র, ২৮৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অনিদ্রা দূর হলো

সাজ্জাদ সুমন



রাত ৪টার আগে ঘুম আসতো না। আমার জন্যে এটি ছিলো অনেক বড় সমস্যা। কিন্তু কোর্সের প্রথম দিনই রাত ১১টায় ঘুমিয়ে পড়লাম। বহুবছর পর আমি বুঝতে পারলাম, পৃথিবীতে ঘুমের চেয়ে শান্তির কিছু নেই। এখন আমি চাইলেই ইচ্ছেমতো ঘুমাতে পারি। আবার পারি ইচ্ছেমতো জাগতে।

[সাজ্জাদ সুমন, নাট্যকার, ২৬৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ক্যান্সার নিরাময়ে মেডিটেশন



ডা. কার্ল সিমনটন



ডা. বার্নি সীজেল

১৯৮৭ সালের এক জরিপে ড. ডেভিড ওরমে জনসন দেখান যারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ৫৫.৪ শতাংশ কম। বিজ্ঞানীরা বোঝার চেষ্টা করেছেন মেডিটেশন ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় ক্যান্সার প্রতিরোধে কাজ করে। তারা দেখেন মেডিটেশনের ফলে একজন মানুষের দেহে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের মাত্রা কমে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস আমাদের দেহের একটি প্রক্রিয়া যেখানে চর্বি, প্রোটিন বা নিউক্লিক এসিড ইত্যাদির সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া হয়ে দেহের কোষগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ক্যান্সারসহ বয়সজনিত অন্যান্য রোগ-বালাই সৃষ্টিতে এই অক্সিডেটিভ স্ট্রেসকে দায়ী করা হয়। আর গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে যারা মেডিটেশন করেন তাদের দেহে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের মাত্রা অনেক কম।

শুধু প্রতিরোধই নয়, ক্যান্সার নিরাময় এবং এর উপসর্গ ও চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতেও মেডিটেশনের কার্যকারিতা প্রমাণিত। বেড়েছে রোগীদের বেঁচে থাকার হার। ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক ওয়াকার এবং তার সহযোগীদের গবেষণায় দেখা গেছে, শিথিলায়ন এবং নিরাময়ের মনছবি প্রয়োগ করে স্তন ক্যান্সারসহ অন্যান্য ক্যান্সার আক্রান্তদের রক্তে টি-সেলের কার্যকারিতা বেড়ে গেছে যা তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়েছে। ১৯৯৩ সালে সিঙ্গাপুরের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী বি জে লী-র লিমফেটিক ক্যান্সার ধরা পড়লে কেমোথেরাপির পাশাপাশি মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে তার ক্যান্সারমুক্ত হওয়ার ঘটনা সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ডা. কার্ল সিমনটন এবং ডা. বার্নি সীজেল প্রচলিত চিকিৎসার সাথে মেডিটেশনের টেকনিক প্রয়োগ করে শত শত ক্যান্সার রোগীকে নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছেন। ২০০৩ সালের এপ্রিলে আমেরিকান ইউরোলজিকেল সমিতির সম্মেলনে ডা. ডীন অরনিশ ঘোষণা করেন তার সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল, মেডিটেশন প্রোস্টেট ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কে রোগী

মো. আনোয়ারুল ইসলাম



আপনার নোজ ক্যান্সার– নাক থেকে গলা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে– ডাক্তারের মুখে এ কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। একদিকে অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা অন্যদিকে স্ত্রী ও ছোট সন্তান নিয়ে উৎকণ্ঠা। সহকর্মীদের কথাবার্তায়ও মনে হচ্ছিলো তারা আমাকে শেষ বিদায় জানাচ্ছে। ৬ বার কেমোথেরাপি নেয়ায় শরীর খুব দুর্বল। খেতে পারি না, ঠিকভাবে হাঁটতেও পারি না। সাহস করে ৪ দিনের কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলাম। গুরুজীর কথায় নতুন করে বিশ্বাস ফিরে পেলাম যে, আমি বাঁচবো। বাসায় নিরাময়ের মেডিটেশন করতাম। আর কেমোথেরাপি নেয়ার সময় ভাবতাম আগামী দিনগুলোর স্বপ্ন নিয়ে। আমি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম।

কিছুদিন আগে ভারতে চেক-আপ করাতে গিয়েছি, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দুজন আত্মীয়ের সাথে আমাকেও চেম্বারে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কে রোগী। দেশে ফিরে সিটিস্ক্যান করালাম। প্রথম রিপোর্ট ভালো দেখে ডাক্তার দ্বিধায় পড়ে গেলেন। আবার করাতে বললেন। দ্বিতীয় রিপোর্টও একই। আমাকে ক্যান্সারমুক্ত ঘোষণা করে ডাক্তার তখন কাজে যোগ দিতে বললেন।

[মো. আনোয়ারুল ইসলাম, চাকরিজীবী, ২৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দুরারোগ্য ক্যান্সার থেকে মুক্তি

সুফিয়া খাতুন



২০০৩ সালে আমার ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়লো। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জানালেন, ধীরে ধীরে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। তবু বিশ্বাস হারাই নি; স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে ভেবেছি স্রষ্টা যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। পর্যায়ক্রমে অপারেশন কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি চলেছে। তখন নিয়মিত মেডিটেশন আর একাগ্র প্রার্থনা ছিলো আমার সঙ্গী। ফলে সে সময় প্রেশার নিয়ন্ত্রণে ছিলো, ব্যথার কষ্টও কম হয়েছে। ঘরের সবকাজ একাই করেছি। দীর্ঘ সাত মাস চিকিৎসার পর আমি ক্যান্সারমুক্ত হলাম।

[সুফিয়া খাতুন, ব্যাংকার, ৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুস্বাস্থ্যের বিশাল সমুদ্রে ব্যথা বা রোগ এক একটি বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র দ্বীপ। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ হয় নি যা থেকে কেউ না কেউ নিরাময় লাভ করে নি। বিশ্বাসকে প্রবল করে আপনিও রোগমুক্ত হতে পারেন।

ফিরে পেলাম নতুন জীবন

হাসান শরীফ জয়



১৯৯৬ সালে প্রথমবার আমার হার্ট এটাক করলে বুকের মধ্যে শক দিয়ে হার্ট সচল করা হয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে আবার হার্ট এটাক। এবার করা হয় এনজিওপ্লাস্টি। ভীষণ হতাশ আমি পরিবারের অনুপ্রেরণায় যখন একটু একটু করে সামলে উঠছি তখন '৯৮ সালে দেখা দিলো সেমিনোমা (ক্যান্সার)। অপারেশন হলো। কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি ইত্যাদি চিকিৎসা চলতে থাকলো। তখন কয়েকজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট আমার জন্যে হিলিং মেডিটেশন করতেন। এতে কষ্ট অনেক কম হতো, ঘুম ভালো হতো।

পরবর্তীতে কোর্স করলাম। কয়েক মাস নিয়মিত মেডিটেশন করার পর ডাক্তাররা আমাকে সুস্থ ঘোষণা করলেন। স্রষ্টার ইচ্ছায় ভালোই ছিলাম। হঠাৎ ২০০৫-এর এপ্রিলে ম্যাসিভ হার্ট এটাক হলো। ডাক্তার জানালেন, ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়া গতি নেই। কিন্তু আমি মনছবি দেখেছি, অটোসাজেশন দিয়েছি যাতে সার্জারি না লাগে। মাটির ব্যাংকে দানের বরকত, যৌথ হিলিং ও সবার দোয়ায় এনজিওপ্লাস্টি করে রিং পরিয়ে দেয়া হলো। ওপেন হার্ট সার্জারির আর প্রয়োজন হয় নি। যেখানে পদে পদে মৃত্যুই একমাত্র পরিণতি হওয়ার কথা সেই আমি করুণাময়ের অনুগ্রহে এখন অনায়াসে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছি, গাড়ি চালাচ্ছি, স্বাভাবিকভাবে সব কাজ করছি।

[হাসান শরীফ জয়, চাকরিজীবী, ৮৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পেয়েছি ক্যান্সারের সাথে লড়াই করার সাহস

ডা. মো. আলমগীর হোসেন



একবার ভাবুন তো সে দৃশ্যের কথা– আপনার অসুস্থতার কথা শুনে বাসায় কান্নার রোল উঠেছে। স্বজনরা শেষ স্মৃতি ধরে রাখতে আপনার সাথে ছবি তুলছে। ডাক্তাররাও টেস্ট রিপোর্ট দেখে ভ্রূ কুঁচকে চিন্তিত মুখভঙ্গি করছেন। চারপাশের সবার এই আহাজারি-দুশ্চিন্তার মধ্যে থেকে কতক্ষণ আপনি আপনার মনোবলকে দৃঢ় রাখতে পারবেন? আর আমার জীবনে এ ঘটনাগুলোই ঘটেছে মাত্র দিন কয়েকের ব্যবধানে।

কিছুদিন আগে থেকেই খেতে পারছিলাম না, মাঝে মাঝেই বমি হচ্ছিলো। আলট্রাসনোগ্রামে দেখা গেল বাম কিডনিতে পানি জমে গেছে, কাজ করছে না। ডান কিডনির অবস্থাও ভালো নয়। কিডনির অপারেশন করে স্টেন্ট লাগানো হলো। এর মধ্যে সিটিস্ক্যান, এমআরআই এবং ৮/৯ বার আলট্রাসনোগ্রামসহ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে দেড় মাসের মাথায় ধরা পড়লো মেটাস্টেটিক ক্যান্সার। ডাক্তারদের মতে ক্যান্সারের মধ্যে এটি সবচেয়ে মারাত্মক। কারণ ইতোমধ্যে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় তা ছড়িয়ে গেছে। বিশেষত ফুসফুস ও পেটে ক্ষতটা একটু বেশি। ফলে রাতে তো নয়ই, দিনেও ভাত খেতে পারতাম না। তরল জাতীয় খাবার খেলেও বমি হয়ে যেতো। ওজন কমে গেল ১৪ কেজি। জরুরি ভিত্তিতে দেশের বাইরে গেলাম। সেখানে ৩ সাইকেলে কেমোথেরাপি চললো। দেশে ফিরেও কেমো চলছিলো। আবার টেস্ট করালাম। এবার রিপোর্ট আরো খারাপ। কারণ কিডনি লিভার ফুসফুস এমনকি হার্টেও পানি চলে এসেছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়লাম। ক্যান্সারের ওপরে থিসিস করায় আমিও এর ভয়াবহতা বুঝতে পারছিলাম। সবার মতো একটা সময় আমারও মনে হতে লাগলো যে, এই ৩৬ বছর বয়সেই হয়তো জীবনের ইতি টানতে হবে। এরকম সময় এক সহকর্মীর পরামর্শে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসি।

প্রথম দিন ৩টি চেয়ার একত্র করে বালিশে মাথা দিয়ে আধশোয়া ছিলাম। দ্বিতীয় দিন থেকে অবস্থা ভালো হতে থাকে। চতুর্থ দিন পুরো ক্লাস করেছি নিজের চেয়ারে বসে। কোর্সের প্রথম দিন থেকেই খেতে পারছি এবং খাবার হজম হচ্ছে। পেইনকিলারের প্রয়োজন আর হচ্ছে না। এখন আমি অনেক সুস্থ বোধ করছি। রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারছি। ফিরে পেয়েছি মনোবল আর দুরারোগ্য ক্যান্সারের সাথে লড়াই করার সাহস।

[ডা. মো. আলমগীর হোসেন, নাক কান ও গলা বিভাগ, বিএসএমএমইউ, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুস্থ থাকার দায়িত্ব নিজে নিন



ডা. হার্বার্ট বেনসন

সুস্থ থাকতে হলে নিজের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে। নিজেকে নিরাময় করার ক্ষমতা প্রতিটি মানুষের সহজাত। এই সহজাত ক্ষমতার সাথে বিশ্বাসকে সম্পৃক্ত করতে পারলে প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থার শতকরা ৯০ ভাগ খরচই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। 'বডি, মাইন্ড, স্পিরিট' সাময়িকীর ১৯৯৭ সালের বিশেষ সংখ্যায় 'একবিংশ শতকের স্বাস্থ্য' প্রচ্ছদ কাহিনীতে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এ মত প্রকাশ করেছেন নব্য চিকিৎসাধারার প্রবর্তক ডা. ডীন অরনিশ, ডা. দীপক চোপড়া, ডা. ল্যারি ডসি, ডা. জন রবিন্স, ডা. কার্ল সিমনটন, ডা. বার্নি সীজেল, ডা. ক্রিশ্চিয়ানে নর্থট্রপ, ডা. হার্বার্ট বেনসন, ডা. জোয়ান বরিসেঙ্কো, ডা. এন্ড্রু ওয়েল, ডা. এডওয়ার্ড টাওব, ডা. মিখাইল স্যামুয়েলস প্রমুখ। কারণ বাইপাস সার্জারি, এনজিওপ্লাস্টি বা সারাজীবন কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রক ওষুধ সেবনের চেয়ে জীবনদৃষ্টি পরিবর্তন করে জীবনধারা বদলের খরচ অনেক অনেক কম।

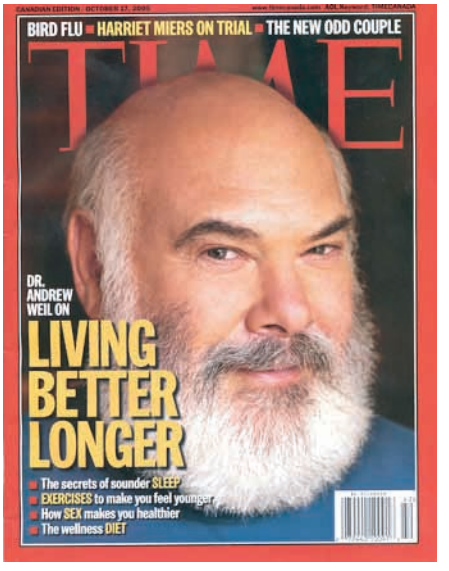
হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষক ডা. হার্বার্ট বেনসন বলেন, একজন মানুষ নিজেই শিথিলায়ন, মেডিটেশন, ব্যায়াম ও পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তার নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারে। বর্তমানে যেখানে রোগীরা ওষুধ বা সার্জারির ওপর নির্ভর করছে সেখানে তাদেরকে নিজের ওপর নির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সুস্থ জীবনের জন্যে নব্য চিকিৎসাধারার অনুসারী হওয়ার বিকল্প নেই। আপনাকেই আপনার স্বাস্থ্য ও নিরাময়ের দায়িত্ব নিতে হবে। ডাক্তার ওষুধ সার্জারি হবে আপনার সহায়ক শক্তিমাত্র।

বিশ্বাসই নিরাময় করে

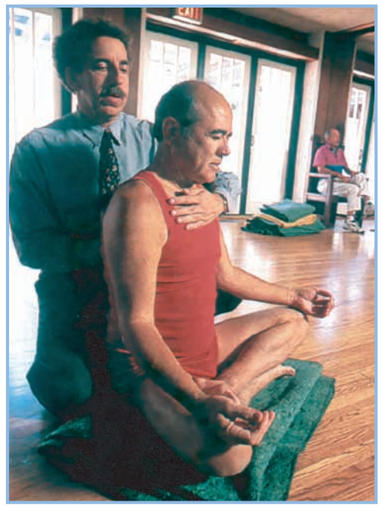
নিরাময়ের জন্যে প্রথম প্রয়োজন বিশ্বাস। এমনকি ওষুধ বা সার্জারিও যে কার্যকর হয়, তার মূল কারণ রোগীর বিশ্বাস– চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে প্লাসিবো ইফেক্ট বলা হয়। বিংশ শতাব্দিতে চিকিৎসাব্যবস্থা শুধুমাত্র ওষুধ, সার্জারি কিংবা প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়ায় নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিকতার কোনো প্রভাব নেই– এতদিন এটাই ছিলো অধিকাংশের ধারণা। কিন্তু এ ধারণায় প্রথম ফাটল ধরান ডা. হার্বার্ট বেনসন। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত তার বেস্ট সেলার 'রিলাক্সেশন রেসপন্স' গ্রন্থে তিনি দেখান, একাগ্র বিশ্বাস নিয়ে মেডিটেশন বা প্রার্থনা করে কীভাবে অনিদ্রা, সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা এবং ব্যথা-বেদনায় আক্রান্ত রোগীরা আরোগ্য লাভ করেছেন। তিনি বলেন, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কারণে যে রোগ-বালাই হয়, প্রচলিত চিকিৎসায় তাতে খুব একটা কাজ হয় না। বরং ৬০-৯০% নিরাময় হয় রোগীর বিশ্বাসের কারণে।

আমি সুস্থ হবো– এ বিশ্বাসের ফলে রোগীর দেহের নিউরো-ইমিউনোলজিকেল সিস্টেম নতুন উদ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে, বদলে যায় রোগের কোষগত নেতিবাচক স্মৃতি। কারণ বিশ্বাস, চিন্তা ও আবেগ দ্বারা সৃষ্ট জৈব রসায়নই শরীরের প্রতিটি কোষকে পরিচালিত করে।



টাইম সাময়িকীর প্রচ্ছদ নিবন্ধে ডা. এন্ড্রু ওয়েল

তাই রোগের দৈহিক কারণের সাথে সাথে এর মানসিক কারণ খুঁজে বের করুন। দুশ্চিন্তা করে রোগ সৃষ্টি না করে সচেতনভাবে ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে সুস্থ থাকার চেষ্টা করুন। সবসময় বিশ্বাস করুন যে, আপনি সুস্থ হবেন। কারণ নবীজী (স) বলেছেন, প্রতিটি রোগেরই রয়েছে নিরাময়। আল্লাহ এমন কোনো রোগ পৃথিবীতে পাঠান নি যার নিরাময় তিনি দেন নি। কেউ জানে আর কেউ তা জানে না। এ নিরাময়ের উপকরণ হতে পারে ওষুধ, দোয়া কিংবা দান। তাই সুস্থতার ব্যাপারে আশাবাদী হোন। বিশ্বাস প্রবল হলে আপনিও যেকোনো রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন।



ডা. ডীন অরনিশ একজন রোগীর মেডিটেশনের ভঙ্গিমা ঠিক করে দিচ্ছেন

হৃদরোগ নিরাময়ে মেডিটেশন

বাইপাস সার্জারি, এনজিওপ্লাস্টি ও ওষুধই দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগীদের একমাত্র চিকিৎসা হিসেবে প্রচলিত ছিলো। ডাক্তাররা বলতেন, আর্টারি একবার ব্লক হওয়া শুরু করলে বাইপাস সার্জারি বা এনজিওপ্লাস্টি ছাড়া কোনো পথ নেই। ডাক্তারদের এই রক্ষণশীল চিন্তার মর্মমূলে প্রথম আঘাত হানেন ক্যালিফোর্নিয়ার কার্ডিওলজিস্ট ডা. ডীন অরনিশ। তিনি প্রথম ১৯৮৭ সালে ৪০ জন গুরুতর হৃদরোগীকে এক বছর ধরে মেডিটেশন, যোগব্যায়াম ও কম কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার গ্রহণ করানোর মাধ্যমে হৃদরোগ থেকে মুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় সেবছর এটি প্রথম পৃষ্ঠার খবর হিসেবে প্রকাশিত হয়। তার বিখ্যাত বই 'প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিজ' বেস্ট সেলার গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়। ওষুধ ও সার্জারি ছাড়া যে হৃদরোগ নিরাময় করা যায়, এটা তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেন। সাপ্তাহিক নিউজ উইক-এর জুলাই ২৪, ১৯৯৫ সংখ্যায় হৃদরোগ নিরাময়ে তার অসাধারণ সাফল্যের বিবরণ দিতে গিয়ে 'গোয়িং মেইনস্ট্রিম' নিবন্ধে বলা হয়, ওমাহার একটি বড় বীমা কোম্পানি ২০০ হৃদরোগীকে ডা. ডীন অরনিশের হৃদরোগ নিরাময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ বাইপাস সার্জারিতে যেখানে ৪০ হাজার ডলার খরচ পড়ে, সেখানে অরনিশের বছরব্যাপী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের খরচ হচ্ছে সাড়ে ৫ হাজার ডলার। ২০০ রোগীর মধ্যে ১৯০ জন এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখেন। এক বছরে ১৯০ জনের মধ্যে ১৮৯ জন সুস্থ হয়ে যান। মাত্র একজন রোগীর অপারেশনের প্রয়োজন হয়।

এ অভাবনীয় সাফল্যের ফলে আরো ১৫টি বীমা কোম্পানি অরনিশের কার্যক্রমে রোগীদের উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেছে। আর সারাদেশ থেকে হাসপাতালগুলো ডাক্তারদের বিভিন্ন টিম ডা. ডীন অরনিশের কাছে পাঠাচ্ছে এ প্রক্রিয়া শেখানোর ট্রেনিং নিতে। কারণ এ প্রক্রিয়ায় যে শুধু অপারেশনের খরচ বাঁচে তা-ই নয়, বরং অপারেশনের পর রোগীকে যে সারাজীবন ওষুধ খেতে হয়, সে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও ব্যয় বহন করা থেকেও রোগী মুক্তি পায়। হৃদরোগ নিরাময়ে অরনিশের প্রক্রিয়া এত ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে যে, একে আর বিকল্প চিকিৎসা বলা যায় না, বলতে হয় চিকিৎসার মূলধারায় এর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

নানা গবেষণার মাধ্যমে এটি এখন এক প্রমাণিত সত্য যে, মেডিটেশন হৃদরোগের প্রতিরোধ ও নিরাময়– দুক্ষেত্রেই খুব কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কোলেস্টেরল হার্ট এটাকের প্রাথমিক কারণ। মেডিটেশন অস্বাভাবিক বেশি কোলেস্টেরলের মাত্রাকে কমিয়ে আনতে পারে। ১৯৭৯ সালে দুজন গবেষক এম জে কুপার এবং এম এম আইজেন ২৩ জন উচ্চ কোলেস্টেরলযুক্ত রোগীর মধ্যে ১২ জনকে মেডিটেশন করান। ১১ মাস পর দেখা যায় যে, মেডিটেশনকারী গ্রুপের কোলেস্টেরল ২৫৫ থেকে ২২৫-এ নেমে এসেছে। আমেরিকায় ২২০ মাত্রাকে স্বাভাবিক গড় মাত্রা ধরা হয়।

মেডিকেল কলেজ অফ জর্জিয়ার ফিজিওলজিস্ট ডা. বার্নেস ১১১ জন তরুণ স্বেচ্ছাসেবীর ওপর এক গবেষণা চালান। এদের মধ্যে ৫৭ জনকে মেডিটেশন করানো হয়, বাকিদের শুধু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি শেখানো হয়।

৮ মাস পর দেখা যায় ১ম গ্রুপের সদস্যদের রক্তবাহী নালীর সংকোচন-সম্প্রসারণ ক্ষমতা বেড়েছে ২১% যা হৃৎপিণ্ডের সুস্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কারণ এনডোথিলিয়াম নামের রক্তনালীর আবরণের এ অসুবিধা থেকেই অল্পবয়সে একজন মানুষের শরীরে শুরু হয় হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রক্রিয়া। অন্যদিকে ২য় গ্রুপের এ ক্ষমতা কমেছে ৪%। বয়স বাড়লে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও ১ম গ্রুপের ক্ষেত্রে কমেছে। ডা. বার্নেস বলেন, লিপিড কমানোর ওষুধ ব্যবহার করে যে ফল আগে পাওয়া যেতো তা-ই এখন পাওয়া যাচ্ছে মেডিটেশনে। ২০০৭ সালে আমেরিকান সাইকোসোমাটিক সোসাইটির বার্ষিক কনফারেন্সে এ রিপোর্টটি পেশ করা হয়।

কর্মব্যস্ত সময় কাটছে

কফিল উদ্দিন



দীর্ঘদিন থেকে আমার হার্টের সমস্যা ছিলো। ১৯৯৮ সালে ওপেন হার্ট সার্জারি হলো। প্রতিদিন বেশ কয়েকটি করে ওষুধ খেতাম। দেশের কয়েকজন খ্যাতনামা ডাক্তারের নিয়মিত রোগী ছিলাম। তারপরও দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। ভাবলাম এটাই আমার নিয়তি। কিন্তু স্রষ্টার অপার করুণায় মেডিটেশন কোর্সে শেখা সুস্থতার মনছবি নিয়মিত দেখতে থাকলাম। শোকর আলহামদুলিল্লাহ– এখন আমার হার্টের অবস্থা খুব ভালো। এই ৭১ বছর বয়সেও কর্মব্যস্ত সময় কাটছে।

[কফিল উদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজসেবক, সাবেক সংসদ সদস্য ও রাজনীতিবিদ, চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি, গণফোরাম। ৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

হৃদরোগ নিরাময়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া

ডা. তালাত মোহাম্মদ



এনজিওগ্রামে ৪টি ব্লক ধরা পড়ার পর ২০০৫ সালের আগস্টে আমার বাইপাস অপারেশন হয়। কিছুদিন পর মেডিটেশন কোর্সে অংশ নিই। ৪ দিনের আলোচনা, মেডিটেশন সব মিলিয়ে এখন মনে হচ্ছে অপারেশন নয়, হৃদরোগীদের সবার উচিত প্রথম সুযোগেই এ কোর্সটি করা। আসলে কোর্সে শেখানো সঠিক জীবনদৃষ্টি, ব্যায়াম, বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস এবং ২ বেলা নিয়মিত মেডিটেশনই পারে হৃৎপিণ্ডের সব ধরনের গোলোযোগের কার্যকরী সমাধান দিতে। কোর্সের কথা আগে জানলে আমিও অনেকের মতো বাইপাসকে বাইপাস করতে পারতাম। হয়তো ব্লকও ধরা পড়তো না। নিয়মিত দমচর্চা ও মেডিটেশন করে এখন অপারেশন পরবর্তী জটিলতা এড়িয়ে সুস্থ আছি। আসলে সুস্থতার জন্যে রিলাক্সেশন বা মেডিটেশন একটি প্রমাণিত বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া।

[ডা. তালাত মোহাম্মদ, চিকিৎসক, ২৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ওপেন হার্ট সার্জারি করাতে হয় নি

আয়েশা আক্তার



২০০৭-এর মাঝামাঝি হঠাৎ করে বুকে ব্যথা শুরু হলো। এনজিওগ্রামে ধরা পড়লো ৯৫% ব্লকড। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বললেন, রিং পরানো যাবে না, ওপেন হার্ট সার্জারি করাতেই হবে। এছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আত্মীয়স্বজনরাও দ্রুত অপারেশন করাতে জোরাজুরি করতে লাগলো। অথচ ডাক্তার যতটা খারাপ ধারণা করছিলেন আমি কিন্তু কখনোই ততটা অসুস্থ বোধ করি নি। শুধু উত্তেজিত হলে বা টেনশন করলে ব্যথা বাড়তো। এর এক সপ্তাহ পর আমার ছেলের অনুপ্রেরণায় কোর্সে আসি। মেডিটেশন করে আত্মবিশ্বাস ও সাহস ফিরে পেলাম। হতাশা কাটিয়ে উঠলাম। অপারেশন ছাড়াই এখন আগের চেয়েও বেশ ভালো আছি। অপারেশনের জন্যে জমানো টাকা দিয়ে গত বছর হজ করে এসেছি। এখন দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতোই জীবনযাপন করছি।

[আয়েশা আক্তার, গৃহিণী, ২৪৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

হার্টে আর কোনো ব্লক নেই

শামছুন্ নাহার হুদা



নাতনিকে কোলে নিয়ে

১৯৯১ সালে প্রথম বুকের ব্যথায় আক্রান্ত হলাম। ১৯৯৮ সালে এনজিওগ্রাম করানোর পর করোনারি আর্টারিতে ৪০% ব্লক ধরা পড়লো। ডাক্তার বললেন, একবার ব্লক হয়ে গেলে ওষুধ দিয়ে তাকে কমানো বা সারানো যায় না। তবে খাবার, ব্যায়াম ও অন্যান্য নিয়মাবলি মেনে চললে ব্লক বৃদ্ধিকে হয়তো ঠেকানো যাবে। শুরু হলো ওষুধ-পথ্য, মেডিটেশন ও প্রার্থনা। ২০০১ সালে চেক-আপের পর শারীরিক অবস্থার উন্নতি দেখে ডাক্তার সব ওষুধ বন্ধ করে দিতে বললেন।

কিন্তু ২০০৭-এ এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। মাদ্রাজের ভেলোরের প্রথিতযশা কার্ডিওলজিস্টরা ইসিজি রিপোর্ট এবং কেস হিস্ট্রি শুনে বললেন, এবার এনজিওপ্লাস্টি এমনকি বাইপাস সার্জারিও করাতে হতে পারে। কিন্তু তাদের আশঙ্কায় বিচলিত না হয়ে স্থির বিশ্বাসে বললাম, শুধু এনজিওগ্রামই করাবো। রিপোর্টে দেখা গেল, আর্টারিতে কোনো ব্লক নেই। ডাক্তারদের অভিজ্ঞতায় যা বিরল ঘটনা, তা-ই ঘটলো আমার জীবনে।

[শামছুন্ নাহার হুদা, সমাজসেবক, ১২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বাইপাসকে বাইপাস করলাম

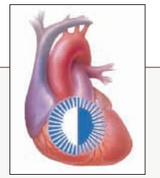
হৃদয় রঞ্জন বিশী



মারাত্মক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে টেনশন আর অস্থিরতায় দিন কাটছিলো। চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন বাইপাস সার্জারির। ঠিক তখন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। প্রচণ্ড বুকের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে তো এলোই, বাড়তি পাওয়া হিসেবে ৩০ বছরের ব্যাকপেইন চলে গেল। এর মধ্যে হঠাৎ চাকরি সংক্রান্ত দুশ্চিন্তায় আবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এনজিওগ্রাম করে জানা গেল হার্টে ৪টি ব্লকেজ, এবার বাইপাস ছাড়া আর রক্ষা নেই। নিয়মিত মেডিটেশন এবং চুম্বক পানি পান আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠলো। সুস্থতার মনছবির সাথে সাথে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে থাকলাম। অপারেশনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ গেলাম। কিন্তু সেখানকার বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞরা জানালেন অপারেশনের আর প্রয়োজন নেই।

[হৃদয় রঞ্জন বিশী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক, ১৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব



প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থায় ধমনীতে জমে থাকা চর্বির স্তর পরিষ্কার করার জন্যে ব্লকেজের পরিমাণ অনুসারে ওষুধ, এনজিওপ্লাস্টি কিংবা বাইপাস সার্জারির পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু এর কোনোটি দিয়েই পুনরায় ব্লকেজ প্রতিরোধ করা যায় না। কেননা এনজিওপ্লাস্টি করার ৪ থেকে ৬ মাসের মধ্যে ২৫ থেকে ৫০ শতাংশেরও বেশি রোগীর ধমনীর ব্লকেজ আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। কারণ মূল সমস্যার সমাধান না করে সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে গেলে যা হয়, এখানেও তা-ই ঘটে। অপারেশনের পর রোগী তার পুরনো জীবন অভ্যাসে ফিরে গেলে আবারও আক্রান্ত হয় ব্লকেজসহ হৃদযন্ত্রের নানা জটিলতায়। জরিপে দেখা গেছে, অপারেশনের পর প্রতি ২০ জনে ১ জন রোগীর পুনরায় হার্ট এটাক হয় এবং স্ট্রোকে আক্রান্ত হয় ৪০ জনে ১ জন রোগী। আর দ্বিতীয়বার বাইপাস করানো মানে ঝুঁকির পরিমাণ ১০% থেকে ২০% বেড়ে যাওয়া। অপারেশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং বিপুল ব্যয়ভারের কথা তো বলাই বাহুল্য।

মার্কিন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ক্রিচটন দীর্ঘ গবেষণার পর দেখিয়েছেন যে, হৃদরোগের কারণ প্রধানত মানসিক। তিনি বলেছেন, কোলেস্টেরল বা চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে করোনারি আর্টারিকে প্রায় ব্লক করে ফেললেই যে হার্ট এটাক হবে এমন কোনো কথা নেই।

করোনারি আর্টারির ৮৫% বন্ধ অবস্থা নিয়েও একজন ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিয়েছেন; আবার দেখা গেছে, একেবারে পরিষ্কার আর্টারি নিয়ে অপর একজন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে সানফ্রান্সিসকোর ডা. মেয়ার ফ্রেডম্যান এবং ডা. রে. রোজেনম্যান ৬০-এর দশকে দীর্ঘ গবেষণার পর দেখান যে, হৃদরোগের সাথে অস্থিরচিত্ততা, বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনপদ্ধতির সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। রোগ ও অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্যে প্রথম প্রয়োজন এই দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন।

তাই হৃদরোগ নিরাময়ে প্রয়োজন শাশ্বত চেতনার আলোকে সুস্থ, শোকর গোজার জীবনদৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক জীবনাচরণ। এসবের সমন্বয়ে হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের সর্বাধুনিক, স্বীকৃত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব।

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে এ ক্লাবের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে–

২ দিনের কম্প্যাক্ট ওরিয়েন্টেশন

- ☐ হৃদরোগের কারণ, ধরন ও পরিচিতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সচেতন করে তোলা
- ☐ হৃদরোগের জন্যে দায়ী ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি এবং অবৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি
- ☐ হৃদরোগের কারণ অনুসন্ধান ও নিরাময়ের বিশেষ মেডিটেশন
- ☐ হৃদরোগীদের জন্যে উপযোগী কোয়ান্টাম ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ
- ☐ হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে শুকরিয়া ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব ব্যাখ্যা

সপ্তাহে ১ দিন গ্রুপ সাপোর্ট ও কাউন্সেলিং সেশনে রয়েছে–

- ☐ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর
- ☐ পারস্পরিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়
- ☐ চিকিৎসাসেবা ও কাউন্সেলিং

সুস্থতার জন্যে প্রয়োজন বিশ্বাস



ডা. আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী

একটি কথা আছে– Patient cure themselves, Doctors show the way. আমি আমার রোগীদেরকে বলি– দেহটা আপনার, ভালো থাকার প্রাথমিক দায়িত্বও তাই আপনার। আমি ওষুধ ও পরামর্শ দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো মাত্র।

স্রষ্টা আমাদের শরীরে অদ্ভুত সব ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। আমরা বুঝি না বলেই তা ব্যবহার করতে পারি না। রোগী হওয়াটা আসলে মনের একটি অবস্থা। কেউ কেউ রোগী হয়ে থাকতেই পছন্দ করেন। অন্যদিকে অনেকে আছেন যারা নানান অসুখ নিয়েও দিব্যি সব কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। তার ভাষায়– হ্যাঁ, আমি এখন প্রয়োজনে ওষুধ খাচ্ছি, তাতে কি? আমি রোগী নই। অর্থাৎ তিনি রোগী হতে রাজি নন। কোয়ান্টামে মানুষ মূলত এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পায়। দেহ-মনের ওপর এ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ।

[ডা. আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী, বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি

এম এফ শামীম



বাম চোখে ঝাপসা দেখায় গেলাম ডাক্তারের কাছে। ভেবেছিলাম গত ১৩ বছরের মতো এবারও লেন্সের পাওয়ার বাড়বে। ডাক্তার সব দেখে বললেন, চোখের নার্ভে পানি জমেছে। অপারেশন করে পানি বের করতে হবে। সাথে এ-ও জানালেন যে, এক্ষেত্রে ৯০ ভাগ রোগী আগের মতো ঝাপসাই দেখেন। বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে আমার দরকার অতিরিক্ত ঘুম। অথচ গত ৪ বছর ধরে ওষুধ খেয়েও প্রয়োজনীয় ঘুম ঘুমাতে পারি না। গভীর ঘুম কেমন তা-ও মনে নেই।

এক পরিচিতের পরামর্শে কোর্স করতে এলাম। প্রথম দিন ক্লাস শেষে বাসায় গিয়ে রাতে তৃপ্তির ঘুম ঘুমালাম। তৃতীয় দিন অনুভব করলাম বাম চোখে আর ঝাপসা দেখছি না। এখন আমি দুচোখেই পরিষ্কার দেখছি। ঘুমও ভালো হচ্ছে।

[এম এফ শামীম, ব্যবসায়ী, ২৯৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

হার্ট দিন দিন ভালোর দিকে যাচ্ছে

আশিকুল হক চৌধুরী



পড়াশোনায় অমনোযোগী, অস্থিরমনা ছেলের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখে কোর্স করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। এর ৬/৭ মাস আগে আমার ব্যাকপেইন এবং স্পন্ডিলাইটিসের সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। চিকিৎসার উপায় খুঁজতে গিয়ে ইন্টারনেটে পেলাম যে, স্পন্ডিলাইটিস ও ব্যথা নিরাময়ে মেডিটেশন একটি কার্যকরী সমাধান। ছেলের উৎসাহ তো ছিলোই। পরম করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করি যে, কোর্সের চারদিনেই ব্যাকপেইন ভালো হয়ে গিয়েছিলো। ২০০৪ সালে আমার হার্ট এটাক হলো। ডাক্তার বললেন, বাইপাস সার্জারি করাতে। কিন্তু অপারেশন না করে পরিমিত ও চর্বিহীন খাবার এবং ব্যায়াম অনুশীলন করতে লাগলাম। সম্প্রতি এনজিওগ্রাম করার পর রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বললেন, খারাপ তো নয়ই, আপনার হার্ট দিন দিন ভালোর দিকে যাচ্ছে।

[অব. যুগ্মসচিব আশিকুল হক চৌধুরী, স্কয়ার ফার্মাসিউটিকেলস লি.-এর নির্বাহী পরিচালক, ১৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ইনহেলার নিতে হচ্ছে না

মমতাজ বেগম



১৯৯৫ সাল থেকে সবসময় ইনহেলার সাথে থাকতো। প্রবাসী আত্মীয়স্বজন বেড়াতে এলে আমার জন্যে 'গিফট' আনতেন ইনহেলার! শ্বাসকষ্টের কারণে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বেশ কবার হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলাম। কিন্তু তার পরের বছর কোর্স করার পর সেই যে ছেড়েছি আজও ইনহেলার নিতে হচ্ছে না।

[মমতাজ বেগম, প্রাক্তন শিক্ষিকা, ১৯৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুস্থতার নতুন স্বাদ

শ্রী সুকুমার চক্রবর্তী



১৯৯৬ সালে হার্টে বাইপাস সার্জারি করানোর পরে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছিলো দ্রুত। প্রায় হাঁটতেই পারছিলাম না। বিদেশি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করলাম। নিয়মিত মেডিটেশন, কোয়ান্টাম খাদ্যবিধি অনুসরণ, দমচর্চা আমাকে নতুন জীবনের স্বাদ এনে দিলো। আমার হৃদযন্ত্র এখন পুরোপুরি সুস্থ। হার্নিয়া, গলব্লাডার এবং ফুসফুসের সমস্যাও অপারেশন ছাড়াই ডাক্তারি চিকিৎসার পাশাপাশি মেডিটেশনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি। ব্যাংকিং কনসালটেন্ট হিসেবে এই ৭৪ বছর বয়সেও কাজ করছি ও নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছি।

[শ্রী সুকুমার চক্রবর্তী, বিশিষ্ট ব্যাংকার, ৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমি এখন পরিপূর্ণ সুস্থ

প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ আব্দু মিয়া



মূলত টেনশনের কারণে ১৯৯৮ সালে প্রথমবার হার্ট এটাক হলো। ২০০৩ সালে কোর্স করে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিলো সুস্থতা। নিয়মিত মেডিটেশন আর কুশল বিনিময়ে 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলার অভ্যাসই আমাকে পর পর ৪ বার হার্ট এটাকের পরও সুস্থ-স্বাভাবিক রেখেছে। ওপেন হার্ট সার্জারি করাতে হয় নি। এমনকি দীর্ঘ ২৭ বছর যাবৎ ডায়াবেটিসে ভুগলেও এখন কোনো ওষুধ খাই না। আমি এখন পরিপূর্ণ সুস্থ। পেশাগত ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে কাজ করছি ফাউন্ডেশনের জন্যে।

[প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ আব্দু মিয়া, চাইল্ড কেয়ার একাডেমি, সুনামগঞ্জ, ১৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

উচ্চ রক্তচাপের জন্যে আর ওষুধ খেতে হয় না

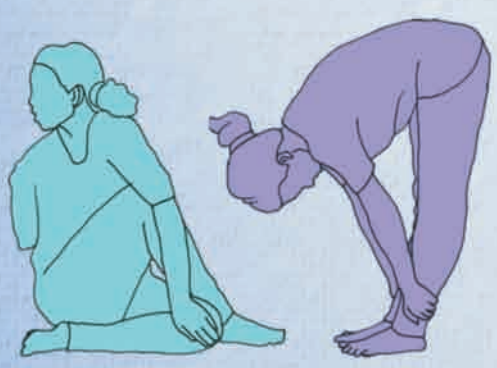
মো. মোতাছিম বিল্লাহ

উচ্চ রক্তচাপের জন্যে একনাগাড়ে ওষুধ খেয়েছি অনেক বছর। মা-বাবা দুজনেরই উচ্চ রক্তচাপ থাকায় একে বংশগত রোগ হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম। কোর্সে অংশ নেয়ার আগেই সিদ্ধান্ত নিলাম কোর্স শেষে ওষুধ ছেড়ে দেবো। শেষ ক্যাপসুলটিও খেলাম কোর্সের শেষ দিন। এরপর আর একটি ওষুধও খাই নি।



[মো. মোতাছিম বিল্লাহ, ব্যবসায়ী, ২৮৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নীরোগ দেহ তরতাজা মন



কোয়ান্টাম ব্যায়াম বুদ্ধিমানদের ব্যায়াম। পরিশ্রম কম, উপকার বেশি, ফলাফল বহুমুখী।

সাধারণ ব্যায়াম ও পাশ্চাত্যের ব্যায়াম শুধু পেশিশক্তি বাড়ায়। কোয়ান্টাম ব্যায়াম পেশিশক্তিকে সংহত করার পাশাপাশি হরমোনের প্রবাহ সুষম, নিরাময় শক্তিকে বেগবান, মনকে তরতাজা আর শরীরকে করে মনোদৈহিক রোগমুক্ত।

১৯৮৩ সাল থেকে দেশে শুরু হয় কোয়ান্টাম ব্যায়ামের কোর্স মা-জী নাহার আল বোখারীর তত্ত্বাবধানে। তারপর ২৬ বছর। অগণিত নারী-পুরুষ এ ব্যায়ামের চর্চা করে উপকৃত হয়েছেন। এঁদেরই কয়েকজনের অভিজ্ঞতা–

কোয়ান্টাম ব্যায়াম

মনছবিতে দেখা সেই শার্ট

ওয়াহেদ চৌধুরী



সেন্টমার্টিন ভ্রমণে তোলা ছবিগুলো দেখে মনটা খারাপ হলো। এত মোটা আমি! কী বীভৎসই না দেখাচ্ছে আমাকে! আসলে দীর্ঘদিনের অনিয়মের পরিণতি ছিলো এটি। কিন্তু এভাবে আর নয়। পরদিনই ছোট সাইজের একটি শার্ট কিনে ড্রেসিং টেবিলের পাশে ঝুলিয়ে রাখলাম। এ শার্ট আমাকে পরতেই হবে। শুরু হলো মনছবি, প্রতিদিন ব্যায়াম ও কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস। অনুশীলনে এতটুকু ফাঁকি দেই নি।

ফলে মাত্র দেড় মাসে ৮৬ কেজি থেকে ওজন কমে হলো ৭৪ কেজি। কিন্তু এরপর আর কমছিলো না। তখন মনে হলো চেষ্টার সাথে সাথে স্রষ্টার রহমতও দরকার। ব্যস, টানা ৪০ দিনের হিলিং এবং অনুশীলন অব্যাহত রাখলাম। আবার ওজন কমতে শুরু হলো। মোট তিন মাসে ওজন কমে দাঁড়ালো ৬৬ কেজিতে। এখন অবশ্য সেই শার্ট একটু ঢিলেঢালাই হয়!

[ওয়াহেদ চৌধুরী, ব্যবসায়ী, ১১৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

৩৫ কেজি ওজন কমিয়ে বেশ ভালো আছি

ফারিয়া লারা



বংশগত অতিরিক্ত ওজনকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছিলাম। বিয়ের পর ওজন ১০ কেজি বেড়ে হয় ৮৫। ডাক্তার বললেন, বেশি মোটা হলে গর্ভধারণে সমস্যা হতে পারে। তখন আমার টনক নড়লো। মা-জীর বই দেখে ব্যায়ামের পাশাপাশি প্রতিদিন ঘণ্টা ধরে হাঁটতাম। মেশিনে সাইক্লিং করতাম। খাবারও ছিলো পরিমিত। ৮/৯ মাসে ২৫ কেজি কমলো। একই রুটিন মাসের পর মাস ধরে রেখেছিলাম। কিন্তু পরের রমজানে একটু সমস্যায় পড়লাম। রোজা রেখে সাইক্লিং বা হাঁটা কষ্টকর হতো। তখন হালকা ইফতারের পর কোয়ান্টাম ব্যায়াম অনুশীলন করতেই স্বস্তিবোধ করতাম। মাস শেষে দেখলাম আরো ১০ কেজি কমেছে। এখন চমৎকার আছি।

[ফারিয়া লারা, ছাত্রী, ২৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কাজ করছি অক্লান্ত

ফরিদা ইয়াছমিন নার্গিস



আমার ৬টি মেজর অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার তাই সতর্ক করে দিয়েছিলেন– সবসময় বিশ্রামে থাকতে হবে। ভারী কাজকর্ম মোটেই করা যাবে না।

আগে যখন দোতলা বাসায় থাকতাম তখন ছেলে-মেয়েকে স্কুলে দিয়ে এসে ৫/৬ মিনিট শুয়ে থাকতে হতো। দিনে দুবার ওঠানামা করলেই হাঁপিয়ে পড়তাম, ক্লান্তি আসতো অল্পতেই। এ সময় ব্যায়ামের কোর্স করলাম। ধীরে ধীরে এনার্জি বাড়তে লাগলো। গত ৬ মাস যাবৎ পাঁচ তলা বাসায় দিনে ৪/৫ বার সিঁড়ি বেয়ে উঠি, বাচ্চাদেরকে পড়াই, মেহমানদের আপ্যায়নসহ ঘরের সবকাজ একা করি। সংসার সামলে কোয়ান্টামের করসেবাতেও অংশগ্রহণ করি। কোনোকিছুই এখন আর আমাকে ক্লান্ত করে না।

[ফরিদা ইয়াছমিন নার্গিস, গৃহিণী, ২৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

যেন ২৫ বছরের যুবক!

এড. এম এ মজিদ



সুপ্রিম কোর্টের চারতলা অফিসে উঠতে গিয়ে আমাকে এখন আর সিঁড়ির প্রতি ধাপে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হয় না। একটানা দীর্ঘক্ষণ কাজ করে তরুণ সহকর্মীদেরও তাক লাগিয়ে দেই। লামায় দুর্গম মুরং পল্লী ভ্রমণের সময় সফরসঙ্গীদের মধ্যে একমাত্র আমি একবারের জন্যেও কোথাও বসে বিশ্রাম নিই নি।

অথচ তিন বছর আগেও আমি ছিলাম অন্য এক মানুষ। ব্যাকপেইন ছিলো ভয়াবহ। মেরুদণ্ড এমনভাবে বেঁকে গিয়েছিলো যে, স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়া তো দূরের কথা, চিৎ হয়ে শুয়েও থাকতে পারতাম না। সঙ্গে ছিলো ডায়াবেটিস। একরকম হতাশ হয়েই কোয়ান্টাম ব্যায়ামে আসা। কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম করার কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম ব্যাকপেইন আর নেই। ডায়াবেটিসও এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আগের চাইতে যে বহুগুণ ভালো আছি তার প্রমাণ হলো পরিচিত মহলে সবাই আমাকে ২৫ বছরের যুবক বলেই ভাবে!

[এডভোকেট আলহাজ এম এ মজিদ, ২১৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পাইলস থেকে মুক্তি

মো. মাসফিকুর রহমান অপু



কোনোরকম ওষুধ ছাড়াই আমার পাইলসের সমস্যা প্রায় ৮০ ভাগ নিরাময় হয়েছে কোয়ান্টাম ব্যায়াম করে। অর্ধচন্দ্রাসন ও বিপরীত করণীতে অশ্বিনীমুদ্রা– এ দুটি আসন নিয়মিত অনুশীলন করতাম। ৩ মাস প্রতিদিন সকালে খালি পেটে বিট লবণ মিশিয়ে কাঁচা ছোলা খেয়েছি। কয়েক দিনের মধ্যেই পাইলস ভালো হয়ে গেল। এখনও ব্যায়াম করছি এবং সুস্থ আছি।

[মো. মাসফিকুর রহমান অপু, চাকরিজীবী, ৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পূর্ণ নিরাময় এলো ব্যায়ামে

নিয়াজ মোহাম্মদ খান



হেমোরেজিক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিলো। একসময় সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরি। কিন্তু হঠাৎ করেই শরীর খারাপ হতে শুরু করে। গ্যাস্ট্রিক, পেটে ব্যথা, বমি হতো প্রতিদিন। দ্রুত ওজন কমছিলো। এভাবে ৬ মাস ডাক্তার দেখানো, ওষুধ খাওয়া চললো। এমনকি হোমিওপেথি কবিরাজিও বাদ দেই নি। কোনো উন্নতি নেই। তারপর শুরু করলাম কোয়ান্টাম ব্যায়াম। আল্লাহর রহমতে একমাসের মধ্যেই হারানো সুস্বাস্থ্য ফিরে পেলাম। ওষুধগুলো ফেলে দিলাম আর আমি লাভ করলাম পূর্ণ নিরাময়।

[নিয়াজ মোহাম্মদ খান, ব্যবসায়ী, ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

১২০ থেকে ৮১ কেজি

মাইদুল ইসলাম



স্টেরয়েডের মতো এলার্জির ওষুধ আমাকে মোটা করে তুলছিলো। একসময় ওজন হলো ১২০ কেজি। ডায়েট চার্ট মেনে ১৫/১৬ কেজি কমালাম। কিন্তু এরপর আর কমছিলো না। জিমের মেশিনে ব্যায়াম করলে প্রচুর খিদে পায়। এতে অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যায় বলে জিম ছেড়ে দেয়ামাত্র রাতারাতি মোটা হয়– এটা জানতাম। তাই জিমে যাই নি। আবার ১০০ কেজি ওজন নিয়ে সুইমিং করাও কঠিন। তাই শুরু করলাম কোয়ান্টাম ব্যায়াম। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে। ওজন কমালে আমাকে কেমন দেখাবে– এ ছবিই তখন চোখের সামনে ভাসতো। এখন আমার ওজন ৮১ কেজি।

[মাইদুল ইসলাম, অনার্স শেষ বর্ষ (ইংলিশ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জব স্ট্রেস দূর হলো

মনিরুল ইসলাম



আমি বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করি। এতদিন মেডিটেশনের মাধ্যমে জব স্ট্রেস দূর করার চেষ্টা করেছি। এখন যুক্ত হলো কোয়ান্টাম ব্যায়াম। ব্যায়ামের প্রায় সবগুলো আসন সহজে করতে পারলেও সবচেয়ে বেশি উপকার পাচ্ছি উজ্জীবন আর স্থিরায়ন বা গোমুখাসন করে। এছাড়া অফিসে ডেস্ক ওয়ার্কের ফাঁকে ফাঁকে নাসায়নের মাধ্যমে দমচর্চা করে একটানা অনেকক্ষণ অক্লান্ত কাজ করতে পারছি।

[মনিরুল ইসলাম, চাকরিজীবী, ১৮০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ঠান্ডা আর নেই, ওজনও বেড়েছে

ফাতেমা তুজ জোহরা



ঘন ঘন ঠান্ডা লাগার কারণে গলা বসে যেতো, কফ জমে থাকতো। ঠিকমতো কথা বলতে পারতাম না। ছিলো 'সিজন চেঞ্জ'-এর সময় জ্বর। ডাক্তার বললেন, এটা নাকি তেমন কিছু নয়। অথচ আমি ঠিকই ভুগছি। এ সময় কোয়ান্টাম ব্যায়াম শুরু করলাম। অন্যান্য আসনের পাশাপাশি নিয়মিত শশাঙ্গাসন ও স্বরায়ন অনুশীলন করতে লাগলাম। আল্লাহর রহমতে ঠান্ডা, গলা বসা বা কফের সমস্যা থেকে আমি পুরোপুরি মুক্ত। জ্বরও আর হয় না। বাড়তি পাওয়া হিসেবে ওজন বেড়ে এখন উচ্চতা অনুসারে স্বাভাবিক মাত্রায় এসেছে।

[ফাতেমা তুজ জোহরা, ছাত্রী, ১৯৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ব্যাকপেইন ভালো হয়েছে

মো. বোরহান উদ্দীন



কোমর ও মেরুদণ্ডের প্রচণ্ড ব্যথায় হাঁটাচলা থেকে শুরু করে ঘুমানো পর্যন্ত সব কাজ অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো। ডাক্তার বললেন, লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস। ওষুধের পাশাপাশি চললো একনাগাড়ে ৬ মাসের হিলিং। যখন ব্যথা একটু কমের দিকে, নিয়মিত ব্যায়াম শুরু করলাম। ফলে ৯০ ভাগ ব্যথা ভালো হয়ে গেল। এরপরে আর ডাক্তারের কাছেও যাওয়ার প্রয়োজন হয় নি। এখন একটু ব্যথা অনুভব করলেই ভুজঙ্গাসন করি, ফলে তীব্র ব্যথা আর হয় না।

[মো. বোরহান উদ্দীন, চাকরিজীবী, ১৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

টনসিলাইটিস নিয়ন্ত্রণে

মো. লোকমান হোসেন



টনসিলের সমস্যা আমার দীর্ঘদিনের। ফ্যানের বাতাস সরাসরি মাথায় লাগলে বা ঠান্ডা পানি খেলে সাথে সাথেই টনসিল ফুলে যেতো। আর একবার ফুললেই পরবর্তী ৩/৪ মাস পর্যন্ত ব্যথা থাকতো, শরীরও বেশ দুর্বল হয়ে পড়তো।

মোটরবাইক চালাতাম গলায় মাফলার জড়িয়ে। তারপরও গলায় ব্যথা হতো। এক বিশেষজ্ঞ দেখে বললেন অপারেশন করাতে। আরেকজন অপারেশন না করিয়ে যে ওষুধ দিলেন তাতেও কোনো লাভ হচ্ছিলো না। কোয়ান্টাম ব্যায়াম শুরু করার ২ সপ্তাহের মধ্যেই দেখলাম টনসিলের সমস্যা অনেকটা কমে গেছে। কখনো কখনো ফুলে উঠলে বা ব্যথা হলেও এখন খুব একটা ভোগায় না।

[মো. লোকমান হোসেন, ব্যবসায়ী, ৭৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ফিরে পেলাম হাতের শক্তি

মাহবুবা আহমেদ



প্রথমে শুরু হলো ঘাড়ে ব্যথা। ফিজিওথেরাপি দেয়ার পর যখন একটু ভালোর দিকে তখন শুরু হলো ডান হাতের গিঁটে গিঁটে ব্যথা। পর্যায়ক্রমে ব্যথা ছড়িয়ে পড়লো বাম হাতে। ডাক্তাররা ব্যথার উৎস বা কারণ ধরতে পারছেন না। এদিকে দুহাতে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারছি না। ভেজা কাপড় নিংড়ানো তো পরে, ঝাড়ুর মাথা ধরে বিছানা পর্যন্ত ঝাড় দিতে পারি নি।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের কেউ বললেন হাতের নার্ভ ছিঁড়ে গেছে, কেউ বললেন হাড় ক্ষয়, ক্যালসিয়াম খেলে ভালো হয়ে যাবে। খেলামও, কিন্তু ব্যথা কমার কোনো লক্ষণ নেই। আরেক ডাক্তার দামি পেইনকিলারের ডোজ দিয়ে শতভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বললেন যে, মাত্র দুদিনে ব্যথা সেরে যাবে।

সেরেছে কি না বুঝে ওঠার আগেই সারা শরীর অবশ হয়ে এলো। প্রচণ্ড এসিডিটি দেখা দিলো। বিছানা থেকে মেঝেতে পা পর্যন্ত ফেলতে পারছি না, সারাক্ষণ হাত-পা কাঁপছে। এ অবস্থা দেখে মেয়ে জোর করে ব্যায়ামের কোর্সে ভর্তি করে দিলো। প্রথম কয়েকদিন ব্যথার কষ্ট চেপে রেখেই আসনগুলো করে গেছি। ১৫ দিন পর থেকেই বিভিন্ন আসনের মুদ্রাগুলো আয়ত্তে চলে এলো। একমাসের মাথায় কোনো ব্যথা নেই। এরপরে আর একটি ওষুধও খেতে হয় নি। এখন দুহাতে চমৎকারভাবে সব কাজ করছি।

[মাহবুবা আহমেদ, গৃহিণী, ২৪১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টায়ন ॥ আত্মজাগরণের অনুঘটক

কোয়ান্টায়ন বা হিরন্ময় মৌনতার স্তরেই একজন মানুষ লাভ করে লালিত অভ্যাসচক্র ভাঙার অন্তর্গত শক্তি। আত্মমগ্নতার এ গভীর স্তরে তখন সে তার ভয় উদ্বেগ হতাশা কাটিয়ে লাভ করে অভূতপূর্ব প্রশান্তির উপলব্ধি। পুরনো আমি-র জায়গায় স্থান করে নেয় নতুন আলোকিত আমি। ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর আচরণ-অভ্যাস ছিন্ন করে বপন করে কল্যাণকর অভ্যাসের বীজ। এ বীজই বিকশিত হয়ে পরিণত হয় প্রাচুর্য, সাফল্য ও খ্যাতির মহীরুহে। ফাউন্ডেশনের সেন্টার/শাখা/সেল কার্যালয়ে পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে পৃথক ব্যবস্থায় কোয়ান্টায়ন অনুষ্ঠিত হয়। আপনিও এ কোয়ান্টায়নে অংশ নিয়ে পেতে পারেন হিরন্ময় মৌনতার স্বাদ। ঘটতে পারে অন্তর্গত শক্তির জাগরণ।

মনের সাথে আত্মার যোগাযোগ

জেরিন জে রহমান



চারপাশে যতকিছুই ঘটুক না কেন কোয়ান্টায়ন করলে আমি প্রশান্ত থাকি। স্রষ্টার স্মরণ সহজ হয়। এর কারণ হতে পারে– কোয়ান্টায়ন করলে মনের সাথে আত্মার যোগাযোগ হয়ে যায়। আর আত্মাই হচ্ছে প্রশান্তির সরোবর।

[জেরিন জে রহমান, স্কুল শিক্ষিকা, ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

স্রষ্টাকে অনুভব করছি

মো. আব্দুর রব



আমি দীর্ঘদিন যাবৎ কোয়ান্টায়ন করি এবং লামার কোয়ান্টায়নেও অংশগ্রহণ করেছি। কোয়ান্টায়নের ফলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান পেয়েছি। স্রষ্টাকে নব নব রূপে অনুভব করতে পারছি। মনকে নিয়ন্ত্রণ করে এখন খুব সহজে মেডিটেশনের গভীর স্তরে চলে যেতে পারি।

[মো. আব্দুর রব, ছাত্র, ২৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সবকিছুতেই যেন আনন্দ

অজয় পাল



কোয়ান্টায়নের উপকারিতা তখনই বুঝতে পারলাম যখন চারপাশের মানুষ আমাকে দেখে বলতে লাগলো এই মানুষটা এত স্থির থাকে কীভাবে? কোয়ান্টায়নে প্রার্থনা করে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছি। রাগ ক্ষোভ থেকে মুক্ত থাকছি। যে উদ্দেশ্যেই কোয়ান্টায়ন করি পরম করুণাময়ের আশীর্বাদে তা পূর্ণ হয়। মোটকথা কোয়ান্টায়ন করে সবকিছুতেই আনন্দ অনুভব করি।

[অজয় পাল, ছাত্র, ২৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নামাজে মনোযোগী হতে পারছি

মানছুরা ফেরদৌসী



অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখা ও মনকে স্থির করার পাশাপাশি কোয়ান্টায়ন সময়ের অপচয় সম্পর্কে আমাকে সচেতন করেছে। কিছুটা হলেও গীবত ও পরচর্চা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারছি। নামাজে মনোযোগী হতে পারছি।

[মানছুরা ফেরদৌসী, ডেমোনস্ট্রেটর, গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়, ২৬৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টায়নই আত্মমগ্নতার তৃপ্তি দিতে পারে

মরহুম সর্দার এম নূর-উজ-জামান



লামার কোয়ান্টাম শিশুকাননে

স্রষ্টার কাছে একজন বান্দার চাওয়াটা আর শুধু চাওয়া থাকে না, পরিণত হয় দাবিতে, যখন বান্দা আন্তরিক প্রার্থনায় মগ্ন হয়। যথাযথভাবে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমেই কেবল সে প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। কোয়ান্টায়ন এই ক্ষমা প্রার্থনার তৃপ্তিকেই পরিপূর্ণ করে বলে আমার বিশ্বাস।

[মরহুম সর্দার এম নূর-উজ-জামান ২৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। প্রতি শনিবার নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করতেন। কোয়ান্টায়নের মাধ্যমে অনেক অসম্ভব প্রাপ্তির অধিকারী হয়েছিলেন সফল এ শিল্পপতি]

পড়ালেখায় মনোযোগ বাড়ে ॥ মো. সোলায়মান হোসেন রবিন

অনেক সময় মাথায় নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। কোয়ান্টায়নে এই জট পাকানো সমস্যার সমাধান করতে পারি। পড়ালেখায় মনোযোগ বাড়ে। স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। কোয়ান্টায়ন করলে মনে হয় আমি পাপবোধ থেকে মুক্তি পাই।

[মো. সোলায়মান হোসেন রবিন, ছাত্র, ২৫৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

Superfood for the Mind

Jerome Sayre

After completing the graduate course in February, I participated in several Quantaions and most recently in an Akheri Doa session during Ramadan.

At first, sitting in Quantaion was not comfortable as my mind alternated between headaches and wandering thoughts. But every time, without fail, the day after the Quantaion I have felt a surge of energy and clarity of mind that was missing before. The day after the Akheri Doa session was the best yet and I was able to handle a hectic, high pressure work schedule and negotiation with ease the next day.

I consider such sessions as 'superfood' for the mind, improving my overall mental fitness for work and life.

[Jerome Sayre, International Development Manager, Graduate of 288th Batch of Quantum Method]

সাধারণেরা লোকজন নিয়ে কথা বলে
শিক্ষিতরা ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে
বুদ্ধিমানরা ধ্যান-ধারণা বিনিময় করে
আলোকিতরা হিরন্ময় মৌনতায় ডুবে যায়

কোয়ান্টাম হিলিং

দোয়া ও দানে কল্যাণ অফুরান



মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলাম

এড. মোহাম্মদ নাঈম উদ্দীন

নিরাময়ের আত্মিক প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম হিলিং। ধ্যানের স্তরে দোয়া রূপান্তরিত হয় সঞ্চারমান কল্যাণ শক্তিতে। যৌথ নিরাময়ে এ কল্যাণ শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। রোগ-ব্যাধি, বালা-মুসিবত দূর করে আর এর সাথে সদকা যুক্ত হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিরাময় হয় দ্রুত। বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায় বুদবুদের মতো। গত ৭ বছরে হিলিংয়ে ৫ লাখ নাম– নিরাময়ের আত্মিক প্রক্রিয়ার প্রতি সার্বজনীন আস্থারই প্রকাশ। হিলিংয়ের কয়েকটি ঘটনা–

২০০৮-এর ফেব্রুয়ারি। ১৫ দিন ধরে জ্বর ও ডায়রিয়া। দিনে ২০/২৫ বার টয়লেটে যেতে হচ্ছে। এক সপ্তাহ পর শুরু হবে আমার এডভোকেটশিপ লিখিত পরীক্ষা। গায়ে প্রচণ্ড কাঁপুনি নিয়ে ১০৪ ডিগ্রি জ্বরসহ মনের জোরে আমি পরীক্ষা দিলাম।

পরদিন থেকেই অবস্থা গুরুতর। শরীর ফুলে গেল। হাসপাতালে ভর্তি হলাম। ফুসফুসে পানি আসায় সপ্তাহখানেক কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হলো। সমস্যা কী বোঝার জন্যে ডাক্তাররা অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না দেখে আরেকটি হাসপাতালে ভর্তি হলাম। সেখানে রক্ত পরীক্ষা হলো প্রায় ৩০ বার আর আলট্রাসনোগ্রাম হলো ৪ বার। রিপোর্টে ধরা পড়লো একিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস; সাথে ইউরিনারি ইনফেকশন। ৪০ দিন ক্যাথেটার ব্যবহার করতে হলো।

এর মধ্যে কথা বলতে পারছি না, খেতে পারছি না। ২৪ ঘণ্টা স্যালাইন চলছে। স্মৃতিশক্তিও দুর্বল হয়ে গেল। হাঁটা-দাঁড়ানো তো দূরের কথা, বসতেও পারতাম না। হাসপাতালের বেড আর স্ট্রেচার ছিলো আমার সঙ্গী। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় আরেকটি হাসপাতালে যেতে হলো। সেখানে আমাকে নিয়ে মেডিকেল বোর্ড বসলো। সার্জন বললেন, এ রোগ ওষুধে ভালো হবে না আর অপারেশন করলেও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুব কম।

হিলিংয়ে নাম দেয়া হলো। কোয়ান্টায়নে জালালিতে বিশেষ দোয়া করলেন হাজার জন। অবাক ব্যাপার এরপর থেকেই অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করলো। অপারেশন লাগলো না, সেরেও উঠছি দ্রুত দেখে বিস্মিত হলেন ডাক্তাররা। ১৪ এপ্রিল– ১লা বৈশাখে বাসায় যাওয়ার অনুমতি দিলেন। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলাম। নতুন বছরে শুরু করলাম নতুন জীবন।

এখন আমি সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মতোই কাজ করছি, কোর্টে প্র্যাকটিস করছি। অসুস্থতা নিয়ে দেয়া এডভোকেটশিপ পরীক্ষায় আমি ভালোভাবেই পাশ করেছিলাম।

এ পর্যন্ত আমি ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ২০ বার কোয়ান্টাম মেথড গ্রাজুয়েশন কোর্স এবং ৪ বার রিয়েলাইজেশন কোর্স রিপিট করেছি। অংশ নিয়েছি জালালিসহ প্রতিটি কার্যক্রমে।

এ বছর জুন মাসে আমার আরেকটি বড় অপারেশন হয়। ও-টি থেকে ফিরে আমার এত প্রাণবন্ত লাগছিলো যে, মনে হচ্ছিলো এখনই দৌড়াতে পারবো। পুরো সুস্থ হলাম এক মাসেরও কম সময়ে।

কিছুদিন আগে ঘুরে এলাম লামা থেকে। একদিন টানা প্রায় ৩ ঘণ্টা আমরা এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে উঠেছি। একটুও তৃষ্ণা বা ক্ষুধাবোধ কাজ করে নি। সেদিন অনুভব করেছি এক নতুন প্রাণশক্তি। চিচিংফাঁকে পাথরের ওপর বসে মেডিটেশনে উপলব্ধি করেছি স্রষ্টার মহিমাকে আর আমার আজকের এই আমি'র পেছনে ফাউন্ডেশনের মতো সৎসঙ্ঘের হাজার মানুষের দোয়াকে।

[এডভোকেট মোহাম্মদ নাঈম উদ্দীন, ৪৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

তিনি আছেন সবার দোয়ায়



মরহুম ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবীর। হিলিং প্রেম তাঁকে পরিচিত করেছিলো হিলিং ইঞ্জিনিয়ার নামে। পরিচিত-অপরিচিত সবার জন্যেই একই দরদ নিয়ে দোয়া করতেন। সাপ্তাহিক হিলিংয়ের একটি বুধবারও বাদ দেন নি। দেশের বাইরে থাকলেও বাংলাদেশ সময় মিলিয়ে হিলিং মেডিটেশনে বসে যেতেন। প্রায়ই বলতেন, 'কোনো বুধবার যদি হিলিংয়ে না আসতে পারি তাহলে সেটাই যেন হয় পৃথিবীতে আমার শেষ দিন'। আল্লাহ তাকে কবুল করেন। ২৯ আগস্ট ২০০৭ এমনি এক বুধবারে চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্দেশ্যে বেরোন তিনি। পথে দ্রুতগামী এক ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে তিনি প্রাণ হারান। ফাউন্ডেশন সে বছর পবিত্র রমজানসহ পরবর্তী ৪০ দিনের সকল নেক কাজের সওয়াব তাঁর কল্যাণে উৎসর্গ করে।

ইটালিতে ওয়ার্ক পারমিট হলো

আনোয়ারা পারভীন



আমার স্বামী ২০০৮ সালে ইটালিতে যান। কাগজপত্রের দিক থেকে সবকিছু ঠিক থাকলেও নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ওয়ার্ক পারমিট পাচ্ছিলেন না। অথচ নিয়মানুযায়ী তা দেড় থেকে দুমাসের মধ্যে পাওয়ার কথা। মানত করলাম– ওয়ার্ক পারমিট পেলে মাটির ব্যাংকে দান করবো। সেই সাথে ৪০ দিনের হিলিং শুরু হলো। এর ঠিক ২৩ দিনের মাথায় তিনি কাজ করার অনুমোদন পেলেন।

[আনোয়ারা পারভীন, চাকরিজীবী, ২৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



হার্ট তো ৩০ বছরের যুবকের মতো

দিলোয়ারা পারভীন

হঠাৎ একদিন স্বামীর বুকে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো। হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার বড় রকমের হার্ট এটাকের সম্ভাবনা আছে বলে ইটিটি করালেন না। বরং রক্ত পরীক্ষা ও ইসিজি করাতে বললেন। তার ২২ বছরের ডায়াবেটিস থাকায় দুশ্চিন্তা আরো বেশি হচ্ছে। স্বামীকে যখন ল্যাবে নেয়া হলো, তখন ১৩ দিনের হিলিং বাবদ সদকার টাকা আলাদা করে রেখে নিজেও হিলিং শুরু করলাম। ২ ঘণ্টা পর ইটিটি করানো হলো। সব রিপোর্ট দেখে হাসতে হাসতে ডাক্তার বললেন, এ বয়সেও ওনার হার্ট ৩০ বছরের যুবকের মতো ভালো। আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত হার্টের আর কোনো সমস্যা দেখা দেয় নি, ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণে আছে।

[দিলোয়ারা পারভীন, গৃহিণী, ৬৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কেমোথেরাপির সবগুলো সাইকেল লাগে নি

মো. সাইদুল ইসলাম সন্টু



রেকটামে ক্যান্সার ধরা পড়ার পর ডাক্তার অপারেশন করে কেমোথেরাপি নেয়ার কথা বললেন। মনে পড়লো পরিচিতজনদের, যারা মারা গেছেন কেমোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়। একসময় বিশ্বাস এলো যে, দাওয়া দোয়া ও দানের মাধ্যমে সুস্থ হতে পারবো। ৫ মাসের ব্যবধানে দুটো অপারেশন হলো। মেডিটেশন, কোয়ান্টাম হিলিংয়ে দোয়াও নিয়মিত চলছিলো। কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই ৬টির মধ্যে কেমোথেরাপির ৪টি সাইকেল সম্পন্ন করলাম। এ সময় বমি, খাওয়ায় অরুচিসহ কিছুই আমার হলো না। বরং আমার হিমোগ্লোবিন বাড়লো। প্লাটিলেট স্বাভাবিক ছিলো। ওজনও বেড়েছিলো। ফলে বাকি ২টি সাইকেল না হতেই ডাক্তার বললেন, আমি ক্যান্সারমুক্ত।

[মো. সাইদুল ইসলাম সন্টু, চাকরিজীবী ও ক্রীড়া সংগঠক, রাজশাহী, ২৫৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কন্যার বাবা হলাম

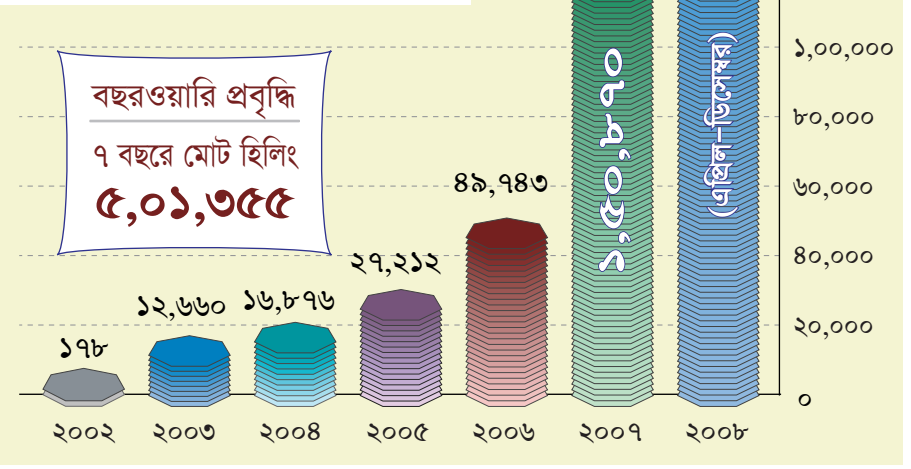
সারওয়ার মোর্শেদ সুজন



সবসময় চাইতাম প্রথম সন্তানটি যেন মেয়ে হয়। তবে পুত্রসন্তান হলে যে অসন্তুষ্ট হতাম তা নয়। আমার সহধর্মিণী প্রায়ই বলতেন, মনে হচ্ছে ছেলে হবে। তার এ কথা শুনে নীরব থাকতাম। কন্যাসন্তান কামনা করে এক বছরের জন্যে হিলিংয়ে নাম দিলাম। মাটির ব্যাংক তো ছিলোই। একবারও আলট্রাসনোগ্রাম করে জানার চেষ্টা করি নি যে, শিশুটি মেয়ে না ছেলে। যথাসময়ে সে পৃথিবীতে এলো। নার্স এসে জানালেন আমি কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছি।

[সারওয়ার মোর্শেদ সুজন, চাকরিজীবী, ৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টাম হিলিং



বিশ্বাসে নিরাময়

মো. হামিদুর রহমান



মায়ের ডায়াবেটিসের সমস্যা ছিলো আগে থেকেই। সেবার সারা শরীরে ব্যথা হওয়ায় ডায়াবেটিক সেন্টারে গিয়ে চিকিৎসা নিয়ে এলেন তিনি। কয়েকদিন পর ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় মায়ের সারা শরীরে বসন্ত রোগীর মতো গুটি দেখা দিলো। এবার শরণাপন্ন হলাম চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের। তিনি জানালেন, মায়ের যে রোগ হয়েছে তাতে শরীরের মাংস পচে যাবে, যার নিশ্চিত পরিণতি মৃত্যু। এ কথা শুনে মা মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন। বাসায় ফিরে আমি হিলিং শুরু করলাম এবং মায়ের সুস্থতা কামনা করে হিলিংয়ে নাম দিলাম। ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের পরামর্শে আপাতত ওষুধও বন্ধ রাখলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই মায়ের শরীর থেকে গুটির পরিমাণ কমতে শুরু করলো। মা এখন ভালো আছেন।

[মো. হামিদুর রহমান, চাকরিজীবী, ২৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নাতনি এখন তৃপ্তি নিয়ে খায়

শাহীন আক্তার শেলী



আমার ৬ বছরের নাতনিকে প্রতিবেলায় খাবার খাওয়ানো ছিলো ছোটখাটো একটা যুদ্ধের মতো! একেক বেলার খাবার ওকে খাওয়াতে লাগতো ৪ থেকে সাড়ে ৪ ঘণ্টা। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্যি যে, ঢাকা থেকে এক লোকমা মুখে দিয়ে সে গাড়িতে উঠেছে, যখন সিলেটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখন সেই খাবার ওর ঠোঁট বেয়ে গলে গলে পড়ছে। কারণ খাবার মুখে নিয়েই সে বসে থাকতো, গিলতো না। একেকদিন বিরক্ত হয়ে আর খেতেই দেই নি, ভেবেছি একসময় খিদে লাগলে ঠিকই খাবে। কিন্তু তাতেও লাভ হয় নি। ক্ষুধায় হয়তো কাহিল হয়ে গেছে, অথচ মুখে খাবার দেয়া মাত্র ঐ একই টালবাহানা। ডাক্তারের পরামর্শে রুচিবৃদ্ধির ওষুধ খাওয়ানোর পরও কোনো উন্নতি হয় নি। সবাই যখন ওর এ অভ্যাস নিয়ে উদ্বিগ্ন তখন ৪০ দিনের জন্যে হিলিংয়ে নাম দেই। কয়েকদিনের মধ্যে দেখি নাতনি আমার বিভিন্ন খাবারের জন্যে আবদার করছে। এখন খাওয়া নিয়ে ওকে আর জোরাজুরি করতে হয় না। ওজন বেড়েছে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হচ্ছে।

[শাহীন আক্তার শেলী, গৃহিণী, ১৩৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কারখানায় কাজ চলছে শান্তিপূর্ণভাবে

সাবিনা রহিম



ত্রিশ বছরের পুরনো রেডিমেড গার্মেন্টসের ব্যবসা আমাদের। এতদিন চমৎকার মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক ছিলো। কিন্তু সম্প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু কারণে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছিলো। মিছিল-মিটিং করে কাজ বন্ধ রাখা ছাড়াও মালিকপক্ষকে হুমকি দিতেও এতদিনের পুরনো শ্রমিকরা কোনো দ্বিধা করে নি। এতে কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হতে থাকে। প্রশাসনিকভাবে কোনো সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না, কী করবেন তা-ও আমার স্বামী বুঝে উঠতে পারছেন না। আর কোনো উপায় না দেখে আমি হিলিংয়ে নাম দিলাম। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা এর সুফল পেতে শুরু করি। শ্রমিকদের মধ্য থেকেই একটি দল উদ্যোগী হয়ে বাকিদের শান্ত করে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এলো। এখন কারখানায় কাজ চলছে পুরোদমে।

[সাবিনা রহিম, শিল্পপতি, ২৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আইসিইউ থেকে ফিরেছেন

হুমায়ুন মামুন



হার্ট এটাক হওয়ায় খালুকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে– এ খবর পেয়েই রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী বাসে উঠলাম। ইতোমধ্যে খালুকে আইসিইউ-তে নেয়া হয়েছে। ডাক্তার-নার্সদের মুখ শুকনো। বিকেলের দিকে অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে সবাই বললো এখন শুধু দোয়া করতে থাকেন। পরদিন কোয়ান্টায়নে জালালি। আর কোনোদিকে না তাকিয়ে রওনা দিলাম ফাউন্ডেশন অফিসের দিকে। জালালি হিলিংয়ে নাম দিয়ে বেরুচ্ছি, এমন সময় ফোন। ভয়ে ভয়ে রিসিভ করলাম। অপরপ্রান্ত থেকে মামা জানালেন, খালুর অবস্থা এখন ভালোর দিকে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। শুকরিয়া আদায় করলাম। সপ্তাহখানেক পর্যবেক্ষণে রাখার পর আশঙ্কামুক্ত হওয়ায় ডাক্তাররা তাকে বাসায় নিয়ে যেতে বললেন। এখন ষাটোর্ধ্ব বয়সী খালুকে সুস্থ শরীরে দেখে সেদিনের কথা ভেবে অবাক হই।

[হুমায়ুন মামুন, ব্যবসায়ী, ২৭১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আয়ু বড়জোর এক বছর

জোবাইর মো. আল ফারুক



২০০৫ সালে ফুপুর জন্ডিস ধরা পড়লো। ডাক্তার-ওষুধ-টেস্ট কোনোটাই বাদ যায় নি। সর্বশেষ যে ডাক্তারকে দেখানো হলো তিনি সরাসরি বলেই দিলেন যে, রোগী আর বড়জোর এক বছর বাঁচবে। মৃত্যুর আগেই স্বজনদের মাঝে মৃত্যুশোক শুরু হলো। কিন্তু আমি একথা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। ফুপুকে বললাম আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখতে। নিজের জন্যে না হলেও সন্তানদের জন্যে তাকে বাঁচতে হবে। এ কথায় কেন যেন ফুপুও ভালো হয়ে ওঠার তাগিদ অনুভব করলেন। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখতে পেলাম। ফুপুর সুস্থতা কামনা করে কয়েক সপ্তাহের জন্যে হিলিংয়ে নাম দিলাম। পরম করুণাময় শুনেছিলেন সে প্রার্থনা। তাই হয়তো ফুপু পাঁচ বছর ধরে যোগ্য গৃহকর্ত্রীর মতোই দিব্যি সংসারের হাল ধরে রেখেছেন।

[জোবাইর মো. আল ফারুক, অনার্স (ইংলিশ), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। ২৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মেয়ের কোল আলো করে এলো সন্তান

ফখরুজ্জাহান



মেয়ের বিয়ে হয়েছে ৬ বছর। সন্তান হচ্ছে না দেখে গাইনোকলজিস্ট-এর শরণাপন্ন হলাম। সব দেখে তিনি বললেন, সমস্যা আছে। চিকিৎসা চলবে, তবে ফল পাবেন কি না তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। অবশেষে মেয়ে কনসিভ করলো। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে গর্ভেই বাচ্চা মারা গেল। দ্বিতীয়বারও একই ঘটনা। ততদিনে আমি কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কোর্স সম্পন্ন করেছি। প্রতিদিন মেয়েকে বিশেষভাবে হিলিং করার পাশাপাশি সদকা হিলিংয়ে নাম দিলাম। প্রথমে টানা ১ মাস, তারপর ৬ মাস চললো সাপ্তাহিক হিলিং। তৃতীয় বারের মতো মেয়ে সন্তানসম্ভবা হলো। এবার টানা এক বছর হিলিং হলো। যথাসময়ে মেয়ের কোল আলো করে এলো এক সুস্থ সুন্দর পুত্রসন্তান।

[ফখরুজ্জাহান, গৃহিণী, ২২৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অন্যের সাফল্য ও নিরাময় কামনা আপনার সুস্থতা ও সাফল্য বাড়িয়ে দেবে।

৫ মিনিটেই ব্যথা কমে গেল

আবদুল্লাহ ইউসুফ রাজু



তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও সাফল্যের সঙ্গে একে একে ধাপগুলো পেরিয়ে আমি এখন আমেরিকার একটি মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। থার্ড ইয়ারে যখন পড়ি তখন আমাদের হাসপাতালে এক রোগিণী এলেন মাইগ্রেনের প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে। নিয়মিত মরফিন নিয়েও কোনো লাভ হচ্ছিলো না। ইতোমধ্যে দুজন ডাক্তার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। শেষে আমাকে পাঠানো হলো। আমি গিয়েই তার কপালের দুপাশে হাত রেখে বললাম, `Close your eyes. Take a deep breath and each time you breath out, think all the pain is going out.' এসময়ে আমিও মেডিটেশনে মহিলাকে হিলিং করলাম। ৫ মিনিট পরেই ব্যথার তীব্রতা অনেক কমে গেল। তাকে এ মনছবিই চালিয়ে যেতে বলে আমি বাতি নিভিয়ে বেরিয়ে এলাম। ২০ মিনিট পরে দেখি নার্সের সাথে হাসতে হাসতে তিনি বেরিয়ে এসেছেন বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে।

[আবদুল্লাহ ইউসুফ রাজু, নিউইয়র্ক কলেজ অফ অস্টিওপেথিক মেডিসিনের ছাত্র, ১৪৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ব্যথা হলে আর দড়ি দিয়ে মাথা বেঁধে রাখতে হয় না

জুবায়দা আখতার



আমার মায়ের এত প্রচণ্ড মাথাব্যথা ছিলো যে সহ্য করতে না পেরে দড়ি দিয়ে মাথা বেঁধে রাখতেন। একবার ব্যথা উঠলে তাকে দেখতাম টানা ছয় মাস পর্যন্ত দড়ি বেঁধে রাখতে। বিশেষ করে শীতকালে ব্যথা যখন বেশি হতো তখন আগে দড়ি বেঁধে তারপর তিনি মাফলার-টুপি পরতেন। স্বাভাবিকভাবেই মায়ের জন্যে তো বরাবরই হিলিং করে এসেছি; এদিকে এক বছরের জন্যে সদকা হিলিংয়েও নাম দিয়ে দিলাম। আল্লাহর রহমতে ৩/৪ মাসের মধ্যেই মায়ের মাথাব্যথা একদম নেই। আজ দুবছর হয়ে গেল, মা এখন সুস্থ আছেন।

[জুবায়দা আখতার, স্কুল শিক্ষিকা, ১৮৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিয়মিত অসুস্থ বন্ধু ও আত্মীয়দের খোঁজখবর নিন। তাদের রোগমুক্তির জন্যে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুন

কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমছে

ডা. সাবরিনা ইয়াসমিন



কোর্সের পরদিন আলোকায়নে এসে কোয়ান্টাম হিলিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম। তখনই মনে পড়লো ওভারির ক্যান্সারে আক্রান্ত খালার কথা। গত ৭ মাস ধরে তিনি এ রোগে ভুগছেন। খাবারে অরুচি, বমি, পেট ফুলে প্রচণ্ড ব্যথাসহ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞের কাছে গেলে তিনি বলেন, অবস্থা এতটাই খারাপ যে, অপারেশন করা যাবে না। একমাত্র চিকিৎসা কেমোথেরাপি। শুরু হলো কেমোথেরাপির একেকটি সাইকেল– ২১ দিন পর পর। প্রতি সাইকেলে ইনজেকশন ৩টি করে। একেকটির দাম ২৪ হাজার টাকা। চিকিৎসা ব্যয়বহুল। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও ভয়াবহ। প্রতিবার কেমো নেয়ার পর খালার শরীর নিস্তেজ হয়ে যেতো। সাথে প্রচণ্ড বমি আর পাতলা পায়খানা। এভাবে চললো ৪টি সাইকেল।

খালার জন্যে হিলিংয়ে নাম দিলাম। এর ৩ দিন পর কেমো-র ৫ম সাইকেল দেয়া হলো। সেদিন রাতে গিয়ে দেখি খালা বিছানায় বসে সবার সাথে গল্প করছেন। তার মুখে হাসি। আমাকে দেখে বললেন, আমি অনেক ভালো আছি। খেতে পারছি, ঘুম হচ্ছে, পেটের ফোলা ভাবও কমে গেছে। হিলিংয়ের এ কার্যকারিতা দেখে আমি তখন অভিভূত। খালার ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলো এখন অন্য কোথাও ছড়াতে পারছে না বরং ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসছে।

[ডা. সাবরিনা ইয়াসমিন, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দ্রুত কাজের অর্ডার পেলাম

বিদ্যুৎ রায়



আমি কাকার সাথে প্রিন্টিংয়ের ব্যবসায় কাজ করি। শপিং ব্যাগ, ভিজিটিং কার্ড প্রভৃতি প্রিন্ট করে থাকি। একবার নতুন অর্ডারের খোঁজে এক বন্ধুর দোকানে গেলাম। সে আমাকে কিছু ব্যাগ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো আমরা তা সরবরাহ করতে পারবো কি না। আমি নমুনা ব্যাগগুলো নিয়ে ফাউন্ডেশনে এসে জালালি হিলিংয়ে নাম দিলাম। পরদিনই আমরা ঐ কাজটি পেয়েছিলাম।

[বিদ্যুৎ রায়, ১৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

চোখের অপারেশন করাতে হয় নি

ইব্রাহীম খলিল



দেড় বছর ধরে চোখের সমস্যায় ভুগছিলাম। ডান চোখের নেত্রনালীর ছিদ্র প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। চক্ষু বিশেষজ্ঞ বললেন, একমাত্র সমাধান অপারেশন। কিন্তু এতে মন সায় দিচ্ছিলো না। কারণ ডাক্তারের মতে, অপারেশনে ভালো হতে পারে, আবার না-ও পারে। আমার বিশ্বাস ছিলো যে, অপারেশন ছাড়াই নেত্রনালীর ছিদ্র খুলে যাবে। প্রতিমাসে জালালি হিলিংয়ে নাম দিতাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমার চোখ এখন সম্পূর্ণ ভালো।

[ইব্রাহীম খলিল, ব্যবসায়ী, ১৩৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বোন রোগমুক্ত হলো

নিরুপম সিংহ



বাড়ি থেকে খবর এলো বোনের মেডিকেল রিপোর্টে যক্ষা ধরা পড়েছে। ডাক্তারের পরামর্শমতো চিকিৎসা চলছিলো। কিন্তু তারপরও বোনের স্বাস্থ্য দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। কর্মসূত্রে দূরে থাকায় প্রার্থনা করা ছাড়া আমার কিছু করার ছিলো না। ফাউন্ডেশন অফিসে এসে হিলিংয়ে নাম দিলাম। দাওয়া ও দোয়ার বরকতে আমার বোন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলো।

[নিরুপম সিংহ, সহকারী প্রকৌশলী, চিটাগং ড্রাইডক লিমিটেড, ২৪৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আব্বা আবারও সাইকেলে চড়েন ॥ নিলুফা ইয়াসমিন



একটা দুর্ঘটনায় আব্বার পা ভেঙে গিয়েছিলো। অপারেশনের সময় ডাক্তাররা বললেন, এ বয়সে ভাঙা হাড় সহজে জোড়া লাগে না। আর লাগলেও চলাফেরায় আগের মতো সাচ্ছন্দ্য কখনো আসবে না। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম– আব্বা কি তাহলে পঙ্গু হয়ে গেলেন? হিলিংয়ে নাম দিলাম। ধীরে ধীরে আব্বা সুস্থ হয়ে উঠলেন। ৬ মাসের মাথায় চলাফেরা শুরু করলেন। ৭ মাসের মাথায় সাইকেল চালাতে লাগলেন। এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষ।

[নিলুফা ইয়াসমীন, ছাত্রী, ২৫৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দাতার বহুমুখী কল্যাণে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক

মাটির ক্ষুদ্র পাত্র এখন পরিণত হয়েছে কল্যাণ ভাণ্ডারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান একত্রিত হয়ে বঞ্চিত জনপদে নির্মিত হচ্ছে আলোকিত জীবন। মাটির ব্যাংকে ক্ষুদ্র দান ও মানত কারো জীবনে নিয়ে আসছে প্রাচুর্য, কেউ মুক্ত হচ্ছেন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে, কারো দূর হচ্ছে বালা-মুসিবত। দানের প্রতিদানে স্রষ্টার রহমতে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হওয়ায় গড়ে প্রতিদিন মাটির ব্যাংক থেকে সংগ্রহের পরিমাণ লাখ টাকার ওপরে। মাটির ব্যাংকে দান বা মানতের বাস্তব প্রাপ্তির হাজার হাজার ঘটনার মাত্র কয়েকটি–

নাফিসার হৃৎপিণ্ডের ত্রুটি দূর হয়ে গেল

এড. দিলসেতারা চুনি



আমাদের ছোট মেয়ে নাফিসা তাবাসসুম। জন্মের একমাস পর ডাক্তার জানালেন ওর হার্টে সমস্যা আছে। স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে না। ফলে মাঝেমাঝেই শরীর নীলবর্ণ হয়ে যায়। দ্রুত ঢাকায় এনে শিশু বিশেষজ্ঞকে দেখালাম। পরীক্ষায় দেখা গেল হার্টে দুটি ছিদ্র। এসব ক্ষেত্রে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মূলত ওষুধ খাওয়ানো হয়। বয়স এক বছরের বেশি হলে তারপর ডাক্তাররা ওপেন হার্ট সার্জারি করার কথা ভাবেন। নাফিসারও ওষুধ চলছিলো।

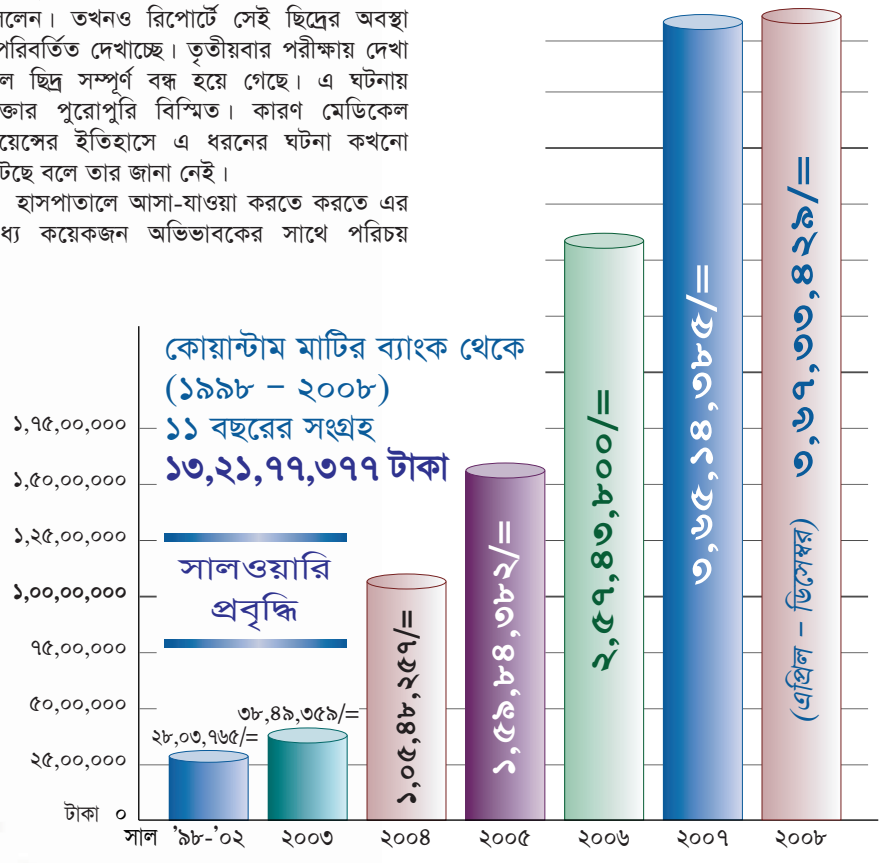
সেসময় প্রতিটি মুহূর্তে আমরা আল্লাহর কাছে শুধু ওর সুস্থতা চাইতাম। এক বছরের জন্যে হিলিংয়ে নাম দিলাম। সারাদেশে ফাউন্ডেশনের সেন্টার-শাখা-সেলে মেয়ের জন্যে দোয়া হতে থাকলো। মানতও করলাম, যদি সার্জারি করাতে না হয়, তাহলে সার্জারির খরচের একটি অংশ মাটির ব্যাংকে দান করবো।

২ মাস পরে ডাক্তারের কাছে গেলাম। পরীক্ষায় দেখা গেল, হার্টের একটি ছিদ্র ছোট হয়ে আসছে। ডাক্তার ৩ মাস পর আবার যেতে বললেন। তখনও রিপোর্টে সেই ছিদ্রের অবস্থা অপরিবর্তিত দেখাচ্ছে। তৃতীয়বার পরীক্ষায় দেখা গেল ছিদ্র সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। এ ঘটনায় ডাক্তার পুরোপুরি বিস্মিত। কারণ মেডিকেল সায়েন্সের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা কখনো ঘটেছে বলে তার জানা নেই।

হাসপাতালে আসা-যাওয়া করতে করতে এর মধ্যে কয়েকজন অভিভাবকের সাথে পরিচয় হয়েছে। বিদেশে বাচ্চার ওপেন হার্ট সার্জারি করানোর পর তারা এখানে ৩ মাস পর পর ফলো-আপ করান। কৌতূহলবশত একদিন তাদের মেডিকেল রিপোর্টের সাথে আমাদের প্রাথমিক রিপোর্ট মিলিয়ে দেখলাম। হার্টের ছবি হুবহু এক! তফাত শুধু আমাদের মেয়েকে এখনও ওপেন হার্ট সার্জারি করানোর প্রয়োজন হয় নি।

এর ঠিক ৩ মাস পর শেষবারের মতো চেক-আপে রিপোর্ট এলো, হার্টের দুটো ছিদ্রই সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাণভরে শুকরিয়া আদায় করলাম। সাথে সাথে মানতের টাকাও মাটির ব্যাংকে দিয়ে দিলাম। নাফিসার বয়স এখন দুই বছর চার মাস চলছে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ– সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুর মতোই প্রাণবন্ত।

[এডভোকেট দিলসেতারা চুনি, ৫৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সমাধান হলো

মোহাম্মদ মতিউর রহমান



অনেক চেষ্টা-তদবির করেও স্ত্রীর চাকরির বদলি ঠেকানো গেল না। যেতেই হলো ঢাকার বাইরে এক কলেজে। শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা থাকায় তাকে ৩ মাস পর পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়। স্ত্রীকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় কর্মকর্তাদের যাকে পাচ্ছি তাকেই অনুরোধ করছি। এক রাতে মেডিটেশনে বসে হঠাৎ অনুশোচনাবোধ কাজ করলো। যিনি সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন তার সাহায্য না চেয়ে আমি কি না মানুষের দ্বারে দ্বারে ধরনা দিচ্ছি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করলাম। মাটির ব্যাংকেও দান করার মানত করলাম।

পরদিন স্ত্রী ফোনে জানালেন যে, তার স্যার বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যখন বদলির নির্দেশটি হাতে পেলাম, আরো বিস্মিত হলাম। শুধু বদলি নয়, ঢাকার সবচেয়ে সেরা কলেজে বদলি। এ-ও কি সম্ভব!

[মোহাম্মদ মতিউর রহমান, ব্যাংকার, ১৬৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলাম

সাবিকুন নাহার



কোরবানির ঈদে গোপালগঞ্জ যাচ্ছিলাম প্রাইভেট কারে। বুড়িগঙ্গা সেতু পার হওয়ার পর চালক হঠাৎ বেপরোয়া গাড়ি চালাতে লাগলো। কোয়ান্টা ভঙ্গি করে তখন শুধু আল্লাহর নাম নিচ্ছি। এরপরে আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখলাম হাসপাতালে নেয়ার জন্যে আমাকে সিএনজিতে ওঠানো হচ্ছে। স্বামী ভালো আছেন। আমার শুধু ঠোঁট ও গলায় একটু কেটে গেছে কিন্তু ব্যথার অনুভূতি হয় নি। অথচ গাড়ির সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। তার চেয়েও বেশি কিছু হতে পারতো যদি গাড়ি ইটের স্তূপে ধাক্কা খেয়ে থেমে না যেতো। কারণ আর মাত্র আধহাত এগুলেই গভীর খাদ। সবসময়ের মতো সেদিনও মাটির ব্যাংকে দান করে রওনা করেছিলাম বলেই হয়তো আল্লাহর রহমতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলাম।

[সাবিকুন নাহার, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ২৫৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সলিসিটর ফি ফিরিয়ে দিলেন

শাহ আহমদ সাদিক



গত বছর লন্ডনে আমার একটি মামলা চালানোর জন্যে একজন সলিসিটর নিয়োগ করি যার ফি ছিলো কয়েক হাজার পাউন্ড। কেসটি শেষ হওয়ার আগেই তিনি তার ফি-র পুরোটাই নিয়ে নেন এবং বলেন যে, কেস জটিল আকার ধারণ করলে তার ফি আরও বাড়তে পারে।

আমার কেসটি কিছুটা জটিল ছিলো। যদি ফি বেড়ে যায় তাহলে কী করবো? অন্যের কাছ থেকে ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব এই কেসের সাফল্যের জন্যে এবং সলিসিটর-এর ফি আমার সাধ্যের মধ্যে রাখার জন্যে মাটির ব্যাংকে মানত করলাম, জালালি দোয়ায় নাম দিলাম। কিছুদিন পর তিনি একটি চিঠিতে জানালেন, কেসটি জটিলতা ছাড়াই নিষ্পত্তি হয়েছে। চিঠির সাথে একটি ভালো অঙ্কের চেক পাঠিয়েছেন সলিসিটর ফি-এর রিফান্ড হিসেবে!

[শাহ আহমদ সাদিক, লন্ডনে আইটি সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে কর্মরত, ১২৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দূরদেশেও কাজ করে

আশা রানী দেবী



কানাডা প্রবাসী বড় মেয়ে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বমি, ডায়রিয়া। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হলো। ডাক্তাররা বাড়ি নিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু শরীর খুব দুর্বল, বালিশ থেকে মাথা পর্যন্ত তুলতে পারছে না। সেদিন মেয়ে জামাইয়ের পিএইচডি বিষয়ক একটি কনফারেন্সে বক্তব্য দেয়ার কথা। আমাকে ফোন করে বললো হিলিংয়ে নাম দিতে। অপরপ্রান্তে শুনছি, ৫ বছর বয়সী নাতিও বলছে, তার পেটে ব্যথা। বাসায় আর কেউ নেই। দূরে থাকায় মা হয়েও আমি কিছু করতে পারছি না প্রার্থনা করা ছাড়া। সাথে সাথে মাটির ব্যাংকে মানত করে হিলিংয়ে নাম দিলাম। রাতে জামাই আবার ফোন করে বললো, সকালে আমার সাথে কথা বলার ১০/১৫ মিনিট পরেই মেয়ে নাকি শোয়া থেকে উঠে বসেছে। নাতিও আর পেটে ব্যথার কথা বলে নি। তাদেরকে কিছুটা সুস্থ হতে দেখে সে-ও কনফারেন্সে যোগ দিয়েছে।

[শ্রীমতী আশা রানী দেবী রাজশাহী প্যারামাউন্ট স্কুলের শিক্ষিকা, ১৮৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রতিমাসে একটা করে দেবেন



অধ্যাপিকা হাসিনা ফেরদৌস বানু

আমি একটা মাটির ব্যাংক দিয়েছিলাম ঢাকার এক বড় শপিং কমপ্লেক্সের একটা দোকানে। কয়েকমাস পর আনতে যখন গেলাম দেখা হলো মালিকের সঙ্গে। তিনি বললেন, ইসলামপুরের যে পাইকারের কাছ থেকে তিনি মাল আনেন সেখানেও দেখেছেন মাটির ব্যাংক। ঐ ব্যবসায়ীর কাছে শুনেছেন এতে টাকা রেখে তার অনেক কল্যাণ হচ্ছে। আমি আশ্বস্ত হলাম– যাক! মাটির ব্যাংকের গুরুত্ব উনি কিছুটা হলেও বুঝেছেন। কিন্তু ব্যাংকটা ফেরত আনতে কয়েকবার গিয়েও তার সাথে দেখা হলো না। শেষবার যখন আনতে গেলাম তখন রমজান।

ঈদের বাজারের ভিড় বা যেকোনো কারণেই হোক সেলসম্যান খুব বিরক্ত হয়ে কোনো কথাই বলতে চাইলো না। বললো, 'আপনি এখন যান'। খুব কষ্ট পেলাম। ঠিক করলাম– এরপর থেকে কেনাকাটার জন্যে ঐ দোকানে গেলেও মাটির ব্যাংক নিয়ে কিছু বলবো না। ইতোমধ্যে তার দোকান ৩ গুণ বড় হয়েছে। কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে। সেলস আইটেমে এসেছে বৈচিত্র।

এবারের রমজানে আমাকে দেখে এক কর্মচারী নিজে থেকেই বললো, 'ম্যাডাম আপনি না আমাদেরকে মাটির ব্যাংক দিয়েছিলেন? আর দেন না কেন? আমরা তো সবাই এতে টাকা রাখি। আমাদেরকে প্রতিমাসে একটা করে দেবেন।' এর মধ্যে মালিক এসে উপস্থিত। একজন এসোসিয়েটকে বোঝাবার ভঙ্গিতে আমি যখন তার সাথে কথা বলছিলাম, হাসিমুখে সবটা শুনে তিনি বললেন, ম্যাডাম, গতমাসে ৩০০ ব্যাচে পরিচিত ১৪ জনকে নিয়ে এ কোর্সটা করেছি!

[অধ্যাপিকা হাসিনা ফেরদৌস বানু, ১১২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পছন্দসই বাসা পেলাম

সুভাষ চন্দ্র দত্ত



তখন আমার দুই ছেলেকে স্কুলে আনা-নেয়া করতে হতো। দূরে বাসা হওয়ায় অফিস টাইমের সাথে মিলিয়ে এ যাওয়া-আসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। মাটির ব্যাংকে মানত করে নতুন বাসা খুঁজছি। মনমতো বাসা নিয়ে মনছবিও দেখছি। কিছুদিন পর স্কুল থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে একটি বাসা পেয়ে গেলাম। যে রকম চেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক ভালো এবং ভাড়াও গ্রহণযোগ্য।

[সুভাষ চন্দ্র দত্ত, চাকরিজীবী, ৬৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রোগহীন রোগী ছিলাম

আবদুল মান্নান সরকার



গ্রাজুয়েট স্ত্রী ও ছোট মেয়ের সঙ্গে

একদিন সকালে হঠাৎ করেই বুকের ডানপাশে ব্যথা অনুভব করলাম। পাত্তা দেই নি তখন। কিন্তু বিকেল নাগাদ ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় ঘাবড়ে গেলাম। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বললেন, বিলিরুবিনের মাত্রা খুব বেশি এবং খারাপ ধরনের জন্ডিস হতে পারে। পরদিন ঢাকার একটি হাসপাতালে কয়েকটি টেস্ট করালাম। কিন্তু রিপোর্টে কিছু বোঝা গেল না। আরো দুবার অন্য হাসপাতালে একই টেস্ট করা হলো। এরপর ডাক্তাররাই বললেন হাসপাতালে ভর্তি হতে। টানা ১৫ দিন থাকলাম, অথচ রোগ নির্ণয় করা গেল না। ১৬ তম দিনে পরীক্ষায় লিভারের নিচে একটা ঝাপসা কিছু দেখা গেল। সিটিস্ক্যানে বোঝা গেল টিউমার। অপারেশন করাতেই হবে। তা না হলে ক্যান্সার হতে পারে।

এদিকে আমার অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। শক্ত খাবার খেতে পারি না। সারাক্ষণ স্যালাইন চলে। ব্যথা হচ্ছিলো প্রচণ্ড। ডাক্তারদের ওপরও ভরসা হারিয়ে ফেলছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম যে, হাসপাতাল থেকে আর বেঁচে ফিরবো না। তাই অপারেশনের আগের দিন বাসায় চলে এলাম। দুবেলা নিরাময়ের মেডিটেশন শুরু করলাম। ৭ দিনের মাথায় ব্যথা অনেক কমে গেল। ২০ দিন পর মনেই হয় নি কখনো আমার ব্যথা হয়েছিলো। শুকরিয়া আদায় করে অপারেশন খরচের কিছু টাকা মাটির ব্যাংকে দান করলাম। গত ৪ বছরে পরম করুণাময়ের রহমতে আর একবারও সে ব্যথা হয় নি।

[আবদুল মান্নান সরকার, প্রিন্সিপাল, মেহের নিগার স্কুল এন্ড কলেজ, ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

চুক্তি আমাদের পক্ষে

মোস্তফা শাকের



খামার করার জন্যে ১৫ শতক জায়গা লিজ নিতে গেলে মালিকপক্ষের সাথে চুক্তি নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়। কারণ তাদের অযৌক্তিক শর্ত মেনে নেয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অথচ জায়গাটাও আমরা হাতছাড়া করতে চাচ্ছিলাম না। মাটির ব্যাংকে মানত করলাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘটে উল্টো ঘটনা– যে শর্ত থেকে তারা একচুলও নড়তে নারাজ ছিলেন, তা ছাড়াই তারা আমাদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করলেন।

[মোস্তফা শাকের, ছাত্র, ১৮১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

হারানো ব্যাগ ফিরে পেলাম

সাবরিনা ফয়েজ শর্মী



গত বছর রোজার ঈদের পরদিন রিকশায় ফিরছি। হঠাৎ দেখি, হাতব্যাগটি নেই। আমার তো তখন দিশেহারা অবস্থা। ব্যাগটিতে বেশ কিছু টাকা ছাড়াও আমার ও বন্ধুর মোবাইল ফোন ছিলো। চালককে রিকশা ঘোরাতে বলে যে পথে এসেছি সে পথ ধরে খুঁজতে খুঁজতে এগুচ্ছি। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। মাটির ব্যাংকে টাকা রাখার মানত করে মনে মনে ৩ বার কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করলাম। দুঃসংবাদটা আরেক বন্ধুকে জানাতে তাকে ফোন করলাম এক দোকান থেকে। আমাকে অবাক করে দিয়ে সে বললো, তোমার ব্যাগ নাকি হারিয়েছে?

আসল ঘটনাটি ছিলো, রাস্তা থেকে ব্যাগটি পেয়ে এক ভদ্রলোক মোবাইলের কল-লিস্ট থেকে শেষ নাম্বারে ফোন করে আমার সেই বন্ধুকে জানান। সাথে সাথে তার দেয়া ঠিকানায় গিয়ে দেখি ব্যাগটি ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টাকা ও মোবাইলসহ আমার ব্যাগটি নিয়ে এলাম।

[সাবরিনা ফয়েজ শর্মী, ২৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সন্তান হলো স্বাভাবিকভাবে

সান্‌জীদা খাতুন



২০০৭ সালে আমার দ্বিতীয় সন্তান জন্মের সময় জটিলতা দেখা দেয়। অপারেশনের জন্যে সবাই প্রস্তুত। আমার স্বামী মাটির ব্যাংকে কিছু টাকা মানত করলেন। হঠাৎ একজন নার্স অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে আমাকে দেখে বললেন, নরমাল ডেলিভারি হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আমার একটি ফুটফুটে সন্তান হলো।

আর্থিক সংকটের কারণে স্বামীর একার পক্ষে সব খরচ বহন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বাচ্চাকে রেখে কাজে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুজনেই মাটির ব্যাংকে কিছু টাকা দান করলাম। হঠাৎ একটা কোম্পানি থেকে কাজের প্রস্তাব এলো যেখানে বাচ্চাকে সাথে করে নিয়ে যাওয়ার ও দেখাশোনার ব্যবস্থা আছে।

[ইংল্যান্ড প্রবাসী সান্‌জীদা খাতুন, ১৭২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ব্যবসায়িক পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে গেল

মো. আব্দুর রশীদ



প্রতিদিন অফিসে প্রবেশ করেই আমি মাটির ব্যাংকে ৫০/১০০ টাকা দান করি। আমার ব্যবসায়িক জীবনে এ এক পরীক্ষিত সত্য যে, যেদিন বিশেষ নিয়ত করে দান করেছি সেদিনই আমার ব্যবসায় নতুন সুযোগ এসেছে। গত এক বছর ধরে একটি প্রতিষ্ঠানে আমাদের পণ্য সরবরাহ করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিলো না। বিশেষত ওখানকার দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এত বেশি বদমেজাজি যে, তার সাথে আলোচনা করাই দায়। অধীনস্থদের গায়ে পর্যন্ত তিনি হাত তোলেন এবং এর মধ্যে আমার একাধিক প্রতিনিধিও তার কাছে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছেন। অবশেষে আমি নিজেই যাবো বলে স্থির করি। একদিন মাটির ব্যাংকে কিছু টাকা রেখে তার সাথে দেখা করি। কোনোরকম উত্তেজনা ছাড়াই এত শান্তভাবে আমাদের মিটিং হয় যে, বাইরে বসা অফিসের অন্যান্যরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলো। সবচেয়ে বড় কথা, ঐ দিনের আলোচনা সফল হয় এবং আমার প্রস্তাব কোনোরকম শর্ত ছাড়াই তিনি গ্রহণ করেন।

[মো. আব্দুর রশীদ, ২৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অপারেশন পরবর্তী জটিলতা থেকে নিরাময়

মো. নুরুল কুদ্দুস্



আমার পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সী শাশুড়ি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং কয়েকবার তার মেজর অপারেশন হয়। শেষবার এপেন্ডিসাইটিসের অপারেশনে বেশ জটিলতা দেখা দেয়। ডায়াবেটিস আছে, তার ওপর অতিরিক্ত মেদ-এর কারণে অপারেশনের কাটা ঘা শুকাচ্ছিলো না কিছুতেই। অনেক ওষুধেও কোনো কাজ হলো না, বরং পচন ধরে গ্যাংগ্রিনে রূপ নিলো। অবস্থা এত খারাপ ছিলো যে ডাক্তাররা শেষ চেষ্টা হিসেবে তাকে ৪টি ইনজেকশন দেয়ার কথা বলেন যার একেকটির মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা। কিন্তু এতে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে। আমরা তার সুস্থতা কামনায় মাটির ব্যাংকে দান করতে থাকি। আল্লাহর রহমতে ডাক্তারদের অবাক করে দিয়ে তিনি খুব দ্রুত সেরে ওঠেন।

[মো. নুরুল কুদ্দুস্, চাকরিজীবী, ২৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নরমাল ডেলিভারি হলো

সুরভী ফেরদৌসি খান



গর্ভধারণের পর থেকেই কোয়ান্টামের বলয়ে বেশি সময় থাকার চেষ্টা করতাম। তখন রিয়েলাইজেশন কোর্সে অংশ নেয়া ছাড়াও দুবেলা মেডিটেশন করেছি, সাদাকায়ন কার্যক্রমে নিয়মিত অংশ নিয়েছি। প্রতিদিন মাটির ব্যাংকে দান করার পাশাপাশি সবসময় মনছবি দেখতাম যে, আমার নরমাল ডেলিভারি হচ্ছে। ২০০৯ সালের ১১ জানুয়ারি ছিলো আমার অনার্স ২য় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা। আর আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাব্য দিন ছিলো সে মাসের ২৩ তারিখ। অর্থাৎ দুটো পরীক্ষা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে এবং তার পরের তিনটি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবো কি না তা নিয়ে ছিলো এক ধরনের অনিশ্চয়তা। কিন্তু ৯ জানুয়ারি সামান্য শারীরিক অস্বস্তি বোধ করায় ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি তখনই হাসপাতালে ভর্তি হতে বললেন। সেদিন রাতে নরমাল ডেলিভারিতে এক ফুটফুটে সুস্থ কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। এরপর আমি ১১ তারিখ থেকে প্রতিটি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছি।

[সুরভী ফেরদৌসি খান, ১৮৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অপারেশনে জটিলতা হয় নি

পারভীন আকতার



আমার বোনের ওভারিতে প্রথমে সিস্ট ধরা পড়ে। সন্তান নেয়ার সময় সমস্যা হবে– এ আশঙ্কায় ডাক্তার আর অপারেশন করেন নি। ৪ বছর এভাবেই চললো। এর মধ্যে সিজার অপারেশনের মাধ্যমে বোনের ৩টি সন্তান হলো। কিন্তু ততদিনে সিস্ট বড় হতে হতে টিউমারে রূপ নিয়েছে। ডাক্তার বললেন, দ্রুত অপারেশন না করালে ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। আরেক ডাক্তার বললেন, ক্যান্সার হয়েই গেছে। বোনের এবার নিয়ে হবে ৪ বার অপারেশন। স্থানীয় চিকিৎসকরা এ ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছিলেন না। ডাক্তারদের আশঙ্কা আমাদেরকেও বিচলিত করে তুলতো যদি মাটির ব্যাংক ও হিলিংয়ের মাধ্যমে দোয়ার সুযোগ না থাকতো। আমরা দুবোন মিলে মাটির ব্যাংকে দান করলাম। হিলিংয়ে নাম দিলাম। ঢাকায় অপারেশন হলো সফলভাবে। আল্লাহর রহমতে বোন এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

[পারভীন আকতার, ছাত্রী, ২৮৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নাশকতা থেকে রক্ষা পেলো বাড়িটি

মো. আজিজুর রহমান ভূঁইয়া



ঢাকার অদূরে আমার নিজের বাড়িতে ভাড়াটিয়ারা থাকেন। একবার কিছু বিশৃঙ্খল শ্রমিক এলাকায় ঢুকে সাধারণ জনগণের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে থাকে। আগুন যখন আমার প্রতিবেশীর বাড়িতে লাগাচ্ছে তখন আমার বাড়ির ভাড়াটিয়ারা আমাকে ফোন করেন। তারা যতটা আতঙ্কিত ছিলেন, আমিও ততটা অসহায় বোধ করছিলাম। দূরে থাকার কারণে আমার করার কিছুই নেই। মাটির ব্যাংকে মানত করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলাম যাতে বাড়ির কোনো ক্ষতি না হয়। শুকরিয়া– সেদিনের নাশকতা থেকে রক্ষা পেলো আমার বাড়িটি।

[মো. আজিজুর রহমান ভূঁইয়া, ডিজিএম, আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড, ১৭৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দলিলটি ফিরে পাবো ভাবি নি

নাফিসা গুলশান



সদ্য কেনা জমির নামজারি ও মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে আলোচনা করতে সেখানকার ভূমি অফিসে যেতে হলো। মেইন রোড থেকে ১০ মিনিটের পথ পেরিয়ে গ্রামের ভেতরে ছিলো সে অফিস। কাঁচা রাস্তা বলে হেঁটে রওনা দিলাম। অফিসে পৌঁছে খেয়াল হলো হাতে ফাইল নেই, ওটার ভেতরেই দলিল ছিলো। দলিল না পেলে জমি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এর কোনো ফটোকপিও আমার কাছে নেই। সাথে সাথে খুঁজতে বেরুলাম। রাস্তার আশপাশে তন্নতন্ন করে খুঁজছি, সামনে যাকে পাচ্ছি তাকেই জিজ্ঞেস করছি। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলো না। দলিলের আশা ছেড়ে দেবো কি না ভাবতে ভাবতেই মাটির ব্যাংকে দান করার নিয়ত করলাম। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যেই এক কিশোর আমাদেরকে বলাবলি করতে দেখে স্থানীয় এক স্কুলঘরে নিয়ে গেল। সেখানে দেখলাম দলিলটি টেবিলে রাখা, কেউ একজন তা কুড়িয়ে পেয়ে দিয়ে গিয়েছিলো।

[নাফিসা গুলশান, ব্যবসায়ী, ১৯৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কিডনির পাথরগুলো নেই

এড. তাস্‌লিমা চৌধুরী



বড় আপার মেয়ের কিডনিতে বেশ ব্যথা। মেডিকেল পরীক্ষায় জানা গেল কিডনিতে পাথর হয়েছে। রিপোর্টে পাথরগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিলো। বাড়ির সবাই খুব বিচলিত। অপারেশন ছাড়া গতি নেই। আমি সাহস হারালাম না। মাটির ব্যাংক নিয়ে গেলাম। ভাগ্নির শ্বশুরবাড়ির লোকজন বিষয়টি ভালোভাবে নিলেন না। তাদের বোঝালাম যে, এ সময়টা পছন্দ-অপছন্দ বাছাই করার নয়। তখন ভাগ্নির বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। ওর কষ্ট দেখে একসময় বাসার সবাই মিলে নিয়ত করে মাটির ব্যাংকে টাকা রাখলো। পরদিন আবার মেডিকেল চেক-আপ করানো হলো। ডাক্তারসহ আমাদের সবাইকে বিস্মিত করে দিলো নতুন রিপোর্টটি। আগের দেখা পাথরগুলো একটিও নেই। বরং কিডনির সে অংশ একদম পরিষ্কার।

[এডভোকেট তাস্‌লিমা চৌধুরী, ২৪৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পছন্দের স্কুলে মেয়েকে ভর্তি করাতে পেরেছি

শাহনাজ পারভীন



স্বপ্ন ছিলো মেয়েকে সেরা স্কুলে ভর্তি করাবো। আমার পছন্দের তালিকায় প্রথম যে স্কুলটি ছিলো সেখানে ভর্তি করানোর জন্যে মেয়েকে প্রস্তুত করছি। ভর্তি পরীক্ষার আগে স্থানীয় পত্রিকায় স্কুলের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো যে, সেনাবাহিনী পরিচালিত সে স্কুলটিতে শুধু সেনাবাহিনীতে কর্মরতদের সন্তানরাই ভর্তি হতে পারবে। আমি হতাশ হলেও আশা ছাড়লাম না। মাটির ব্যাংকে দান ও হিলিংয়ে নাম দেয়া শুরু করলাম। স্কুল কর্তৃপক্ষ পরের বিজ্ঞপ্তিতে বললো যে, কেজি শ্রেণীতে সীমিত সংখ্যক আসনে সাধারণ নাগরিকদের সন্তানরাও ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রায় ১২শ পরীক্ষার্থীর মধ্যে চান্স পেলো মাত্র ৩২ জন। যে নয়জন সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে তাদের মধ্যে আমার মেয়েও ছিলো। আমার বিশ্বাস, নিবেদিত দান ও বিশেষ প্রার্থনার ফলে এটি সম্ভব হয়েছে।

[শাহনাজ পারভীন, শিক্ষিকা, ২৪১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

লাখো বিপন্নের ভরসাস্থল

রক্তদানে আগ্রহী প্রজন্ম সৃষ্টিতে সাফল্যের পাশাপাশি আন্তরিক সেবা, আধুনিক প্রযুক্তি ও আপসহীন মান নিয়ন্ত্রণের ফলে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম পরিণত হয়েছে লাখো বিপন্নের ভরসাস্থলে। নিরাপদ রক্তের জন্যে মানুষ এখন প্রথমেই ছুটে আসে কোয়ান্টাম ল্যাবে। মাসে সাড়ে ৫ হাজার ইউনিট রক্ত উপাদান সরবরাহ বিপন্ন মানুষের ক্রমবর্ধমান আস্থারই প্রকাশ।

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এখন লাখো বিপন্ন মানুষের ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছে। ২০০০ সালে ল্যাবের কার্যক্রম শুরু করার পর যেখানে প্রথম বছরে রক্ত সরবরাহ করা হয়েছিলো ১,৫৬৪ ইউনিট সেখানে ২০০৯ সালে ল্যাব থেকে প্রতি মাসে গড় সরবরাহকৃত রক্ত ও রক্ত উপাদান ৫,৩০৫ ইউনিট। আগস্ট ২০০৯ পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়েছে মোট ২,৩৮,৪৫৩ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান।

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নিজস্ব ল্যাব। ২০০৩ সালে সংযোজিত হয় রক্তের কম্পোনেন্ট সেপারেটর (সেন্ট্রিফিউজ মেশিন), স্ক্রিনিংয়ের জন্যে আধুনিক এলাইজা মেশিন, −৯০ ও −৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রার ডিপ ফ্রিজ এবং প্লাটিলেট সংরক্ষণের জন্যে প্লাটিলেট ইনকিউবেটর।

লক্ষ রক্তদাতার ডোনার পুল

কোয়ান্টাম ১৯৯৬ সাল থেকে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময়ের নিরন্তর প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছে ১৫,৩৮১ আজীবন এবং ৮৯,৩২০ জনেরও বেশি অনিয়মিত রক্তদাতার সুসংগঠিত ব্লাড ডোনার পুল। কোয়ান্টামের রক্তদাতারা এখন শুধু দেশেই রক্ত দিচ্ছেন না, বিদেশেও রক্তদানকে জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

অজেয় ১৯ ॥ রক্তদানের চেতনা ছড়িয়ে পড়ছে

১৯তম জন্মদিনকে প্রথম রক্তদানের মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এক ব্যাপক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি 'অজেয় ১৯'। ২০০৮ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে এ কার্যক্রম। এ পর্যন্ত স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অর্ধশতাধিক প্রোগ্রাম হয়।

ব্লাড ক্যাম্প

রক্ত সংগ্রহের জন্যে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্লাড ক্যাম্প। আগস্ট ২০০৯ পর্যন্ত ৯৭১টি ব্লাড ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত রক্তের পরিমাণ ৭০,৪১০ ব্যাগ।

রমজানে রক্তদানে সওয়াব বেশি

রমজানে রোজা রেখে রক্ত দিলে রোজা নষ্ট হয় না এবং শারীরিক ক্ষতিও হয় না বরং ৭০ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। বিশিষ্ট আলেমদের এই ফতোয়ার ফলে ২০০৭ সাল থেকে রোজার মাসে রক্তদানের পরিমাণ অনেকগুণ বেড়েছে।

নিরাপদ রক্তের নিশ্চয়তা

কোয়ান্টাম ল্যাব প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত পাঁচটি মৌলিক স্ক্রিনিং সম্পন্ন করে রক্ত প্রদানের ব্যাপারে আপসহীন মনোভাব নিয়ে কাজ করে আসছে। রক্তে হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, সিফিলিস, এইডস বা ম্যালেরিয়া ইত্যাদি যেকোনো একটি জীবাণুর উপস্থিতি সম্পর্কে কোনোরকম সংশয় বা প্রশ্ন দেখা দিলে সে রক্তের ব্যাগ সাথে সাথে বাতিল ও ধ্বংস করা হয়।

আজও আমার স্বামী বেঁচে আছেন

শারমীন শামরোজ



গত বছর আমার স্বামী হেমোরেজিক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। প্লাটিলেট খুব দ্রুত নেমে যাচ্ছে। আমরা আতঙ্কিত। প্লাটিলেট পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে খবর পেলাম কোয়ান্টামে প্লাটিলেট সেপারেটর মেশিন আছে। এরপর প্রতিদিন কোয়ান্টাম থেকে প্লাটিলেট নিয়ে গেছি। সময়মতো প্লাটিলেট পেয়েছিলাম বলে আজও আমার স্বামী বেঁচে আছেন। সে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়তো স্রষ্টা আমাকে এখানে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাকে পাঠিয়েছেন আমার ডিরেক্টর যিনি নতুন কেউ চাকরিতে জয়েন করলেই তাকে কোয়ান্টাম কোর্স করতে পাঠান।

[শারমীন শামরোজ, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, ২৬১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জন্মদিনে রক্তদানের আনন্দই আলাদা

তানজিদ মোর্শেদ খান



২০০৭ সালে কোর্সে অংশগ্রহণ করে প্রথম জানতে পারলাম রক্তদান করার গুরুত্ব। সিদ্ধান্ত নিলাম ১৯তম জন্মদিন থেকেই রক্তদান শুরু করবো। পরিচিত আত্মীয়, বন্ধুদেরকেও সাধ্যমতো উদ্বুদ্ধ করি এ মহান কার্যক্রমে এগিয়ে আসতে। আমার দুই বন্ধু সিদ্ধান্ত নিলো তাদের জন্মদিনে রক্তদান করবে। তাদের সাথে থাকা আরো দুই বন্ধুর এ বিষয়ে তেমন ধারণা ছিলো না। রক্তদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর পর তারাও উদ্বুদ্ধ হলো রক্তদানে। সেদিনটি আমার জন্যে ছিলো অত্যন্ত আনন্দের একটি দিন। আমার ৪ বন্ধুই জীবনে প্রথমবারের মতো রক্তদান করার আনন্দ পেলো।

[তানজিদ মোর্শেদ খান, শিক্ষার্থী, ২৩৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

একজন রক্তগ্রহীতার চিঠি

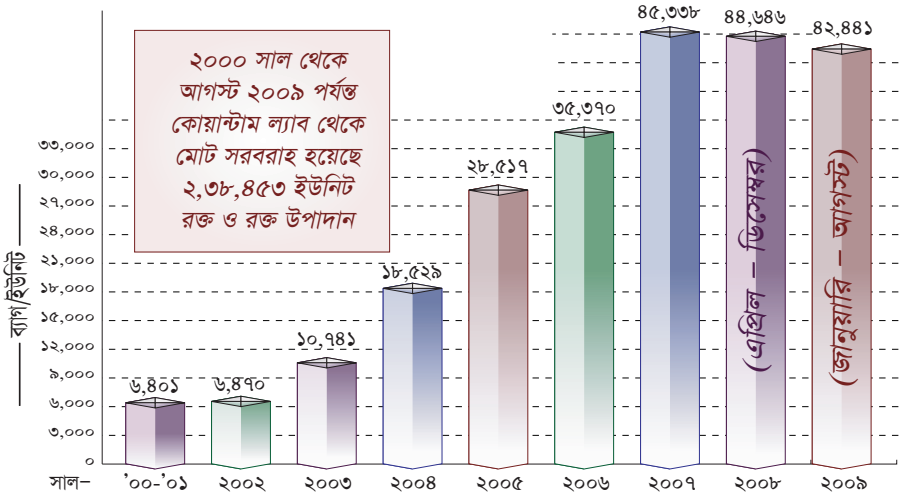


শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

২০০৬ সালে আমার খুবই অসুস্থ এক আত্মীয়ের রক্তের প্রয়োজন। কোয়ান্টাম ল্যাবে এসে বিনয়ের সাথে বলেছি যাতে বিরক্ত না হন। পরে দেখি ওনারা আমার চাইতে আরো বেশি বিনয়ী। সবার ব্যবহার আমাকে অবাক করেছে। সবকিছু সাজানো গোছানো একেবারে পরিপাটি। সবাই অতিশয় ভদ্র। বসে বসে ব্রোশিউর এবং রক্ত সরবরাহ করতে কোথায় কত সময় কীভাবে ব্যয় হচ্ছে তার হিসাব দেখছিলাম। আরো বিস্মিত হলাম তখন, যখন ঠিক সময়ে রক্ত সরবরাহ করলো। ভাবছি, আল্লাহ গাফুরুর রহীমই ভালো জানেন কোথায় এলাম! চাইনিজ রেস্টুরেন্ট বা বিউটি পার্লারের মতো পকেট খালি করে ফেলবে নাকি! এক ভদ্রমহিলা (কর্মকর্তা) বললেন, ভাইয়া, ইচ্ছে করলে আপনিও রক্তদান করতে পারেন। উনার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভেতরে গিয়ে ফরম পূরণ করলাম। আমার ওজন দেখে বললেন, আমরা দুঃখিত, আপনার উচ্চতা অনুযায়ী ওজন একটু কম। এর মধ্যে একজন এসে এক গ্লাস শরবত খাওয়ালেন যা পূর্বে কখনও খাই নি। এরপর থেকে ভাবতাম কীভাবে রক্ত দেয়ার মতো পুণ্যের কাজ করা যায়। ২০০৮ সালে কোর্স করতে এসে আমার সাথীসহ আরো ২/৩ জনকে রক্তদানের জন্যে উদ্বুদ্ধ করলাম। হঠাৎ মনে হলো, দেখি, আরেকবার দেয়া যায় কি না। এবার কোনো রকমে রক্ত দিলাম। কিন্তু অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হলো, যখন দেখি ২য় বার রক্ত দেয়ার পর আমার ওজন ৮ কেজি বেড়ে গেল এবং শরীর ঝরঝরে তরতরে হয়েছে। সারাক্ষণ সজীব তরতাজা অনুভূতি নিয়ে চলাফেরা করি।

ইতি–

সৈয়দ আকবর হোসেন, ব্যবসায়ী



এসেছিলেন ৮ কিলোমিটার হেঁটে

১০ জুন, ২০০৯। কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি, লন্ডন-এর পক্ষ থেকে আমরা স্বেচ্ছা রক্তদান করবো বৃটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সেদিন আন্ডারগ্রাউন্ড টিউব স্ট্রাইক ডাকা হলো। তার মানে প্রতিদিন যে ৩৫ লক্ষ মানুষ আন্ডারগ্রাউন্ড টিউব দিয়ে যাতায়াত করেন, তাদের পুরো চাপটা পড়বে রাস্তার যানবাহনের ওপর। অন্য সময় যেখানে যেতে ৩০/৩৫ মিনিট লাগতো সেখানে এখন লাগবে ৪/৫ ঘণ্টা।

এনএইচএস-এর ডিরেক্টর জাস্টিন টেপার ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, এ স্ট্রাইকের মধ্যেও আমরা যাবো কিনা। আমরা বললাম, যেহেতু তারিখ আগে থেকে ঠিক করা আছে সুতরাং অবশ্যই যাবো। কিন্তু তেমন একটা লোক হবে না ভেবে স্ট্রাইকের কারণে তিনি তার অর্ধেক কর্মচারীকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

পরদিন দুপুর ১টা বাজতে না বাজতেই এনএইচএস-এর ব্লাড সেন্টার মুখর হয়ে উঠলো আমাদের পদচারণায়। রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত আমরা মোট ৫১ জন সেদিন রক্ত দিয়েছিলাম। প্রায় সবাই এসেছিলেন। একজন তো সকাল ৯টায় বাসা থেকে বেরিয়ে পৌঁছেছেন দুপুর ১টায়। আরেকজন বাস না পেয়ে ৮ কি.মি. হেঁটে ব্লাড সেন্টারে এসেছিলেন রক্ত দিতে! কতটা উদ্বুদ্ধ হলে এরকম দুর্যোগেও মানুষ এত আন্তরিক হতে পারে দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন এনএইচএস-এর কর্মকর্তাগণ।

[তন্ময় আহমেদ, লন্ডন]



রক্তদাতা সম্মাননা ক্রেস্ট-মেডেল-ট্রফি

মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচাতে স্বেচ্ছা রক্তদাতারা যে নিঃস্বার্থ সেবা দিচ্ছেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ ফাউন্ডেশন নিয়মিত আয়োজন করছে রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটি একটি নতুন ও অনন্য ধারণা। এসব অনুষ্ঠানে এসে স্বেচ্ছা রক্তদাতারা অত্যন্ত সম্মানিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করেন।



৩ বার রক্তদান করে আজীবন রক্তদাতা হয়েছেন এমন প্রতি ১০০ জনকে নিয়ে এ পর্যন্ত কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগে ৬০টির-ও বেশি রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান হয়েছে। এ অনুষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে আসা বুদ্ধিজীবী, জাতীয় দৈনিকগুলোর সম্পাদক, সাংবাদিক, লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ দেশের বিশিষ্টজনদের কাছ থেকে রক্তদাতারা বিশেষ সনদ, আইডি কার্ড ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া ১০ বার রক্তদান করে যারা সিলভার ক্লাবের সদস্য হয়েছেন তাদেরকে সম্মাননা জানাতে ৩টি ও ২৫ বার রক্তদান করে যারা গোল্ডেন ক্লাবের সদস্য হয়েছেন তাদের সম্মানে প্রথমবারের মতো ১০ জুলাই ২০০৯-এ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে একটি রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ২৫ বার রক্ত দেয়া ৯ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে নিজের ছবি সম্বলিত ও '২৫' উৎকীর্ণ বিশেষ ট্রফি ও সনদ দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে গোল্ডেন ক্লাবের সদস্য ১০ জন ও সিলভার ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ১,৩০৩ জন।



ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান, দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউ নেশন



তিনি বলেন, কোয়ান্টাম ভালো কাজের আদর্শ স্থাপন করছে।

(১৪ ডিসেম্বর '০৫)

গোলাম সরোয়ার

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, দৈনিক যুগান্তর



তিনি বলেন, রক্তদানের এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশে।

(৪ আগস্ট '০৬)

এম আসফউদ্দৌলা

সাবেক সচিব ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, বাংলাদেশ টুডে



কোনো বিদেশি সাহায্য ছাড়াই ফাউন্ডেশন যে রক্তদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাতে আমি অভিভূত।

(২২ জুন '০৭)

আবেদ খান

বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট ও টিভি ব্যক্তিত্ব



তিনি বলেন, রক্তদান কার্যক্রমে কোয়ান্টাম ল্যাব আদর্শে পরিণত হয়েছে।

(১৪ ফেব্রুয়ারি '০৬)

নুরুল কবীর

সম্পাদক, দৈনিক নিউ এজ



তিনি বলেন, রক্তদানের মাধ্যমে সাধ্যমতো মানব কল্যাণ করতে হবে।

(২২ সেপ্টেম্বর '০৬)

নাঈমুল ইসলাম খান

সম্পাদক, দৈনিক আমাদের সময়



তিনি বলেন, যারই সুযোগ আছে তার এ কার্যক্রমের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিত।

(২৮ জুলাই '০৭)

ইকবাল সোবহান চৌধুরী

সম্পাদক, দি বাংলাদেশ অবজারভার



তিনি বলেন, রক্তদান কার্যক্রমের মাধ্যমে নীরব বিপ্লব সাধন করছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

(২০ মার্চ '০৬)

আলমগীর মহিউদ্দিন

সম্পাদক, দৈনিক নয়া দিগন্ত



তিনি বলেন, রক্তদানের মতো সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের দেশ একদিন উন্নতির শিখরে পৌঁছবেই।

(১৯ জানুয়ারি '০৭)

মোস্তফা কামাল মজুমদার

সম্পাদক, দি নিউ নেশন



তিনি বলেন, আত্মিক প্রেরণা আর উচ্চতর লক্ষ্যই কোয়ান্টামের এ কার্যক্রমকে সুন্দর সুশৃঙ্খল ও মহৎ করে তুলেছে।

(১৭ মার্চ '০৮)

আমানুল্লাহ কবির

প্রাক্তন সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ



তিনি বলেন, নিঃস্বার্থ সেবার মধ্যে স্বেচ্ছা রক্তদান অন্যতম।

(২৬ মে '০৬)

মাহবুবুল আলম

সম্পাদক, দৈনিক দি ইন্ডিপেনডেন্ট



তিনি বলেন, বাংলাদেশে একদিন ১০০ ভাগ রক্তের চাহিদাই স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের মাধ্যমে পূরণ হবে।

(২ ফেব্রুয়ারি '০৭)

এ এইচ এম মোয়াজ্জেম হোসেন

সম্পাদক, দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস



তিনি বলেন, মানুষকে দূষিত রক্তের অভিশাপ থেকে মুক্ত করছে কোয়ান্টাম।

(২৮ মার্চ '০৮)

কাজী রফিকুল ইসলাম

চিফ এক্সিকিউটিভ ও প্রেসিডেন্ট, আহসানিয়া মিশন



তিনি বলেন, মানুষ যাতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভালো কাজ করতে পারে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সে সুযোগ করে দিয়েছে।

(২৮ জুন '০৬)

আতাউস সামাদ

প্রবীণ সাংবাদিক



তিনি বলেন, ভালো কাজের প্রচারের প্রয়োজন হয় না, মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রমাণ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এ কার্যক্রম।

(২৩ মার্চ '০৭)

ড. এম আব্দুস সামাদ

উপাচার্য, প্রাইম ইউনিভার্সিটি



তিনি বলেন, স্বেচ্ছা রক্তদানে আমাদের সবাইকে বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

(১৮ এপ্রিল '০৮)

অধ্যাপক বজলুল মবিন চৌধুরী

উপাচার্য, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ



তিনি বলেন, স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের মাধ্যমে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

(১০ মে '০৮)

ইমদাদুল হক মিলন

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও টিভি ব্যক্তিত্ব



তিনি বলেন, কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে দৈনিক শতাধিক ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হওয়া এদেশে নজিরবিহীন ঘটনা।

(২০ অক্টোবর '০৮)

ফরিদ হোসেন

ঢাকা ব্যুরো প্রধান, এপি



তিনি বলেন, রক্তদাতারা মানুষের প্রতি ভালবাসা থেকেই রক্তদান করেন।

(১৬ ফেব্রুয়ারি '০৯)

শ্যামল দত্ত

সম্পাদক, দৈনিক ভোরের কাগজ



তিনি বলেন, স্বেচ্ছা রক্তদানে যত বেশি মানুষকে সম্পৃক্ত করা যাবে পেশাদার রক্তদাতাদের দৌরাত্ম্য তত কমতে থাকবে।

(২৪ মে '০৮)

অধ্যাপক মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান

উপাচার্য, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি

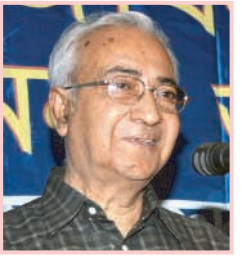


তিনি বলেন, নিরাপদ পরিসঞ্চালন নিশ্চিত করতে শুধুমাত্র স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের রক্তই গ্রহণ করা উচিত।

(২৫ অক্টোবর '০৮)

আতিকুল হক চৌধুরী

বিশিষ্ট নাট্যকার ও নির্দেশক



তিনি বলেন, স্বেচ্ছা রক্তদাতারাই মানুষের প্রকৃত বন্ধু।

(৯ মার্চ '০৯)

ড. এম আনোয়ার হোসেন

উপাচার্য, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়



তিনি বলেন, রক্তদাতারা মানুষকে বাঁচার আশা ও আনন্দ যুগিয়ে যাচ্ছেন।

(২৮ জুন '০৮)

ড. আমিনুল ইসলাম

উপাচার্য, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি



তিনি বলেন, রক্তদানের উপকারিতা জানানোর মাধ্যমে সবাইকে রক্তাদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(১০ নভেম্বর '০৮)

ড. এ এম এম সফিউল্লাহ

উপাচার্য, বুয়েট



তিনি বলেন, রক্তদাতারা প্রমাণ করেছেন জাতি হিসেবে আমরাও কিছু দিতে পারি।

(২৩ এপ্রিল '০৯)

ড. এম রিজওয়ান খান

উপাচার্য, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি



তিনি বলেন, সবারই উচিত নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদান করা।

(১৬ আগস্ট '০৮)

সাইফুল বারী

প্রধান উপদেষ্টা, এটিএন বাংলা

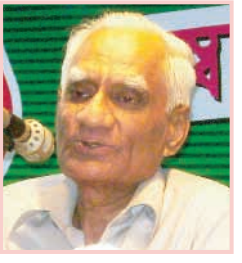


তিনি বলেন, রক্তদান সবচেয়ে বড় সেবা। কারণ এর মাধ্যমে মূল্যবান জীবন বাঁচানো সম্ভব।

(১ ডিসেম্বর '০৮)

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



তিনি বলেন, তরুণ সমাজ উদ্যোগী হলে আমরা স্বেচ্ছা রক্তদানে স্বাবলম্বী হবো।

(৮ জুন '০৯)

ড. এম আলিমউল্যা মিঞান

উপাচার্য, আইইউবিএটি



তিনি বলেন, স্বেচ্ছা রক্তদাতারা মানবতার সেবায় ত্যাগের মনোভাব নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন।

(৩০ আগস্ট '০৮)

শওকত মাহমুদ

সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব



তিনি বলেন, স্বেচ্ছা রক্তদাতারা নীরবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

(২৬ জানুয়ারি '০৯)

বিভিন্ন সময় এ অনুষ্ঠানে আসা সম্মানিত প্রধান অতিথিগণ নানাভাবে একটি বক্তব্যই প্রকাশ করেন যে, মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাতে স্বেচ্ছা রক্তদানের কোনো বিকল্প নেই। তাই স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের প্রতি সকলে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নিঃস্বার্থভাবে এ মহতী উদ্যোগে এগিয়ে আসার জন্যেই প্রতিদিন বেঁচে যাচ্ছে অনেক মূল্যবান জীবন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এ সার্থক কার্যক্রম সবার মাঝেই সঞ্চার করে আস্থা ও নির্ভরতা।

প্রতিবেদক : ডা. আতাউর রহমান



তৃষিত পথিকের পানির তৃষ্ণা নিবারণের মধ্য দিয়ে ফাউন্ডেশন সৃষ্টির সেবার যে কাজ শুরু করেছিলো আজ তা বহুমুখী প্রকল্প। বদলে দিচ্ছে হাজার হাজার অসহায় মানুষের জীবন। প্রমাণ করছে সঙ্ঘবদ্ধ হলে স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে সৃষ্টির সেবায় যেকোনো কাজ করা সম্ভব।

বছরে তারা একবারই পায় গোশত খাওয়ার সুযোগ!

সত্যিকার দুস্থদের মধ্যে গোশত বিতরণের মাধ্যমে কোরবানির তাৎপর্যকে যথাযথভাবে অনুসরণের জন্যে ২০০২ সাল থেকে লামায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোরবানি কার্যক্রম। আর এর মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম পল্লীর সরই এবং পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নগুলোর হাজার হাজার পরিবারে ঈদের আনন্দকে ভাগ করে নেয়ার যে তৃপ্তি লাভ করেন কোয়ান্টামের সদস্যরা তা অতুলনীয়। দুস্থদের অনেকেই আছেন যারা বছরে মাত্র এই একটি দিনেই গোশত খাওয়ার সুযোগ পান।

প্রথম বছর ২০০২ সালে ২টি গরু কোরবানি দেয়া হয়েছিলো। আর ৭ম বছর ২০০৮ সালে কোরবানি দেয়া হয় ৮২টি গরুসহ মোট ৯২টি পশু। ৭,৩১৫টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয় ১০,৮৯৪ কেজি গোশত ।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, এত ব্যাপক একটি আয়োজনের শৃঙ্খলা এবং দ্রুততা। পশু জবাই, কাটা, গোশত প্যাকেট করা থেকে শুরু করে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে তা বিতরণ– এসব কাজ শেষ হয় মাত্র ৪ থেকে ৫ ঘণ্টায়। পরম করুণাময়ের রহমতের পাশাপাশি এর পেছনে রয়েছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং একঝাঁক দক্ষ প্রো-কোয়ান্টিয়ারের আন্তরিকতা।

মন্টু মিয়াদের আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে না!

বস্তির একচিলতে ঘরটায় মন খারাপ করে শুয়ে আছে ১২ বছর বয়সী মন্টু মিয়া। কারণ তার মা যে সাহেবের বাসায় কাজ করে আজ তার বড় ছেলেটির মুসলমানির অনুষ্ঠান হচ্ছে খুব ধুমধাম করে। হায়রে নিয়তি! কেউ হাজার হাজার টাকা খরচ করে মুসলমানির অনুষ্ঠান করে, আর কেউ বয়স পেরিয়ে গেলেও সামান্য কয়েকশ টাকার জন্যে পারে না খতনা করাতে।

এরকম হাজারো মন্টু মিয়ার কষ্টের সমব্যথী হতে জুলাই ২০০৫ থেকে ফাউন্ডেশনের সিলেট সেন্টারের উদ্যোগে শুরু হয় খতনা কার্যক্রম। দরিদ্র শিশু-কিশোর এমনকি শৈশবে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে খতনার সুযোগবঞ্চিত পূর্ণবয়স্ক অনেক পুরুষও এখন এ সেবা গ্রহণ করছেন।

বর্তমানে ঢাকার মিরপুর কুড়িল সবুজবাগ গেণ্ডারিয়া টঙ্গীসহ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া চকরিয়া হালিশহর হাটহাজারী বাঁশখালী বারৈয়ারহাট সিলেট রাজশাহী খুলনা যশোর বরিশাল খালিশপুর বয়রা ও ময়মনসিংহে সপ্তাহের একাধিক দিনে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ কার্যক্রম।

২০০৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশে খতনা সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা ১০,০৮৯ জন। উল্লেখ্য, খতনার পর প্রত্যেককে দেয়া হয় ফুল কোর্স এন্টিবায়োটিক, ব্যথার ওষুধ, ভিটামিন সি ট্যাবলেট এবং ১টি লুঙ্গি ও গামছা।

শেষ বিদায়ে থাকুক মমতার পরশ

বেওয়ারিশ লাশ অথবা দাফনে অক্ষম দরিদ্রের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে রাজশাহীতে প্রথম ২০০৪ সালে শুরু হয় দাফন কার্যক্রম।

প্রথম বছর মোট ৫৩টি লাশ দাফন ও সৎকার করা হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয় খুলনা ও সিলেটে। এ পর্যন্ত রাজশাহীতে ১৭৯টি দাফন ও ৪টি সৎকার, নারায়ণগঞ্জে ৪টি, সিলেটে ২টি, খুলনায় ১১টি এবং লামায় ৭টি দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।

১০০ ঘণ্টায় তৈরি হয় ১ লক্ষ প্যাকেট স্যালাইন

ভয়াবহ বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্তমানবতার সাহায্যে সবসময়ই এগিয়ে এসেছে ফাউন্ডেশন। বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালনা করেছে ত্রাণ কার্যক্রম।

১৯৯৮ সালের বন্যা পরবর্তী সময়ে ঢাকার অদূরে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রূপগঞ্জের পশ্চিমগাঁও গ্রামটিকে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পুনর্বাসিত করা হয়। ত্রাণ, গৃহনির্মাণ সামগ্রী ও চিকিৎসাসেবা সরবরাহ করা হয় পরবর্তী দুবছর।

২০০৪ সালের বন্যায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ফাউন্ডেশনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের একদিনের আয় বা ব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থ ফাউন্ডেশনের ত্রাণ তহবিলে দান, ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণে অংশ নিয়েছেন অগণিত নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। কেন্দ্রীয় স্যালাইন প্রকল্পে ১০০ ঘণ্টায় ১ লক্ষ প্যাকেট স্যালাইন তৈরি হয়। কাজ করেছেন সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা থেকে শুরু করে ৬ বছরের শিশু।

২০০৭-এ দীর্ঘ ২ মাসব্যাপী ঢাকা যশোর সোনারগাঁও নারায়ণগঞ্জ বিক্রমপুর কিশোরগঞ্জ সিলেট সুনামগঞ্জ জামালগঞ্জ ও শেরপুরের বন্যাদুর্গত বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এছাড়াও ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বরে পরিচালিত হয় সিডর রিলিফ কার্যক্রম। ২০০৯ সালে সিডর বিধ্বস্ত এলাকায় স্থাপন করা হয় ৬টি নলকূপ। ২০০৯-এ ঘূর্ণিঝড় আইলা বিধ্বস্ত দক্ষিণাঞ্চলেও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

চিকিৎসাসেবা

লামায় কোয়ান্টাম চিকিৎসা সেবাকেন্দ্রে ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন বয়সের পাহাড়ি-বাঙালিকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেয়া হয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের উপস্থিতিতে নিয়মিত আয়োজিত হয় চিকিৎসাশিবির। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় ফাউন্ডেশনের নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক সদস্যদের সহায়তায় ফ্রি চিকিৎসা পরামর্শ ও রোগী শুশ্রূষা সেবা দেয়া হচ্ছে। মিরপুর সেন্টারের উদ্যোগে মিরপুরে ইউসেপ বাংলাদেশের কার্যালয়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ফ্রি চিকিৎসা পরামর্শ ও ওষুধ দেয়া হয়।

প্রতিবেদক : আবেগ রহমান

সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায়

যাকাত আদায় যেমন ফরজ, তেমনি সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। যাকাতের মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র বিমোচন। সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচ্ছল আর অর্থনীতিকে গতিময় করে তোলা। এ কারণে হজরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে আরবে যাকাত গ্রহণ করার মতো কেউ ছিলো না। যাকাত ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। কোনো কারণে সমাজ ও রাষ্ট্র এ দায়িত্ব পালন না করলে সচেতন মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। কারণ যাকাতের অর্থ একসঙ্গে জমা করে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয়ের মাধ্যমে আদায় করা বাঞ্ছনীয়।

কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড



বঞ্চিত ও দুস্থ মানুষের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ফাউন্ডেশন ১৯৯৬ সালে কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড গঠন করে। কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড থেকে সংগৃহীত প্রতিটি টাকা শরীয়ত নির্ধারিত খাতে বৈষয়িক নৈতিক ও আত্মিক পুনর্বাসনের দূরপ্রসারী লক্ষ্যে ব্যয় করা হয়। পরিকল্পিতভাবে যাকাত প্রদান এবং যাকাতদাতার সম্পদে বরকত হচ্ছে বলেই এ ফান্ডে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ প্রতিবছরই উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে।

যাকাত প্রদান করায় বার্ষিক আয় দ্বিগুণের চেয়েও বেশি

এন ইসলাম

কোর্স করার পর যাকাত সম্পর্কে আমার বিশেষ সচেতনতা সৃষ্টি হয়। ঠিক করি যে, যথাযথভাবে হিসেব করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দেবো। সে অনুযায়ী কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ডে আমার পুরো টাকাটা প্রদান করে এর ৫০% তুলে নিই পরিচিত দরিদ্রদের জন্যে।

অবাক বিষয়, ২০০৫ সালে আমি যাকাত দেই ১২ হাজার ৫০০ টাকা, পরের বছর ২৬ হাজার ৫০০ টাকা, তার পরের বছর ৬৭ হাজার ৫০০ টাকা এবং এ বছর অর্থাৎ ২০০৯ সালে আমার যাকাতের পরিমাণ এসেছে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দিলে যে সম্পদে কীভাবে বরকত আসে তা দেখলাম একেবারে চোখের সামনে।

[একজন শিল্পপতি, ২১১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সম্পদ হালাল করতে যাকাত

আলী হাকিম

যাকাত আদায় না করলে গোটা সম্পদ হারাম হয়ে যায় জেনেও যাকাত ফাঁকি দেয়ার নানা কারণ খুঁজতাম। পরবর্তীতে এক প্রোগ্রামে গুরুজীর কথা শুনে কীভাবে যাকাত বেশি দেয়া যায় ঐ কারণগুলো খুঁজতে থাকি। যাকাত দিলাম। সবকিছুতেই পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হতে লাগলো। পরের বছর যাকাত দিতে গিয়ে দেখি যে, আমার যাকাত গত বছরের চেয়েও দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং প্রতিবছরই এটা বাড়ছে। উপলব্ধি করলাম সম্পদ হালাল ও পবিত্র করার গুরুত্ব।

[একজন ব্যবসায়ী ও ব্যবস্থাপক, ১১৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



যাকাত ফান্ডের পশুসম্পদ প্রকল্প ॥ ঋণমুক্ত স্বনির্ভরতার পথ

লামার কেয়াজুপাড়ার কমলাখোলার বাস্তুভিটাহীন দিনমজুর সাহাবুদ্দিন ২টি গরু নেন ২০০২ সালে। এখন গরুর সংখ্যা ৬টি। ৪টি গরু বিক্রি করে যে লাভ পেয়েছেন তা দিয়ে এখন তিনি জমি কিনে নিজস্ব ঘর তৈরি করবেন বলে ভাবছেন।

মাগুরার শালিখা থানার শতখালী ইউনিয়নের সহায়-সম্বলহীন সুন্দরীকে জামানতের অভাবে কোনো ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাও ঋণ দিতে আগ্রহী ছিলো না। পশুসম্পদ প্রকল্পের আওতায় তাকে একটি বাছুর দেয়া হয়। ৬ মাস লালনপালনের পর এটি বিক্রি করে তার লাভ হয় সাড়ে ৪ হাজার টাকা। পরবর্তীতে তিনি আরো দুটি বাছুর নিয়ে লাভের টাকায় নিজ বাড়িতে গড়ে তুলেছেন হাঁস-মুরগির খামার।



একই ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের মোছাম্মা খাতুন দুটি গরু পালন করে মুনাফা করেছেন সাড়ে ৮ হাজার টাকা। আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে তার পরিবারে। এখন গরুর সংখ্যা বাড়িয়ে ক্ষুদে খামার তৈরির পরিকল্পনা করছেন তিনি।

এভাবে ঋণজর্জরিত ও হতদরিদ্রদের স্বাবলম্বী করে তোলাই হচ্ছে পশুসম্পদ প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ফাউন্ডেশনের আওতায় কোয়ান্টাম পল্লী লামা এবং যশোর শাখার তত্ত্বাবধানে মাগুরার শতখালী ইউনিয়নে ৮টি গ্রামে এ পর্যন্ত ১৫০টি পরিবারে ২২২টি গরু এবং লামায় ৭১টি পরিবারে ১৬৬টি গরু বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদক : আহমেদ শরীফ

দারিদ্র বিমোচন এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে এক সফল প্রয়াস পশুসম্পদ প্রকল্প। বাস্তুভিটাহারা, ঋণ জর্জরিত ও বঞ্চিতদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে যাকাত ফান্ড থেকে ক্রয়কৃত গরু যাকাত গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে লালনপালন করে বড় করে তোলেন। তারপর বিক্রয় উপযোগী হলে তা বিক্রির টাকা থেকে গরুর ক্রয়মূল্য বাদ দিয়ে যে লাভ থাকে সে টাকা ফাউন্ডেশন ও লালনকারী ব্যক্তি সমানভাবে ভাগ করে নেন। ফাউন্ডেশন সে টাকা দিয়ে আবার নতুন করে তাকে একাধিক গরু কিনে দেয়। ইতোমধ্যেই কর্মসংস্থান ও আত্মনির্ভরশীলতার পথ ধরে এ প্রকল্পের মাধ্যমে দাঁড়াতে শুরু করছে অনেক পরিবার।





কোয়ান্টাম শিশুসদন



প্রতিটি শিশুর হোক আত্মপরিচয়

অন্য আর দশটি শিশুর মতো এ শিশুটির জন্ম তার পরিবারের জন্যে নিয়ে আসে নি কোনো আনন্দ, ঠাঁই হয় নি তার মায়ের কোলে। তখন তার বয়স মাত্র ১৮ দিন। আর কিছুক্ষণ পরই তাকে তুলে দেয়া হবে সঙ্ঘবদ্ধ শিশু পাচারকারীদের হাতে। সব ঠিকঠাক। কোনোরকমে বাংলাদেশ সীমান্তের বাইরে নিয়ে যেতে পারলেই কেল্লা ফতে! লোকমুখে এ খবর পেয়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের রাজশাহী সেন্টারের দায়িত্বশীলরা ছুটে গেলেন সেখানে। স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় শিশুটির আত্মিক অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব নিলো কোয়ান্টাম শিশুসদন।

২০০৪ সালে কোয়ান্টাম শিশুসদনের যাত্রা শুরু হয়েছিলো যে শিশুটিকে নিয়ে সেই নাদিয়া তাহসীনের এটুকু অতীতই শুধু জানা যায়।

দুস্থ ও ছিন্নমূল এ ধরনের নবজাতকদের আশ্রয়দান ও লালনের জন্যে ফাউন্ডেশনের রাজশাহী সেন্টারে গড়ে উঠেছে কোয়ান্টাম শিশুসদন। ২০০৪ সালের মার্চে নাদিয়ার আগমনের পর একে একে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে নাফিসা, নাবিলা, লাবিবা, নাজিয়াসহ মোট ১১টি শিশু। এরা সবাই শিশুসদনে এসেছে ৩০ দিনেরও কম বয়সে। কাউকে তাদের অভিভাবক স্বেচ্ছায় দিয়ে গেছেন। আবার কাউকে পাওয়া গেছে পরিত্যক্ত অবস্থায়।

সমাজের চোখে ভাগ্যহত এ শিশুরা শিশুসদনে বেড়ে উঠছে সৌভাগ্যবান শিশু হিসেবে। আপন সন্তানের মতোই যত্নে লালিত হচ্ছে এরা। শিশুদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্যে রয়েছেন ৯ জন আয়া। বাচ্চারা তাদেরকেই মা বলে ডাকে। খেলাধুলো, দৌড়-ঝাঁপের মধ্য দিয়েই একজন হাউজ টিউটরের কাছে চলে ছড়া-কবিতা, বর্ণমালা আর অংক শেখার ক্লাস। তাদের প্রতিদিনের খাবারের মেনু তৈরি করা হয়েছে পুষ্টিবিজ্ঞানের আলোকে। এছাড়া সপ্তাহে ২ দিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়।

এ সবকিছুর নেপথ্যে আছেন সাহিদা বানু। রাজশাহী নার্সিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর নেয়ার পর থেকে শিশুসদনের অনারারি পরিচালক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত যার ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন সাধনা– সবই এই শিশুসদন।

শিশুসদনের ১১টি শিশু যেন ১১টি বোন। ৫ বোন প্রায় পিঠাপিঠি; বয়স ৫ থেকে সাড়ে ৫ বছরের মধ্যে। আর সর্বকনিষ্ঠ জনের বয়স আড়াই বছর। শুধু রাজশাহী সেন্টার নয়, বৃহত্তর কোয়ান্টাম পরিবারের প্রাণ যেন ওরা। আর এ পরিবারই এখন তাদের ঠিকানা, শেকড়, আত্মিক নির্ভরতার আশ্রয়স্থল।

আপন মা-বাবার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত এ শিশুরা কোয়ান্টাম পরিবারে যে কতখানি কাঙ্ক্ষিত তার উদাহরণ হলো তাদের আকিকা ও দোয়া অনুষ্ঠানটি। ২০০৪ সালের নভেম্বরের ২৬ তারিখে প্রথম ৫টি শিশুর আকিকা দেয়া হয়। রাজশাহী সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ আকিকা অনুষ্ঠানে সারাদেশ থেকে অংশ নেন ২,৭০০ অতিথি। সেদিন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট-এসোসিয়েটসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মুখরিত ছিলো রাজশাহী সেন্টার।

ব্যাপক এ আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্যে সেন্টারের প্রতিবেশী ও স্থানীয়রা করেছেন সবরকম সহযোগিতা। তাদের বাড়ির ছাদ ও জমিতে ৫টি স্টেশন নির্মাণ করে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ করেন প্রতিবেশীরা। সুস্বাদু খাবার সবাইকে তৃপ্তির সাথে খাওয়ানোর পরও যেন ফুরাচ্ছিলো না। বিদায় নেয়ার সময় অতিথিরা আবারও শিশুদের একনজর দেখে তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে প্রাণভরে দোয়া করেছেন। এতিমের মাথায় যার হাত থাকে, স্রষ্টার রহমত সরাসরি তার ওপর বর্ষিত হয়– এ বাণীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিললো সেদিন।

এতিম, পরিত্যক্ত যে মাসুম শিশুরা একসময় পরিস্থিতির বলি হতে যাচ্ছিলো, তারাই এখন একটু একটু করে বেড়ে উঠছে আলোকিত মানুষ হিসেবে। পরিবার তাদের স্থান দিতে পারে নি, কিন্তু তারাই একসময় সবখানে গড়ে নেবে নিজেদের সম্মানজনক অবস্থান। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সকল সদস্যের আন্তরিক দোয়া নিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে আত্মপরিচয় সৃষ্টির এই সাহসী অভিযাত্রীরা।

প্রতিবেদক : মো. রিয়াদ উল কবীর





শ্রমানন্দে করসেবা

শ্রম যখন আনন্দে রূপান্তরিত হয়, তখন সে শ্রমই হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত সাফল্যের উৎস। কাজের ওপর যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ তার জন্যে হয়ে যায় সহজ। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবও হয়ে যায় সম্ভব। বিস্ময়াভিভূত হয়ে মানুষ দেখে সেই মহান কাজের রূপকারকে।

আর একজন অনন্য মানুষ এই শ্রমানন্দকেই কাজে লাগায় তার মেধার সর্বোত্তম ব্যবহার করে অন্যের সেবায়। শ্রমানন্দে করসেবার পথে ধাপে ধাপে সে হয়ে ওঠে অনন্য অজেয় কালোত্তীর্ণ।

আসলে জীবনের সব অর্জনই কষ্ট ও পরিশ্রমনির্ভর। কারণ স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন কষ্ট ও পরিশ্রমনির্ভর করে। ২০০৮ সালের ১–৩ মে বার্ষিক নির্বাহী ওয়ার্কশপ থেকে শুরু করে কোয়ান্টায়নে জালালি, আখেরি দোয়া ও বছরব্যাপী অন্যান্য প্রোগ্রামে কষ্ট ও পরিশ্রম সম্পর্কে এই নতুন ধারণা, শ্রমানন্দের এই চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। ফলে ২০০৮-এ কোয়ান্টাম অভিধানে যুক্ত হয় নতুন দুটি শব্দ–শ্রমানন্দ ও করসেবা। আর এ শব্দ দুটির জয়ানুরণনেই সম্ভব হয় ২০০৮ সালে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর–এ ৯ মাসে ১২ মাসের কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন করা।

২০০৮-এর ডিসেম্বরে কোরবানির ঠিক আগে লামায় কোয়ান্টিয়ার ওয়ার্কশপ থেকেই মূলত শুরু হয় কায়িক শ্রমের মধ্য দিয়ে সেবানন্দে নিবেদিত হওয়ার অভ্যস্ততা। কোয়ান্টামমের কামরুল চত্বরে নতুন মঞ্চ তৈরির জন্যে দফতারান এবং প্রশান্ত শিখর থেকে হাজার হাজার ইট বয়ে আনেন নারী-পুরুষ, কিশোর-প্রৌঢ় নির্বিশেষে সকল কোয়ান্টিয়ার। এসব বহনে কারো ক্লান্তি তো ছিলোই না, বরং ছিলো জড়তা ভাঙার এক অসাধারণ আনন্দ, সহযোদ্ধা অনুভূতির এক অদ্ভুত তৃপ্তি। একইভাবে জ্বালানি কাঠ এবং পাথরও বয়ে আনেন তারা।

আর এরপর থেকেই কোয়ান্টাম সদস্যদের আত্মনির্মাণ ও চেতনা অনুশীলনের এক অন্যতম প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ালো করসেবা। এখন লামা কোয়ান্টায়ন, সাফারি বা অগ্রসর সদস্যদের নিয়ে অন্বেষায়ন–সবকিছুতেই আছে করসেবা পর্ব।



পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা করসেবা

লেখাপড়া জানা মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে কায়িক শ্রমের ব্যাপারে যে জড়তা আছে, তুচ্ছতাবোধ আছে – সেটা থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসেছেন কোয়ান্টাম সদস্যরা এ অনুশীলনের মাধ্যমে।

এখন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে নিয়মিতভাবে চলে পরিচ্ছন্নতা করসেবা। রাস্তা থেকে শুরু করে



নোংরা আদালতপাড়া, স্কুল-কলেজ ও পাবলিক টয়লেট–সবখানেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছেন ঝাড়ু, বেলচা, বালতি আর মফ নিয়ে। ঝেড়েমুছে চকচকে করে তুলছেন বছরের পর বছর অপরিষ্কার হয়ে থাকা জায়গাগুলো।

বাইরেটা পরিষ্কার করতে গিয়ে মলিনতামুক্ত হয়েছে তাদের ভেতরটাও। কোনো কাজের ব্যাপারেই এখন তাদের কোনো জড়তা নেই, দায়িত্ব নিতে শিখেছেন, কেটে গেছে অন্যের ওপর নির্ভরতা। বেড়েছে ফিজিক্যাল ফিটনেস, সেই সাথে মানসিক শক্তি।

আর এটাই করসেবার উপযোগিতা। যুগে যুগে কালে কালে সাধকরা তাদের সাধনার অংশ হিসেবেই ব্যাপৃত হতেন কায়িক শ্রমে, সেবানন্দে। অনন্য মানুষের পথে হাঁটতে চান যারা, তাদেরও তাই এগুতে হবে এ পথেই।

করসেবার সাংগঠনিক প্রভাবও খুব ফলপ্রসূ। ২০০৯ থেকে শুরু করে ২০১০, ১১ এবং ১২ – এই প্রতিটি বছরে মাটির ব্যাংক সংগ্রহকে হালনাগাদ করার যে কাজ হয়েছে সেখানে কোয়ান্টামের আর্ডেন্টিয়ার কর্মীরা আন্তরিকভাবে নিবেদিত হয়েছেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাটির ব্যাংক সংগ্রহে। ফলে সংগ্রহও হয়েছে আশানুরূপ।

২০০৯ সালে ৩০০ তম কোর্সকে কেন্দ্র করেও সুযোগ ঘটে করসেবার। বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের বাণী পৌঁছে দেয়ার মধ্য দিয়ে শত শত কোয়ান্টাম সভা এবং কোয়ান্টাম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সবার আন্তরিক শ্রমে রচিত হয় ৩০০ কোর্সপূর্তির এক বাঁকবদলকারী ইতিহাস।

শুধু গ্রাজুয়েটরাই নন, করসেবায় দেখা গেছে যে, পরিবারের এসোসিয়েট সদস্যরাও অংশ নিয়েছেন সক্রিয়ভাবে। এমনও এসোসিয়েট ছিলেন যিনি অফিস ছুটি নিয়ে করসেবায় কাজ করেছেন। এমনকি পাঁচ থেকে দশ বছরের শিশুরাও মা-বাবার সাথে এসে সাধ্যমতো কাজ করে গেছে।

শ্রমানন্দে করসেবার এ উদ্দীপনায় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা যেভাবে উজ্জীবিত হয়েছেন, তেমনিভাবে উজ্জীবিত হোক দেশের প্রতিটি মানুষ। দায়িত্ব নেয়ার, স্বাবলম্বী হওয়ার মানসিকতা আসুক সবার মধ্যে, প্রতিটি কাজকেই সম্মান করতে শিখুন সবাই–এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

প্রতিবেদক : মারুফ ইবনে মাহবুব



কোয়ান্টাম পল্লী
সাধনার মনের বাড়ি

পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে প্রকৃতি আর আধুনিকতার মিশেলে গড়ে উঠেছে চমৎকার এক স্বাস্থ্যনিবাস কোয়ান্টামম। ১৯৯৯ সালে প্রথম ধ্যানঘর তৈরির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টামম। এরপর ২০০০ সালে নির্মিত হয় বাংলো ও অফিসঘর। ২০০১ সালে আধুনিক টয়লেট, পানির ট্যাংক, নলকূপ ও পানি তোলার পাম্প এবং জেনারেটর স্থাপন করা হয়। মূল অংশের ১৫ একরসহ আশপাশ মিলিয়ে কোয়ান্টামমের বর্তমান পরিধি এখন ২৫ একর।

জেনারেটর আর সোলারের আলোয় সন্ধ্যা হতেই ঝলমলিয়ে ওঠে পুরো কোয়ান্টামম। অথচ আশেপাশে যতদূর দেখা যায় প্রায় পুরোটাই ঢাকা ঘন অন্ধকারে।

কোয়ান্টামমের প্রবেশদ্বার সালাম তোরণ দিয়ে ঢুকতেই শুঁড় উঁচিয়ে আপনাকে স্বাগত জানাবে একপাল হাতি। সত্যি নয়, এসব সিমেন্টের তৈরি ভাস্কর্য। কোয়ান্টামমের বিভিন্ন জায়গায় চোখে পড়বে এমনি আরো নানা কারু ও দারুশিল্প।

প্রায় সাড়ে তিন একর জায়গা জুড়ে রয়েছে অভয়ারণ্য 'কান্তারান'। এখানে অনেকগুলো হরিণের সাথে আছে খরগোশ, তিতির, দুর্লভ প্রজাতির হাঁস ও বহু নয়নাভিরাম পাখি। কোয়ান্টামমে এখন প্রায় ৩০০ প্রজাতিরও বেশি পাখি চোখে পড়ে।

আছে বিভিন্ন প্রজাতির হাঁসের চারণ লেক 'হংসলেক' ও কান্তারানে অবস্থিত মনোমুগ্ধকর 'আলোকায়ন হ্রদ'। প্রজাপতির বিচরণও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এ পর্যন্ত লামায় পাওয়া গেছে ৮০টিরও বেশি ধরনের প্রজাপতি।

ক্রমাগত বনায়নের ফলে একসময়কার শুষ্ক রুক্ষ উষর লামা এখন সবুজে সুশোভিত। প্রতিষ্ঠার প্রথম পাঁচ বছরে প্রায় ৩২ একর জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়। ২০১১ সালের বর্ষা মৌসুমে সবুজায়ন কার্যক্রমের আওতায় লাগানো হয় লক্ষাধিক চারা।

নিমস্কয়ার, পেয়ারা বাগান, আমলকি আর আনারস বাগান ছাড়াও রয়েছে প্রায় ৩ শতাধিক প্রজাতির বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছ। রয়েছে ৪৮ প্রজাতির ফুলগাছ।

নানা জাতের দেশি বাঁশ সংরক্ষণ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছে ব্যাম্বোরিয়াম। দেশে যে ৩০ প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়, এ পর্যন্ত তার ২৪টি এই ব্যাম্বোরিয়ামে নিয়ে আসা হয়েছে।

কোয়ান্টামমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান হচ্ছে হাজার বর্গফুটের ধ্যানঘর যার পাশ দিয়ে ঝর্নাধারা প্রবাহিত। ধ্যানঘরে বসলেই এর ধ্বনি মুহূর্তে আপনার মনকে নিয়ে যাবে প্রশান্তির এক সুগভীর সরোবরে। ধ্যানঘরে রয়েছে ৩০০ বর্গফুটের দখিনা বারান্দা। একসাথে ধ্যান করতে পারেন দুশ ধ্যানী।

আর কোয়ান্টামমের সাম্প্রতিক সংযোজন হলো শীর্ষদেশ গিরি ধাড়কানে নবনির্মিত হেক্সাগন আকৃতির নিরাময় মঞ্চ 'আরোগ্যশালা'। এখানে রয়েছে সহস্র রংধনু রঙে সজ্জিত পাথর যার ওপর বসে আত্মনিমগ্ন হন সবাই। আরোগ্যশালায় আগতদের জন্যে পাশেই রয়েছে অতিথিশালা।

২০০৯ সালে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ উদ্বোধন করেন শিশুকাননের নতুন খেলার মাঠ গ্রাউন্ড অলিম্পিয়ান–সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত যে মাঠটি দেশের সর্বোচ্চ খেলার মাঠ হিসেবে এখন পরিচিত।

কোয়ান্টামমে আবাসন হিসেবে রয়েছে বাংলো রহমাতান, ফ্যামিলি কটেজ সালামাতান, পাহাড়ের শীর্ষে বাংলো শোকরান। এছাড়া অর্গানিয়ার, শিক্ষকশিক্ষিকা এবং সিস্টারদের জন্যে রয়েছে বেহতারান, আলিশান, হুসনান ও আখলাকান। সপরিবারে থাকার জন্যে আছে পূর্বান ও শামারান।

কোয়ান্টামমের প্রথম সেমিপাকা ভবনটি হলো 'মহল স্বপ্নান' যা সেখানে কর্মরত আয়া ও পরিচারিকাদের জন্যে নির্মাণ করা হয়। পুরুষ ধ্যানীদের জন্যে রয়েছে গিরীশান ও অতীশান। মহিলা ধ্যানযাত্রীদের জন্যে ফাতিমান ১ ও ২। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ছাত্রদের আবাসন এখন স্থানান্তরিত হয়েছে ভ্যালি ইকরান চত্বরের নূর হল ও খান হলে। আবাসিক স্কুলের ৫০০ ছাত্র এখন এখানেই থাকে। আর শিশুদের জন্যে সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে ৪,৫০০ বর্গফুটের ডাইনিং হল নেয়ামাতান–যেখানে একসাথে খেতে পারে সাড়ে ৫ শ জন। আর কোয়ান্টামমের ৩,৫০০ বর্গফুটের ডাইনিং 'দরবারান' তো রয়েছেই। ১,৫০০-এর বেশি ধরনের মালামাল নিয়ে স্থাপিত হয়েছে 'ভান্ডারান'।

কোয়ান্টামমের চিকিৎসাকেন্দ্রটি পরিচিত 'শাফিয়ান' নামে–প্রফেসর এম ইউ আহমেদের নামানুসারে যার নামকরণ হয়েছে 'এম ইউ আহমেদ নিরাময় কেন্দ্র'। এছাড়া লামায় নির্মিতব্য কোয়ান্টাম হাসপাতালের জন্যে সম্প্রতি গ্রহণ করা হয়েছে প্রায় ৫ একর জমি।

৪,০০০-এর বেশি বই নিয়ে গড়ে উঠেছে 'অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পাঠাগার'।

নগরজীবনের যান্ত্রিকতা ও কোলাহল মুক্ত হয়ে নির্জন প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়ার জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় কোয়ান্টামম– সাধনার মনের বাড়ি।

বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে দিনে দিনে তা হয়ে উঠছে আরো সুসজ্জিত। পরিণত হয়েছে ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশে আত্মিক সাধনার জন্যে এক আকর্ষণীয় স্থানে।

প্রতিবেদক : মাকসুদ হোসাইন



জাতীয় খো খো টুর্নামেন্টে সাফল্য

২০০৯ সালে আন্তঃস্কুল খো খো টুর্নামেন্টে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। এটাই তাদের প্রথম কোনো টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ এবং শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাথে লড়ে বিজয়। আর ২০১২ সালে জাতীয় টুর্নামেন্টে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলার মধ্য দিয়ে রানার আপ হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। উপভোগ্য খেলা উপহার দেয়ার জন্যে পুরো টুর্নামেন্টেই কসমো স্কুলের দুটি দল ছিলো সবচেয়ে ফেভারিট। ফাইনালে মাত্র ২ পয়েন্টের ব্যবধানে রানার আপ হয় তারা।

মুরং সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম এ-প্লাস

কিছুদিন আগেও যারা জানতো না কীভাবে জুতো পরতে হয়, জুম চাষ বা মজুর খেটেই যাদের জীবন কেটে যেতো, সেই কিশোররাই এখন স্বপ্ন দেখে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কিংবা ব্যবসায় প্রশাসনে উচ্চশিক্ষা নেয়ার। বান্দরবানের অরণ্য জনপদের ৩ মুরং কিশোর তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম এসএসসিতে এ-প্লাস পেয়েছে।

গত ৩ বছর ধরেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শতকরা ১০০ ভাগ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হচ্ছে ওরা। জুনিয়র পরীক্ষায়ও প্রায় সবাই পেয়েছে 'এ'। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে দুজন।

ডাক্তার হয়ে বেরুবে নানওয়াই মুরং

২০১০ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্র নানওয়াই মুরং ভর্তির সুযোগ পায় খুলনা মেডিকেল কলেজে। বলাবাহুল্য, ডাক্তার হয়ে বেরুলে নানওয়াই-ই হবে তার সম্প্রদায়ের প্রথম এমবিবিএস ডাক্তার।

বঞ্চিত এ শিশুরাই শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের ফলে ২০০৩ থেকে প্রতি বছর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে লামা ও বান্দরবানে প্যারেড ও ডিসপ্লেতে ১ম স্থান অধিকার করে আসছে। ২০০৯ ও ২০১০-এ উপর্যুপরি প্রথম হওয়ায় ২০১১ সালে চট্টগ্রামে তারা লাভ করে বিশেষ পারদর্শিতা ক্রেস্ট।

ওপরের মন ভালো করে দেয়া খবরগুলো এমন এক জনপদের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেখানে লেখাপড়া তো দূরের কথা, খাবার রান্না করে খাওয়ার বিষয়টিও ছিলো তাদের অজানা। মহামারী বা ম্যালেরিয়ার কারণে কেউ মারা গেলে স্থানীয় বদ্যির পরামর্শে তার বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়া হতো। জীবনে কখনো দাঁতমাজা বা স্যান্ডেল পরার চিন্তা ছিলো কল্পনাতীত।

যাত্রা যখন শুরু

বান্দরবানের লামায় দুর্গম পাহাড়ি এলাকার সুবিধাবঞ্চিত এ শিশুদের জন্যে ২০০১ সালে মাত্র ৭টি মুরং শিশু নিয়ে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম শিশুকানন। ২০১২ সালে এসে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ শ-এ। বাঙালি ছাড়াও ১৫টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্রামা, খ্রিষ্টান, প্রকৃতি পূজারিসহ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী শিশুদের এমন সহাবস্থানের উদাহরণ পার্বত্য এলাকার অন্য কোথাও নেই। গত দুবছর ধরে নেত্রকোনা থেকে গারো ও তংচংঙ্গ্যা জাতিগোষ্ঠীর শিশুরাও ভর্তি হচ্ছে এখানে। ভ্যালি ইকরান চত্বরের প্রাক্তন স্কুলভবনটি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের আবাসন হিসেবে। আর স্কুল স্থানান্তরিত হয়েছে গিরি ফিকরান টিলায় প্রকৃতিবান্ধব চমৎকার স্থাপত্যরীতির এক সেমিপাকা ভবনে।

৩টি পর্যায়ে স্কুল কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

২০০৭ সালের গোড়া থেকে নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের জন্যে আবাসিক তত্ত্বাবধানে সূচনা শ্রেণী, পরিচারিকা ও স্টাফদের সন্তানদের জন্যে অনাবাসিক শাখা এবং বাকি আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্যে শিশু শ্রেণী থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত কোয়ান্টাম কসমো স্কুল–এ তিনটি পর্যায়ে স্কুল কার্যক্রম চলছে।

হতে হবে অলরাউন্ডার

ছাত্রদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্যে মূল পাঠক্রমের পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন সহপাঠ কার্যক্রম। খো খো দাবা শাওলিন কুংফু ক্যারম লুডু ব্যাডমিন্টন সাইক্লিং ইত্যাদি ইনডোর ও আউটডোর গেমসে তারা নিয়মিত অংশ নেয়।

ভোরে দরবারানে শিথিলায়ন মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাদের দিন। দিনে তিন সেশনে পাঠদান হয় শিশুদের। সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত স্কুল কার্যক্রম, বেলা ২.৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ যেমন–হাতের লেখা, চিত্রাঙ্কন, সাধারণ জ্ঞান, শিষ্টাচার ও সুবচনের ওপর ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত রয়েছে রিফ্রেশমেন্ট ক্লাস (আরসি)।

এছাড়াও তারা নিয়মিত শারীরিক শিক্ষা, এসেম্বলি ও কোয়ান্টাম ব্যায়াম চর্চা করে। রয়েছে করসেবা–শিশুদের স্বনির্ভর, পরিশ্রমী এবং চৌকস করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিদিনের এ কার্যক্রমে রয়েছে শারীরিক শ্রমের কাজ। যেমন–ইট বহন, বাজার আনা, লাকড়ি বহন ইত্যাদি।

বিভিন্ন সময়ে বিশেষ প্রশিক্ষক ও নিয়মিতভাবে স্থানীয় প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সাংস্কৃতিক ক্লাসে গান, নাচ ও আবৃত্তি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সেই সাথে রয়েছে দেয়ালিকা প্রকাশ, টিভি ও শিক্ষামূলক ডকুমেন্টারি দেখার সুযোগ।

ভর্তি উৎসব

প্রতি বছরই লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ৪–৬ বছর বয়সী ৫০ জন করে নতুন শিশু নেয়া হয় শিশুকাননে। শিশু মনোবিজ্ঞানের আলোকে যাচাই করা হয় তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং শারীরিক সক্ষমতা।

গ্রাউন্ড অলিম্পিয়ান

অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবোই–এ আপ্তবাক্য নিয়ে কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীরা এখন অনুশীলন করে গ্রাউন্ড অলিম্পিয়ান–তাদের নতুন খেলার মাঠে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হাজার ফুট উচ্চতায় নির্মিত এ মাঠটি এখন দেশের সবচেয়ে উঁচু খেলার মাঠ হিসেবে পরিচিত। ২০১০ সালে এর উদ্বোধন করেন জাতীয় ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

আঁধারে আলোর ফুলের মতোই কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের একেকটি ফুল আজ প্রস্ফুটিত হচ্ছে। আলোকিত হয়ে একসময় তারা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীময় আরো লক্ষ জীবনকে আলোকিত করতে– এ মনছবি এঁকে নিয়েই তারা এগিয়ে যাচ্ছে দৃপ্ত পদক্ষেপে।


সূচনা শ্রেণী

প্রতিবেদক :
ইঞ্জিনিয়ার ইফাত আরা

লামা কোয়ান্টায়ন

হিরন্ময় মৌনতার পথে যাত্রা



কোয়ান্টায়ন বা মৌন সাধনা আত্মনির্মাণের এক চমৎকার অনুঘটক। আর তা যদি হয় নিখাদ প্রকৃতিতে তাহলে তো কথাই নেই। কোয়ান্টামমে এখন প্রতিমাসেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৩ দিনব্যাপী কোয়ান্টায়ন। কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও প্রোমাস্টারদের জন্যে আলাদা আলাদা এ আয়োজনে অংশ নিন। উদ্ভাসিত হোন নতুন আত্ম উপলব্ধিতে।

লামা কোয়ান্টায়ন। নাগরিক কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে নিখাদ প্রকৃতির মাঝে নিজের অন্তরতম সত্তার সাথে একাত্ম হওয়ার এক অসাধারণ আয়োজন।

কোয়ান্টায়ন মানে হিরন্ময় মৌনতা। যাকে বলা যেতে পারে মেডিটেশনের দীর্ঘরূপ। নিছক চুপচাপ বসে থাকা নয়, এ মৌনতায় একজন মানুষ ডুবে যান আত্মশুদ্ধি ও আত্ম উপলব্ধির মগ্নতায়।

আমাদের মন হচ্ছে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রের মতোই এক অস্থির সত্তা। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কোনো বিশাল জাহাজ ডুবে গেলেও যেমন বোঝা যায় না, তেমনি অশান্ত মনে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো কথাও জাগাতে পারে না কোনো উপলব্ধির অনুরণন। আবার শান্ত নিস্তরঙ্গ হ্রদে ছোট্ট একটি ঢিলের তরঙ্গও যেমন পৌঁছে যায় বহুদূর, তেমনি একটি স্থির মনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ধরে রাখাও হয় খুব সহজ।

এ উদ্দেশ্যেই ৩ দিনব্যাপী কোয়ান্টায়নের আয়োজন, যাতে দীর্ঘ আত্মনিমগ্নতার মধ্য দিয়ে একজন মানুষ নতুন আত্ম উপলব্ধির সোপানে উপনীত হতে পারেন। বিশেষ এ কোয়ান্টায়ন এখন প্রতিমাসেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কোয়ান্টায়ন-যাত্রীরা বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার শান্তিনগর থেকে রওনা হয়ে কোয়ান্টামমে পৌঁছান শুক্রবার ভোরে। নাশতা ও বিশ্রামের পর ধ্যানঘরে রিপোর্টিং। সুখী জীবনের মেডিটেশনে অংশ নেয়ার পর হয় কোয়ান্টায়নের ওপর প্রারম্ভিক আলোচনা ও ব্রিফিং। এরপরই শুরু হয় নিবিড় কোয়ান্টায়ন।

পাহাড়ি স্থাপত্যশৈলীর ছনে ছাওয়া ধ্যানঘরের পাশ দিয়ে প্রবহমান ঝর্নাধারার অনুরণন আর বুনো প্রকৃতির ঘ্রাণ–সবমিলিয়ে অপার্থিব এক অনুভূতিতে ধ্যানযাত্রীদের হৃদয় ভরে ওঠে।

এরই মাঝে শুরু হয় আত্মপর্যালোচনা। কী করেছি, কী করি নি, কেন করি নি বা এখন কী করা উচিত? আত্মপর্যালোচনার এ অনুভূতি একদিকে যেমন বেদনার্ত করে হৃদয়কে, তেমনি পাপমুক্তির এক পবিত্র অনুভূতিতেও সিক্ত করে। জীবনের ভুলগুলো অবলোকন করে অনুশোচনা আর আত্মশুদ্ধির প্রার্থনায় মগ্ন হন সবাই।

রাগ ক্ষোভ ঘৃণা দুঃখ কষ্টের মতো আত্মবিনাশী আবেগগুলো আসলে একজন মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে। তার সম্ভাবনাকে বিকশিত হতে দেয় না। এই ক্ষতিকর আবেগের জঞ্জালমুক্ত হয়ে হৃদয়কে প্রেম ও ক্ষমায় প্লাবিত করার এক অনবদ্য উপলব্ধি লাভ করেন কোয়ান্টায়নকারীরা।

দ্বিতীয় দিনের শুরু হয় আরোগ্যশালায় মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে। এর পর করসেবা। কোয়ান্টায়নের এ এক উপভোগ্য পর্ব। শারীরিক শ্রমের কাজে সবাই মিলে অংশগ্রহণ। কখনো লাকড়ি টানা, কখনো মসজিদের মাটি কাটা কখনো বা পাথর বহন। আর এ কাজের মধ্য দিয়ে একটু হলেও কোয়ান্টামম গড়ার কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করার তৃপ্তি লাভ করেন কোয়ান্টায়নকারীরা।

দ্বিতীয় দিনের আরেকটি অনবদ্য সুযোগ লামার মসজিদে জুম্মার নামাজে অংশগ্রহণ। লামা কোয়ান্টায়নে এসেই অনেক মহিলার জীবনে প্রথম জুম্মার নামাজে শরীক হওয়ার সুযোগ ঘটেছে।

তৃতীয় দিনের সূচনা হয় গ্রাউন্ড অলিম্পিয়ানে মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে। শুকরিয়া, জীবনছবি আর সৎসঙ্গে একাত্মতার নতুন শপথে শুরু হয় তাদের পথচলা।

দুপুরের পর থাকে অনুভূতি-উপলব্ধির কথা জানিয়ে রিপোর্ট লেখার সুযোগ আর সবশেষে সমাপনী মেডিটেশন।

প্রোমাস্টার কোয়ান্টায়নও অনুষ্ঠিত হয় নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট অনুসরণ করে। কোয়ান্টায়ন করে কেউ ফিরে পান তার হারানো 'আমি'কে। কেউ আবিষ্কার করেন তার সম্ভাবনাকে, কেউ ঋদ্ধ হন নতুন উপলব্ধিতে।

এভাবেই জীবনের ব্যতিক্রমী ৩টি দিন কোয়ান্টায়নের হিরন্ময় মৌনতায় অবগাহন করে অভ্যস্ত জীবনে ফিরে আসেন তারা এক নতুন আলোকিত 'আমি' হয়ে।

প্রতিবেদক : নাজমুন নাহার রুমী





কোয়ান্টাম সাফারি

ধ্যান ও ভ্রমণে একাকার মন

কোয়ান্টাম সাফারি–দুদিনব্যাপী লামার কোয়ান্টামম ভ্রমণের এক উৎসবমুখর আয়োজন। কোয়ান্টাম পরিবারের গ্রাজুয়েট ছাড়াও তাদের পরিবার বন্ধু বা পরিচিত পরিমণ্ডলের সদস্যদের নিয়ে প্রায় প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ সাফারি।

বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার শান্তিনগর থেকে বাসে ওঠেন যাত্রীরা। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে রাত ৮টার মধ্যেই রিপোর্ট করতে বলা হয় সবাইকে। ব্রিফিং এবং হাজিরা শেষে একে একে বাসে ওঠেন তারা। নিজ পরিবারের সদস্যরা থাকলেও এ যাত্রার মধ্য দিয়ে সবাই যেন একীভূত হয়ে যান বৃহত্তর কোয়ান্টাম পরিবারের সাথে।

প্রত্যেক বাসের জন্যেই ঠিক করা হয়ে যায় একজন বাস লিডার–যিনি পুরো যাত্রাপথে সবার দেখ-ভাল করার দায়িত্ব নেন। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে শুরু করে বাসের চাকা। এক স্বপ্নযাত্রার উত্তেজনায় চনমনিয়ে ওঠে সবার মন। মাঝপথে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ২০ মিনিটের যাত্রাবিরতি, তারপর আবার চলা। অবশেষে আমিরাবাদের শাহপীর ফিলিং স্টেশনে বাস যখন থামে তখন সুবহে সাদিক মাত্র শুরু হয়েছে। কোয়ান্টিয়াররা দক্ষ হাতে চোখের নিমেষেই লাগেজের ব্যবস্থাপনা সেরে ফেলে। ঘুম জড়ানো চোখে শুরু হয় চাঁদের গাড়িতে করে আরেক যাত্রা।

এবড়ো-খেবড়ো পথ পাড়ি দিয়ে ঘণ্টাদেড়েক পরে কোয়ান্টামমের প্রবেশদ্বার সালাম তোরণের সামনে যখন চাঁদের গাড়ি থামে, তখন আর কারো চোখে ঘুম নেই। ঢুকেই অবাক হওয়ার পালা। একি! এই দিনের বেলায় হাতির পাল এলো কোত্থেকে! ধাওয়া করবে নাকি? আরে আরে এ-তো দেখি ভাস্কর্য। কিন্তু এ-তো বাস্তবের মতো!

যাত্রীদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর সাথে সাথে কে কোথায় থাকবেন সে ব্রিফিং-ও সেরে ফেলেন কোয়ান্টামমের কর্মীরা। লাগেজ নিয়ে সবাই চলে যান যার যার স্টেশনে। এরপর ফ্রেশ হয়ে সকালের নাশতা খাওয়ার জন্যে সবাই আসতে থাকেন কোয়ান্টামমের সুবিশাল ডাইনিং দরবারানে–যেখানে ৩০০ মানুষ একসাথে বসে খেতে পারেন।

নাশতার পর চা খেতে খেতে একটু গল্প করার সুযোগ। অবশ্য এর মধ্যেই হয়ে যায় মিলনায়তনে যাবার সময়। সেখানে সুখী জীবনের মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় সাফারি পর্ব।

এরপর গোসলের পালা। কিন্তু সে গোসল শহরের সাজানো-গোছানো বাথরুমের শাওয়ার বা বাথটাবে নয়, একদম বুনো প্রকৃতির মাঝখানে ঝিরির পাথুরে জলস্রোতে। আর মহিলারা তো আরো রোমাঞ্চকর অভিযানে। প্রায়ান্ধকার গিরিখাদ চিচিংফাঁকের হাঁটুপানি, কোমরপানি ভেঙে এগুচ্ছে তারা যেন কোন অজানা রহস্য ভেদ করতে। মাঝে মাঝে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে নানা লতা-গুল্ম, শামুক কিংবা বাঁশের খণ্ড। কিন্তু তারা এগিয়ে যাচ্ছেই। কারণ এ পথের শেষ যে তাদের দেখতেই হবে।

অবশেষে আসে সেই চিচিংফাঁক, দুই পাহাড়ের আলিঙ্গন যেখানে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। গলা ফাটিয়ে সবাই বলে চি-চিং ফাঁ-ক! ব্যস! খুলে গেল পথ। আর খানিকটা গেলেই এক পাহাড়ি ঝর্না। অনেক উঁচু থেকে আছড়ে পড়ছে যার সুশীতল জল।

চিচিংফাঁকের পাথরে সবাই বসে পড়ে ছোট্ট এক শুকরিয়ার মেডিটেশনে। নিয়ত করে ডুব দেয় সামনের জলাধারটিতে। অনেকেই বলেছেন তাদের অনেক দুরারোগ্য অসুখ ভালো হয়ে গেছে চিচিংফাঁকের এই জলে ডুব দিয়ে। মাটি মেখে ভালো হয়ে গেছে চর্মরোগ।

দুপুরে ফিরে খেয়ে সবাই ঘুম। বিকেলে কোয়ান্টামম ভ্রমণ। একে একে তারা ঘুরে দেখেন বাংলো, মুখতারান, শাফিয়ান, শোকরানসহ বিভিন্ন স্থাপনা। রহমগিরিতে উঠে রংধনু রঙে সজ্জিত ৫০০ পাথরকে যখন একসাথে দেখেন–বিস্মিত না হয়ে পারেন না। অবাক হয়ে যান শুনে যে, প্রতিটি পাথরই মেডিটেশনের আসন হিসেবে রাখা। কোয়ান্টামমের নির্মীয়মাণ মসজিদ চত্বরেও যান তারা।

সন্ধ্যায় মিলনায়তনে বসে প্রজেক্টরে ডিভিডি দেখার আয়োজন। লামার ওপর নির্মিত ডিভিডি অমানিশায় আলোর দিশা আর জাতীয় প্যারেড ও ডিসপ্লে-তে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ছাত্রদের কৃতিত্বের ওপর তৈরি ডকুমেন্টারি।

এরপর রাতের খাবার খেয়ে ঘুম। কারণ সকালে উঠতে হবে। যদিও সারাদিনের এত দৌড়ঝাঁপের পরও এতটুকু ক্লান্তি লাগছে না কারো।

পরদিন খুব ভোরে করসেবা। কোয়ান্টাম সাফারির এ এক উপভোগ্য পর্ব। শারীরিক শ্রমের কাজে সবাই মিলে অংশগ্রহণ। কখনো লাকড়ি টানা, কখনো মসজিদের মাটি কাটা কখনো বা পাথর বহন। আর এ কাজের মধ্য দিয়ে একটু হলেও কোয়ান্টামম গড়ার কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করার তৃপ্তি লাভ করেন অংশগ্রহণকারীরা।

এরপর আরোগ্যশালায় প্রার্থনার মেডিটেশন। আরোগ্যশালা হলো কোয়ান্টামমের শীর্ষদেশ গিরি ধাড়কানে হেক্সাগন আকৃতির নবনির্মিত নিরাময় মঞ্চ। এখানকার বিশেষ প্রাণশক্তিসমৃদ্ধ পানি পান করে অনেকেই লাভ করেছেন শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি। শুধু নিজে খাওয়া নয়, নিজের পরিজনদের জন্যেও পাত্র ভরে পানি নিয়ে আসেন সবাই।

ফিরে এসে নাশতা খেয়ে আবারও প্রকৃতি স্নান। এবার ছেলেরা চিচিংফাঁক ও মেয়েরা ঝর্নায়। তারপর দুপুরে খাবার ও কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ।

বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় কণিকা প্রতিযোগিতা। এর মধ্যেই সুযোগ করে চলতে থাকে ছবি তোলা, চা-মুড়ি খাওয়া, গল্প করা কিংবা চুপচাপ বসে প্রকৃতিকে দেখা। কেউ একটু সুযোগ করে নেন ধ্যানঘরে গিয়ে মেডিটেশনের তন্ময়তায় হারিয়ে যাওয়ার।

সন্ধ্যায় অনুভূতি বিনিময় পর্বে দুদিন ধরে অংশ নেয়া ধ্যানযাত্রীরা বর্ণনা করেন তার মনোমুগ্ধকর সব উপলব্ধির কথা।

এরপর সমাপনী আলোচনাতেই মনে পড়ে–এখন ফিরতে হবে।

যেতে নাহি চাই, তবু যেতে হয়–এর মতোই একসময় ফুরিয়ে যায় সময়। আবার আসতে হবে, বার বার আসতে হবে। এ তৃষ্ণা নিয়ে রাত্রির আঁধার কেটে ফেরত যাত্রার পথ যখন তারা ধরেন, নিজের অজান্তেই চোখ ভিজে ওঠে অশ্রুতে।

প্রতিবেদক : শিমুল মাহমুদ



চিচিংফাঁকে পাথরের ওপর বসে মেডিটেশন



বাংলা ভাষায় মেডিটেশনের প্রথম অডিও ক্যাসেট শিথিলায়ন। প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি। কালের প্রয়োজনে সেই অডিও ক্যাসেটই ২০০৫ সালে রূপান্তরিত হয়েছে ডিজিটাল অডিও সিডিতে। ১৯ বছরে এ ক্যাসেট/ সিডি পৌঁছে গেছে লক্ষ লক্ষ ঘরে। বাংলা ভাষায় আর কোনো ক্যাসেট/ সিডি কেউ এতবার বাজিয়ে শোনেন নি।

আর ২০১১ সালে Easy Relaxation সহ ৪টি ইংরেজি মেডিটেশন নিয়ে ২টি নতুন অডিও সিডি প্রকাশিত হয়েছে। শান্তির অন্বেষায়, রোগমুক্তির প্রচেষ্টায় সাফল্যের সন্ধানে বিশ্ববাসীর জন্যেও কোয়ান্টাম মেডিটেশনের চর্চা এখন উন্মুক্ত।

ক্যাসেট/ সিডি ১

সাইড-এ : শিথিলায়ন (শিথিল প্রক্রিয়া) ॥ প্রস্তুত হয়ে ক্যাসেট/ সিডি প্লেয়ার অন করে দিন। প্রথম শুরু করবেন সাইড-এ দিয়ে শিথিল প্রক্রিয়ায় শিথিলায়ন। সিডি/ ক্যাসেটে আপনাকে যা বলা হচ্ছে আপনি শুধু তা কল্পনা করে যাবেন। হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। শিথিলায়ন প্রক্রিয়ায় নিজেকে শুধু সমর্পণ করুন। তাহলেই চমৎকার শিথিলায়ন হবে। সাইড-এ বাজিয়ে দিনে ২ বার করে ১ মাস চর্চা করুন।

সাইড-বি : শিথিলায়ন (আরাম প্রক্রিয়া) ॥ সাইড-এ ১ মাস চর্চার পর সাইড-বি বাজিয়ে আরাম প্রক্রিয়ায় শিথিলায়ন করুন। মিউজিক বাজার সময় অটোসাজেশন, প্রত্যয়ন ও মনছবি, নিরাময় ইত্যাদি করতে পারেন। রাতে বিছানায় শুয়ে সাইড-বি বাজিয়ে মেডিটেশন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন।

ক্যাসেট/ সিডি ২

সাইড-এ : ভয় ॥ যেকোনো ধরনের ভয় দূর করতে কয়েকদিন নিয়মিত অনুশীলন করুন।

সাইড-বি : নেতিচিন্তা ॥ সকল নেতিবাচক চিন্তার অশুভ প্রভাব দূর করে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার জন্যে কয়েকদিন নিয়মিত অনুশীলন করুন।

ক্যাসেট/ সিডি ৩

সাইড-এ : রাগ ॥ রাগ ও ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্যে নিয়মিত অনুশীলন করুন।

সাইড-বি : ক্ষোভ ও ক্ষমা ॥ মনে সঞ্চিত সব ধরনের ক্ষোভ, ঘৃণা দূর ও ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে নিজের গুণাবলি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে নিয়মিত অনুশীলন করুন।

ক্যাসেট/ সিডি ৪

সাইড-এ : দুঃখ ॥ সব ধরনের দুঃখবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে কিছুদিন নিয়মিত অনুশীলন করুন।

সাইড-বি : অনুশোচনা ॥ পাপবোধ ও অনুশোচনা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে নিয়মিত কিছুদিন অনুশীলন করুন ।

[মনের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো, অর্থাৎ সাফল্য নিরাময় সুস্বাস্থ্য ও প্রশান্তি লাভের জন্যে রাগ ক্ষোভ ভয়-ভীতি ঘৃণা দুঃখ ইত্যাদি আগে দূর করা প্রয়োজন। তাই ১ নম্বর ক্যাসেটের এ-সাইড দিয়ে ১ মাস শিথিলায়ন করার পর বি-সাইড দিয়ে শিথিলায়ন চর্চা করুন। তারপর ২, ৩ ও ৪ নম্বর ক্যাসেট বাজিয়ে পর্যায়ক্রমে দিনে ২ বার করে অনুশীলন করুন। নিজের প্রয়োজন অনুসারে কোন মেডিটেশন কত দিন করবেন তা নিজেই ঠিক করে নিন। মনের বিষ থেকে মুক্ত হওয়ার পর আপনি মনোযোগ দেবেন মনছবিতে।]

ক্যাসেট/ সিডি ৫

সাইড-এ : মনছবি (শিথিল প্রক্রিয়া) ॥ দিন শুরু করুন মনছবি মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে। প্রতিদিন সকালে এর অনুশীলন করতে পারেন। মনছবি হচ্ছে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ পেশাগত সামাজিক পারিবারিক আর্থিক সৃজনশীল ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আপনার সর্বোচ্চ চাওয়া-পাওয়ার ছবি কল্পনায় সৃষ্টি করুন।

সাইড-বি : মনছবি (আরাম প্রক্রিয়া) ॥ এ মেডিটেশনে মনের বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘ মনছবির মধ্যে নিমগ্ন হবেন। পরিকল্পিতভাবে দিনের প্রতিটি কাজ করার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবেন।

ক্যাসেট/ সিডি ৬

সাইড-এ : নিরাময় (শিথিল প্রক্রিয়া) ॥
[নিরাময় কক্ষ মনের বাড়ির দরবার কক্ষের ডানপাশে অবস্থিত। বিশাল এ কক্ষে চিকিৎসা, ওষুধ ও প্রযুক্তির সুব্যবস্থা রয়েছে]

এ মেডিটেশনে নিরাময় কক্ষে বসে এক এক করে নিজ দেহের অঙ্গ পর্যবেক্ষণ করবেন। সুস্থতার মনছবির মাধ্যমে আত্ম-নিরাময়ের প্রক্রিয়াকে বেগবান করবেন।

সাইড-বি : নিরাময় (আরাম প্রক্রিয়া) ॥ এ প্রক্রিয়ায় আপনি নিরাময় কক্ষের বাইরে ভ্রমণ ও লেকে গিয়ে নিজের সব রোগব্যাধি বা সমস্যা লিখে পানিতে ফেলে দেবেন। জটিল রোগমুক্তির জন্যে দিনে ২ বার মেডিটেশনটি করা উচিত।

ক্যাসেট/ সিডি ৭

সাইড-এ : কল্পনা ॥ মানুষ যা কল্পনা করতে পারে, যা বিশ্বাস করতে পারে, তা অর্জনও করতে পারে। কল্পনার শক্তিকে শাণিত করার এ মেডিটেশনটি আপনার অবলোকন ও উপলব্ধি ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবে বহুগুণ। আপনার মনছবি হবে লক্ষ্যভেদী।

সাইড-বি : মস্তিষ্ক ॥ যুক্তি ও আবেগ, ভাষা ও সৃজনশীলতা, বৈষয়িক ও আত্মিক ভাবনা ইত্যাদির অর্থাৎ মস্তিষ্কের দুই বলয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সুন্দর সমন্বয়ের জন্যে মাঝে মাঝে এ অনুশীলন অত্যন্ত কার্যকর।

ক্যাসেট/ সিডি ৮

সাইড-এ : প্রকৃতির সাথে একাত্মতা-১ ॥ বিভিন্ন ধাতু ও সবুজ প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে নিজের শক্তিকে নবরূপে উপলব্ধি করার এক অনন্য মেডিটেশন এটি।

সাইড-বি : প্রকৃতির সাথে একাত্মতা-২ ॥ এ মেডিটেশনে সমুদ্রের বিশালতায় একীভূত হয়ে আপনি মহাপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবেন, প্রবেশ করবেন উপলব্ধির এক নতুন স্তরে।

ক্যাসেট/ সিডি ৯

সাইড-এ : হও উন্নত শির ॥ এ মেডিটেশনে হীনম্মন্যতা দূর করে নিজের অনন্যতায় বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে সাফল্যের পথে অগ্রসর হবেন।

সাইড-বি : লজ্জা ও সংকোচ ॥ লজ্জা, সংকোচ ও জড়তা দূরীকরণের মাধ্যমে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় কাজ করার জন্যে নিয়মিত অনুশীলন করুন।

ক্যাসেট/ সিডি ১০

সাইড-এ : আনন্দ ॥ দেহ-মনকে আনন্দে প্লাবিত করার এক অনন্য মেডিটেশন এটি। চমৎকার মিউজিক সম্বলিত এ মেডিটেশনে আলস্য বিষাদ দুঃখ জরা ব্যাধি গ্লানি ও হতাশা মুহূর্তে দূর হয়ে নতুন উদ্যম ও কর্মস্পৃহা অনুভব করবেন আপনি।

সাইড-বি : সুসম্পর্ক ॥ এ মেডিটেশনকে আপনি আত্মীয়, বন্ধু ও প্রিয়জনের সাথে ভুল বোঝাবুঝি দূর করে এক স্থায়ী সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে কাজে লাগাতে পারেন।

ক্যাসেট/ সিডি ১১

সাইড-এ : সুখী পরিবার ॥ পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক মমতা ও ভালবাসাই পারিবারিক শান্তির মূল ভিত্তি। এক সুখী ও সমৃদ্ধিশালী পরিবার গঠনে মেডিটেশনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সাইড-বি : পারিবারিক একাত্মতা ॥ পরিবারের সদস্যদের সাথে একাত্মতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভাবনীয় শক্তি, উদ্দীপনা ও প্রশান্তির ফল্গুধারা সৃষ্টি করতে পারবেন।

[প্রতি বৃহস্পতিবার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এ মেডিটেশনে মিলিত হোন]

ক্যাসেট/ সিডি ১২

সাইড-এ : যৌথ মেডিটেশন ॥ যৌথ মেডিটেশনে সম্মিলিত প্রার্থনা আপনার সুস্থতা ও সমস্যা সমাধানে কার্যকরী নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। তাই প্রতি শুক্রবার আপনার নিকটবর্তী সেন্টার/ শাখা/ সেলে **সাদাকায়ন কার্যক্রম** এবং মঙ্গলবার **আলোকায়ন কার্যক্রমে** অংশ নিন।

সাইড-বি : যৌথ সামাজিক মেডিটেশন ॥ সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে আপনার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও পরিচিতদের নিয়ে এ মেডিটেশনে মিলিত হতে পারেন।

ক্যাসেট/ সিডি ১৪

[এ দুটি মেডিটেশন শুধুমাত্র কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটরা অনুশীলন করতে পারবেন]

সাইড-এ : কমান্ড সেন্টার ॥ কমান্ড সেন্টার মনের বাড়ির মূল শক্তিকেন্দ্র। মনের বাড়ির দরবার কক্ষের বাম দিকের কোণে অবস্থিত দরজা দিয়ে ১০ থেকে ০ গণনা করে কমান্ড সেন্টারে প্রবেশ করতে হয়। নিজের ও মানবতার কল্যাণ কামনায় এবং রোগ নিরাময়ে কমান্ড সেন্টারের শক্তিকে আপনি সুসংহতভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

সাইড-বি : আত্মপর্যালোচনা ॥ এ মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে নিয়মিত আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আত্মনির্মাণের প্রক্রিয়া বেগবান হবে।

ক্যাসেট/ সিডি ৩০

সাইড-এ : শিক্ষার্থী ক্ষোভ-অভিমান ॥ মা-বাবা, অভিভাবক বা শিক্ষকের প্রতি ক্ষোভই অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায়। জমে থাকা এ ক্ষোভ দূর করে শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশে অত্যন্ত ফলপ্রসূ মেডিটেশন এটি।

সাইড-বি : আত্মদর্পণে শিক্ষার্থী ॥ নিজের ভুলগুলো শনাক্ত ও নিয়মিত রুটিন অনুসরণের মাধ্যমে মেধার পরিপূর্ণ বিকাশে শিক্ষার্থীদের জন্যে এক অনন্য মেডিটেশন।

ক্যাসেট/ সিডি ৩১

সাইড-এ : শিক্ষার্থী মনছবি ॥ এ মেডিটেশনে একজন শিক্ষার্থী জীবনের লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে অবলোকনের মাধ্যমে সাফল্যের মনছবি নির্মাণ ও তা অর্জনের প্রক্রিয়া অনুশীলন করেন।

সাইড-বি : নিমগ্ন পড়াশোনা ॥ ভালো রেজাল্টের জন্যে দিনরাত লেখাপড়া নয় বরং প্রয়োজন মনোযোগ, মনে রাখার কৌশল ও সময়ের ফলপ্রসূ ব্যবহার। আর আত্মনিমগ্ন পড়াশোনার এ মেডিটেশনটি শিক্ষার্থীকে দেবে কার্যকর সমাধান।

সুখী জীবন

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন–এই অপূর্ব ছন্দে একাত্ম হয়ে সুখ-সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবেন আপনি সুখী জীবনের মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে। আর সার্বজনীন প্রার্থনার মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে প্লাবিত হবেন পরম প্রভুর করুণায়। ভরে যাবে অপূর্ণতা, দূর হবে সকল শূন্যতা।

আসুন প্রার্থনা করি

প্রার্থনা সকল ইবাদতের নির্যাস। স্রষ্টা প্রার্থনা পছন্দ করেন এবং তা কবুল করেন। শাশ্বত ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে মাতৃভাষায় গ্রন্থিত প্রার্থনাগুলোরই অডিও রূপ 'আসুন প্রার্থনা করি'। অনন্ত কল্যাণের প্রত্যাশায় নিমগ্ন হোন প্রার্থনায়।

ইংরেজি মেডিটেশন

বিশ্ববাসীর কাছে সুস্বাস্থ্য প্রশান্তি আর সাফল্যের বাণী পৌঁছে দিতে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে মোট ৩টি অডিও সিডি। একটিতে আছে Easy Relaxation ও Sweet Sleep। শিথিলায়ন আর প্রশান্তিময় গভীর নিদ্রার জন্যে দুটি চমৎকার মেডিটেশন। আরেকটিতে আছে Happiness আর The Future নামে দুটি মেডিটেশন। প্রথমটি আনন্দ আর শুকরিয়ায় অবগাহনের, দ্বিতীয়টি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আর জীবনের লক্ষ্যকে সুসংহত করার জন্যে।

এছাড়াও আছে সিডি Well being. বাছাই করা ১০০ অটোসাজেশন আর প্রার্থনার এক অনবদ্য মেডিটেশন নিয়ে গ্রন্থিত এই সিডি।

হৃদরোগ নিরাময়ে মেডিটেশন

এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি ছাড়া হৃদরোগ নিরাময়ে চমৎকার সহায়ক এ মেডিটেশনগুলো। দুটি সিডিতে আছে হৃদয়ের কথা বলি হৃদয়ে, আত্ম পর্যালোচনা, হৃদরোগ নিরাময় ও সুস্থ হৃৎপিণ্ড নামে মোট ৪টি মেডিটেশন।

হে মানুষ শোনো!

আল কোরআন ও হাদীসের কিছু মর্মবাণীর অডিও রূপ হচ্ছে 'হে মানুষ শোনো'। এ সিডি আপনাকে আলোকিত করবে ধর্ম ও মানবিকতায়। ইহকাল ও পরকালে সফল ও সম্মানিত হওয়ার পথ পাবেন আপনি।



পবিত্র ধর্মবাণী

সকল ধর্মের মূল সুরের ঐক্যেরই এক অভূতপূর্ব নিদর্শন 'পবিত্র ধর্মবাণী'। বেদ, ভগবদ্গীতা, ধম্মপদ, বাইবেল এবং কোরআন ও হাদীসের মর্মবাণী নিয়ে গ্রন্থিত এ অডিও সিডির বাণীগুলো শুনলেই আপনি অনুভব করবেন ধর্মাচারে পার্থক্য থাকলেও সকল ধর্মের মূল শিক্ষা আসলে এক।

আত্মজাগরণ

জীবন বদলের এক অসাধারণ অনুঘটক এ সিডি। প্রতিদিন বলা বা শোনার মতো শত অটোসাজেশন নিয়ে গ্রন্থিত এ সিডির ট্র্যাকগুলো নিয়মিত অনুশীলন করলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপনার মধ্যে সঞ্চারিত হতে শুরু করবে এ গুণগুলো।

জীবন কণিকা

জীবনকে সুন্দর করার জন্যে অনেক কিছু নয়, প্রয়োজন সঠিক জীবনদৃষ্টি। জীবনদৃষ্টি সঠিক হলে আপনি রক্ষা পাবেন হোঁচট খাওয়া থেকে, বেঁচে যাবেন ভুল করা থেকে। মনে প্রশান্তি থাকবে, সুখ থাকবে, শুকরিয়া থাকবে। সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় আপনি এগিয়ে যাবেন সফল জীবনের পথে।

সঠিক জীবনদৃষ্টির এই ছোট ছোট কথা নিয়েই গ্রন্থিত সিডি জীবনকণিকা। বিষয়ভিত্তিক মোট ১৭টি ট্র্যাকে বিন্যস্ত এ সিডি নিয়মিত শুনতে শুরু করলেই আপনি বুঝতে পারবেন আপনার পরিবর্তন।

ওয়েবসাইট থেকে যেকোনো মেডিটেশন ফ্রি ডাউনলোড করা যায়



প্রকাশনা

বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ

গত ১৭ বছরে কোয়ান্টামের প্রকাশনা সমৃদ্ধ হয়েছে নানামুখী বৈচিত্রে। ফাউন্ডেশনের পাঠ তালিকায় সংযোজিত হয়েছে বেশকিছু প্রকাশনা।

কোয়ান্টাম মেথড



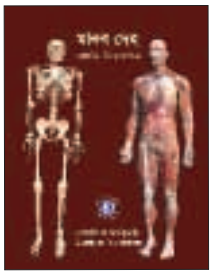
বাংলাভাষায় সর্বাধিক পঠিত ননফিকশন 'কোয়ান্টাম মেথড' নতুন সহস্রাব্দের প্রয়োজন পূরণে এক কালজয়ী গ্রন্থ যাতে রয়েছে সাফল্য নিরাময় প্রশান্তি ও প্রাচুর্যলাভের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বিবরণ।

কোয়ান্টাম কণিকা



আকারের ক্ষুদ্রতায় আর বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায় এক অভিনব প্রকাশনা কোয়ান্টাম কণিকা। আলোকিত জীবনের এরকম হাজারো সূত্র নিয়ে গ্রন্থিত এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। এখন চলছে এর ৩য় সংস্করণ। পড়ুন। উজ্জীবিত হবেন সঠিক জীবনদৃষ্টির আলোয়।

মানবদেহ



মানবদেহের অঙ্গসমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ ও অবলোকন ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ৮ পৃষ্ঠার রঙিন ফোল্ডার 'মানব দেহ' কোয়ান্টাম হিলিং সহায়িকা।

কোয়ান্টাম বুলেটিন



১৯৯৩ সাল থেকে 'আত্মনির্মাণ' নামে এবং ১৯৯৭ সালে প্রথম 'কোয়ান্টাম বুলেটিন' প্রকাশের পর ২০০১ সাল থেকে প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে কোয়ান্টাম বুলেটিন।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্য চর্চা



আধুনিক নর-নারীর মনোদৈহিক সুস্থতা ও সৌন্দর্যের প্রয়োজনকে সামনে রেখে দীর্ঘ দুই যুগের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফসল 'কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্য চর্চা' প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে।

অটোসাজেশন



বিশ্বসাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন ১০০০ অটোসাজেশনের সংকলনগ্রন্থ 'জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন'। ২০০৯ সালে দীর্ঘ ১৭ বছর পর প্রকাশিত হয়েছে মহাজাতকের এ নতুন বইটি। ২০১০ সালে প্রকাশিত হয় এর ইংরেজি সংস্করণ।

ডিভিডি



স্বেচ্ছা রক্তদানের ওপর বাংলাদেশে প্রথম ডকুমেন্টারি 'একটি প্রাণকে বাঁচাবো বলে' আর কোয়ান্টামের ওপর নির্মিত ডকুমেন্টারি 'অমানিশায় আলোর দিশা'র পর প্রকাশিত হয় আরো দুটি ডিভিডি 'আপনিও সুস্থ হতে পারেন' এবং 'কোয়ান্টাম বিশ্বাস ও বাস্তবতা'। প্রথমটি নিরাময় ও রোগমুক্তির কিছু ঘটনার প্রামাণ্যচিত্র আর দ্বিতীয়টি বিশ্বাস থেকে বাস্তবতায় রূপান্তরের ফাউন্ডেশনের কিছু ভিডিওচিত্রের গ্রন্থনা।

শিক্ষার্থী সহায়িকা



২০১০ সালে প্রকাশিত হয় 'কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী সহায়িকা'। এতে আছে ভালো রেজাল্টের জন্যে পরীক্ষায় প্রশ্ন নির্বাচন ও খাতায় উপস্থাপনের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ অনেকগুলো টিপস। প্রয়োগ করে অনেক শিক্ষার্থীই পেয়েছেন সফলতা।

কোয়ান্টাম স্টিকার : জীবনধর্মী বাণী সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন এ স্টিকারগুলো সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।





মঙ্গলবার আলোকায়ন

মঙ্গলবার আলোকায়ন। কোয়ান্টাম পরিবারে সপ্তাহের প্রাণোচ্ছল দিন। এ দিনটিতে ফাউন্ডেশনে এলে যে কেউই এটা বুঝতে পারবেন। সারাদিনে ১০টি সেশন। প্রতিটি ১ ঘণ্টা করে। একদল সিঁড়ি বেয়ে নামছেন তো আরেক দল ঢোকার জন্যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন। সবার জন্যে উন্মুক্ত এ কার্যক্রমে হাজার মানুষ সমবেত হন মেডিটেশন করতে, কাউন্সেলিং নিতে, জীবনকে সুন্দর করতে। আলোকায়নে আসাটাই এক অন্যরকম তৃপ্তি।

'বাবা বাবা ওঠো, আজ তো মঙ্গলবার! আলোকায়নে যাবে না?' এভাবেই সাড়ে তিন বছরের মেয়ে রুদাইবা ভোরবেলা বাবার ঘুম ভাঙায়। অফিসে যাওয়ার পথে আলোকায়নে অংশ নেন রুদাইবার বাবা মি. মামুন। এতে সারাদিন অফিসে তিনি কাজ করতে পারেন ঠান্ডা মাথায়। বাবার এই অভ্যাসের কথা ছোট্ট রুদাইবারও অজানা নেই। কারণ বাবার কোলে চড়ে সে-ও যে মাঝে মাঝে আসে আলোকায়নে।

মিসেস শারমীন সকালে বেইলি রোডের স্কুলে মেয়েকে নামিয়ে দিয়ে চলে আসেন আলোকায়নে। বেলা ১২টায় যখন মেয়েকে আনার সময় হয় ততক্ষণে তার ৩টি সেশনে অংশ নেয়া হয়ে গেছে।

তবে মিসেস শিরীন অবশ্য ছেলের স্কুল ছুটির পর একবারে তাকে নিয়েই আসেন। কারণ আলোকায়নে নিয়মিত অংশ নেয়ায় ছেলের মধ্যে বেশ পরিবর্তন দেখছেন তিনি। পড়ালেখায় বেশ মনোযোগী। বাসায় আগের মতো রাগারাগি করে না। মোবাইল নিয়েও আজকাল মেতে থাকছে কম। তাই আলোকায়নে আসা যাতে মিস না হয় এজন্যে যা যা করার সবকিছু করেছেন। এমনকি কোচিংয়ে পড়ার শিডিউলটাও এমনভাবে করিয়েছেন যাতে মঙ্গলবার ঐ সময় কোনো পড়া না থাকে।

মিসেস আনজুমানের মতো আরো অনেকেই বিকেলের সেশনে আসেন সপরিবারে। আলোকায়নের সে সেশনগুলোতে তখন তিল ধারণের জায়গা থাকে না। একটি সেশন চলতে থাকে আর পরের সেশনে অংশ নেয়ার জন্যে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন অনেকে। দোতলায় হল থেকে লাইন লম্বা হতে হতে নিচতলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

ইকবাল আহমেদ মতিঝিলের একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে আছেন। অফিস শেষ করে বাসায় যাওয়ার আগে আলোকায়নের সন্ধ্যার সেশনটায় তিনি আসেন। তার ভাষায়, সারাদিনের কর্মক্লান্তি দূর হয়ে এক চমৎকার প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে আমি ফিরে যাই বাসায়। মাঝে মাঝে তার স্ত্রীও চলে আসেন বাসা থেকে। আলোকায়ন শেষ করে দুজনে একসাথে ফেরেন বাসায়।

মি. মামুন, মিসেস শারমীন, মিসেস শিরীন, বা মি. ইকবালের মতো আরো অনেকের কাছেই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় প্রশান্তি হলে প্রতি মঙ্গলবার আয়োজিত আলোকায়ন কার্যক্রমটি পরিণত হয়েছে সপ্তাহের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত একটি দিনে। সকাল সাড়ে ৭টার প্রথম সেশন থেকে শুরু করে রাত ১০টার শেষ সেশনের পরও মুখর হয়ে থাকে প্রশান্তি হল এবং সংলগ্ন অফিস চত্বর।

১ ঘণ্টার একেকটি সেশনকে সাজানো হয়েছে জীবনকে সফল ও সুন্দর করার নানা বিষয়ে আকর্ষণীয় আলোচনা আর আধঘণ্টার মেডিটেশন দিয়ে। ছাত্রছাত্রী গৃহিণী পেশাজীবী ব্যবসায়ীসহ সব পেশার সব বয়সের সব ধর্মের মানুষের জন্যে বিষয়গুলো এত উপযোগী আর জীবনঘেঁষা যে মঙ্গলবারের এই সারাদিনে গড়ে হাজার জন আসেন শান্তিনগরে কেন্দ্রীয় প্রশান্তি হলে।

কেন্দ্রের পাশাপাশি ঢাকার মিরপুর এবং চট্টগ্রাম সিলেট রাজশাহী সেন্টারেও যথারীতি অনুষ্ঠিত হয় এ কার্যক্রম। আলোকায়নের এ কার্যক্রমটি সবার জন্যেই উন্মুক্ত। ফলে গ্রাজুয়েটরা তাদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-বন্ধু, প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে আসতে পারেন এখানে।

সিমিন আর তার বোন কোয়ান্টাম মেথডের ২৯৮তম ব্যাচে অংশ নিয়েছিলো। কিন্তু ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামে আসতে গেলে বাবা বাধা দিতেন। রিটায়ার করার পর সারাক্ষণ বাসায় থাকা বাবার চোখ এড়িয়ে যে আসবে সে সুযোগও নেই। অগত্যা দুবোন একদিন বুঝিয়ে শুনিয়ে বাবাকে নিয়ে এলো আলোকায়নে।

পুরো পরিবেশ তাকে এত মুগ্ধ করলো যে, তারপর থেকে ৩০০ ব্যাচে কোর্স করার আগে একটি আলোকায়নও তিনি মিস করেন নি। ফাউন্ডেশনের এখন তিনি পুরোদস্তর একজন স্বেচ্ছাকর্মী। কেটে গেছে অবসর জীবনের অবসাদ আর বিষণ্নতা।

আলোকায়নে প্রতি সপ্তাহে থাকে নতুন নতুন আলোচনার বিষয়। মেধার বিকাশে মেডিটেশন, টেনশন ও অস্থিরতা মুক্তির উপায়, দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবেলায় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরাময়ের রহস্য, সাফল্যের পঞ্চসূত্র, আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার উপায়– এ ধরনের বিষয়ে মাসব্যাপী চলে ধারাবাহিক আলোচনা। আলোচনার সাথে মিল রেখে মেডিটেশনেও থাকে বৈচিত্র।

২৭ বছর বয়সী তরুণ রেজা। বছরখানেক আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরুলেও ভালো কোথাও জব পাচ্ছিলেন না। এক বন্ধুর কাছে শুনে একদিন চলে এলেন আলোকায়নে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আর কর্মজীবনের সাফল্যের সূত্রের কথাগুলো তাকে দারুণ প্রভাবিত করলো। কোর্স করলেন। এখন একটি বেসরকারি অফিসে ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত।

আলোকায়নের আলোচক হিসেবে থাকেন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশার সফল ব্যক্তিত্ব এবং ফাউন্ডেশনের অর্গানাইজারগণ।

ঢাকার ইমপিরিয়াল কলেজের শিক্ষক জনাব ইমামউদ্দিন কলেজ ছুটির পর নিয়মিতভাবেই ১৫/২০/৩০ জন ছাত্রের একেকটা দলকে নিয়ে চলে আসেন আলোকায়নে। এটা কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের আগ্রহের কারণেই।

আলোকায়নের কাউন্সেলিং সেশনে উপস্থিত থাকেন শিক্ষার্থী, পারিবারিক, মেডিকেল এবং ক্যারিয়ার কাউন্সিলরবৃন্দ। যেকোনো বিষয় নিয়ে তাদের সাথে নিঃসঙ্কোচে আলোচনা করা যায় পরিপূর্ণ গোপনীয়তার নিশ্চয়তায়।

চারপাশে যেখানে নেতিবাচক কথা, রোগ শোক জরা ব্যাধিতে মানুষ জর্জরিত, তখন আলোকায়ন থেকে তারা পাচ্ছেন নতুন আলোর দিশা। শুরু করতে পারছেন সাফল্যের অভিযাত্রা। নির্মাণ করছেন আলোকিত অনন্য মানুষের জীবন।

প্রতিবেদক : ফেরদৌসী সুলতানা

শুক্রবার সাদাকায়ন

প্রতি শুক্রবার সারাদেশের সেন্টার শাখা ও সেলগুলোর সাদাকায়নে সমবেত হন বন্ধু ও আত্মীয়সহ কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা। মেডিটেশন আলোচনা হিলিং কাউন্সেলিং ও সৃষ্টির সেবায় ব্যয় করেন দেড়টি ঘণ্টা। সৎকর্মের আনন্দানুরণনে ছন্দায়িত হয় পুরো সপ্তাহ।

মিসেস জিন্নাত আরার প্রতি শুক্রবার গুলশান-ধানমণ্ডি-গুলশান যাতায়াতেও ক্লান্তি নেই। বরং বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে ঘণ্টা ধরে কাউন্ট ডাউন করতে থাকেন যে, কখন সকাল হবে। কারণ শাখায় এসে তিনি যে উদ্দীপনা পান তাতে সপ্তাহের বাকি দিনগুলো তার বেশ ভালো যায়।

ব্যাংকার মইনুল ইসলাম খানের আগে যেখানে ছুটির দিনে ঘুম ভাঙতো বেলা ১১টায়, এখন তিনি শুক্রবার শাখায় আসেন প্রোগ্রাম শুরুর অন্তত আধঘণ্টা আগে। তার স্ত্রী সুমাইয়া আনোয়ার মৌটুসীর বেড়েছে সেবার মানসিকতা। যেখানে যতটুকু পারেন সেবা দেয়ার চেষ্টা করেন।

মোহাম্মদ হোসেনের কাছে সাদাকায়নের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ যৌথ মেডিটেশন। শাখায় সবার সাথে মেডিটেশন করলে খুব সহজেই তিনি মনের গভীরে ডুবে যান।

৩৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট নাসিম আরা বেগমের বোন-ম্যারোর গুরুতর সমস্যায় যখন মাদ্রাজে চিকিৎসা চলছিলো তখন শাখায় তার জন্যে প্রতি শুক্রবার যৌথ হিলিং হতো। এখন তিনি ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে অনেকটাই মুক্ত।

সাদাকায়নে আসা মানেই গৃহিণী সালমা আক্তারের মন ভালো হয়ে যাওয়া। তাই ঘরের কাজ সামলে কোনোদিন আসতে না পারলে তিনি একটু মনমরাই থাকেন।

ব্যবসায়ী আজমল হোসেন কোর্স করার পর শাখায় নিয়মিত ছিলেন। মাস ছয়েক দেখা নেই। এরপর হঠাৎ একদিন উপস্থিত। চেহারা বিধ্বস্ত। জানা গেল, ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে। মাঝখানে ব্যস্ততা এত ছিলো যে, একবেলা মেডিটেশন করারও সময় করতে পারতেন না। শাখাতেও অনিয়মিত হয়ে গেলেন। দুঃসময়ে অন্তত ফাউন্ডেশনের দোয়াটুকু পাবেন বলে আবার আসা শুরু করলেন। এখন তার ব্যবসা আগের চেয়ে ভালো চলছে।

নুসরাত ছোটবেলা থেকেই একটু লাজুক। শাখা আয়োজিত এক ব্লাড ক্যাম্পে পরিচালক যখন তাকে ডোনার মোটিভেশনের দায়িত্ব দিলেন তখন তার মাথায় হাত। অপরিচিত কাউকে রক্তদানের কথা কীভাবে বলবে! শেষ পর্যন্ত ভালোভাবেই কাজটি করলো। এখন সবার সাথে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারে।

অনুভূতিগুলো গ্রাজুয়েটদের কাছ থেকে শোনা তাদের চোখে সাদাকায়ন কার্যক্রম সম্পর্কে। ১৯৯৫ সাল থেকে এ কার্যক্রম নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

প্রতি সপ্তাহে শাখা-সেলগুলো মুখরিত হচ্ছে নতুন নতুন অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে। ফলে সেন্টার শাখা সেলের পরিসর যেমন বিস্তৃত হচ্ছে, তেমনি বাড়ছে এলাকাভিত্তিক নতুন সেল ও প্রাইমারি সেলের সংখ্যা।

উষ্ণ অভ্যর্থনা আর হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের কারণে প্রথমবার এসেই সবাই অনুভব করেন তিনি যেন তার আপন জায়গায় এসেছেন। আর নিয়মিত অংশগ্রহণকারীরাও এখানে এসে পান আত্মার আত্মীয়ের সাথে মিলিত হওয়ার আনন্দ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তন্ময় দত্ত থাকেন সূর্যসেন হলে। শাখায় এসে তিনি বাড়ির অভাব ভুলে যান। কারণ তন্ময়ের কাছে কোয়ান্টাম পরিবারের আত্মিক বন্ধন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শাখার পরিচালক ও নির্বাহী ভাইয়ারাই তার লোকাল গার্জিয়ান।

সেন্টার শাখা সেলগুলো হচ্ছে ফাউন্ডেশনের একেকটি সেবাকেন্দ্র। শাশ্বত চেতনাকে নিজের মধ্যে ধারণ এবং মেডিটেশনের সুফল ধরে রাখা সহজ হয় যখন পাশে থাকেন সমমনা আরো সহযাত্রী।

ফাউন্ডেশনের সেবা কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয় শাখা-সেলের মাধ্যমে। এই সেবা বা সাদাকা থেকেই সাদাকায়ন। সাধ্যমতো সঙ্ঘবদ্ধ সৎকর্ম করার চমৎকার সুযোগ রয়েছে এখানে। তাই মেধা, শ্রম ও সময় দিয়ে যেকোনো বয়সী, যে কেউ এ সেবার মাধ্যমে পুণ্যের ভাগীদার হতে পারেন। পাশাপাশি মানুষের উপকারের মধ্য দিয়ে আপনার মেধাকে বিকশিত করতে পারেন শতধারায়।

কোয়ান্টাম বৈঠক

কোয়ান্টাম মেথড সম্পর্কে জানার এক চমৎকার আয়োজন কোয়ান্টাম বৈঠক। মেডিটেশন কী ও কেন, কোয়ান্টাম মেথডের আলোকে কীভাবে প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য লাভ করা যায়– এ বিষয়গুলো নিয়ে এক ঘণ্টা বা তারও কম সময়ে আলোকপাত করা হয় এ অনুষ্ঠানে।

এ পর্যন্ত সারা দেশে সেন্টার শাখা সেলের নিজস্ব উদ্যোগ ছাড়াও কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও এসোসিয়েটদের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে আয়োজিত হয়েছে কোয়ান্টাম বৈঠক। ইতোমধ্যে কোয়ান্টামের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে গেছে স্কুল-কলেজ, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক হল বা মেস, করপোরেট অফিস, ব্যাংক, শিল্প-কারখানা, বিভিন্ন পেশাজীবী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এপার্টমেন্ট কমিউনিটি, বিউটি পার্লার, বুটিকস, ব্যায়ামাগার, এমনকি পার্ক, সী-বিচ, নদীর পাড় বা বাসায় গৃহিণীদের মাঝে। কোয়ান্টাম সম্পর্কে কৌতূহলী হাজার হাজার মানুষ এ বৈঠক থেকে লাভ করছেন আলোকিত জীবনের পথ-নির্দেশনা।

প্রতিবেদক : নাজমুন নাহার



কোয়ান্টাম বৈঠকে আগতদের একাংশ

এগিয়ে যান ধাপে ধাপে

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার মধ্য দিয়ে আপনি নির্মাণ করবেন একটি নতুন জীবনের কাঠামো। আর এই কাঠামোকে সুশোভিত করে সদানন্দে বিচরণ করার জন্যেই পরবর্তী কোর্সগুলো।



প্রথমায়ন কোর্স

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অগ্রসর সদস্যদের মেধার বিকাশে ও আন্তরিক সেবাদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্যে প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম প্রথমায়ন। দক্ষ চৌকস এবং সাংগঠনিক ও নেতৃত্বের গুণাবলিতে সমৃদ্ধ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব নির্মাণের ২ দিনব্যাপী এ কোর্সটি ৫টি পর্বে বিন্যস্ত। কোর্সটি পরিচালনা করছেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান।

কোয়ান্টাম মেথড রিয়েলাইজেশন কোর্স

আধ্যাত্মিক সাধনার অগ্রবর্তী ধাপ হিসেবে কোয়ান্টাম মেথড রিয়েলাইজেশন কোর্স (যা উচ্চতর কোর্স বা মাস্টার্স কোর্স নামেও পরিচিত) বিশাল অতীন্দ্রিয় সম্ভাবনার জগতের প্রবেশদ্বার। উচ্চতর কোর্সে অংশগ্রহণ করে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে সম্ভব এক বিষাদমুক্ত সদানন্দ জীবন লাভ।



কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কোর্স

ভালো রেজাল্ট করাটা খুবই সহজ। করতে চাইলেই করা যায়। এজন্যে অতি মেধাবী হতে হবে, বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে হবে তা-ও নয়। কিছু বিশেষ নিয়মে লেখাপড়া করাই যথেষ্ট।

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কোর্স সাফল্যের প্রয়োজনীয় নির্দেশনারই এক গ্রন্থনা যার আন্তরিক অনুসরণ ধাপে ধাপে একজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে যাবে ক্লাসে ১ম ও জীবনে ১ম হওয়ার পথে। গুরুজীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কোর্স পরিচালনায় রয়েছেন কৃতী শিক্ষার্থী রাবিয়া নাজরীন। ২ দিনের এ কোর্সে শিক্ষার্থী শিক্ষক ও অভিভাবকসহ স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো ছাত্রছাত্রী কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট এতে অংশ নিতে পারেন। বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি রয়েছে মেডিটেশন, এসাইনমেন্ট ও গ্রুপ ডিসকাশন। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সমস্যাকে সঠিকভাবে শনাক্ত ও দূর করার প্রক্রিয়ায় শামিল হতে পারেন।



কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কোর্স

মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারের মাধ্যমে মন ও মস্তিষ্ককে বিশেষ স্তরে নিয়ে গিয়ে নিজের ও অন্যের কল্যাণ সাধনের প্রক্রিয়া চর্চাই হলো কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কোর্স।

২ দিনের এ কম্প্যাক্ট কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন গ্রাজুয়েট লাভ করেন নিজের ও অন্যের (পরিচিত/অপরিচিত) রোগ নির্ণয়, নিরাময় ও কল্যাণ কামনার প্রক্রিয়া; কথায়, কাজে ও সিদ্ধান্তে প্রজ্ঞা, উপলব্ধির ভিন্নমাত্রা এবং এর জ্ঞানকে কাজে লাগানোর সামর্থ্য। কোর্সটি পরিচালনা করছেন ডা. মনিরুজ্জামান।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কোর্স

অনন্ত যৌবন কালজয়ী মন

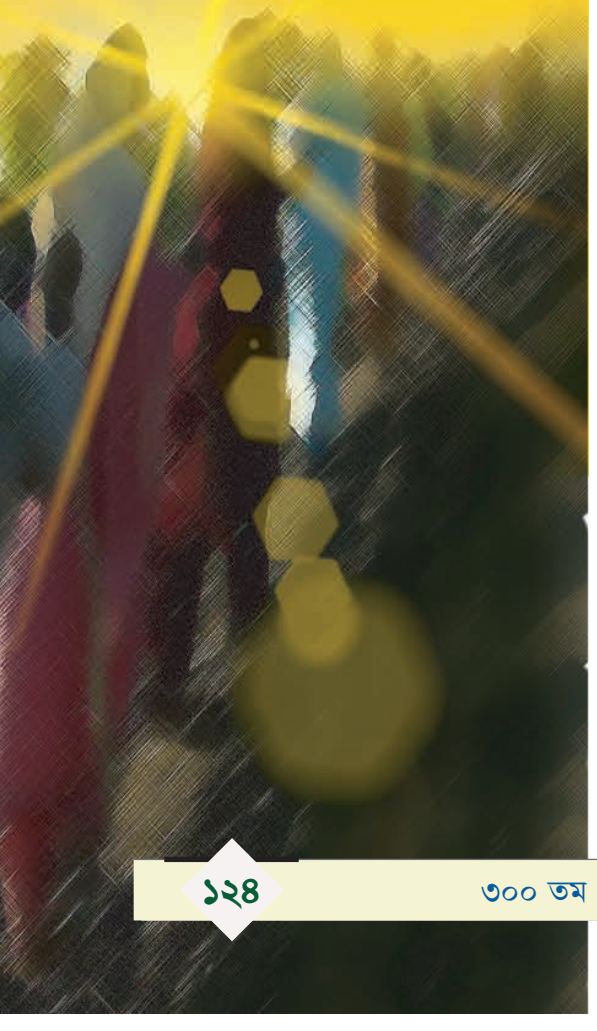
অনন্ত যৌবন ও কালজয়ী মনের অধিকারী পরিপূর্ণ সুস্থ জীবনের জন্যে মেডিটেশনের পাশাপাশি প্রয়োজন ব্যায়াম চর্চা। ব্যায়ামের মধ্যে সেরা হচ্ছে কোয়ান্টাম ব্যায়াম। ১৯৮৩ সাল থেকে যোগ মেডিটেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম মহিলাদের জন্যে এ ব্যায়াম প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেন মা-জী নাহার আল বোখারী।

এরপর তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ফাউন্ডেশনের অর্গানাইজারদের পরিচালনায় নতুন আঙ্গিকে পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় এটি শুরু হয়। ২০০৯-এর এপ্রিল থেকে শুরু হয় ব্যায়ামের 'কম্প্যাক্ট কোর্স'। ২ দিনের এ কম্প্যাক্ট কোর্সের ফলে এখন অংশগ্রহণকারীরা প্রতিটি টেকনিক থেকে আরো দ্রুত উপকৃত হচ্ছেন।



কোয়ান্টামে নারী

সারা পৃথিবীতে নারী যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করছে, সে অধিকারগুলো ফাউন্ডেশনে সে পেয়েছে কোনো সংগ্রাম ছাড়াই। ফাউন্ডেশনে নারী ও পুরুষ এক কাতারের সহযোদ্ধা। যথোপযুক্ত সুযোগ ও সম্মান পাওয়ায় নারী তার মেধাকে বিকশিত করছে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেতনার প্রসারে সে অনেকের চেয়ে অগ্রসর ...



গৃহিণী হোন বা পেশাজীবী, অসহায় বা আপাত সফল, প্রাচ্যের অথবা পাশ্চাত্যের, প্রত্যেক নারীর জীবনের নেপথ্যেই পাওয়া যাবে একটি অজানা অধ্যায়। যেখানে একজন নারী হিসেবে তাকে প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হতে হয় নানা প্রতিকূলতার। মেধা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পাড়ি দিতে হয় বন্ধুর পথ। আপাত সুখের অন্তরালে ভোগ করতে হয় বঞ্চনা ও নিগ্রহ।

এ নিগ্রহের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে নারীকে তার প্রকৃত মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা মানবিক মহাসমাজ নির্মাণের পূর্বশর্ত। ফাউন্ডেশন শুরু থেকেই এ লক্ষ্যে কাজ করে এসেছে। আর তার প্রথম পদক্ষেপ হলো নারীকে ঘিরে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও আচার-অভ্যাস দূর করা।

২০০৩ সালে 'পারিবারিক জীবনে অবিদ্যা' শীর্ষক ওয়ার্কশপে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক পারিবারিক জীবনের প্রধান অবিদ্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন নারীর প্রতি ভ্রান্তবিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিকে। ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেন, নারী সকল পাপের উৎস, ছেলে আপন মেয়ে পর– এ ধারণাগুলো একান্তই অবিদ্যা। যে পরিবারে নারীর সম্মান নেই, সে পরিবারে কখনোই সুখ, শান্তি আসতে পারে না। তিনি বলেন, জ্ঞান অর্জন ও আত্মপরিচয় সৃষ্টিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে দিতে হবে সমান অধিকার।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নারীর আকর্ষণ সহজাত। সেই সাথে নারী ও তার অধিকারের প্রতি এই সম্মানের কারণে কোয়ান্টামকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন সমাজের সকল স্তরের নারীরা। কোয়ান্টাম চেতনাকে লালন করার পাশাপাশি সম্পৃক্ত হচ্ছেন কোয়ান্টামের বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে। কেউ গৃহকর্ম বা পেশার পাশাপাশি, আবার কেউ জীবনের সবটুকু সময়ই দিচ্ছেন ফাউন্ডেশনকে। সামাজিকভাবে সম্মানিত প্রতিশ্রুতিশীল ক্যারিয়ার ছেড়ে কোয়ান্টামকে মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছেন অনেক নারী।

পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যম নারীপুরুষের সম্পর্ক এমনভাবে চিত্রিত করছে যে, তারা যেন পৃথিবীতে মারামারি কাটাকাটি করতে এসেছে। কিন্তু কোয়ান্টাম চেতনায় নারীপুরুষ একে অপরের পরিপূরক। ফাউন্ডেশনে এসে নারীরা তাই পাচ্ছেন একটি শান্তিময় পারিবারিক জীবন নির্মাণের অনুপ্রেরণা এবং এ সংক্রান্ত নানা কার্যকর পথ-নির্দেশনা। পাশাপাশি পাচ্ছেন তাদের অবদানের স্বীকৃতি এবং আত্মপরিচয় সৃষ্টির সুযোগ।

একসময় যাদের পরিচিতি ছিলো শুধুই একজন গৃহিণী– ঘরকন্নার কাজ, অতিথি আপ্যায়ন আর বিনোদনের নামে টিভি দেখেই যাদের জীবন কেটে যেতো, তারাই ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম হয়ে চমৎকার মেধার স্বাক্ষর রাখছেন নানামুখী ক্ষেত্রে। দ্বিধাহীন বিশ্বাস আর আন্তরিক আচরণ দিয়ে সহজেই অন্যদের উদ্বুদ্ধ করছেন কোর্সে অংশগ্রহণ অথবা মাটির ব্যাংকে দান করতে। জীবনে কোনোদিন মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ান নি যিনি, চমৎকার উপস্থাপনায় তিনি অনুপ্রাণিত করছেন শত শত মানুষকে। দক্ষভাবে পরিচালনা করছেন হাজার হাজার সদস্যবিশিষ্ট কোয়ান্টাম সেল বা শাখা।

রক্তদান থেকে ত্রাণ কার্যক্রম, চিকিৎসাসেবা থেকে বৃক্ষরোপণ– সব কার্যক্রমেই পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করছেন নারীরা। প্রতি বছরই বাড়ছে নারীদের অংশগ্রহণের হার। হিলিং এবং কোয়ান্টায়নে পুরুষদের তুলনায় নারীদের অংশগ্রহণই বেশি।

সফলভাবে সন্তান পালন করার পর অথবা আনুষ্ঠানিক ক্যারিয়ার শেষ করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে সময় দিয়ে জীবনের শেষার্ধকে চমৎকারভাবে অর্থপূর্ণ করে তুলছেন অনেক নারী। কেন্দ্র পরিচালিত হিলিং সেশনে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের সম্মান অর্জন করেছেন মোহাম্মদপুর শাখার বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সুরজাহান বেগম। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বেগম শামসুন্নাহার, যিনি একসময় পিঠ ও হাঁটুব্যথায় প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিলেন, এখন মিরপুর সেন্টারের সেবা কার্যক্রমের আওতায় অসুস্থদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের জন্য দোয়া করছেন। নার্সিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল হিসেবে অবসর গ্রহণের পর কোয়ান্টাম শিশু সদনের পরিচালক হিসেবে নতুন জীবন শুরু করেছেন সাহিদা বানু।

সারা পৃথিবীতে নারী যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করছে, সেই অধিকারগুলো ফাউন্ডেশনে সে পেয়েছে কোনো সংগ্রাম ছাড়াই। ফাউন্ডেশনে নারী ও পুরুষ এক কাতারের সহযোদ্ধা। যথোপযুক্ত সুযোগ ও সম্মান পাওয়ায় নারী তার মেধাকে বিকশিত করছে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়।

ফলে ফাউন্ডেশনে বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রমের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের একটা বড় অংশই এখন নারী। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ও পরিচালক সমন্বয়– দুজনই নারী। শাখার পরিচালকদের মধ্যেও নারীদেরই প্রাধান্য। সাংগঠনিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের নেতৃত্বেও আছেন নারীরা।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেতনার প্রসারে পুরুষের চেয়েও অগ্রগামী নারীরা। আন্তরিক ও অকৃত্রিম আচরণের মাধ্যমে সহজেই অন্যদের কোয়ান্টামের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন গৃহিণীরা। স্বামীদের তুলনায় স্ত্রীরাই তাদের জীবনসঙ্গীদের কোর্সে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন বেশি। ঘরে ঘরে কোয়ান্টাম বৈঠক আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনেককে ৩০০ তম কোর্সে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছেন অনেক নারী।

কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে যে, চেতনার বিস্তৃতি ও এর স্থায়িত্বের একটি অপরিহার্য শর্ত হলো পারিবারিক ভিত্তি। কোয়ান্টাম চেতনার পারিবারিক ভিত্তি লাভের প্রধান অনুঘটক হিসেবেও কাজ করেছে নারীরা।

সত্য ও কল্যাণের আশ্রয়ে নারীরা যুগ যুগের বঞ্চনা হতে মুক্ত হয়ে সুন্দর আলোকিত জীবন লাভ করবেন এবং নিজেরাও সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃপ্ত ভূমিকা রাখবেন এ মনছবিই দেখে কোয়ান্টাম।

প্রতিবেদক : বনানী তানজিমা রহমান



কোয়ান্টাম পরিবার সুখী পরিবার

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত চতুর্থ দিন সকাল। ধ্যানের স্তরে মা-বাবার প্রতি গভীর ভালবাসায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন অংশগ্রহণকারীরা। নতুন করে অনুভব করেন সুখী পরিবারের গুরুত্ব। আর এজন্যে কোয়ান্টাম সূত্র ও পারিবারিক মেডিটেশন চর্চার প্রয়োজনীয়তা। বৃহস্পতিবারকে তারা পালন করেন পারিবারিক দিবস হিসেবে। আলোকিত পরিবার কার্যক্রমে নিয়ে আসেন পরিবারের সবাইকে।

সংসার ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত বাদ দিয়েছি

এম বানু

আমার শাশুড়ি ও ননদের আচরণ এতই অমানবিক ছিলো যে, সিদ্ধান্ত নিই– এ পরিবারে থাকা সম্ভব নয়। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার সময় আলোকিত পরিবার কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারি। সেই থেকে নিয়মিত ফ্যামিলি কাউন্সেলিং নেয়ার পাশাপাশি মেডিটেশন ও হিলিং শুরু করি। কিছুদিন পরই পাল্টে যেতে থাকে শাশুড়ি ও ননদের আচরণ। তাই সংসার ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত বাদ দিলাম।

এখন তিনি মাসে দেন ২০ হাজার টাকা

এন পারভীন

আমার স্বামী, স্ত্রী-সংসার-সন্তানের পেছনে কোনো খরচ করতে চাইতেন না। সংসারের সব বিষয়ে তার নজরদারি– চাল কেন ফুরিয়ে গেল, ডিম গেল কোথায়, ওয়াশিং পাউডার এত তাড়াতাড়ি ফুরালো কেন ইত্যাদি। সারা বছর তো স্ত্রী-সন্তানকে কোনো কাপড় দিতেনই না এমনকি ঈদেও না। বরং আমার বাবার কাছ থেকে কিছু নিয়ে এলে সেটাও নিয়ে নিতেন।

২০০৮ সালে গুরুজী যখন ঘোষণা করলেন, '২০০৮ সাল কোয়ান্টামের ২০০৮ সাল আপনার', আমি মনছবি দেখতে শুরু করলাম, আমার স্বামী আমাকে নিয়মিত টাকা দিচ্ছেন। কিছুদিন পর তিনি আমার মা-বাবার সামনে অঙ্গীকার করলেন, সংসার খরচ বাবদ মাসে ১৫,০০০ টাকা দেবেন। এখন তিনি সংসার খরচ বাবদ মাসে ২০,০০০ টাকা দেন। আমার এবং বাচ্চাদের পোশাক লাগলে তা-ও কিনে দেন।

স্বামীর পরিবর্তনে অভিভূত

এস বেগম

আমি এবং আমার স্বামী– দুজনই সম্মানজনক পেশায় আছি। বিয়ের কিছুদিন পর আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা শুরু হয়। একসময় সেটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, স্বামী গায়ে হাত তুলতেও শুরু করে। আর এসবের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে আমার সন্তানের ওপর। যে ছেলেটি সবসময় ভালো রেজাল্ট করতো, হঠাৎ করেই সে খারাপ করতে শুরু করে।

কোর্সে অংশ নেয়ার পর থেকে পারিবারিক শান্তির জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন, হিলিং ও মাটির ব্যাংকে দান করতে থাকলাম। কিছুদিন পরই পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করলো। আগে আমার স্বামী সবকিছু চাওয়ার আগেই তৈরি না থাকলে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যেতো। অথচ এখন তার সহনশীল আচরণে আমি অভিভূত। বাস্তবে আমি তাকে কিছুই বলি নি, শুধু কমান্ড সেন্টারের মেডিটেশনে মমতার সাথে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। সন্তানের রেজাল্টও আবার ভালো হচ্ছে।

শাশুড়িকে দেখি মায়ের মতো

ই জাহান

আমার বিয়ের ৩ বছর পর আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। কোর্স করার পর শ্বশুরবাড়ির প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আসে। শাশুড়িকে মায়ের মতোই শ্রদ্ধা-ভালবাসার চোখে দেখতে শুরু করি। স্বামীর ভাই-বোনকে করে নিলাম নিজ ভাই-বোনের মতোই আপন। শ্বশুরবাড়ির প্রতি এ মমতার ফলে আজ ১৪ বছর ধরে আমি সফলভাবে সংসার করছি। তারা আমাকে আপন ভাই-বোনের চাইতেও বেশি আপন মনে করে।

১৫ বছর পর মা-বাবা একত্রিত হলেন

এ খান

আমি ছোট থাকতেই আমার মা-বাবা আলাদা হয়ে যান। অনেক কষ্টে মা আমাকে লালনপালন করেন। খুব ইচ্ছে হতো মা-বাবাকে একসাথে দেখার। কিন্তু সন্তান হিসেবে কষ্ট পাওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিলো না। ১৯৯৫ সালে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করলাম। ১৯৯৭-এর শেষের দিকে পুরোদমে বাবা-মাকে একত্র করার চেষ্টা শুরু করলাম। এজন্যে গুরুজী কমান্ড সেন্টার এবং মনছবির মাধ্যমে তাদের বোঝানোর পরামর্শ দিলেন। আমি তা-ই করলাম। ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে সবাইকে অবাক করে দিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর পর আমার মা-বাবা আবার একত্রিত হলেন।

আব্বা এখন সবার খোঁজখবর রাখেন

আর করিম

আমার আব্বা খুব বদরাগী ছিলেন। প্রায়ই চিৎকার চেঁচামেচি করতেন। আমার বোনদের সাথে প্রায় কথাই বলতেন না। তিনি একটি পার্বত্য জেলায় গাছের ব্যবসা করেন। সেখানে গেলে সপ্তাহ, মাস পেরিয়ে যেতো কিন্তু পরিবারের কোনো খোঁজ নিতেন না। আমি কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে বোঝাতে শুরু করলাম, আব্বা এরাই আপনার আপনজন। সন্তানদের সাথে সবসময় সুন্দর আচরণ করুন। তাদের নিয়মিত খবর নিন। তাদের মেধা-দক্ষতা-যোগ্যতা বিকাশের জন্যে দোয়া করুন। আল্লাহর অশেষ রহমতে আব্বা এখন সবার সাথে আগের চাইতে অনেক সুন্দর আচরণ করেন। নিয়মিত সবার খোঁজখবর রাখেন। সবার সাথেই তার সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

সন্তান আবার ভালো রেজাল্ট করছে

নায়রা

স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার পর নানা প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে ধৈর্য একেবারেই কমে গিয়েছিলো। রাগলে সন্তানকে মারধোর করতাম। তার বাবার বিরুদ্ধে অনেক নেতিবাচক কথা বলতাম। কোর্সে অংশগ্রহণের পর এসব নেতিবাচক অভ্যাস অনেক কমেছে। সন্তানের লেখাপড়ায় এ পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। দুবছর ধরে ক্লাসে তৃতীয় হওয়ার পর গত দুই সেমিস্টারেই সে প্রথম হয়েছে।

আগামী দিনের অনন্য মানুষেরা

সাদিয়া

আমার ছেলের যখন জন্ম হয় আমি তখন ছাত্রী। গর্ভাবস্থায় নিয়মিত আনন্দের মেডিটেশন করেছি। জন্মের পর নিয়মিত অটোসাজেশন দিয়েছি 'আমরা সবসময় আনন্দময়' 'আমরা সবসময় প্রশান্তিময়।' করুণাময়ের অনুগ্রহে আমার ছেলের ঘুম ভাঙে হাসি দিয়ে। সারাদিন হেসে খেলে কেটে যায়। একটা বিভাগীয় শহরে ওকে নিয়ে একা থাকতাম। এমনও হয়েছে মুদি দোকানদার, বস্তির মহিলার কাছে ওকে রেখে ভার্সিটিতে যেতে হয়েছে। সব পরিস্থিতির সাথে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এখন ওর বয়স ৫ বছর। আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত ওর কোনো বড় অসুখ হয় নি। যখন খেতে চাইতো না, বলতাম– শুদ্ধ খুব ভালো ছেলে, খাবার দিলেই খেয়ে ফেলে। এদিকে ৪ মাস আগে জন্ম নেয়া আমার মেয়েটি রাতে ঘুমাতে চাইতো না। আমি তাকে কোলে নিয়ে বলতাম, 'তুমি ভালো মেয়ে, তুমি হাসিখুশি, তুমি রাতে ঘুমাও।' ওদের দুজনকেই আমি অটোসাজেশন দিই, 'তোমরা অনন্য মানুষ হবে।' একদিন আমার সে সাজেশনও সত্যি হবে এই স্বপ্নই আমি দেখি।

স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ নিয়েছি

অনামিকা

আমার কাবিন হওয়ার এক সপ্তাহ পর স্বামী ইতালি চলে যান। প্রথম দিকে জীবন দুর্বিষহ মনে হতো। হতাশা ও অনিশ্চয়তার কারণে খারাপ সঙ্গ, খারাপ কাজ এমনকি মাদকাসক্তির পথ বেছে নিতেও দ্বিধা করি নি। চেষ্টা করেছি আত্মহত্যার।

কোর্স করার পর মনে হয়েছে, কী বোকাই না আমি ছিলাম! যা ছিলো আমার স্বর্ণ সময় তাকে ধূলিসাৎ করেছি। এখন আবার শুরু করেছি গ্রাউন্ড জিরো থেকে। লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়েছি, শ্বশুরবাড়ির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছি, স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রতিজ্ঞা করেছি। খুঁজে পেয়েছি আলোকিত জীবনের সহজ সরল পথ।

দুবছরে একবারও ঝগড়া হয় নি

এন জামান

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার আগে আমার স্ত্রীর সাথে প্রায়ই ঝগড়া বেঁধে যেতো। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছিলো আমার সন্তানের ওপর। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণের পর আমি স্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ দেই যে, আমাদের আর ঝগড়া হবে না। কোর্স করার পর দুবছর পেরিয়ে গেছে, সত্যি সত্যি আমাদের একবারও ঝগড়া হয় নি। স্ত্রী ঝগড়া শুরু করতে চাইলে আমি আগেই হার মেনে নিই। ঝগড়াতে হেরে যে এত মজা, এত উপকার আগে জানলে এতদিন শুধু শুধু ঝগড়া করতাম না।

মা বুকে জড়িয়ে ধরলেন

এন হোসেন

মা-বাবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আমার পারিবারিক জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। মা-বাবার মধ্যে সদ্ভাব ছিলো না। থাকতাম মায়ের সাথে। বাবার সাথে মাঝে মাঝে যোগাযোগ হতো। এ ব্যাপারটাকে মা পছন্দ করতেন না। প্রায়ই দুর্ব্যবহার করতেন। একসময় আমার মনে হতো পৃথিবী একটা কারাগার। মৃত্যুই মুক্তির উপায়।

কোর্স করার পর আমার চিন্তা-চেতনা পুরোপুরি পাল্টে গেল। নিয়মিত পারিবারিক মেডিটেশনে পরিবারের সবার জন্যে দোয়া করতে লাগলাম। মা-র বকা-ঝকা, কটুকথা, গালিগালাজ, মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ সব হাসিমুখে সহ্য করেছি। এমনকি মা যখন আমার টিউশনির টাকায় কষ্ট করে কেনা কলেজের বই-পত্রগুলোও জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছেন তখনও প্রো-একটিভ ছিলাম। মেডিটেশনে নিজেকে অটোসাজেশন দিতাম যে, মাকে আমি আরো শ্রদ্ধা করছি। তার সব আচরণকে প্রো-একটিভভাবে নিচ্ছি। মনছবি দেখতাম, মায়ের প্রতি আমার ভালবাসা আরো দৃঢ় হচ্ছে।

একদিন মা তার ভুল বুঝতে পেরে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আজ আমাদের পরিবারের সবাই সমমর্মী ও মমতাশীল। যদিও অর্থের অনটন আছে, মাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, তবুও আজ আমরা অনেক সুখী।

আব্বু কখন বাসায় আসবা?

এ মান্নান

১৯৯৭ ও ২০০২ সালে পর পর দুটি অর্থনৈতিক দুর্ঘটনার ফলে আমি অভাবগ্রস্ত ও হতাশ হয়ে পড়ি। এ হতাশার প্রভাব পড়ে আমার পারিবারিক জীবনে। প্রায় প্রতিদিনই বাসায় গিয়ে রাগারাগি করতাম, সামান্য ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত হয়ে যেতাম। নেশার জালেও জড়িয়ে গিয়েছিলাম। একসময় লক্ষ্য করলাম আমার স্ত্রী, সন্তান আমার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আমি বাসায় থাকলে তারা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতো কখন কী হয়ে যায়। কখনো যদি আমাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হতো, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো যে, আমি বাসায় নেই। মারামারি চিৎকার চেঁচামেচি থেকে কয়েকদিনের জন্যে তারা রেহাই পেয়েছে।

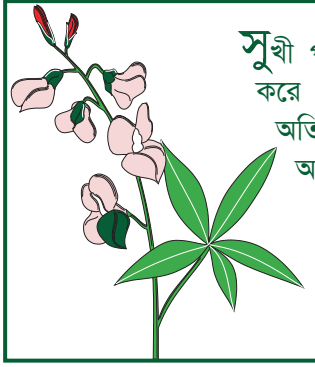
একদিন আলোকায়নে শুকরিয়ার আলোচনা শোনার পর আমার মনে প্রশ্ন জাগে, স্রষ্টা তো আমাকে অনেক দিয়েছেন, তারপরও কেন আমি এত হতাশাগ্রস্ত। সেই থেকে আমার পরিবর্তনের শুরু। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণের পর এ পরিবর্তন আরো গভীর হয়। এখন আমি অনেক ধৈর্যশীল ও সদাচারী। ফলে আমার পারিবারিক জীবনে এত সুখ ও শান্তি এসেছে যা আমি আগে কল্পনাও করতে পারতাম না। যে সন্তানরা আমি ঘরে না থাকলে খুশি হতো, এখন কিছুক্ষণ ঘরে না থাকলে তারা তিনবার ফোন করে জিজ্ঞেস করে, আব্বু কখন বাসায় আসবা?

বাবাকে এখন আমিই বোঝাই

এ খাতুন

খুব অল্প বয়সে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে পিতা মাতা ও স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে জীবনকে নিরানন্দ ও নিজেকে মূল্যহীন মনে হতো। ছোট ভাই-এর অনুপ্রেরণায় কোর্সে এসে পেলাম এক নতুন জীবনের আহ্বান। নিজেকে পরিবারের অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসতে পেরেছি। এখন সবাই আমাকে বোঝে, গুরুত্ব দেয়। এমনকি অসুস্থ-রাগী বাবাকে কিছু বোঝাতে হলেও আমিই কথা বলি, যা ছিলো অকল্পনীয়।

প্রতিবেদক : নূর আখতার হেলেন



সুখী পারিবারিক জীবনের কোয়ান্টাম সূত্রগুলোকে অনুসরণ করে অনেক পরিবারই এখন অতীতের ভুল বোঝাবুঝিকে অতিক্রম করে আগের চেয়ে সুখী। কোয়ান্টাম সদস্যরা অধিকাংশই আগের চেয়ে ভালো মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন। সুন্দর ও মমতাময় পারিবারিক জীবনের যে ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে, তা যুগ যুগ শুধু টিকেই থাকবে না, আরো বিকশিত হবে, এটাই কোয়ান্টামের মনছবি।

প্রবাসে মেডিটেশন

আমি এক অনন্য মানুষ, আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম। সারা পৃথিবী আমার। যেখানে দরকার সেখানে যাবো। যা প্রয়োজন তা-ই নেবো। যা চাই তা-ই পাবো– কোয়ান্টাম প্রত্যয়নের এ প্রেরণাকে সামনে রেখেই কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটরা এখন ছড়িয়ে পড়ছেন সারাবিশ্বে। প্রবাসে সফল পেশা-শিক্ষা-পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি তারা কোয়ান্টাম চেতনা বিস্তারের জন্যেও কাজ করছেন, সংগঠিত হচ্ছেন সৎসঙ্ঘের একেকটি ইউনিট হিসেবে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কোয়ান্টামের পদযাত্রা শুরু হয় ২০০২ সালের ২০ অক্টোবর গুরুজী-মা-জীর ইউরোপ সফরকালে লন্ডনে একটি সেল স্থাপনের মধ্য দিয়ে। মাত্র ১৫ জন নিয়ে যে সেল যাত্রা শুরু করে এখন সেটি কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি নামে পুরোদস্তুর একটি শাখা। রবিবার সকালে স্থানীয় আইকন কলেজে বিরতিহীনভাবে চলে একের পর এক কার্যক্রম। সাড়ে ৯টা থেকে কোয়ান্টাম ব্যায়াম, সাড়ে ১০টায় আলোকায়ন, পৌনে ১২টায় সাইকি কোর্স এবং সবশেষে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে প্রো-মাস্টার্স কার্যক্রম। সদস্যরা বলেন, সপ্তাহের যান্ত্রিকতার পর এই দিনটি যেন তাদের কাছে ঈদের আনন্দ নিয়ে আসে।

২০০২, ২০০৬ এবং ২০০৮ সালে গুরুজীর পরিচালনায় লন্ডনে মেডিটেশনের ওপর ৪ দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালে লন্ডনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত কোয়ান্টায়নে জালালিতে অংশ নেন প্রায় ১০০ গ্রাজুয়েট। ২০০৮ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর মা-জীর লন্ডন সফরের সময় অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার, দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ, প্রো-মাস্টার নৈশায়ন এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ।



২০০৮-এর সফরকালে লন্ডনে কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির সদস্যদের মেডিটেশন করাচ্ছেন মা-জী



৪ জুলাই ২০০৯ ওয়ার্কশপে USA সেলের সদস্যরা

মা-জীর এ সফরকালে কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির ৩০ জন সদস্য যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেল্‌থ সার্ভিসে রক্তদান করেন। এভাবে আরো ৪ বার তারা রক্তদান করেছেন। রক্তদানের ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের সাধারণ জনগণের আগ্রহ যেখানে কমছে, সেখানে এই আন্তরিকতা অভিভূত করেছে ন্যাশনাল হেল্‌থ সার্ভিসের কর্মকর্তাদের।

পরিচালক নজরুল ইসলাম এবং প্রধান নির্বাহী শাহ আহমেদ সাদিক-এর নেতৃত্বে লন্ডন শাখায় কাজ করছে একঝাঁক কর্মী। জুলাই মাসে দুবার ইন্টারনেট স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে আলোকায়ন এবং কোয়ান্টাম সভার আলোচনা সরাসরি সম্প্রচার করেছেন তারা। লন্ডন শাখার তত্ত্বাবধানে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে কোয়ান্টামের বেশ কিছু সেল।

বিশাল যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন কোয়ান্টামের সদস্যরা। এদের সাথে যোগাযোগ করে ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি সামিনা মুস্তারীন, নুসরাত শারমিন, সামিরা ফারাহ এবং আরো দুজন সক্রিয় সদস্য গঠন করলেন ইউএস ভার্চুয়াল সেল। প্রতি রবিবার নির্দিষ্ট সময়ে যার যার অবস্থান থেকেই মেডিটেশন শুরু করলেন তারা। এছাড়া শনিবার রাত ১১টায় হিলিং, বুধবার রাত ১১টায় প্রো-মাস্টার্স মেডিটেশন এবং মাসের তৃতীয় রবিবার দুঘণ্টার জন্যে কোয়ান্টায়ন করেন তারা। প্রতিবছর জুলাই-এর ৪ তারিখে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে আসছে ইউএসএ সেল। জুলাই ২০০৯-এর ওয়ার্কশপে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত হন ২৯ জন গ্রাজুয়েট।

২০০৮-এর ৪ মে কাজ শুরু করে স্কটল্যান্ডের এবারডিন সেল। এখানে সাদাকায়নের পাশাপাশি হিলিং, মাটির ব্যাংক, রক্তদান কার্যক্রম চলছে। ২০০৯-এ এবারডিনের বাংলামেলায় রক্তদান সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম চালান তারা। স্টল পরিদর্শন করে তাদের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবারডিনের মেয়র।

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখে শারজায় যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টামের ইউএই সেল। সেখানে এক সপ্তাহ পর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে যৌথ মেডিটেশন।

কোয়ান্টাম দম্পতি ফখরুল আলম চৌধুরী এবং নাজনীন সুলতানার উদ্যোগে ১১ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় সিডনির অর্বান-এ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে যৌথ মেডিটেশন এবং কোয়ান্টাম মেথড বই-এর ওপর পাঠচক্র। এছাড়া সুইডেন এবং বেলজিয়ামেও সম্প্রতি শুরু হয়েছে কোয়ান্টামের কার্যক্রম।

আন্তর্জাতিক শাখা সেলের ছায়ায় অথবা ওয়েবসাইট/ই-মেইলের মাধ্যমে যারাই প্রবাসে থেকেও কোয়ান্টাম চেতনা লালন করার চেষ্টা করেছেন, পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে প্রবাস জীবনের নানা প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠে সুখ ও সমৃদ্ধির পানে এগুচ্ছেন তারা সকলেই।

প্রতিবেদক : বনানী তানজিমা রহমান



উদ্বোধনের দিন UAE সেলের সদস্যরা



লাইভ ইন্টারনেট স্ট্রিমিংয়ে লন্ডন শাখার সদস্য সারাহ বিনতে সালেহ এবং জাকির হোসেন

সেলিব্রেটি জগতে মেডিটেশন

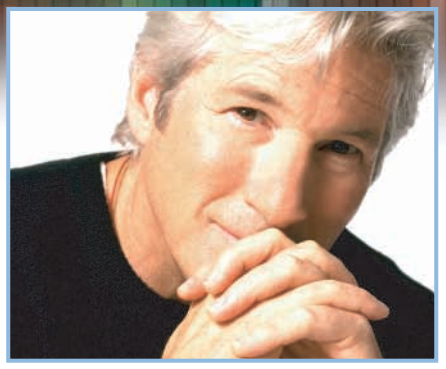
ইটালিয়ান পরিচালক বার্নার্ডো বারতোলুচি ১৯৯৩ সালে হলিউডে একটি মুভি তৈরি করেন, যার নাম ছিলো লিটল বুদ্ধা। মুভিটিতে গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বর্তমান সময়ের বৌদ্ধধর্মসহ অনেক বিষয় চমৎকারভাবে নিয়ে আসা হয়। এর বড় আকর্ষণ ছিলো নানা ধরনের মেডিটেশনের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেয়া। মুভিটি অনেকের মনে প্রভাব ফেলেছিলো।

মেডিটেশন এখন সিনেমার গ্লামারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। পশ্চিমা সিরিয়াস মুভি থেকে শুরু করে একশন নির্ভর অসংখ্য মুভিতে মেডিটেশনের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে মার্শাল আর্ট মুভিগুলোতে এর ব্যবহার যেমন দেখা যায় তেমনি টুম্ব রেইডারের মতো প্রযুক্তি নির্ভর মুভিতেও ভিন্ন পদ্ধতির মেডিটেশন দেখা যায়। মেডিটেশন করছে দি লাস্ট সামুরাই, স্টার ট্রেক, স্টার ওয়ারস, মাস্কম্যান বা লস্ট হরাইজনের মতো সায়েন্স ফিকশন ছবির চরিত্ররা।

শুধু সিনেমার পর্দায় নয়, পর্দার চরিত্ররা বাস্তবেও মেডিটেশনকে জীবনের অংশ করে ফেলেছেন। প্রিটি ওমেন মুভিখ্যাত অভিনেতা



মেডিটেশন এখন সিনেমার গ্লামারের সাথে জড়িয়ে গেছে। সায়েন্স ফিকশন সিরিজ স্টার ট্রেক এন্টারটেইনমেন্টের চরিত্ররাও ভিন্ন পদ্ধতির মেডিটেশন করছেন



অভিনেতা রিচার্ড গিয়ার। সারাদিনের কর্মপ্রেরণার রসদটুকু তিনি মেডিটেশন থেকেই নিয়ে নেন

রিচার্ড গিয়ারের প্রতিদিনের সঙ্গী মেডিটেশন। সারাদিনের কর্মপ্রেরণার রসদটুকু তিনি মেডিটেশন থেকেই নিয়ে নেন। তিনি বিষয়টির প্রতি এত বেশি অনুরক্ত যে, তিব্বতের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি হিসেবেও নিজেকে সারাবিশ্বে পরিচিত করে ফেলেছেন। আরেক একশন হিরো স্টিভেন সেগাল যার অভিনীত মুভিগুলো সারা পৃথিবী থেকে আয় করেছে সাড়ে আটশ মিলিয়ন ডলার এবং যিনি হার্ট টু কিল থেকে শুরু করে ২০০৯ সালের ড্রিভেন টু কিল মুভিতে অস্ত্র হাতে অসংখ্য শত্রুকে



স্টিভেন সেগাল

চিরতরে শান্ত করে দিয়েছেন, ব্যক্তিজীবনে তিনি নিজে শান্তির জন্যে বেছে নিয়েছেন মেডিটেশনকে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি মেডিটেশন করছেন গভীরভাবে।



'মেডিটেশনের সময়কার অনুভূতি সত্যিই অসাধারণ'
– কেট বসওয়ার্থ

ব্লু ক্রস বা সুপারম্যান রিটার্নখ্যাত অভিনেত্রী কেট বসওয়ার্থ মেডিটেশন করার সময়টিকে মনের অসাধারণ অবস্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। দি লর্ড অফ দি রিংস, পাইরেটস অফ দি ক্যারিবিয়ানের অভিনেতা অরলান্ডো ব্লুম মনে করেন, মেডিটেশন তাকে আত্মবিধ্বংসী প্রবণতা থেকে বাঁচিয়েছে। বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি প্রয়োজন পূরণ থেকে শুরু করে জীবনকে আরো মহৎ করার প্রেরণা যোগায় মেডিটেশন। এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে।



'মেডিটেশন হচ্ছে খুব বাস্তবমুখী একটি অনুশীলন। মেডিটেশন আমাকে আমার বাস্তব জীবনের প্রয়োজনগুলো আরো সুন্দরভাবে পূরণের পথ দেখায়' –অরলান্ডো ব্লুম

পশ্চিমা সেলিব্রেটিদের মধ্যে মেডিটেশন এখন খুবই জনপ্রিয় একটি চর্চা। এর পেছনে ভূমিকা রেখেছেন প্রাচ্যের কয়েকজন আলোচিত ব্যক্তিত্ব। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগোতে গিয়েছিলেন ১৮৯৩ সালে। তিনি সেখানে বিশ্ব ধর্মসভায় এক চমৎকার বক্তব্য রাখেন। স্বামী বিবেকানন্দের সূচনা সম্বোধন শুনেই অনেকে তার ভক্ত হয়ে যান। প্রাচ্যের মেডিটেশন নিয়ে তিনি অনেককে জানার সুযোগ করে দেন। তার আমেরিকা ভ্রমণের সময়ের একটি ঘটনা– স্বামী বিবেকানন্দকে একদিন গলফ কোর্ট দেখতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে অল্প সময়ের জন্যে খেলতে অনুরোধ করা হয়। তিনি এর আগে গলফ খেলেন নি। স্বামী বিবেকানন্দ সংক্ষিপ্ত মেডিটেশন করে সহজ ভঙ্গিতে বলে আঘাত করেন। বল গিয়ে ঠিক জায়গায় পড়ে।



গলফার টাইগার উডস। মেডিটেশন তাকে দিয়েছে প্রশান্তি স্থিরতা মনোসংযোগ

মজার বিষয় হলো, মনোসংযোগের অসাধারণ ক্ষমতার জন্যে বিখ্যাত বিশ্বসেরা গলফার টাইগার উডস, যিনি গলফ খেলে আয় করেছেন ১১০ মিলিয়ন ডলার, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন মেডিটেশনের অভ্যাস। মা-বাবার কাছ থেকে ছোটবেলায়ই এ অভ্যাস আয়ত্ত করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন টাইগার উডস।

আধুনিক জ্যাজ সংগীতের অন্যতম দিকপাল হার্বি হ্যানকক। মেডিটেশনকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন তার সৃজনশীলতা বাড়ানোর কাজে। তার ভাষায় মেডিটেশন করেই তিনি পেয়েছেন অভ্যস্ততার আরামবলয় ভাঙার সাহস। নতুন কিছুকে গ্রহণ করা বা যেকোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণে তিনি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী।

মহাঋষি মহেশ যোগীর টিএম-কে অনেকেই চিনেছে পপগ্রুপ বিটলসের জন্যে। ৬০-এর দশকের সাড়া জাগানো এই ব্যান্ড গ্রুপটিকে বলা হয় জনপ্রিয় সংগীতের ইতিহাসে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বাণিজ্যসফল সংগীত দল। ১৯৬৭ সালে ওয়েলসের বাঙ্গুরে মহাঋষি মহেশ যোগীর সাথে তারা সাক্ষাৎ করে। ১৯৬৮ সালে ভারতের



১৯৬৭ সালে মহাঋষি মহেশ যোগীর সঙ্গে বিটলস গ্রুপের ৪ সদস্য : পল ম্যাকার্টনি, জন লেনন, জর্জ হ্যারিসন এবং রিঙ্গো স্টার

ঋষিকেশে টিএম-এর ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বিটলসের হোয়াইট এলবামের বেশিরভাগ গানই ঋষিকেশে বসে লেখা।



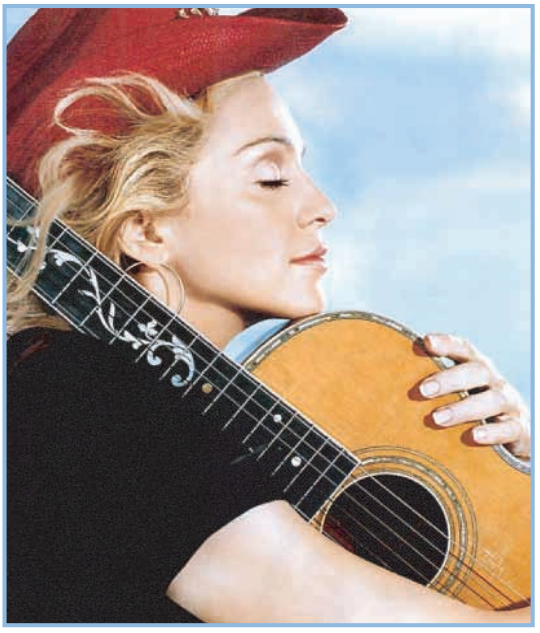
জ্যাজতারকা হার্বি হ্যানকক। মেডিটেশন তাকে দিয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের আত্মবিশ্বাস

কেন? কারণ অর্থ-বিত্ত-খ্যাতি বা ড্রাগ তাদের যা দিতে পারে নি সেই সুখ এবং পরিপূর্ণতা তারা পেয়েছিলেন মেডিটেশন থেকে। ২০০৯ সালের এপ্রিলে একটি অনুষ্ঠানে সাবেক বিটল স্টার পল ম্যাকার্টনি মন্তব্য করেন, মেডিটেশন শেখাটা আমাদের জন্যে ছিলো মহাঋষির কাছ থেকে পাওয়া একটা উপহার। শান্তি এবং স্থিরতার জন্যে সেসময় আমরা এমন একটা কিছুই খুঁজছিলাম। আমেরিকান অভিনেত্রী, গায়িকা এবং ফ্যাশন মডেল মিয়া ফারো ছিলেন মহাঋষির আরেক ভক্ত। গোল্ডেন গ্লোব এওয়ার্ড বিজয়ী এ তারকাও ঋষিকেশে এসে মেডিটেশনের পাঠ নিয়েছেন।

ত্রয়োদশ শতকের পারস্য সুফিসাধক মওলানা জালালুদ্দিন রুমির বিশ্বজনীন প্রেমের কবিতার আবেদন এ সময়েও এত ব্যাপক যে, আধুনিককালের একজন খ্যাতিমান মেডিটেশন প্রশিক্ষক ড. দীপক চোপড়ার সম্পাদনায় সে কবিতাগুলোর সংগীতরূপে কণ্ঠ দেন ডেমি মুর, গোল্ডি হন, মার্টিন শিন, ড্রেব্রা উইঙ্গার এবং ম্যাডোনার মতো বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীরা। রুমির কবিতা অবলম্বনে রচিত 'এ গিফট অফ লাভ' শিরোনামের এ এলবামটিতে ম্যাডোনা কণ্ঠ দেন 'বিটারসুইট' গানটিতে।



অভিনেত্রী মিয়া ফারো



রুমির প্রেমের কবিতা অবলম্বনে 'এ গিফট অফ লাভ' এলবামে কণ্ঠ দেন পপতারকা ম্যাডোনা

টম নোল হলিউডের একজন মেডিটেশন গুরু যার কাছে হিদার গ্রাহাম থেকে শুরু করে ডেভিড লিঞ্চ, নাতালি মেন্ডোজা, কেট ফিশারের মতো হলিউড তারকারা মেডিটেশনের দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, যত দিন যাচ্ছে শোবিজ দুনিয়ার মানুষদের কাছে মেডিটেশনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। 'সেলিব্রেটি পেস অফ লাইফ' অর্থাৎ তারকাজীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মেডিটেশনই হয়ে উঠছে তাদের ভরসাস্থল। রক এন্ড রোল দুনিয়ার রানি বলে খ্যাত টিনা টার্নার মেডিটেশনের একজন একনিষ্ঠ চর্চাকারী। মেডিটেশনের জোরেই নিজের গভীর দাম্পত্যসংকট কাটিয়ে আবার তিনি হয়ে ওঠেন মিডিয়া আইকন।



টিনা টার্নার– মেডিটেশনের জোরেই দাম্পত্যসংকট কাটিয়ে আবারও হয়ে ওঠেন মিডিয়া আইকন

গায়ক-গীতিকার লিউনার্ড কোহেন। হতাশা বিষণ্নতা আর দুঃখবিলাস একসময় যার জীবনের নিত্যসঙ্গী ছিলো, ধ্যানের পথ ধরে তিনি নিজেই এখন দুঃখমুক্তির পথ দেখাচ্ছেন হাজার মানুষকে

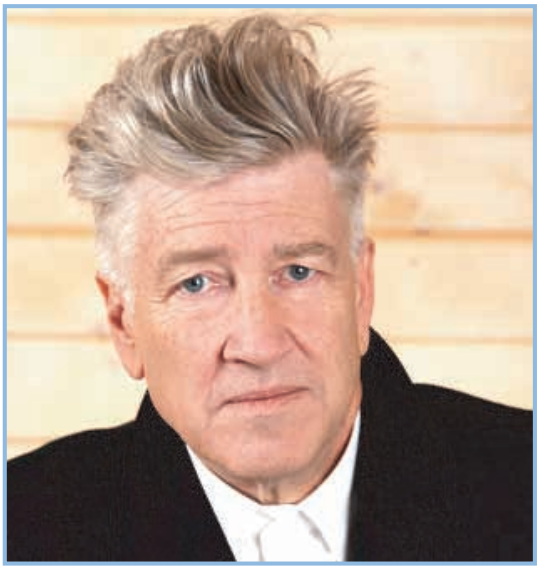


কানাডিয়ান গায়ক ও গীতিকার লিওনার্ড কোহেন মেডিটেশনের মাধ্যমে মুক্ত হয়েছেন তার দীর্ঘদিনের মাদকাসক্তি থেকে, সেরে উঠেছেন গভীর বিষণ্নতা থেকে। পরবর্তীতে তিনি একজন জেনগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গোথিকা ছবিতে অভিনয়ের সময় থেকেই দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে অভিনেত্রী হ্যালি বেরি শুরু করেন মেডিটেশনের চর্চা।



বিউটি কুইনখ্যাত হ্যালি বেরি– দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেছিলেন মেডিটেশনের চর্চা

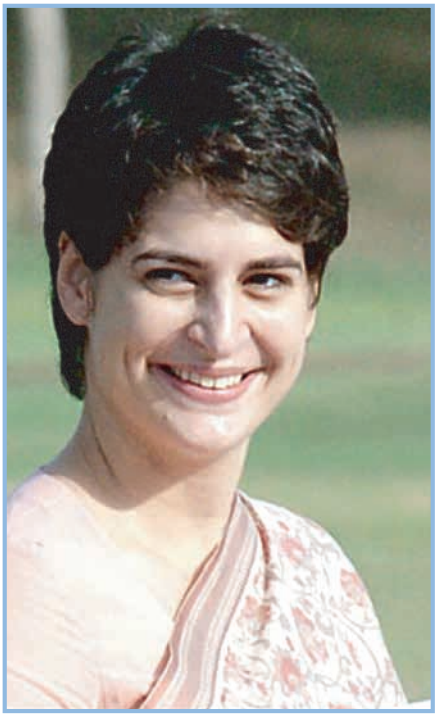
বিশ্বখ্যাত মুভি পরিচালক ডেভিড লিঞ্চ সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, সারা পৃথিবীর এক মিলিয়ন শিশুকে যদি মেডিটেশন শেখানো যায় তবে পৃথিবীর চেহারা বদলে যাবে। প্রাথমিকভাবে তিনি পাঁচটি মহাদেশে এক মিলিয়ন শিশুকে মেডিটেশন শেখানোর প্রকল্প নিয়েছেন। এজন্যে কনসার্ট ও অন্যান্য মাধ্যমে তিনি ২ কোটি মার্কিন ডলার সংগ্রহের অভিযানে নেমেছেন।



চিত্রপরিচালক ডেভিড লিঞ্চ উদ্যোগ নিয়েছেন বিশ্বের এক মিলিয়ন শিশুকে মেডিটেশন শেখানোর

এতো গেল রুপালি পর্দার তারকাদের কথা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক খ্যাতিমান রাজনীতিক, সাংবাদিক, লেখকরাও এখন মেডিটেশন করেন। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মেডিটেশন করতেন। যত ব্যস্ততাই থাক সকালে আধা ঘণ্টা যোগধ্যান না করে তিনি কাজ শুরু করতেন না। এখন সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন তার নাতনি প্রিয়াংকা গান্ধী।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং মাঝে মাঝেই নির্জনবাসে যেতেন। এমনি এক নির্জনবাসের আত্মমগ্নতা শেষে তিনি ঘোষণা দেন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের।



প্রিয়াংকা গান্ধী



অং সান সু কি। দীর্ঘ ২০ বছরের বন্দিত্বের জীবনে মেডিটেশনই তাকে দিয়েছে ধৈর্য আর প্রশান্তি

অং সান সু কি। ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের অপরাধে গত ২০ বছর ধরে গৃহবন্দি আছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী বার্মার এই গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী। দীর্ঘ বন্দিত্বের জীবনে নিঃসঙ্গতা নৈরাশ্য আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে মেডিটেশনই তাকে যুগিয়েছে লড়াই করার ধৈর্য সাহস আত্মবিশ্বাস আর প্রশান্তি। তিনি বলেন, একজন ধ্যানী কখনো নিঃসঙ্গতায় ভোগে না।



হিলারি ক্লিনটন

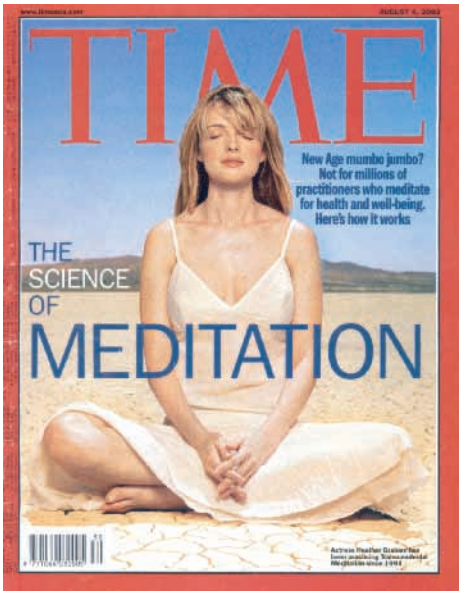


ফোর্ড মটরস-এর চেয়ারম্যান বিল ফোর্ড

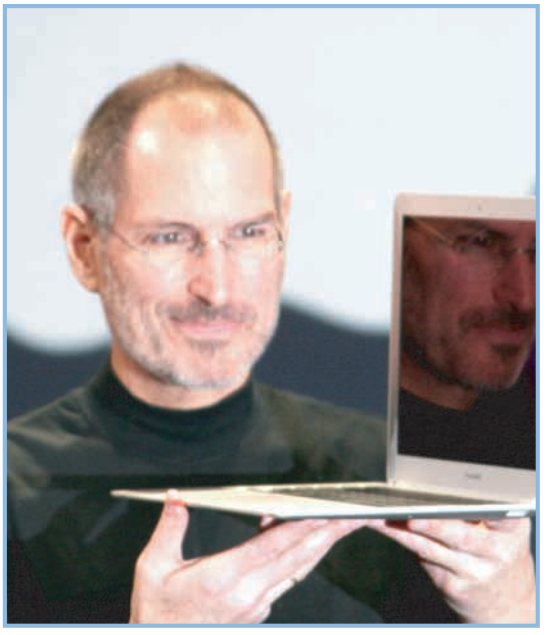
ভারতের সংবিধান প্রণেতা বাবা আম্বেদকার ছিলেন আরেক সর্বজনশ্রদ্ধেয় বৌদ্ধ ধ্যানী। আর আমেরিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর এবং বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনও যে মেডিটেশন করেন, মিডিয়ার কল্যাণে তা-ও এখন সবারই জানা।

বাদ যান না ধনকুবেররাও। ফোর্ড মটরসের প্রধান বিল ফোর্ড এবং এপল কোম্পানির সিইও স্টিভ জবসও মেডিটেশন করেন।

সেলিব্রেটিদের এই মেডিটেশন প্রেম আসলে পাশ্চাত্যের জনজীবনে মেডিটেশনের প্রভাবেরই একটি প্রতিফলন। স্কুল, হাসপাতাল, আইন বিভাগ, সরকারি ভবন, বাণিজ্যিক অফিস এমনকি জেলখানা– কোথায় নেই মেডিটেশন? আইওয়া অঙ্গরাজ্যের মহাঋষি ইউনিভার্সিটির অধীনস্থ কলেজ এবং স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা দিনে দুবার মেডিটেশন করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের জন্যে মেডিটেশনকে



'দি সায়েন্স অফ মেডিটেশন' শিরোনামে টাইমের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মডেল হয়েছেন অভিনেত্রী হিদার গ্রাহাম ১৯৯১ সাল থেকে মেডিটেশন যার দুবেলার চর্চা



এপল কোম্পানির সিইও স্টিভ জবস

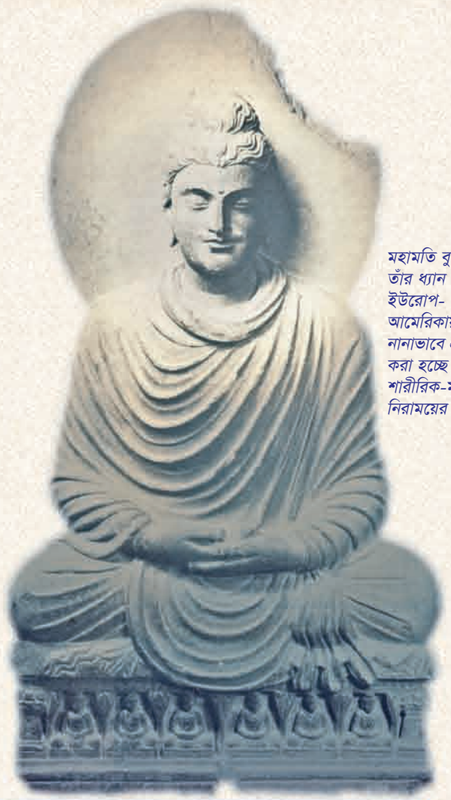
বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিমানবন্দরে প্রার্থনাকক্ষ কিংবা সাইবার ক্যাফের পাশাপাশি চোখে পড়বে বিশেষ চিহ্নিত মেডিটেশনকক্ষও।

নিউইয়র্ক টাইমস, গার্ডিয়ান, টাইম, নিউজউইক-এর মতো বিশ্বখ্যাত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোতে বিভিন্ন সময় মেডিটেশনের ওপর আকর্ষণীয় ও তথ্যনির্ভর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনগুলো এই ক্রেজ আরো বাড়িয়েছে বৈ কমায় নি।

টাইম ম্যাগাজিনের আগস্ট ২০০৩ সংখ্যায় 'দি সায়েন্স অফ মেডিটেশন' প্রচ্ছদ নিবন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি মানুষ এখন নিয়মিতভাবে মেডিটেশন করছে। ১০ বছর আগের তুলনায় এ সংখ্যা দ্বিগুণ। মেডিটেশন ক্লাসগুলোতে বিপুল সংখ্যায় আমেরিকার মূলধারার জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিই প্রমাণ করছে মেডিটেশন এখন তাদের স্মার্টনেসের অঙ্গ। মেডিটেশনের জনপ্রিয়তা আসলে দিন দিন এতই বাড়ছে যে, মেডিটেশনে অবিশ্বাসীরাই এখন সেখানে পরিণত হয়েছেন সংখ্যালঘুতে।

প্রতিবেদক :
মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান
[সম্পাদক, রুটস, ১৩৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ধ্যান মোরাকাবা মেডিটেশন
দেশে দেশে যুগে যুগে



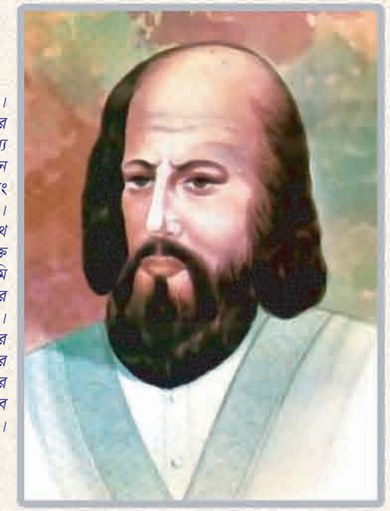
মহামতি বুদ্ধ। তাঁর ধ্যান পদ্ধতিকে ইউরোপ-আমেরিকায় এখন নানাভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে বিভিন্ন শারীরিক-মানসিক নিরাময়ের ক্ষেত্রে।

ধ্যান একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া। মহামতি বুদ্ধ ধ্যানের পথে বোধি লাভ করেছেন। ধ্যানের মাধ্যমেই নির্বাণ লাভের পন্থা শিখিয়েছেন অনুসারীদের। যিশুখ্রিষ্টের জীবনে ধ্যান এবং প্রার্থনা হয়ে গিয়েছিলো একাকার। আর মহানবী হজরত মোহাম্মদ (স) বছরের পর বছর হেরা গুহায় কাটিয়েছেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। ধ্যানের স্তরেই পবিত্র কোরআনের বাণী নাযিল হয়েছে তাঁর ওপর।

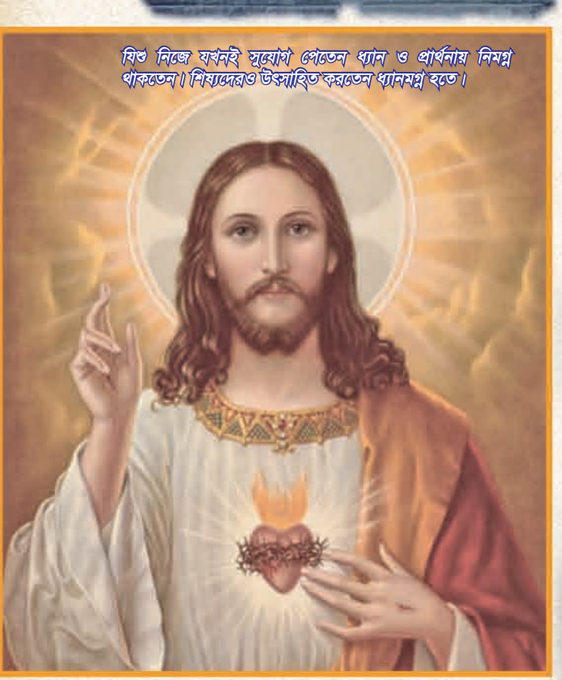
যুগে যুগে দেশে দেশে সাধকরা আত্ম উপলব্ধির জন্যে এ প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করেছেন। মুনি-ঋষিরা পরমাত্মার সাথে সংযুক্ত হওয়ার সাধনায় যোগ-ধ্যানকে ব্যবহার করেছেন। স্রষ্টায় সমর্পণের জন্যে সুফিসাধকরা নিমগ্ন হয়েছেন মোরাকাবা-মোশাহেদায়। তাফাক্কুর বা তাদাব্বুরের যে কথা কোরআনে বলা হয়েছে তা আসলে সৃষ্টিরহস্য নিয়ে ধ্যানেরই তাগিদ।

প্রাচ্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য এই ধ্যান, মোরাকাবা বা মেডিটেশনই এখন পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় হচ্ছে। প্রয়োগ হচ্ছে মূলত প্রশান্তি ও আত্মনিরাময় লাভের ক্ষেত্রে।

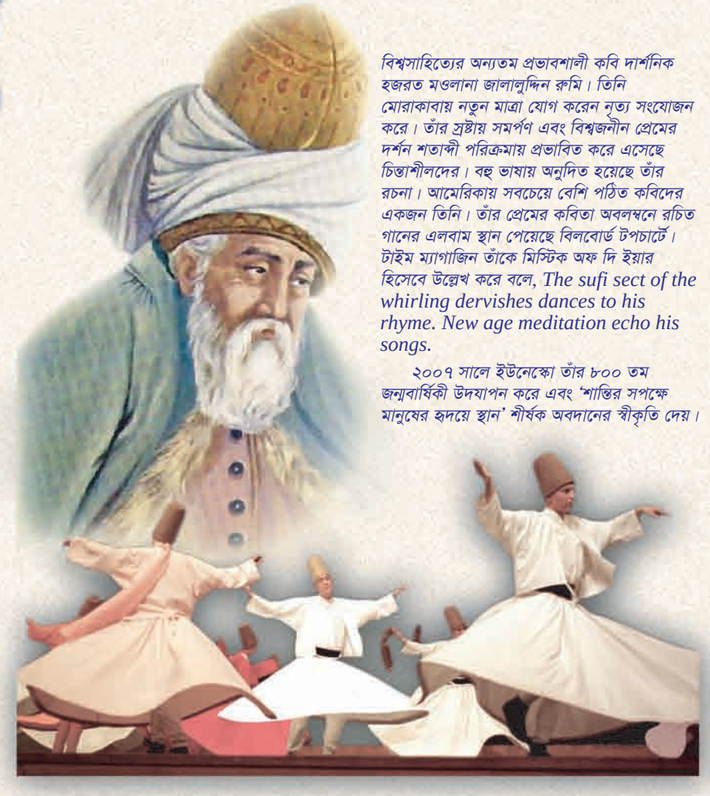
ধ্যান, মেডিটেশন, মোরাকাবা, তাফাক্কুর শব্দগুলো ভিন্ন হলেও মূল নির্যাস একই। বিভিন্ন ধর্ম আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এটি প্রায়োগিকভাবে ভিন্ন রূপ নিলেও পানির সার্বজনীনতার মতোই ধ্যানের নির্যাস সার্বজনীন, সকল মানুষের জন্যে। এ অধ্যায়ে তারই কিছু ছবি সংযোজিত হলো।



ইমাম গাজ্জালী। দীর্ঘ ১০ বছর নির্জনবাসের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেন আত্মশুদ্ধি এবং ধ্যানের পথেই মুক্তি। শরিয়তের সাথে সাধনাকে সম্পৃক্ত করে তিনি ইসলামি জীবনদৃষ্টির পুনর্জাগরণ ঘটান। পরবর্তী হাজার বছরে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সাধক-দার্শনিকদের তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন।

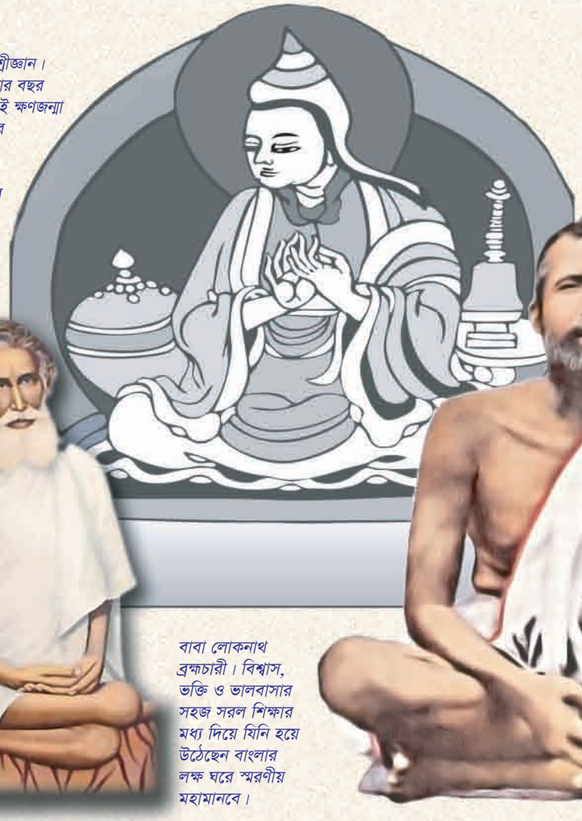


যিশু নিজে যখনই সুযোগ পেতেন ধ্যান ও প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকতেন। শিষ্যদেরও উৎসাহিত করতেন ধ্যানমগ্ন হতে।

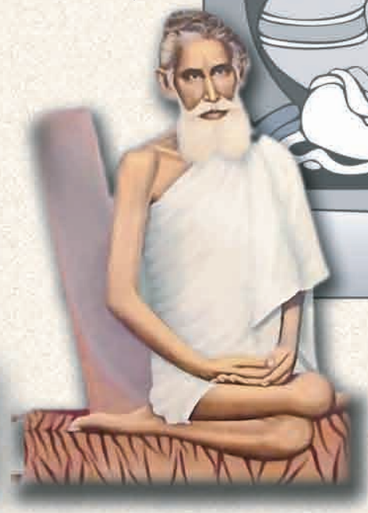


বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম প্রভাবশালী কবি দার্শনিক হজরত মওলানা জালালুদ্দিন রুমি। তিনি মোরাকাবায় নতুন মাত্রা যোগ করেন নৃত্য সংযোজন করে। তাঁর স্রষ্টায় সমর্পণ এবং বিশ্বজনীন প্রেমের দর্শন শতাব্দী পরিক্রমায় প্রভাবিত করে এসেছে চিন্তাশীলদের। বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে তাঁর রচনা। আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি পঠিত কবিদের একজন তিনি। তাঁর প্রেমের কবিতা অবলম্বনে রচিত গানের এলবাম স্থান পেয়েছে বিলবোর্ড টপচার্টে। টাইম ম্যাগাজিন তাঁকে মিস্টিক অফ দি ইয়ার হিসেবে উল্লেখ করে বলে, *The sufi sect of the whirling dervishes dances to his rhyme. New age meditation echo his songs.*

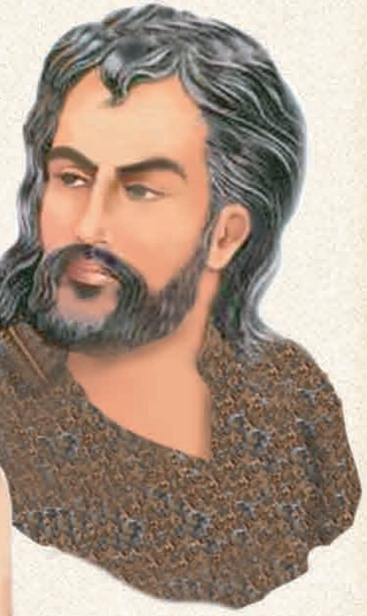
২০০৭ সালে ইউনেস্কো তাঁর ৮০০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করে এবং 'শান্তির সপক্ষে মানুষের হৃদয়ে স্থান' শীর্ষক অবদানের স্বীকৃতি দেয়।



অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আজ থেকে হাজার বছর আগে বাংলার এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ধ্যানের শিক্ষা দিয়ে উপমহাদেশ, তিব্বত ও চীনের সমাজ-জীবনের পঙ্কিলতা দূর করতে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।



বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী। বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসার সহজ সরল শিক্ষার মধ্য দিয়ে যিনি হয়ে উঠেছেন বাংলার লক্ষ ঘরে স্মরণীয় মহামানবে।



ইরানের কবি হাফেজ সিরাজী সুফিধারার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস। ইংরেজ শাসনাধীন উপমহাদেশে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আত্মিক পুনর্জাগরণের সূচনা করেন। বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের কাছে ধ্যান ও আধ্যাত্মিকতাকে সমাদৃত করে তোলেন।



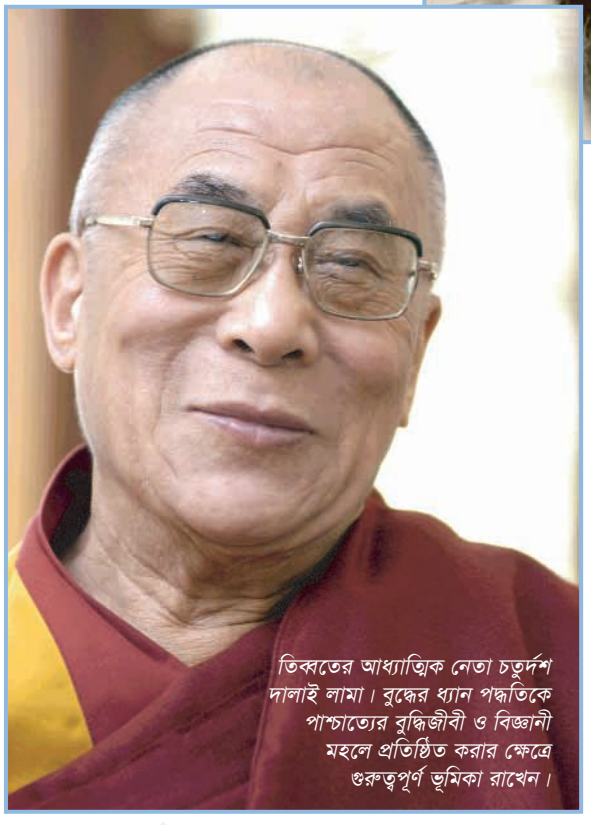
ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তিনি বলেছিলেন, বাংলা জাগলে ভারত জাগবে... জগৎ জাগবে...। একেশ্বরবাদ এবং সকল ধর্ম ও মতসহিষ্ণুতা ছিলো তাঁর শিক্ষার ভিত্তি। সবাইকে তিনি মিলিতভাবে সাধনার পথে ডাক দিয়েছেন।



রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে শিকাগোর বিশ্ব ধর্মসভায় তাঁর বিখ্যাত ভাষণ প্রাচ্যের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিজয়ের সূচনা করে। পাশ্চাত্য অনুভব করতে পারে তাদের অন্তঃসারশূন্যতা। আধ্যাত্মিকতার প্রসারের জন্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্ত সোসাইটি এবং ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।



সুফিবাদের আন্তর্জাতিক ধারার প্রবর্তক হজরত এনায়েত খান। ইউরোপ এবং আমেরিকায় তিনিই ধ্যানের এই ধারাকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

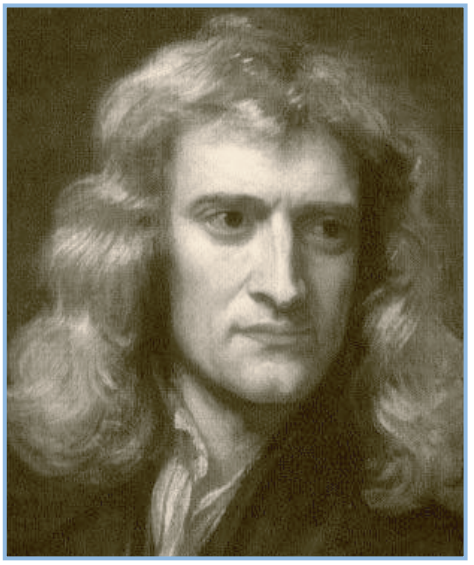


তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা চতুর্দশ দালাই লামা। বুদ্ধের ধ্যান পদ্ধতিকে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানী মহলে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

মহাঋষি মহেশ যোগী ষাটের দশকে পাশ্চাত্যে বেদান্ত দর্শনকেন্দ্রিক টিএম-কে পরিচিত করান। পরবর্তীতে যা পাশ্চাত্যের মিডিয়া এবং জনজীবনে ধ্যানচর্চাকে জনপ্রিয় করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।



বিজ্ঞানীদের বিশ্বদৃষ্টি



আইজ্যাক নিউটন

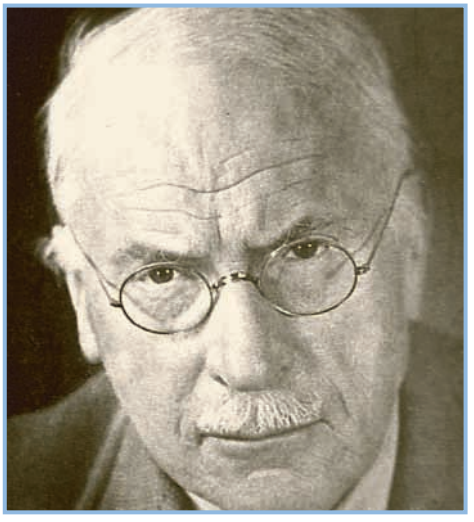
বিজ্ঞানী নিউটন আপেল গাছের নিচে মেডিটেশন করছিলেন। তিনি পড়ন্ত আপেল থেকে ল' অফ গ্রাভিটেশন আবিষ্কার করেন।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক, নিল্‌স বোর, ওয়ার্নার হেইজেনবার্গ, জন একল্‌স প্রমুখ কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও নিউরো সায়েন্সের নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে বিজ্ঞান থেকে নির্বাসিত মনকে আবার বিজ্ঞানে পুনর্বাসিত করেন।

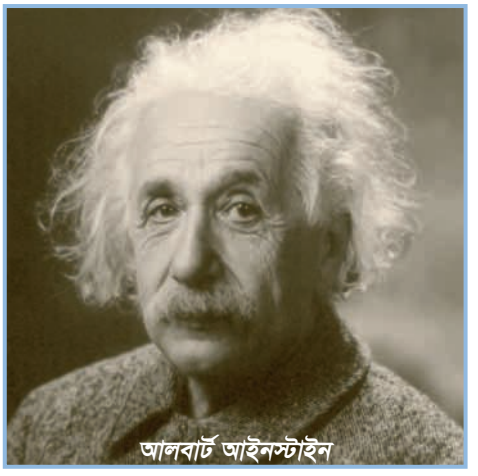
ড. কার্ল গুস্তাভ ইয়াং, ড. জে বি রাইন, লরেন্স লি-শান– এঁদের গবেষণা আধুনিক মানুষকে মেডিটেশন ও আত্মিক বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে।

মন ও চেতনার ক্ষমতা সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির সারসংক্ষেপ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ইউজিন উইগনার তার 'Remarks on the Mind-Body Question' নিবন্ধে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানীই এ সত্যকে মেনে নিয়েছেন যে, চিন্তা অর্থাৎ মনই হচ্ছে মূল। 'চেতনার উল্লেখ ছাড়া কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর নিয়মকে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণভাবে গঠন করা সম্ভব নয়।'
("It is not possible to formulate the laws of Quantum Mechanics in a fully consistent way without reference to the consciousness.")

নিবন্ধের উপসংহারে বিজ্ঞানী উইগনার বলেছেন, 'বিশ্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণা শেষ পর্যন্ত চেতনাকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে' ('Scientific study of the world led to the content of consciousness as an ultimate reality.')



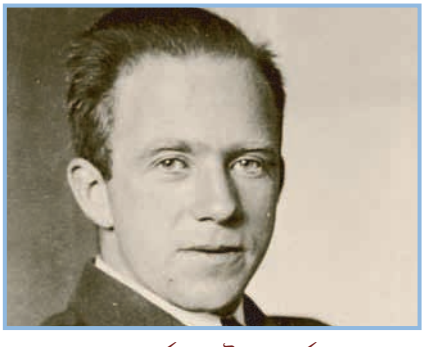
ডা. কার্ল গুস্তাভ ইয়াং



আলবার্ট আইনস্টাইন



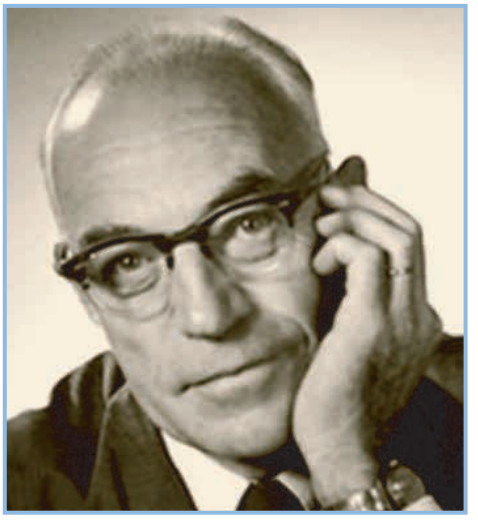
ইউজিন উইগনার



ওয়ার্নার হেইজেনবার্গ



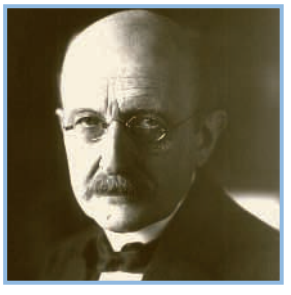
সোভিয়েত গবেষক কার্ল নিকোলিয়েভ, ড. কার্ল কামেনেস্কি এবং এঁদের সহকর্মীরা টেলিপ্যাথির মাধ্যমে মোর্সকোডে সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণ করে বিস্ময় সৃষ্টি করেন।



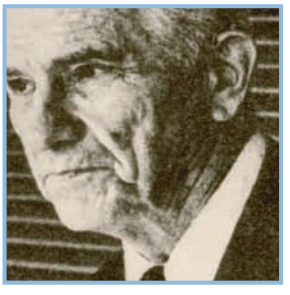
জন একল্‌স



নিল্‌স বোর



ম্যাক্স প্লাঙ্ক



ড. জে বি রাইন



প্রাচ্যের পদ্ধতিই বেশি কার্যকর
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের সমীক্ষা

সভ্যতার উৎসভূমি এশিয়া। ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান প্রযুক্তি– সবকিছুরই শেকড় এশিয়ার মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত। ইসলাম বৌদ্ধ হিন্দু ও খ্রিষ্টান– পৃথিবীর এই মহান ধর্মগুলোর উৎসভূমি এই এশিয়া। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিসে এরিস্টটল ও প্লেটো যখন তাদের গণতন্ত্রের মতবাদে অভিজাত ও দাস শ্রেণীর মধ্যে বিভাজনের কথা বলেছেন, তখন এই বাংলায় মহামতি বুদ্ধ প্রচার করেছেন সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী। তিনি বলেছেন, জন্মসূত্রে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না বা অচ্ছুত হয় না, কর্ম দ্বারাই সে ব্রাহ্মণ বা অচ্ছুতে রূপান্তরিত হয়।

গ্রিসে আইন বা গণতন্ত্র চর্চার ইতিহাস মাত্র আড়াই হাজার বছর। অথচ এই প্রাচ্যে আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে হাম্মুরাবির শাসনামলে আইন ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছিলো। ইউরোপের অধিকাংশ ভাষারই জন্ম হয়েছে ফোরাত নদীর তীরে বিকশিত ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় প্রচলিত আরামাইক ভাষা থেকে। ইউরোপের বড় বড় শহরগুলোতে পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা মাত্র দেড়শ বছরের। আর মহেনজোদারো-হরপ্পার পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা চার হাজার বছরের পুরনো। ঢাকার মসলিনের সমকক্ষ সুতার কাপড় এখনও পাশ্চাত্যের কোনো প্রযুক্তি তৈরি করতে পারে নি। বাংলায় আবিষ্কৃত দাবা খেলার চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত কোনো খেলা এখনও পাশ্চাত্যে আবিষ্কৃত হয় নি।

সকল বিজ্ঞানের ভিত্তি অঙ্ক। আর অঙ্কের ভিত্তি হচ্ছে শূন্য। এই শূন্য আবিষ্কৃত হয় বাংলায়। বাংলা থেকে শূন্য আরবে এবং সেখান থেকে ইউরোপে যায়। বিজ্ঞানের রাজ্যে ঘটে বিপ্লব। তাই বলা যায়, পাশ্চাত্যের সকল জ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎসভূমি এশিয়া।

এশিয়া বিশ্বকে যত জ্ঞান ও প্রযুক্তি উপহার দিয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার মেডিটেশন। ব্রেন ও মনকে ধ্যানের স্তরে নিয়ে গিয়ে যে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় প্রাচ্যের সাধকরা হাজার হাজার বছরের সাধনার মাধ্যমে তা মানুষকে দেখিয়ে গেছেন। সাধকদের দেখানো এই পথ থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে বিভিন্ন ধ্যান প্রক্রিয়া। দ্রাবিড় সভ্যতা আমাদেরকে দিয়েছে যোগধ্যান। মহামতি বুদ্ধ শিখিয়ে গেছেন বিপাসন ধ্যান পদ্ধতি। এই ধ্যান চীনে চেন নামে এবং জাপানে জেন নামে প্রচলিত হলো যা আসলে বাংলা ধ্যান শব্দেরই ভাষাগত রূপান্তর। আউলিয়া-দরবেশগণ দিয়েছেন সুফি-মোরাকাবা। অর্থাৎ প্রাচ্যে প্রোথিত হয়েছে মেডিটেশনের এক দীর্ঘ, সমৃদ্ধ এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি। ধ্যানের এই মৌল উৎসগুলো থেকেই বিকশিত হয়েছে পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের বর্তমান সকল মেডিটেশন ও মন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

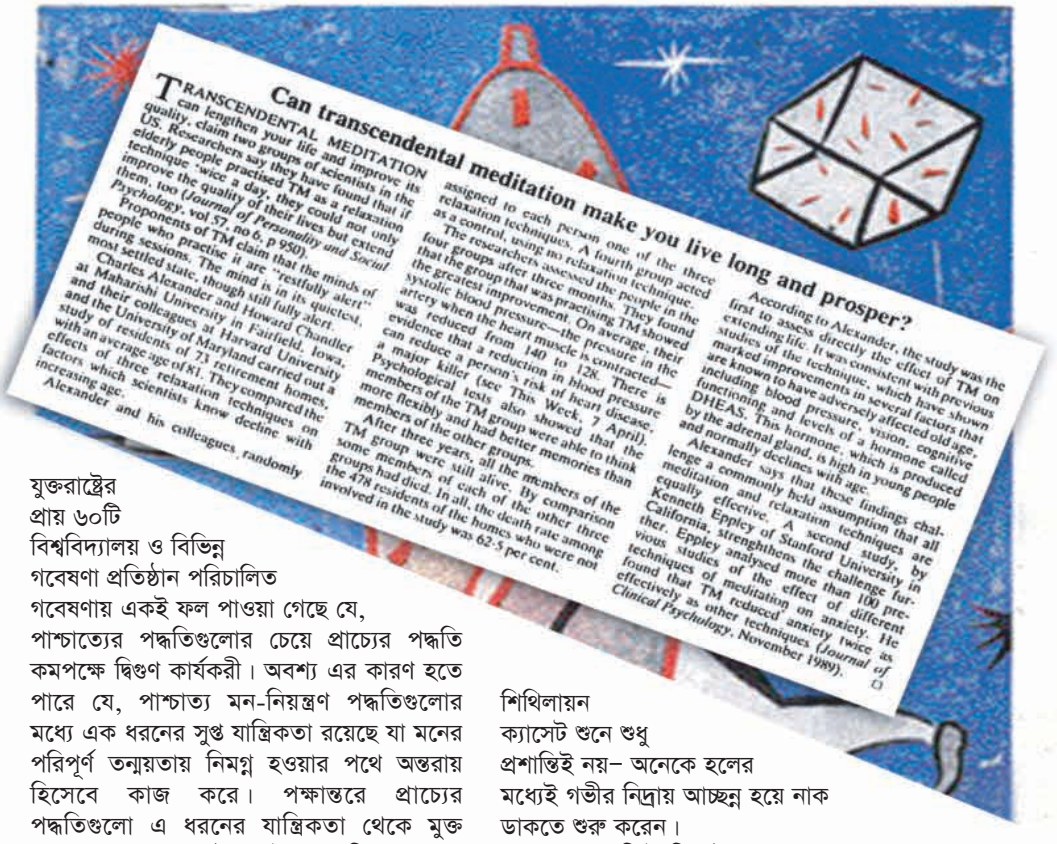
বিশ শতক মেডিটেশন চর্চার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী শতক। শতকের প্রথমভাগেই জেন মেডিটেশন ও সুফি মেডিটেশন জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। ডি টি সুজুকি, লবসাং রাম্পা, হজরত এনায়েত খান প্রমুখ সাধক এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন। তিব্বতীয় সাধক দালাই লামার নেতৃত্বে বিপাসন ধ্যান অর্থাৎ জেন, মহাঋষি মহেশ যোগীর টিএম এবং হজরত জালালুদ্দীন রুমির বিশ্বজনীন প্রেমের মেডিটেশন জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে।

৬০-এর দশকে প্রাচ্যের এই পদ্ধতিগুলো জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করার কয়েক বছরের মধ্যে পাশ্চাত্যের উদ্যোক্তারাও আত্ম উন্নয়ন ও প্রশান্তির জন্যে ধ্যান পদ্ধতি চালু করেন। ১৯৬৪ সালে সাইকো কেবারনেটিক্স, ১৯৬৬ সালে সিলভা মেথড, ১৯৬৮ সালে ইএসটিসহ প্রায় অর্ধশত পদ্ধতি চালু হয়। তবে ৬০ ও ৭০-এর দশকে মেডিটেশনের কার্যকারিতা নিয়ে সংশয়ী লোকের অভাব ছিলো না। ফলে গবেষণা হয়েছে প্রচুর। গবেষণার প্রতিটি ফল ছিলো মেডিটেশনের পক্ষে।

প্রাচ্যের ধ্যান পদ্ধতির প্রতি এই সার্বজনীন আগ্রহের কারণ হচ্ছে এর কার্যকারিতা। ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নিউসায়েন্টিস্ট পত্রিকার ১৯৯০ সালের ২৮ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়, বয়স্কদের ক্ষেত্রে জীবনের মান ও আয়ু বাড়াতে প্রাচ্য পদ্ধতির মেডিটেশনই বেশি কার্যকরী। যুক্তরাষ্ট্রের দুদল বিজ্ঞানী ৭৩টি রিটায়ারমেন্ট হোমের বাসিন্দাদের ওপর এক গবেষণা চালান যাদের বয়স ছিলো গড়ে ৮১ বছর। দৈব নির্বাচনের মাধ্যমে বাসিন্দাদের মোট চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। তিনটি গ্রুপকে শেখানো হয় তিনটি পৃথক পৃথক শিথিলায়ন বা মেডিটেশন পদ্ধতি। যার একটি ছিলো টিএম বা প্রাচ্য মেডিটেশন পদ্ধতি। ৪র্থ গ্রুপকে কোনো মেডিটেশন পদ্ধতি শেখানো হলো না।

তিন মাস পর গবেষকরা এই চার গ্রুপের লোকদের অবস্থা জরিপ করলেন। দেখা গেল, যে গ্রুপটি টিএম চর্চা করছিলেন তাদের উন্নতিই সবচেয়ে বেশি। তাদের সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ১৪০ থেকে নেমে এসেছে ১২৮-এ। যার মানে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি এখন কম। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায়ও দেখা গেল অন্যান্য গ্রুপের লোকদের তুলনায় তাদের চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি– দুটোই বেড়েছে।

তিন বছর পর আবারও জরিপ চালিয়ে দেখা গেল বাকি প্রতিটি গ্রুপ থেকে কেউ না কেউ মারা গেলেও টিএম গ্রুপের সবাই বেঁচে আছেন। আরও উল্লেখ্য যে, রিটায়ারমেন্ট হোমের যে ৪৭৮ জনকে এ গবেষণার আওতায় আনা হয় নি তাদের মৃত্যুর হার ছিলো ৬২.৫%। অর্থাৎ এ গবেষণার ফলাফল আয়ু বাড়াতে মেডিটেশনের কার্যকারিতাকে তুলে ধরার পাশাপাশি প্রমাণ করেছে প্রাচ্য পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বকে। গবেষকদলের নেতা প্রফেসর চার্লস আলেকজান্ডার মন্তব্য করেছেন, 'সব মেডিটেশন পদ্ধতিই সমানভাবে কার্যকর– প্রচলিত এ ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে এ গবেষণার ফলাফল।' এ চ্যালেঞ্জই আরও জোরদার হয়েছে স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির কেনেথ ইপলির আরেকটি গবেষণা থেকে। কেনেথ ইপলি উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ওপর ১০০টিরও বেশি মেডিটেশন পদ্ধতির প্রভাব পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন, উৎকণ্ঠা নিবারণে টিএম কাজ করে অন্যান্য পদ্ধতির চেয়েও দ্বিগুণ কার্যকরীভাবে।


newscientist

Can transcendental meditation make you live long and prosper?

TRANSCENDENTAL MEDITATION can lengthen your life and improve its quality, claim two groups of scientists in the US. Researchers say they have found that if elderly people practised TM as a relaxation technique -twice a day, they could not only improve the quality of their lives but extend them, too (Journal of Personality and Social Psychology, vol 57, no 6, p 950).

Proponents of TM claim that the minds of people who practise it are "restfully alert" during sessions. The mind is in its quietest, most settled state, though still fully alert.

Charles Alexander and Howard Chandler at Maharishi University in Fairfield, Iowa, and their colleagues at Harvard University and the University of Maryland carried out a study of residents of 73 retirement homes, with an average age of 81. They compared the effects of three relaxation techniques on factors which scientists know decline with increasing age.

Alexander and his colleagues randomly assigned to each person one of the three relaxation techniques. A fourth group acted as a control, using no relaxation technique.

The researchers assessed the people in the four groups after three months. They found that the group that was practising TM showed the greatest improvement. On average, their systolic blood pressure—the pressure in the artery when the heart muscle is contracted—was reduced from 140 to 128. There is evidence that a reduction in blood pressure can reduce a person's risk of heart disease.

Psychological tests also showed that the members of the TM group were able to think more flexibly and had better memories than members of the other groups.

After three years, all the members of the TM group were still alive. By comparison some members of each of the other three groups had died. In all, the death rate among the 478 residents of the homes who were not involved in the study was 62.5 per cent.

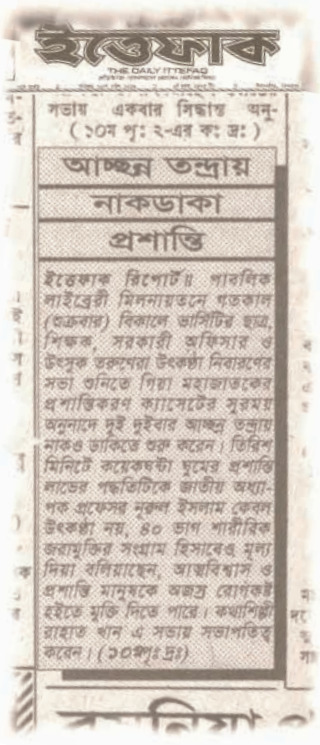
According to Alexander, the study was the first to assess directly the effect of TM on extending life. It was consistent with previous studies of the technique, which have shown marked improvements in several factors that are known to have adversely affected old age, including blood pressure, vision, cognitive functioning and levels of a hormone called DHEAS. This hormone, which is produced by the adrenal gland, is high in young people and normally declines with age.

Alexander says that these findings challenge a commonly held assumption that all meditation and relaxation techniques are equally effective. A second study, by Kenneth Eppley of Stanford University in California, strengthens the challenge further. Eppley analysed more than 100 previous studies of the effect of different techniques of meditation on anxiety. He found that TM reduced anxiety twice as effectively as other techniques (Journal of Clinical Psychology, November 1989).

যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৬০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত গবেষণায় একই ফল পাওয়া গেছে যে, পাশ্চাত্যের পদ্ধতিগুলোর চেয়ে প্রাচ্যের পদ্ধতি কমপক্ষে দ্বিগুণ কার্যকরী। অবশ্য এর কারণ হতে পারে যে, পাশ্চাত্য মন-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এক ধরনের সুপ্ত যান্ত্রিকতা রয়েছে যা মনের পরিপূর্ণ তন্ময়তায় নিমগ্ন হওয়ার পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। পক্ষান্তরে প্রাচ্যের পদ্ধতিগুলো এ ধরনের যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত হওয়ায় মনকে সহজেই মগ্ন চৈতন্যে নিয়ে যায়।

আমেরিকান জার্নাল অফ ক্লিনিকেল হিপনোসিসে প্রকাশিত এক নিবন্ধে ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ডের ড. আকিরা ওতানি প্রাচ্যের মেডিটেশন পদ্ধতির ব্রেনওয়েভ এবং নিউরোফিজিওলজিকেল প্রভাবের ওপর পরিচালিত গবেষণা রিপোর্টগুলোর মেটা এনালাইসিস করে বলেছেন, নিরাময়ের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পদ্ধতির চেয়ে প্রাচ্যধারার মেডিটেশন পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

আর মেডিটেশনের সকল প্রাচ্য ধারার সফল উত্তরসূরি 'কোয়ান্টাম মেথড'। যোগ, বিপাসন ও মোরাকাবার নির্যাসে সমৃদ্ধ কোয়ান্টাম মেথড সকল ধর্মের সকল মানুষের উপযোগী একমাত্র পরীক্ষিত পূর্ণাঙ্গ মেডিটেশন পদ্ধতি। এক যুগের নীরব গবেষণায় সীমিত প্রয়োগেই এর সাফল্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর কার্যকারিতার প্রথম প্রমাণ হিসেবে বলা যায় ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে ৪ শতাধিক শ্রোতা আধঘণ্টার শিথিলায়ন ক্যাসেট শুনে শুধু প্রশান্তিই নয়– অনেকে হলের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে নাক ডাকতে শুরু করেন।


ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
সভায় একবার সিদ্ধান্ত অনু-
(১০ম পৃ: ২-এর কঃ দ্রঃ)
আচ্ছন্ন তন্দ্রায়
নাকডাকা
প্রশান্তি
ইত্তেফাক রিপোর্ট॥ পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে গতকাল (শুক্রবার) বিকালে ভার্সিটির ছাত্র, শিক্ষক, সরকারী অফিসার ও উৎসুক তরুণেরা উৎকণ্ঠা নিবারণের সভা শুনিতে গিয়া মহাজাতকের প্রশান্তিকরণ ক্যাসেটের সুরময় অনুনাদে দুই দুইবার আচ্ছন্ন তন্দ্রায় নাকও ডাকিতে শুরু করেন। ত্রিশ মিনিটে কয়েকঘন্টা ঘুমের প্রশান্তি লাভের পদ্ধতিটিকে জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর নুরুল ইসলাম কেবল উৎকণ্ঠা নয়, ৪০ ভাগ শারীরিক জরামুক্তির সংগ্রাম হিসাবেও মূল্য দিয়া বলিয়াছেন, আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি মানুষকে অজস্র রোগকষ্ট হইতে মুক্তি দিতে পারে। কথাশিল্পী রাহাত খান এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। (১০ম পৃঃ দ্রঃ)

২ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় বক্স আইটেম করে ছাপা হয় একটি রিপোর্ট 'আচ্ছন্ন তন্দ্রায় নাক ডাকা প্রশান্তি'। এতে বলা হয়, পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে গতকাল (শুক্রবার) বিকেলে ভার্সিটির ছাত্র, শিক্ষক, সরকারি অফিসার ও উৎসুক তরুণেরা উৎকণ্ঠা নিবারণের সভা শুনিতে গিয়া মহাজাতকের প্রশান্তকরণ ক্যাসেটের সুরময় অনুনাদে দুই দুইবার আচ্ছন্ন তন্দ্রায় নাক ডাকিতে শুরু করেন। ত্রিশ মিনিটে কয়েক ঘণ্টা ঘুমের প্রশান্তি লাভের পদ্ধতিটিকে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম কেবল উৎকণ্ঠা নয়, ৪০ ভাগ শারীরিক জরামুক্তির সংগ্রাম হিসাবে মূল্য দিয়া বলিয়াছেন, আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি মানুষকে অজস্র রোগ কষ্ট হইতে মুক্তি দিতে পারে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আকারে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ৭ জানুয়ারি ১৯৯৩ সালে। ৪ দিন মোট ৪০ ঘণ্টার কোর্স। তারপর টানা ১৭ বছর। একজন প্রশিক্ষকের এককভাবে ক্লাস নিয়ে ৩০০ কোর্স সম্পন্ন করার মতো অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে এরই মধ্যে। একই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ৩০০ বার।

অনুশীলনে সহজ, কার্যকারিতায় অনন্য আর শাশ্বত জীবন চেতনার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় লাখো মানুষের জীবনে এসেছে মৌলিক পরিবর্তন। এ পরিবর্তন মানসিক, শারীরিক, পেশাগত, পারিবারিক ও আত্মিক। শুরুটা দেশে হলেও এ পরিবর্তন ও সাফল্যের উচ্ছ্বাস অতিক্রম করেছে সকল ভৌগলিক সীমা।

৩ যুগের দীর্ঘপথে

মহাজাতক অকাল্ট ও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেন ১৯৭৩ সালে তদানীন্তন মাসিক ঢাকা ডাইজেস্টে। তারপর থেকে বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকীতে লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ইএসপি ও টেলিপ্যাথি সম্পর্কে সবচেয়ে সাড়া জাগানো লেখাগুলো প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের অকাল্ট অনুরাগীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। আর এ যোগাযোগের ফলে ১৯৭৬ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ এস্ট্রলজার্স। মরহুম সৈয়দ আলী ইমাম সভাপতি, শহীদ আল বোখারী মহাজাতক মহাসচিব, মরহুম টি আহমেদ সহসভাপতি, ফারুক চৌধুরী ও সৈয়দ মাহবুব আলম যুগ্ম সম্পাদক ও ডা. ফজলুর রহমান কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এ তৎপরতার বিস্তৃতি ঘটে। এসব সেমিনারে মরহুম বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী, মরহুম মুজিবর রহমান খাঁ, ইত্তেফাক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, ড. মিজানুর রহমান শেলী, কথাশিল্পী রাহাত খান, প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মরহুম ড. মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ড. এনামুল হক, সাংবাদিক মরহুম সানাউল্লাহ নূরী প্রমুখ অংশগ্রহণ করে অকাল্ট চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। যোগ মেডিটেশন ও অকাল্ট চর্চা এক নতুন মাত্রা লাভ করে ১৯৮০ সালে। মহাজাতক দৈনিক আজাদের বার্তা সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়ে শান্তিনগরে অফিস স্থাপন করেন। এ অফিসটি হয়ে ওঠে সমাজসংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন তথা জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র। এখানে বিভিন্ন আলোচনায় জাতীয় অধ্যাপক মরহুম দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মরহুম বেগম সুফিয়া কামাল, সাংবাদিক মরহুম ওবায়েদ-উল-হক, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, মরহুম শাহাবুদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, মিজানুর রহমান, কবি মরহুম আবদুস সাত্তার, মরহুম এম এ মোহাইমেন, কবি রবিউল হুসাইন, পান্না কায়সার, কবি আল মাহমুদ, মরহুম আসাদুল হক, মরহুম আব্দুল হালিম চৌধুরী, কামাল লোহানী, শিল্পী কামাল আহমেদ, কবি বেলাল চৌধুরীসহ বহু গুণীজন অংশগ্রহণ করেন।

তখন থেকে যারা মহাজাতকের সাথে মেডিটেশন বা অকাল্ট বিষয়ে আলোচনায় নিয়মিত অংশ নিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রয়াত শিল্পাচার্য কামরুল হাসান, মরহুম শিল্পী-গুরু রশীদ চৌধুরী, মরহুম ড. আখলাকুর রহমান, ড. কাজী মফিজুর রহমান, ওবেইদ জাগীরদার, মরহুম ডা. এসএম সালাহ উদ্দীন, মরহুম অভিনেতা আখতার হুসেন, মরহুম ডা. শাহ আলম ও ইঞ্জিনিয়ার শাফাত খৈয়াম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৮৩ সালে মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাজাতককে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেন প্রফেসর এমইউ আহমেদ। এ সময় মহাজাতকের কাছ থেকে মেডিটেশনের পাঠ নেন ড. কাজী মফিজুর রহমান, প্রয়াত শিল্পাচার্য কামরুল হাসান, শিল্পী-গুরু রশীদ চৌধুরী, ডা. ফজলুর রহমান প্রমুখ।

১৯৮৬ সালে যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র যোগ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত হয়। মেডিটেশন প্রক্রিয়া বা ধ্যানের স্তরে পৌঁছার প্রক্রিয়াকে সহজ করা ও মন-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন টেকনিক নিয়ে পরিচালিত গবেষণা নতুন গতি লাভ করে। গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে মাদাম নাহার আল বোখারী তাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। এ গবেষণার ফলেই উদ্ভাবিত হয় আধুনিক জীবনযাপনের বিজ্ঞান 'কোয়ান্টাম মেথড'। প্রয়াত শিল্পী-গুরু রশীদ চৌধুরী ও শিল্পাচার্য কামরুল হাসান কোয়ান্টাম মেথডের প্রতীক ডিজাইন করে দেন।

কোয়ান্টাম মেথডের প্রতিটি প্রক্রিয়া নিয়ে নীরবে চলতে থাকে গবেষণা ও অনুশীলন। প্রতিটি টেকনিক নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়। ৯০ দশকের শুরুতেই এটি একটি পরীক্ষিত পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করে। মহাজাতক ধাপে ধাপে এ পদ্ধতিকে সাধারণ্যে পরিচিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৯২ সাল থেকে তিনি দৈনিক ইত্তেফাক ও মাসিক উপমা ডাইজেস্টসহ বিভিন্ন পত্রিকায় শিথিলায়ন ও মেডিটেশন সম্পর্কে লেখা শুরু করেন। ১৯৯৩ সাল থেকে তিনি মাসিক রহস্য পত্রিকায় দীর্ঘদিন নিয়মিত আত্মনির্মাণ বিভাগে লেখেন।



যোগ ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভায় কবি মরহুম আব্দুস সাত্তার ও জাতীয় অধ্যাপক মরহুম দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ।



১৯৮৩ সালে মেডিটেশনকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রে যোগব্যায়াম চর্চা করছেন ডা. ফজলুর রহমান, মরহুম অভিনেতা আখতার হুসেন, ড. কাজী মফিজুর রহমান প্রমুখ।

দীর্ঘ এক যুগের নীরব গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৯৩-এর ৭ জানুয়ারি হোটেল সোনারগাঁও-এ কোয়ান্টাম মেথডের ১ম কোর্স অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় দীর্ঘযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভাষাসৈনিক মরহুম সালেহ উদ্দিন কায়সার।





১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি বাংলা ভাষায় প্রথম মেডিটেশন ক্যাসেট প্রকাশের মাধ্যমে এক নবদিগন্তের সূচনা হয়। পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে আয়োজিত এ মেডিটেশন ক্যাসেট প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম।



মেডিটেশন চর্চার একযুগ ও কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ১৯৯৪-এর ৭ জানুয়ারি হোটেল শেরাটনের বলরুমে প্রথম কোয়ান্টাম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম।

১৯৯৪-এর কোয়ান্টাম উৎসবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কোয়ান্টাম মেথড বইয়ের প্রকাশ। প্রথম বছরেই শেষ হয়ে যায় এর ৫টি সংস্করণ। পরিণত হয় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত ননফিকশন গ্রন্থে। ২০০০ সালে প্রকাশিত হয় ১০০ তম কোর্সপূর্তি অভিজ্ঞতার আলোকে কোয়ান্টাম মেথডের পরিবর্ধিত সংস্করণ।

দ্বিতীয় কোয়ান্টাম উৎসব হয় ১৯৯৫ সালের ৬ জানুয়ারি এবং তৃতীয় কোয়ান্টাম উৎসব হয় ১৯৯৭ সালে ২১ মার্চ।



'মনছবি : বাংলাদেশ ২০২৫' রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় ৩ জুলাই, ১৯৯৮। ছবিতে পুরস্কার গ্রহণ করছে 'ক' বিভাগে ২য় স্থান অধিকারী উপমা বিশ্বাস।



২০০৮-এর মাঝামাঝি থেকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে সূচিত হয় এক নতুন বাঁক। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের বিপুলসংখ্যক অংশগ্রহণকারীর কারণে কোর্সের আয়োজন করতে হয় নতুন নতুন ভেন্যুতে। জুলাইয়ে ঢাকার ২৭৩ তম ব্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় কাকরাইলের আইডিইবি হলের বড় পরিসরে।



৫০ তম কোর্সপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সৈকতে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ধ্যানযাত্রায় গ্রাজুয়েটদের নিয়ে গুরুজী পরিচালনা করেন বিশেষ মেডিটেশন।



১৯৯৪ সালের আগস্টে কোর্স অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে শুরু হয় কোয়ান্টাম মেথডের যাত্রা। আর ২০০৮ সালে ২৭৫ তম কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামে। সাফল্যের মুকুটে সংযুক্ত হয় আরো এক নতুন পালক।

১৯৯৯ সালের আগস্টে শুরু হয় মেডিটেশন কোর্সের শততম ব্যাচ। উপমহাদেশে কোনো আধুনিক মেডিটেশন পদ্ধতির এটাই প্রথম শততম কোর্স পূর্তি। বিশেষ কনসেশনে সারাদেশে আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৮টি ব্যাচে অনুষ্ঠিত শততম কোর্সে বিপুল সংখ্যক সদস্য অংশ নেন।

১৫০ তম কোর্স অনুষ্ঠিত হয় ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ অক্টোবর ২০০২। একটানা ৪ দিনে অনুষ্ঠিত কোর্সের এটাই প্রথম ব্যাচ।



১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল, ২০০৫ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয় ২০০ তম কোর্স– কোনো মেথডের উদ্ভাবক কর্তৃক এককভাবে ক্লাস নিয়ে ২০০ কোর্স সম্পন্ন করার বিরল সাফল্য। এ উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ স্মারকের মোড়ক উন্মোচন হয় ১ নভেম্বর, ২০০৫।

জুন, ২০০৭-এ অনুষ্ঠিত হয় ২৫০ তম কোর্স। কোয়ান্টাম চেতনা বিকাশের যাত্রায় সূচিত হয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।



২০০২ সালে লন্ডনে মেডিটেশনের ওপর ৪ দিনব্যাপী সেমিনারের মধ্য দিয়ে দেশের বাইরে বিস্তৃত হলো কোয়ান্টাম মেথডের পরিসর। ২০০৬ এবং ২০০৮ সালেও লন্ডনে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।



২০০৯ সালকে বলা যায় ফাউন্ডেশনের উড়াল দেয়ার বছর। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ক্ষেত্রে এ বছর সৃষ্টি হয় এক অভূতপূর্ব জোয়ার। বছরের প্রথম কয়েক মাসেই কক্সবাজার সুনামগঞ্জ বগুড়া কুমিল্লা হবিগঞ্জের মতো নতুন নতুন জায়গায় প্রথম কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য জায়গার কোর্সগুলোতেও অংশ নেয় বিপুলসংখ্যক মানুষ।



কোয়ান্টাম মেথড ৩০০ তম কোর্স মেডিটেশন চর্চার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। উদ্ভাবক কর্তৃক এককভাবে ক্লাস নিয়ে ৩০০ কোর্স সম্পন্ন করা বিশ্বে এই প্রথম। জুলাই ২০০৯-এ ৩০০ তম ব্যাচের পর আগস্ট মাসেই অনুষ্ঠিত হয় নতুন ভেন্যুতে চলমান ৩০০ ব্যাচের ক্লাস। আর অক্টোবরে হয় আরো বড় কলেবরের ৩০০ উচ্ছ্বাস ব্যাচ।



শিল্পী রশিদ চৌধুরী শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর। এতে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন বিশিষ্ট শিশু সংগঠক রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান, চিত্রশিল্পী আমিনুল ইসলাম, সাবেক সচিব কাজী ফজলুর রহমান প্রমুখ।



১৯৯৩ সাল থেকেই নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ। ২০০৮ সালে বসুন্ধরা সিটি গ্রান্ড হলে ২ হাজারেরও বেশি গ্রাজুয়েট নিয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।



১৯৯৯ সাল থেকে ফাউন্ডেশন প্রতি রমজানে আয়োজন করছে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। একটানা ৮ দিনে ৪৫ ঘণ্টায় মৌনতা ও ধ্যানের স্তরে তরজমাসহ কোরআন তেলাওয়াত শোনার এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন সারাদেশের প্রায় ৩ হাজার মানুষ। ২০০৯ সালে দুই দিনে অনুষ্ঠিত আখেরি দোয়ায় অংশ নেন ৩,৩০০ মানুষ।



আলোচনা, মেডিটেশন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব নিয়ে সাজানো ৩ ঘণ্টাব্যাপী কার্যক্রম প্রজ্ঞায়ন। ২০০৬ সাল থেকে মাসিক গ্রাজুয়েট যৌথ মেডিটেশন নামে শুরু হলেও পরবর্তীতে গ্রাজুয়েট প্রজ্ঞায়ন নামে এ কার্যক্রমটি প্রতি মাসের ১ম বুধবার অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিলো।



আত্মনির্মাণ ও সৃষ্টির সেবা কার্যক্রমকে আরও সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে গঠিত হয় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের আত্ম উন্নয়নমূলক প্রতিটি প্রোগ্রাম সদস্যদের নৈতিক, আত্মিক পুনর্জাগরণ ও মানবিক মহাসমাজ নির্মাণের লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে।



কোয়ান্টায়ন, কোরআন শ্রবণ, যৌথ হিলিংয়ের নিয়মিত মাসিক আয়োজন কোয়ান্টায়নে জালালি। কর্মদিবসে অনুষ্ঠিত হলেও গড়ে উপস্থিত থাকেন হাজারো অংশগ্রহণকারী।

অক্টোবর ২০০৯ থেকে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট এবং প্রো-মাস্টারদের জন্যে আলাদাভাবে যথাক্রমে প্রজ্ঞা জালালি এবং সজ্ঞা জালালি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।



১৯৯৩ সাল থেকে ঈদুল ফিতরের দিন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে গুরুজীর সঙ্গে ঈদ মোলাকাত। এতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ে শামিল হন সব বয়সী নারী-পুরুষ। ২০০৯-এর ঈদ মোলাকাতে ছিলেন সাড়ে ৭ হাজার মানুষ।

৩ যুগের এ দীর্ঘযাত্রায় কোয়ান্টামের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে বিশ্বাস। সাধারণভাবে যা কিছু অসম্ভব মনে করা হতো, আমরা বিশ্বাস করতাম এগুলো করা সম্ভব। উপকরণের স্বল্পতা বা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাও আমাদের কাজকে দিয়েছে নতুন গতি। বিরোধে না জড়িয়ে বিকল্প পথে এগিয়ে গেছি। শোকর আর সবর আমাদের ভিত্তিকে করেছে মজবুত। নতুন প্রজন্মের বিশ্বাস হচ্ছে কোয়ান্টামের পক্ষেই অনেক কিছু করা সম্ভব।

গুণীজন ভাবনা

ধ্যান : আত্ম আবিষ্কারের হাতিয়ার

সৈয়দ আলী আহসান



মেডিটেশন বা ধ্যান হচ্ছে আত্ম আবিষ্কার ও আত্ম অনুভবের মাধ্যম ও হাতিয়ার। অতএব, ধ্যানকে পবিত্র মনে করতে হবে। প্রতিটি মানুষকে আমি ধ্যানরত দেখতে চাই। যখনই সে সময় পাবে তখন কিছুটা সময়ের জন্যে হলেও সে যেন ধ্যানে নিমগ্ন হয়। আর যেকোনো উপাসনা হোক– তার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে মনোযোগ ও একাগ্রতা।

আজ চতুর্দিকে যে সন্ত্রাস ও মিথ্যাচারের রাজত্ব, চারদিকে মানুষের অবমাননার চেষ্টা– এ মিথ্যাচার ও আত্মার অবমাননা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যে প্রত্যেকের উচিত তার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে দেখা। সকলের উচিত ভেবে দেখা– কেন আমি জন্মেছি, আমার অস্তিত্বের দাবি কী। এ আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্ম অনুসন্ধানের মাধ্যমেই আমরা পরম সত্যকে জানবো, আনন্দকে পাবো, বিশ্বাসকে অনুভব করবো। ধ্যানের সার্থকতা এখানেই।

[জাতীয় অধ্যাপক বিশিষ্ট সাহিত্যিক মরহুম সৈয়দ আলী আহসান। সাবেক ভিসি, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন]

ধ্যানমগ্নতার প্রকাশ কোয়ান্টাম সচেতনতা

ড. সৈয়দ সফিউল্লাহ



আধুনিক বিজ্ঞান এখন কোয়ান্টাম সচেতনতার কথা বলে। কোয়ান্টাম সচেতনতার স্তরে পৌঁছতে হলে কোয়ান্টাম মেথড বা যেকোনো কার্যকরী মেডিটেশন পদ্ধতির মাধ্যমে একাগ্রচিত্ত হয়ে আত্মনিমগ্ন হতে হবে।

[বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র প্রফেসর ড. সৈয়দ সফিউল্লাহ। গবেষণামূলক বিজ্ঞান গ্রন্থ 'অস্তিত্বের অতলান্তে', 'কোয়ান্টাম সচেতনতা' এবং 'স্বপ্ন ও সচেতনতা'-র লেখক]

মূল্যবোধের পুনর্জাগরণই হচ্ছে আসল শক্তি

প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী



আমাদের প্রয়োজন মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ। যদি মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ঘটে, যদি এমন যোগ্য নেতৃত্ব আসে যিনি প্রকৃত মূল্যবোধে উজ্জীবিত– দেশে সুষ্ঠু প্রশাসন ও সুশাসন নিশ্চিত করবেন এবং সেবক হিসেবে জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন তাহলে আমাদের দেশও ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

সুতরাং এই যে চাওয়া, একান্তভাবে চাওয়া, আমাদের চিন্তা-চেতনার সমস্ত শক্তি দিয়ে চাওয়া– এর ফল পাওয়া যাবেই। আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি– অবক্ষয়, বৈষম্য এবং অবিচার দূর করার সংকল্পের মাধ্যমে সবাই মিলে আমরা সুখীসমৃদ্ধ একটি দেশ গড়ছি।

[বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কলামিস্ট প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি]

সত্যিই ভালো থাকা যায়

ড. মিজানুর রহমান শেলী



মনস্তত্ত্ববিদরা দেখেছেন, প্রতিটি ব্যর্থতার নেপথ্যে পারিপার্শ্বিক কারণের চেয়েও ব্যক্তির নেতিবাচক চিন্তা-আশঙ্কা-সংকোচ-সংশয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। 'ব্যর্থ হবো' মনে করলে ব্যর্থতার সম্ভাবনা প্রবল হয়। আবার 'সফল হবো' ভাবলে ব্যর্থতা যদি চলেও আসে তা কাটিয়ে ওঠা যায়, নতুনভাবে সাফল্যগাঁথা রচনা করা যায়।

যেমন সকালে 'ভালো আছি' বলে দিন শুরু করলে সত্যিই সারাদিন ভালো থাকা যায়। আর ধ্যান বা মেডিটেশনের প্রথম প্রাপ্তিই আত্ম আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে নিজের ভেতরের সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করা যা তাকে অমর করবে, ইতিহাসের পাতায় কালজয়ী হিসেবে তুলে ধরবে।

[বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক ড. মিজানুর রহমান শেলী সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিডিআরবি)-র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।]

জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে

এম হাফিজউদ্দিন খান



প্রশাসনিক জবাবদিহিতার একটা প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া হলো ন্যায়পাল নিয়োগ। ন্যায়পালের কাজ হলো প্রশাসনের হাতে সাধারণ মানুষের যেকোনো হয়রানির প্রতিকার করা, প্রতিরোধ করা।

সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতার বিষয় নিয়ে আমাদের এখনই ভাবা উচিত। কারণ এই দেশে, এই সমাজেই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে থাকতে হবে। তারা যাতে একটা ভালো পরিবেশে, ভালো হয়ে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা তো আমাদেরই করে যাওয়া উচিত।

[ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম হাফিজউদ্দিন খান। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং প্রাক্তন কম্পট্রোলার এণ্ড অডিটর জেনারেল অফ বাংলাদেশ]

উন্নত জীবনের জন্যে কোয়ান্টাম

বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম



কোয়ান্টাম স্বপ্ন দেখায়-বিশ্বের অন্যতম সেরা জাতিতে উত্তরণ ঘটবে আমাদের। এটি খুব বড় একটি ব্যাপার। পাশাপাশি আত্মউন্নয়নমূলক ও সেবামূলক নানা কাজের মাধ্যমে মানুষকে উন্নততর জীবনের দিকে পরিচালিত করছে কোয়ান্টাম। কোয়ান্টামের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা অনুশীলন করে মানুষ যে উপকৃত হচ্ছে তার সুফল সমাজ এবং দেশকেও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। কোয়ান্টাম চেতনাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া প্রয়োজন যাতে একটি সুন্দর সমাজ নির্মাণের এ প্রচেষ্টার সাথে আরো বেশি সংখ্যক মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে।

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম। তিনি কোয়ান্টাম মেথডে ২৭৮

কোয়ান্টাম নতুন সহস্রাব্দের জীবনযাপনের বিজ্ঞান

সুস্থ, সুন্দর ও সার্থক জীবনের জন্যে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি। সমকালীন মানুষের মূল সমস্যা এখানেই। সকল চিন্তা একদেশদর্শিতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। একজন একাউন্টেন্ট মনে করেন হিসাববিজ্ঞান দিয়েই তিনি সকল সমস্যার সমাধান করবেন, প্রকৌশলী মনে করেন তার প্রযুক্তি-জ্ঞানই জীবনের সমস্যার সমাধান করবে। চিকিৎসক মনে করেন ওষুধ খেলে বা অপারেশন করলেই শরীরের সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আমলা মনে করেন সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি তারই হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশেষ কোনো বিষয়ে ডক্টরেট করে মনে করেন পৃথিবীর সকল জ্ঞান তার আয়ত্তে চলে এসেছে। একজন আলেম, পুরোহিত মনে করেন ধর্মাচারই সব সমস্যার সমাধান করবে। একজন তরুণ বা তরুণী মনে করে বহুজাতিক কোম্পানির একটা চাকরি পেলে জীবনের সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু সার্থক ও পরিতৃপ্ত জীবন আর এই ভাবনাগুলোর মধ্যে ব্যবধান এক সমুদ্রের। সাধারণ মানুষ এই ব্যবধান অতিক্রম করতে না পারার কারণেই রোগ, শোক ও হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

অথচ সবকিছু মিলিয়েই হচ্ছে জীবন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুস্থ জীবনের এক চমৎকার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছে, 'শারীরিক রোগব্যাধি বা অক্ষমতার অনুপস্থিতিই সুস্বাস্থ্য নয়। সুস্বাস্থ্য হচ্ছে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিক সুখ ও প্রাণ-প্রাচুর্য।' অর্থাৎ শুধু পুষ্টিকর খাবার আর ওষুধই একজন মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করতে পারে না। অথবা সারাক্ষণ মুভি দেখলে বা টিভির সামনে বসে থাকলেই মানসিক সুখ অর্জিত হয় না। আবার পরিবারের বা চারপাশের মানুষ অশান্তিতে থাকলেও মানুষ সুখী হতে পারে না। তেমনি বৈষয়িক সাফল্য এলো কিন্তু আত্মিক শূন্যতা যদি থাকে তাহলেও জীবন পরিতৃপ্ত হয় না। অর্থাৎ জীবনের কোনো প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে নয়, জীবনের সবগুলো প্রয়োজন সুন্দরভাবে পূরণ করতে পারলেই একজন মানুষ সুখী হতে পারে।

কোয়ান্টাম এ কথাই বলে যে, জীবনকে দেখতে হবে পরিপূর্ণরূপে। সঠিক জীবনদৃষ্টি ও জীবনযাপনের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করেই একজন মানুষ সুখী জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারে। অমর কথাশিল্পী লিও টলস্টয় যা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন–

`Most important of all the sciences one can and must have to learn is the science of living, so as to do the least evil and the greatest possible good.'

কোয়ান্টাম হচ্ছে সেই Science of Living যা বলে দেয় জীবনটাকে কীভাবে সুন্দর করা যায়, ভুল থেকে কীভাবে দূরে থাকা যায়, পাপ কত কম করা যায়, আর ভালো বা কল্যাণ কত বেশি করা যায়। তাই আমরা কোয়ান্টামকে বলি জীবনযাপনের বিজ্ঞান, জীবন আচরণের বিজ্ঞান। এ আলোয় আমরা আলোকিত হচ্ছি, আলোকিত করছি সাধারণ মানুষকে। পরিবর্তিত করছি নিজেদের ও অন্যদের জীবনকে।

সুস্থ জীবনের জন্যে প্রথম প্রয়োজন প্রশান্তি। যা নির্ভর করে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। সঠিক জীবনদৃষ্টির অভাব বা অবিদ্যাই মানুষের সকল দুঃখের কারণ। কোয়ান্টাম এ অবিদ্যার অন্ধকার থেকে একজন মানুষকে মুক্ত করে। প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি দূর করে তাকে সঠিক কর্মমুখী বা প্রো-একটিভ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। সে হয়ে ওঠে শোকর গোজার। প্রতিটি সমস্যাকে গ্রহণ করে চ্যালেঞ্জ হিসেবে। আত্মবিশ্বাস ও প্রজ্ঞার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যাকে রূপান্তরিত করে নতুন সম্ভাবনায়। দৃষ্টিভঙ্গি বদলে সে তার জীবনকেই বদলে দেয়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শরীর। স্বাস্থ্য যদি ঠিক না থাকে তাহলে অর্থ, বিত্ত, সবকিছুই অর্থহীন। হেনরি ফোর্ড আমেরিকার তার সময়ের সবচেয়ে বড় ধনকুবের ছিলেন। একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন– গত ৬ মাসে আপনার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী? তিনি বলেছিলেন, 'কয়েকদিন আগে আমি একটি ডিমের এক-চতুর্থাংশ খেয়ে তা হজম করতে পেরেছিলাম। এটাই আমার গত ৬ মাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।' ব্যবসার কোটি কোটি টাকা মুনাফার চেয়ে একটি ডিম খেয়ে হজম করতে পারাই তার ৬ মাসের স্মৃতিতে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এ থেকেই সুস্থতার গুরুত্ব আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

শরীরের ব্যাপারে কোয়ান্টাম যে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিয়েছে তা আমাদের ঐতিহ্যের নির্যাসে প্রণীত ও আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষিত।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রাচুর্য। প্রাচুর্য মানে অভাবমুক্তির অনুভূতি; যুক্তিসঙ্গত প্রতিটি চাওয়াকে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় পাওয়ায় পরিণত করার সামর্থ্য। প্রাচুর্যের কোয়ান্টাম পঞ্চসূত্র অনুসরণ করে হাজার হাজার গ্রাজুয়েট এখন এগিয়ে যাচ্ছেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাচুর্যের পথে।

চতুর্থ হচ্ছে পরিবার। পরিবার আমাদের সুখের মূল আকর। পরিবারভিত্তিক জীবনযাপনের মানসিকতা ইউরোপ আমেরিকাতে নেই বলেই সেখানে এত অনাচার, এত অশান্তি। যারাই পরিবারকে তুচ্ছ ভেবেছেন, পরিবারের বাইরে আনন্দ খুঁজতে গিয়েছেন, তারা পরিণামে প্রতারিত হয়েছেন, ভুল করেছেন, অশান্তিতে ভুগেছেন।

কোয়ান্টাম চেতনার সাফল্য হচ্ছে পরিবারকে সুখী পরিবারে রূপান্তরিত করা। অন্য কোনো চেতনাই আমাদের দেশে এভাবে পারিবারিক রূপ পায় নি।

পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আত্মিক। মানুষ জন্মগতভাবেই উপাসনা করতে চায়, প্রার্থনা করতে চায়। চায় উচ্চতর কারো কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে। এক অসীম ও পরম সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের আকুতি মানুষ তার জেনেটিক ব্লুপ্রিন্টেই বহন করছে। তাইতো সবকিছু পাওয়ার পরও কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা থেকে যায়। এ অপূর্ণতা এবং অতৃপ্তির কারণেই ৭০ বছর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের বিনাশ ঘটেছে।

১৯৬৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে মহা ধুমধামে বিপ্লবের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছিলো। যা নিয়ে টাইম ম্যাগাজিন একটি কভার স্টোরি করলো– 50 Years of Soviet Union। তাতে বলা হয়– সোভিয়েত ইউনিয়নে সবচেয়ে শ্রদ্ধার জায়গা হলো লেনিনের মাজার। সবসময় লোকজন সেখানে যায়। এক বৃদ্ধা এসেছেন তার মেয়ে এবং মেয়ের জামাইকে নিয়ে। এক সাংবাদিক তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন যে, লেনিনের আশীর্বাদ নিতে এসেছি। তার আশীর্বাদ পাওয়া গেলে আমার মেয়ে আর জামাতার জীবনটা সুখের হবে, সুন্দর হবে।

৪৮ বছর বয়স্ক এ মহিলার জন্ম হয়েছে বিপ্লব পরবর্তী এমন এক সোভিয়েত ইউনিয়নে যেখানে নাস্তিক্যবাদ ছিলো রাষ্ট্রীয় ধর্ম। তারপরও তার মাথা থেকে সমর্পণের চিন্তা দূর করা যায় নি। যখন আর কাউকেই পান নি তখন লেনিনকেই দেবতা ভেবে তার মাজারে নিয়ে এসেছেন মেয়ে আর জামাতাকে। এটাই মানবীয় প্রকৃতি। আত্মিক শূন্যতা সে কোনো না কোনোভাবে পূরণ করবে।

কোয়ান্টামে এই আত্মিক শূন্যতা পূরণের চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে। কোয়ান্টাম প্রত্যেকের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেককে উৎসাহিত করে আন্তরিকভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনে। কারণ সত্যিকারের ধর্ম পালনের মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে। আর ধ্যানের মাঝেই সে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পিত করতে পারে পরম সত্তার কাছে। লাভ করতে পারে সীমাহীন আত্মিক প্রশান্তি।

তাই নিঃসংশয়ে বলা যায়, কোয়ান্টাম মানবিক চেতনা শাশ্বত ধর্মীয় বীজ থেকে অঙ্কুরিত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক নির্যাসে লালিত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোয়ান্টামের দিক-নির্দেশনা ধর্মসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত। সুখী ও প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর সুস্থ মানুষের সবটুকু প্রয়োজন পূরণের প্রক্রিয়াই রয়েছে কোয়ান্টামে। তাই কোয়ান্টামই হচ্ছে নতুন সহস্রাব্দে আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের বিজ্ঞান, যা দিয়ে সে তার মেধাকে বিকশিত করবে, জীবনের অঙ্ক মেলাবে, জীবনকে ভরিয়ে তুলবে প্রশান্তি ও প্রাচুর্যে। ■

কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট

www.quantummethod.org.bd

You are not alone–আপনি একা নন। আলোকিত জীবনের অভিযাত্রায় আপনার রয়েছে হাজারো সহযাত্রী–এ চেতনাকেই লালন করছে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকেই আপনি পৌঁছে যেতে পারেন একটি প্রশান্তিময় আশ্রয়স্থলে। যেখানে শাশ্বত সত্যের বাণী পুনরুজ্জীবিত করবে আপনাকে। ঘুচিয়ে দেবে সব নিঃসঙ্গতা হতাশা নিরাপত্তাহীনতা।

কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট যাত্রা শুরু করে ২০০২ সালে। সেই থেকে নানা পরিমার্জন-পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে ওয়েবসাইট। ২০১২ সালের এপ্রিলে যখন এ স্মারকের পরিমার্জিত সংস্করণ বেরুচ্ছে, তখন এ পথচলা এগিয়েছে আরো খানিকটা। সংযোজিত হয়েছে আরো কিছু ফিচার।

শুরু করতে পারেন আজ থেকেই

মেডিটেশনের ব্যাপারে আগ্রহী হলে আপনি শুরু করতে পারেন আজ থেকেই। প্রথমে Learn Meditation বা 'মেডিটেশন শিখুন' সেকশনটি ভালোভাবে পড়ুন। এরপর ডাউনলোড সেকশন থেকে চর্চা শুরু করুন। বাংলা ছাড়াও আছে ইংরেজি Relaxation-এর অডিও এবং বেশ কয়েকটি মেডিটেশনের ইংরেজি অনুবাদ।

ফ্রি ডাউনলোড

কপিরাইটের মাধ্যমে জ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রাখায় বিশ্বাসী নয় কোয়ান্টাম। ওয়েবসাইটের হোমপেজের নিচের অংশে তাই ছোট্ট করে লেখা আছে Copyright belongs to humanity–স্বত্ব মানবতার জন্যে। ফ্রি ডাউনলোড কোয়ান্টাম ওয়েবসাইটের সবচেয়ে জনপ্রিয় সেকশন। কোয়ান্টামের বইগুলো ছাড়াও এখান থেকে স্মারক, বুলেটিন, ব্রোশিউর, কণিকা, থিম-সং সহ সবকটি মেডিটেশনের অডিও ফাইল ডাউনলোড করতে পারবেন। ফলে এখন যে কেউ ঘরে বসেই মেডিটেশন চর্চা শুরু করে দিতে পারেন; সচ্ছন্দে পেতে পারেন কোয়ান্টামের যেকোনো প্রকাশনা।

কেন মেডিটেশন

Feelings বা 'অনুভূতি' সেকশনে রয়েছে মেডিটেশন করে সুস্থ সফল জীবনের অধিকারী হয়েছেন এমন শত শত কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের কথা। এসব পড়ে আপনি নিজে যেমন উজ্জীবিত হবেন তেমনি পারবেন আপনার পরিচিত পরিমণ্ডলের যে কাউকে মেডিটেশনে আগ্রহী করে তুলতে।

Why Meditation–কেন মেডিটেশন বিভাগে আছে টেনশন-স্ট্রেস থেকে মুক্তি, ব্যথা ও রোগমুক্তি, স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধি, নেশা দূর ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেডিটেশনের কার্যকারিতার বৈজ্ঞানিক প্রমাণসমৃদ্ধ কয়েকশ প্রবন্ধের রেফারেন্স।

ভিডিওক্লিপ

ওয়েবসাইটে এখন প্রায় প্রতিটি কোর্সেরই প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানের ভিডিওক্লিপ ছাড়াও আছে কোয়ান্টামের নিজস্ব প্রযোজনার সব ভিডিও আইটেমগুলোর ভিডিও। ডাউনলোড করে তো দেখা যাবেই, ইউটিউব থেকে সরাসরি প্লে করেও দেখা যাবে।

আপডেটেড থাকুন

ওয়েবসাইটের ইভেন্ট ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে জেনে নিতে পারেন কোয়ান্টামের পরবর্তী প্রোগ্রামগুলোর সর্বশেষ সময়সূচি। এছাড়া হোমপেজেই পাবেন কোয়ান্টাম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর ও ঘোষণা।

আপনার প্রশ্ন, গুরুজীর জবাব

ওয়েবসাইটে এখন আছে হাজারেরও বেশি প্রশ্নোত্তর নিয়ে সংকলন 'আপনার প্রশ্ন, গুরুজীর জবাব'। গত ২০ বছরে কোয়ান্টামের সকল কোর্স, ওয়ার্কশপ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে গুরুজীর যেসব প্রশ্নোত্তর আলোচিত হয়েছে তা বাংলায় পাওয়া যাচ্ছে। পেজটি সার্চেবেল হওয়ায় প্রয়োজনীয় টপিকে ক্লিক করেই পাঠক পেয়ে যাচ্ছেন সে সংক্রান্ত সব প্রশ্নোত্তর। যেকোনো প্রশ্ন পাঠক পাঠাতেও পারছেন ফিডব্যাকের মাধ্যমে।

আজকের অটোসাজেশন

আজকের অটোসাজেশন ছাড়াও অটোসাজেশনের ব্যাখ্যা ও প্রক্রিয়াসহ আছে বিষয়ভিত্তিক সুবিন্যস্ত ১০০১টি অটোসাজেশন। বাংলা ও ইংরেজি দুটোতেই।

উইশবোর্ড

সমস্যামুক্তি ও কল্যাণ কামনার জন্যে এখন আপনার পাশে রয়েছে লক্ষ সহযাত্রী। এজন্যে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইটের উইশবোর্ডে আপনার প্রার্থনাটি লিখে জানানোটাই যথেষ্ট।

কোরাম

সৃজনশীল ভাবনাগুলোকে একে অপরের সাথে শেয়ার করার জন্যে এ বছর ওয়েবসাইটের নতুন সংযোজন হলো কোরাম–কোয়ান্টাম ফোরাম। কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার, এসোসিয়েট–সবাই এখন এখানে লিখতে পারছেন, পারছেন নিজের যেকোনো জানার ঘাটতিকে অন্যদের মাধ্যমে পুষিয়ে নিতে।

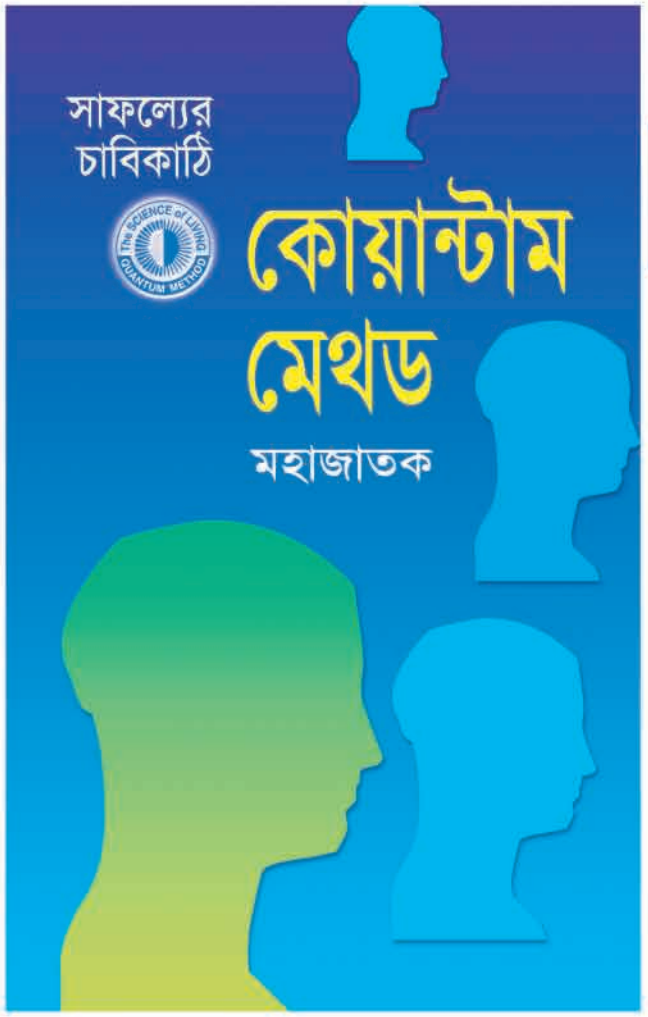
ব্লাড ফোরাম

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে যারা রক্তদান করছেন তাদের প্রোফাইল নিয়ে ব্লাড ফোরাম করার প্রথম ধাপ হিসেবে এখন তাদের ছবিসহ নামের তালিকা দেখা যাচ্ছে ওয়েবসাইটে।

প্রশান্তি-সুস্বাস্থ্য-সাফল্যের বাণীকে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট। প্রযুক্তির আকর্ষণীয় প্রয়োগ, সহজ ব্যবস্থাপনা ও বিষয়বস্তুর সমৃদ্ধির কারণে দিন দিন বাড়ছে ওয়েবসাইটের জনপ্রিয়তা। শুধু প্রবাসী বাঙালিরা নয়, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কোয়ান্টাম সম্পর্কে জেনে কৌতূহলী হয়ে উঠছেন নানা দেশের মানুষ। জীবনযাপনের বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও দিক-নির্দেশনা পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে।

প্রতিবেদক : শাহেদ হাসনাইন রাবিত

বিশ্ববাসীর কাছে এখন কোয়ান্টাম চেতনা পৌঁছে যাচ্ছে নিমেষেই। মেডিটেশনের সবগুলো সিডি বই ফ্রি ডাউনলোড করা যাচ্ছে, দোয়া করা ও চাওয়া যাচ্ছে উইশবোর্ডে, আর নিজের সৃজনশীল ভাবনাগুলোকে মেলে ধরা যাচ্ছে কোরামে।



নতুন সহস্রাব্দের প্রয়োজন পূরণে

কোয়ান্টাম মেথড

এই একটি মাত্র বই
আপনার জীবন
বদলে দিতে পারে

অতীন্দ্রিয় জগতের প্রবাদ পুরুষ

মহাজাতক

সুদীর্ঘ সাধনার ফসল তুলে দিয়েছেন
আপনার হাতে

আপনি এখন অনায়াসে লাভ
করতে পারেন

প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য, সাফল্য ও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা

১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের
সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ
নব্বইয়ের দশকে বাংলা ভাষায়
সর্বাধিক পঠিত
নন-ফিকশন

২২৪ পৃষ্ঠা সাদা কাগজে মুদ্রিত বইটির মূল্য মাত্র **২১০** টাকা
পেপারব্যাক সংস্করণের মূল্য মাত্র **৫৪** টাকা

প্রকাশনায় :
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০

মেডিটেশন সহায়ক বই, ক্যাসেট/সিডি, কণিকা বা
কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণের জন্যে যোগাযোগ করুন

যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩১৯৩৭৭ **মোবাইল :** ০১৭১১-৬৭১৮৫৮, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩
চট্টগ্রাম : ০৩১-৬৫৩৬৮৮, ০১৭১১-৩৯৩০১০ **সিলেট :** ০৮২১-৭১১৬১২, ০১৭১১-২৮০৬৫২ **রাজশাহী :** ০৭২১-৭৭১৫৫০, ০১৭১১-১০৪২৮৯
E-Mail : info@quantummethod.org.bd **Website :** www.quantummethod.org.bd